মহাস্থবির এর গল্পসমগ্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

কালীপুজোর রাত্রি

জগন্নাথ সরকার হঠাৎ একেবারে সাহেব বনে গেল। একটু কারণও ছিল। সে চাকরি করত ইংরেজটোলার এক বাঙালী দোকানে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চাকরি। সোমবার থেকে শনিবার অবধি দশটা-আটটা, আর রবিবার দোকান সাফ্ করবার নাম করে আধখানা দরজা খোলা হোতো। সেই ফাঁক দিয়ে একবার কোনো খদ্দের দোকানে ঢুকলে তার আর সওদা না করে বেরুবার উপায় ছিল না।

জগন্নাথ ধুতি পাঞ্জাবি আর চটিজুতো পরেই কাজে যেত কিন্তু তার মনিব একদিন ডেকে বল্লেন—ওহে, এবার থেকে তোমায় কোট প্যান্টুন পরে আসতে হবে। মেমসাহেবরা ধুতি পছন্দ করে না।

জগন্নাথ বল্লে—মশাই, বাইশ টাকায় ধুতিরই খরচ কুলোয় না—

মনিব বল্লে—তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, সে বন্দোবস্ত করা যাবে।

পরের মাস থেকে জগন্নাথের ত্রিশ টাকা মাইনে হয়ে গেল। কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারলে যে ত্রিশ টাকায় সাহেবীয়ানা আর বাঙালীয়ানা দুই একধারে চালান মুশকিল। ধোপার খরচ বিস্তর, তার ওপরে গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ ইত্যাদি নানা রকমের বন্ধনে দেহকে বাঁধতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়। ওদিকে আত্মা ও দেহের মধ্যে যে পৈতৃক বন্ধন বর্তমান তা অটুট রাখা দায় হয়ে ওঠে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একদিন বুক ঠুকে মনিবকে বলে ফেল্লে—মশায় ত্রিশ টাকায় তো কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

মনিব তার আস্পর্ধার কথা শুনে গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন—ত্রিশ টাকার বেশি দিলে আমার কুলিয়ে ওঠা মুশকিল।

অগত্যা এই দুই অকুলনের মধ্যে সামঞ্জস্য করে জগন্নাথ ধুতি চাদরের খরচটা কমিয়ে ফেল্লে। কর্মস্থান থেকে বাড়িতে ফিরে ফরসা পোশাক ছেড়ে দিয়ে সে ময়লা ইজার কোট পরত। সেই পোশাকেই আড্ডা দিতে বেরুত; এমন কি বাজার করা, শোয়া সবই সেই পোশাকেই চলত।

বন্ধুবান্ধবেরা জগন্নাথের হঠাৎ এই হাল-চালের পরিবর্তন দেখে বলত—জগা ছোঁড়া একেবারে সাহেব বনে গেল।

বন্ধুদের মন্তব্য শুনে জগন্নাথ কায়দা করে বাঁকাভাবে বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলত—ড্যামইট—।

তার ইংরাজী উচ্চারণের কায়দা দেখে আড্ডাধারীদের বুক গর্বে ফুলে উঠত—তারা ভাবত, তবু যা হোক, আমাদের মধ্যে অন্ততঃ একটাও লায়েক হোলো।

সেবার দুর্গাপুজো পড়েছিল কার্তিকমাসে। পুজোতে জগন্নাথের ছুটি নেই। সে সময় দেশী খদ্দেরের ভিড় বেশী, আর সাহেবরা নাকি পুজোর সময় দোকান বন্ধ থাকাটা মোটেই পছন্দ করে না। এই সব কারণে জগন্নাথের মনিব রাতে আরও একঘণ্টা বেশি দোকান খোলা রাখেন। জগন্নাথের বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটা বাজে। বাড়িতে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে সে আড্ডায় গিয়ে জোটে আর বারোটা অবধি সেখানে বসে মনিবের সাতপুরুষ উদ্ধার করে বাড়ি ফেরে—এইটুকু ছিল তার পুজোর আনন্দ।

সেদিন কালীপুজো। ক'দিন থেকে আড্ডাধারীরা মহা উৎসাহে তুবড়ী তৈরী করতে লেগে গিয়েছে। কাজে যাবার সময় জগন্নাথ একবার আড্ডায় ঢুঁ দিয়ে বলে গেল—আমি না এলে তুবড়ি জ্বালাস্ নি।

জগন্নাথ কিন্তু সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারলো না। বিকেল থেকে একটা বেয়াড়া খদ্দের জুটে আটটা পর্যন্ত জ্বালিয়ে চলে যাওয়ার পর জগন্নাথ রোজদিনের মতো ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এল।

কার্তিকের শেষাশেষি। রাত্রে বেশ হিম পড়ে বলে আজকাল সে কোটের ওপর একটা ওভারকোট চড়িয়ে আড্ডা দিতে বেরোয়। বাড়িতে ফিরে তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে আড্ডায় গিয়ে সে দেখলে তুবড়িগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর, যে গোটা কয়েক আছে তা সরলার বাড়িতে গিয়ে জ্বালানো হবে।

সরলা জগন্নাথদের প্রধান আড্ডাধারী চৈতন্যকিঙ্করের রক্ষিতা। আড্ডার অধিকাংশ সেবায়েতেরই সেখানে অবাধ গতিবিধি থাকলেও জগন্নাথ কখনো সেখানে যায় নি। এ বিষয়ে তার চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। পৃথিবীর অধিকাংশ চরিত্রবান্ লোকের মতো চরিত্র হারাবার সুযোগ সে বেচারীর আজও হয়ে ওঠে নি। তুবড়ি পোড়ান শেষ হয়ে গিয়েছে, আর আড্ডাও এখুনি ভাঙবে শুনে মনটা দমে গেল। সে বলে—তোদের জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে এলুম আর তোরা কিনা চল্লি!—ড্যাম ইট।

বন্ধুরা বল্লে—তুইও চল না সরলার বাড়ি।

জগন্নাথ বললে—না না দূর,—আমি কি যাব।

চৈতন্য বল্লে—চল্ না, তুই তো কখনো যাস্ নি।

যাবার ইচ্ছা যে তার একেবারে ছিল না তা নয়। সে একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে বল্লে—এই বেশে!

গোবিন্দ বল্লে—তাতে কি হয়েছে? সরলা সে রকম লোকই নয় যে কিছু মনে করবে।

রামহরি উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল—সত্যি বলতে কি, ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি কিন্তু আমাদের সরলার মতো মেয়েমানুষ দেখি নি। চৈতন্য ছাড়া সে আর কাউকে জানে না। বেশ্যার মধ্যে সতী পাওয়া যায় না কে বলে?

জগন্নাথ বল্লে—চল্ যাই, দেখে আসি তোদের সরলাকে।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় বন্ধুরা মিলে সরলার বাড়ির দিকে অভিযান করলে। সবার হাতেই একটা কি দুটো তুবড়ি। রাস্তা থেকে সের পাঁচেক মাংস কিনে নেওয়া হোলো। ঠিক হোলো যে অনুপানটা সরলার বাড়ি থেকেই আনতে দেওয়া হবে।

চিৎপুর রোডের ট্রাম তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় ভিড়ের অন্ত নেই, অনেকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চলেছে। মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি হোলেই অত্যন্ত অনিচ্ছায় একবার তারা ঘাড় নামিয়ে ধাক্কাটা সামলে আবার ঊর্ধ্বমুখী হোয়ে চলে। চারিদিকে দুম্‌দাম্‌ পটকার শব্দ; বাতাস বারুদের গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দিয়ে জগন্নাথের দল সরলার বাড়িতে ঢুকল।

সরলার বাড়ি চিৎপুর রোডের উপর। বাড়িতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা ঘর। সেদিন সব ঘরই ভর্তি। এক একটা ঘরে এক এক রকমের হল্লা। শহরের প্রায় শ'দুয়েক তান্ত্রিক সেখানে কারণ সলিলে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই এ রকম হট্টগোল শুনে জগন্নাথ প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল, কিন্তু পাছে বন্ধুরা নাবালক মনে করে এই ভয়ে কোনো মন্তব্য না করে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল।

সরলার ঘর একেবারে তেতলায়। ছাদের উপরে এই একখানি মাত্র ঘর। তাদের দল সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ছাদে উঠে সরলার ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। সরলা তখন ঘরের দরজা খুলে বাতি জেলে একজন পুরুষের গলা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। সে দৃশ্য দেখে চৈতন্যকিঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে হাঁক দিলে—সরলা!

সরলার কোনো সাড়া নেই। চৈতন্য আবার হাঁকলে—সরি!

এবারেও কোনো সাড়া না পেয়ে চৈতন্য ঘরের মধ্যে ঢুকে সরলার হাতখানা সেই লোকটার গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে হিঁচড়ে টেনে তুল্লে। সরলা দাঁড়াতে পারছিল না; সে টলে' দরজায় হেলান দিয়ে বল্লে—দুপুরবেলা বড্ড মদ খেয়েছিলুম, ভারি নেশা ধরেছে।

চৈতন্য বল্লে—ওটা কে?

—ও গোপাল।

চৈতন্য গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে বল্লে—আবার ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়েচিস্‌—আজ ওকে মেরে ফেলব।

সরলা চৈতন্যের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বল্লে—দেখ, কেলেঙ্কোরী কোরো না। দুপুরবেলা এখানে বেড়াতে এসে এক বোতল মদ আনিয়ে খেলে; এখুনি নেশা ছাড়লেই চলে যাবে। ও তোমার কি ক্ষেতিটা করেছে শুনি?

—আচ্ছা দেখছি—বলে চৈতন্য ছাদে বেরিয়ে এসে বল্লে—মাংস আনা হয়েছে, রাঁধবার জোগাড় কর্‌।

ছাদের কোণে একটা উনুন ছিল, সরলা তাতে আগুন দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ওদিকে চৈতন্য মাংস হজম করবার আরক আনতে দেবার জন্য ঘন ঘন রামচরণকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে।

উনুনে মাংস চড়িয়ে দেবার পর চৈতন্য বল্লে—এবার তুবড়িগুলো জ্বালান যাক।

সমস্ত ব্যাপারটা জগন্নাথের মন্দ লাগছিল না। চৈতন্যের প্রস্তাব শুনে সে উৎসাহিত হয়ে বল্লে—আমি তুবড়িতে আগুন দেব।

তাড়াতাড়ি ওভার কোটটা খুলে ছাদের ওপরে ফেলে গোটা তিনেক তুবড়ি তুলে নিয়ে জগন্নাথ রাস্তার দিকের আল্‌সের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে এল। আরও দু'একজন তুবড়ি ধরাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল কিন্তু জগন্নাথ তাদের থামিয়ে দেশলাই নিয়ে অগ্রসর হলে পেছন থেকে বলে উঠল,—দেখব জগা, এক কাঠিতে ধরাতে—

এক কাঠিতেই একটা তুবড়ি ধরিয়ে জগন্নাথ পেছু হটে এল। একটার পর একটা, তারপর আর একটা, এমনি করে তিনটে তুবড়ি হুস্‌ হুস্‌ করে জ্বলে গেল। তখনো গোটাকয়েক তুবড়ি বাকি, জগন্নাথ আরও তিনটে তুলে নিয়ে আলসের কাছে গিয়ে শুনতে পেলে রাস্তায় যেন ভারী গোলমাল হচ্ছে। গোলমাল শুনেই সে তড়াক করে পিছু ফিরে এসে বল্লে—রাস্তায় ভয়ানক গোলমাল হচ্ছে।

রাস্তার গোলমাল ক্রমেই বাড়তে লাগল। বন্ধুদের মধ্যে আর একজন সাহস করে রাস্তার দিকে উঁকি মেরে ফিরে এসে ভয়ে ভয়ে বল্লে—গোলমাল, ভারি গোলমাল।

সবাই বল্‌তে লাগল—ব্যাপার কি ? এত গোলমাল কিসের ?

সরলা এতক্ষণ এক জায়গায় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে বাজী পোড়ান দেখছিল। হঠাৎ সে ছুটে আল্‌সের ধারে গিয়ে তখুনি ফিরে এসে বল্লে—সর্বনাশ হয়েছে। নিচের তলায় বাজীর দোকানে আগুন ধরে গেছে। আল্‌সেতে কখনো তুবড়ি জ্বালায়—

চৈতন্য হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে—দোকানটা কার ?

এ পাড়ার গুণ্ডাদের, সাংঘাতিক লোক ওরা।

রাস্তায় তখন গোলমাল বেশ পাকিয়ে উঠেছে। আগুন—আগুন,—বের করে নিয়ে আয়—এই সব চীৎকারে রাস্তা সরগরম।

ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয় বুঝতে পেরে জগন্নাথ তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা পরে, একটু অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছাদের অন্য এক ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে দোতলার এক সারের ঘরগুলো সব দেখা যায়। সে দেখলে একদল লোক মদ খেয়ে খুব হল্লা করছে। কেউ ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে, কেউ গান গাইছে, কেউ তবলা বাজাচ্ছে। তারই পাশের ঘরে একটা ভুঁড়িওয়ালা বুড়ো বসে মদ খাচ্ছে, সামনে একটা আধাবয়সী স্ত্রীলোক বসে। লোকটা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছে। অন্য সময় এই দৃশ্যগুলো সে বেশ উপভোগ করত, কিন্তু তখন এসব দিকে মন দেবার অবসর তার ছিল না। সে ভাবছিল—বাজীর দোকানের আগুন এখুনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। দেখতে দেখতে শহর শুদ্ধ লোককে

চম্‌কে দিয়ে দমকল এসে হাজির হবে: তারপরে পুলিশ এসে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। সেই তো তুবড়িতে আগুন দিয়েছিল, সাজাটা নিশ্চয়ই তারই হবে। কাল সকালে খবরের কাগজে তাদের কীর্তি কথা প্রকাশ হবে। একবার তার মনে হোলো—এখান থেকে লাফ দিয়ে যদি একতলায় পড়া যায় তাহলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই যা কলেঙ্কারীর পর তো মৃত্যুই ভাল।

সে একবার ঝুঁকে নিচে উঠোনের দিকে চেয়ে দেখলে। অন্ধকার! উঃ! এখান থেকে পড়লে হাত পা গুঁড়ো হয়ে যাবে। না না তা সে পারবে না, যা কপালে আছে তাই হবে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ এই রকম সব আকাশ পাতাল ভাবছিল, এমন সময় বাজাঁর দোকানের একদল লোক মার্‌ মার্‌ শব্দে লাঠি নিয়ে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকল। সে দেখতে পেলে, লোকগুলো লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে যারা হল্লা করছিল, তাদের মধ্যে একজন লোক কি কাজে বাইরের বারান্দায় বেরিয়েছিল, সে হঠাৎ কতকগুলো লোককে লাঠি হাতে ঐ রকম উত্তেজিত অবস্থায় দেখে বল্লে—এই, অত চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

গুণ্ডাদের মধ্যে একজন বল্লে—ধর, এই এক ব্যাটা—

ঘরের ভেতর থেকে একজন বল্লে—কি হয়েছে রে নেদো?

নেদো বল্লে—দেখ্‌না এই এক শালা—

—তবে রে—বলে একটা লোক ঘর থেকে একটা সোডার বোতল নিয়ে এসে কোনো বাক্যব্যয় না করে গুণ্ডাদের ছুঁড়ে মারলে। তারপর দুই তরফে রক্তারক্তি।

দোতলায় আর একটা ঘরে বসে যে বুড়ো লোকটি এতক্ষণ অতি শান্তভাবে মদ্যপান করছিল, গোলমাল শুনে হঠাৎ সে একটা বিকট চিৎকার করে খাড়া হয়ে উঠল। মারামারিতে যোগ দেবার জন্যে মহা উৎসাহে সে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু সেই ঘরের স্ত্রীলোকটি তাকে টেনে ঘরের মধ্যে পুরে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

জগন্নাথ ছাদে দাঁড়িয়ে এই সব দৃশ্য দেখছিল, আর ভাবছিল—সব অনর্থের মূল আমি—

হঠাৎ কে তার হাত ধরে টানতেই সে ফিরে দেখলে যে, সরলা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সরলা ফিস্‌ফিস্‌ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমিই তুবড়িতে আগুন দিয়েছিলে?

জগন্নাথের চোখের সামনে তখন সহস্র তুবড়ি সর্ষেফুলের ঝরণা ঝরিয়ে দিচ্ছিল! সে জিজ্ঞাসা করলে—ওরা কোথায়?

—ওরা যে যার পালিয়েছে, কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এতক্ষণ কি করছিলে তবে? তোমাকেই তো ওরা খুঁজছে?

সর্বনাশ! জগন্নাথের বুকের ভেতর কে যেন বলতে আরম্ভ করে

দিলে—আমাকে খুঁজছে ?

সে প্রকাশ্যে সরলাকে জিজ্ঞাসা করলে—আমি কোথা দিয়ে যাব বল দিকিন ?

সরলা চারিদিকে চেয়ে বলে—পালাবেই বা কি করে ? এই বেশে ওখান দিয়ে নামতে গেলেই ওরা ধরে ফেল্‌বে।

জগন্নাথ বল্লে—তা হোলে তোমার একখানা শাড়ী আমায় দাও, প'রে পালাই।

সরলা বল্লে—তাই দিচ্ছি, এখানে দাঁড়াও।

সরলা তার ঘরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়েই ছুটে ফিরে এসে বল্লে—পালাও, পালাও—ওরা ওপরে উঠেছে। পাশের বাড়ির ঐ ছাদে লাফিয়ে পড়ে ওদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যাও।

জগন্নাথ আর দ্বিরুক্তি না করে পাশের বাড়ির ছাদ লক্ষ্য করে ছুট্‌ল।

পাশাপাশি বাড়ি, দু বাড়ির ছাদের মধ্যে কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান। সে এক লাফে সেই ব্যবধানটুকু পার হয়ে সেই ছাদে গিয়ে আল্‌সের ধারে আত্মগোপন করলে।

কিছুক্ষণ সেই নির্জন ছোট্ট ছাদে বসে থেকে জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল। সামনেই একখানা ছোট ঘর, জগন্নাথ বুঝতে পারলে যে, ঘরখানা না পার হলে সিঁড়ি পাওয়া যাবে না।

একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আগেই, পাছে আর একটা বিপদ এসে জোটে এই ভয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকতে সাহস করছিল না। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায় ?

হঠাৎ রাস্তায় একটা গোলমাল ওঠায় সে আর কোনো চিন্তা না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—কে! কে এল ?

ঘরের এককোণে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলে না। ঘরের মধ্যে একটা দড়িতে খান কয়েক ময়লা শাড়ী ঝোলানো ছিল। জগন্নাথ ভাবলে পেণ্টুলান ছেড়ে এর একটা শাড়ী প'রে এখান থেকে সরে পড়া যাক্‌। বুকের মধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে সে আলনা থেকে ধাঁ করে একখানা শাড়ী টেনে নিলে।

আবার যেন কে চাপা আর্তনাদের সুরে বলে উঠল—কে ? চোর—আঃ—

জগন্নাথ মুহূর্তের মধ্যে শাড়ীখানা দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে আর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো। এবার সে দেখতে পেলে অন্ধকার মাটিতে একটা ছেঁড়া মাদুরে কে যেন শুয়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, একটি রুগ্না স্ত্রীলোক একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে পড়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কে ? কি চাও!

জগন্নাথ বল্লে—দেখ, আমি বড় বিপদে পড়েছি। স্ত্রীলোকটি একটু চুপ করে থেকে বল্লে—বিপদ! কি বিপদ?

জগন্নাথ সমস্ত ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি বলে গেল। মেয়েটি চোখ বুজিয়ে পড়ে রইল, তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। জগন্নাথ তার কাহিনী শেষ করে তাকে বল্লে—তোমার একখানা শাড়ী পরে আমি আজকের মতো পালাই! কাল এসে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। কি বল?

মেয়েটি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না। জগন্নাথ দেখলে সে চোখ বুজিয়ে নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। ধীরে অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়ছে। জগন্নাথ বুঝতে পারলে জীবন-মৃত্যুর এই ক্ষীণ বন্ধন যে কোনো মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে। সে একবার ঝুঁকে তার মুখখানা ভাল কোরে দেখবার চেষ্টা করলে। শীর্ণ মুখ, চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে; চোখ কোটরাগত, রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে যে কেমন দেখতে ছিল তা কিছুতেই ঠিক করা যায় না। ব্যাধির নির্মম হস্ত তার দেহে পুরাতন পরিচয়ের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট রাখে নি। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জগন্নাথের মনটা করুণায় ভরে উঠতে লাগল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আহা!

ঠিক সেই সময় রাস্তার একদল লোক চেঁচিয়ে উঠল—ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালী—

বাইরের আনন্দ-উৎসবের চীৎকার আর ঘরের মধ্যে এই করুণ-দৃশ্য। এই দুইয়ের মিলে জগন্নাথের মনে কি রকম একটা উদাস ভাব এনে দিলে। সে সেখান থেকে উঠে আবার ছাদে বেরিয়ে গেল।

পাশের বাড়ির ছাদে তখনও কয়েকজন লোক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জগন্নাথ একবার রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে গুণ্ডারা তখনো লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় পট্টি বাঁধা একটা লোক রাস্তায় একখানা চেয়ার পেতে বসে চুরুট খাচ্ছে। সেই লোকটা ওপর দিকে মুখ তুলতেই সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘরের প্রদীপটা তখন নিব-নিব হয়ে এসেছে। সেই আঁধারে জড়ানো আলোর মধ্য দিয়ে জগন্নাথ নিজের দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ন করে একবার শায়িত নারীর দিকে চেয়ে নিলে। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই, সব চুপচাপ, মৃত্যুর মতো সব নীরব। একবার তার মনে হোলো এবার দড়ি থেকে, একটা শাড়ী টেনে নিয়ে পরে চলে যাই। কিন্তু তখুনি আবার মনে হোলো—ছি-ছি! এই অসহায়া মুমূর্ষু নারীর একখানা শাড়ী চুরি করে প্রাণ বাঁচাতে হবে! কিন্তু এই বেশে নামলে তো গুণ্ডারা নিশ্চয় ধরে ফেলবে! পোশাক দেখে নিশ্চয় তারা চিনে রেখেছে; ও বাড়ির সরলাও তাই বলেছে—তবে উপায়!

বাইরে কতকগুলো লোক চেঁচিয়ে উঠল—পাকড়ো—পাকড়ো—

জগন্নাথ চমকে উঠে একবার হতাশ দৃষ্টিতে সেই নিদ্রিতা নারীর দিকে চাইলে। প্রদীপের ক্ষীন আলো ক্ষীণতর হোতে লাগল ; তার সম্মুখে শায়িত এই অপরিচিতার জীবনপ্রদীপও যেন ঐ আলোর মতো ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। কে এই নারী ? ঘটনাচক্রের কি অদ্ভুত সংঘটন। সহসা তার বুকের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠল—পালা—পালা—এখানে দাঁড়াতে আছে ?

জগন্নাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন সময় ক্ষীণ নারীকণ্ঠে আবার প্রশ্ন হোলো—বাইরে এত গোলমাল হচ্ছে কিসের ?

জগন্নাথ আবার তাকে গোলমালের কারণ বলে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার একখানা কাপড় আমায় দাও, আমি পরে পালাই।

সে বল্লে—ঐ যে কতকগুলো শাড়ী রয়েছে একখানা প'রে যাও।

জগন্নাথ তাড়াতাড়ি একখানা শাড়ী টেনে নিয়ে খুলে দেখলে সেখানা শতচ্ছিদ্র। সেটা ফেলে দিয়ে আর একখানা শাড়ী টেনে নিলো। সেখানা দিয়ে এমন বিশ্রী একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল্ল যে কাপড়খানা খুলতেও তার ঘেন্না হোলো। সেটা ফেলে দিয়ে সে আর একখানা আধময়লা শাড়ী টেনে নিয়ে তাকে বল্লে—এখানা প'রেই পালাই। তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা খুলে ফেলে সে আবার বল্লে—কাল এসে এগুলো নিয়ে যাব।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত অঙ্গে আঘাত লাগলে লোকে যেমন আর্তনাদ করে ওঠে ঠিক সেই রকম আর্তনাদের সুরে মেয়েটি বলে উঠল—না, না—ওগো ও শাড়ীখানা প'রে যেও না। ওটা আমার মা দিয়েছিল। ঐটে আমায় পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে বলে রেখেছি।

এক ঝলকে বুকের মধ্যে সমস্ত ব্যথা উছলে দিয়ে মেয়েটি অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল। তার সেই কাতর অনুনয় যেন মূর্তিময়ী হয়ে এসে জগন্নাথের হাত দুখানা চেপে ধরলে, অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে শাড়ীখানা খসে মেঝেতে পড়ে গেল। জগন্নাথ স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যেন বলতে লাগল—ছোট্ট একটি মেয়ে, গাঁয়ের পথে আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। সে বড় হোলো, তার বিয়ে হোলো। তারপর একদিন অসতর্ক মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। আজ মনুষ্যত্বের শেষ ধাপে নেমে এসেও সে মায়ের দেওয়া এই রাঙা শাড়ীখানার মায়া ছাড়তে পারে নি। নানা রকমের সম্ভব ও অসম্ভব ছবি তার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর একবার নিজের মনটাকে শক্ত করে নিয়ে সে বল্লে, আচ্ছা, এই তোমার শাড়ী রইল আমি চল্লুম—

দেখ তুমি বড় বিপদে পড়েছ, না ? আচ্ছা শাড়ীটা প'রে যাও, কিন্তু কাল আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেও ! একবার শীতের দিনে একটা লোক আমার গায়ের কাপড়খানা চেয়ে নিয়ে গেল, আর ফিরিয়ে দিলে না।

জগন্নাথ তাকে কি একটা বলতে যাচ্ছিল ; এমন সময় পাশের বাড়ির ছাদ

থেকে আওয়াজ হোলো—ঐ ছাদ দিয়ে পালিয়েছে—

জগন্নাথ চেয়ে দেখলে পাশের বাড়ির ছাদে কয়েকজন লোক ও দুটো পাহারাওয়ালা সেই দিকে চেয়ে রয়েছে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সে পোশাক ছেড়ে শাড়ীটা প'রে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

যখন সে বাড়ি ফিরলে তখন ভোরের বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঘরে ঢুকে সে চারিদিকের জানালা খুলে দিয়ে অবশ দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিলে।

পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙল তখন প্রায় বারোটা। দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চেয়ে পাশ ফিরে চাকরির কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বেলা পাঁচটা অবধি ঘুমিয়ে উঠে স্নান করে গত রাতের শাড়ীখানা একটা খবরের কাগজে বেশ করে মুড়ে নিয়ে সেই অপরিচিতার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

একদিন আগে যেখানে জীবন-মরণ-সংশয় হয়েছিল আশ্চর্যের বিষয় সেই বাড়িটা খুঁজে বার করতে জগন্নাথের আধঘণ্টা সময় কেটে গেল। রাস্তায় খানিকক্ষণ পায়চারি করে দরজাটা ঠিক করে নিয়ে সে টপ্ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে একেবারে তেতলায় গিয়ে উঠল।

তেতলার ঘরে সেদিন আর আলো নেই, অন্ধকার! ঘরের ভেতর ঢুকে জগন্নাথ দুটো তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে দেখলে কেউ নেই, ফাঁকা ঘর হা-হা করছে। একটা দমকা হাওয়া জাগন্নাথকে শিউরে দিয়ে সামনের দরজা দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি দোতলায় নেমে একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলে—ওপরে যে থাকত সে কোথায় গা?

—মরে গেছে।

—এ্যাঁ! কখন মারা গেল?

—আজ দুপুরে! এখনো তারা শ্মশান থেকে কেউ ফেরে নি। জগন্নাথ আর কোনো কথা না বলে সেখান থেকে নেমে একেবারে নিমতলার ঘাটের দিকে ছুটল।

রাস্তার দু'পাশের দোকান ঘরগুলোতে তখন বাতি জেবলে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে শাঁখ, ঘণ্টা ও আনন্দের কলরব। জগন্নাথের কানে তখন কোনো শব্দই যাচ্ছিল না, তার কানে শুধু সেই অপরিচিতার করুণ অনুনয় এসে বাজছিল—ওগো, ওখানা প'রে যেও না, ওটা আমার মায়ের দান।

জগন্নাথ একরকম ছুটতে ছুটতে শ্মশানের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হোলো। এক জায়গায় কতগুলো লোক একটা চিতা সাজাচ্ছিল, চিতার পাশেই একটা নারীর শব। কিছুক্ষণ ধরে সে শ্মশানের চতুর্দিকে পাগলের মতো ছুটে সমস্ত মৃতদেহগুলোকে দেখে বেড়ালে। কিন্তু কোথাও তার জীবনদাত্রীর দেখা পেলে না।

বুকজোড়া একটা অবসাদ নিয়ে সে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গার ওপরে একটা নির্জন পণ্টুনে গিয়ে বসে পড়ল।

অমাবস্যার অন্ধকার। নদীর জল মিশ্ কালো, কিছুই দেখা যায় না।

চারিদিকে বিসর্জনের করুণ বাজনা, এরই মধ্যে বসে বসে জগন্নাথ ভাবছিল— কি করা যায়! অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে সে ধড়মড়িয়ে উঠে একবার— 'ড্যাম ইট্' বলে কাগজে মোড়া শাড়ীখানা ছুঁড়ে নদীর জলে ফেলে দিলে। তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলে।

'বাজীকর'

আমি ফিরছিলুম কুতুবমিনার দেখে। বাংলার মোলায়েম জমির উপর চরে বেড়ান এই ললিতলবঙ্গ দেহযষ্টি, দিল্লীর ফরমায়েসী একার তালকানা ঝাঁকুনি খেতে খেতে যখন প্রায় বেঁকে এসেছে, এমন সময় নেমে পড়লুম।

একাওয়ালা আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল পুরোন দিল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যিখানে। চতুর্দিকে বড় বড় প্রাসাদ, কবর, দুর্গ—কোনটা হাত-পা-ভাঙা, বিকট রাক্ষসের মত দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনটা বা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে শুধু কতকগুলো ইট আর পাথরের রাশি হয়ে পড়ে রয়েছে। এরি মাঝে মাঝে এক একটা চক্‌চকে পাথরের কবর অরক্ষিত জঙ্গলময় বাগানের মধ্যে বসোরার গোলাপের মত ফুটে রয়েছে। সৃষ্টি আর প্রলয়ের এমন কোলাকুলি এর আগে আর চোখে পড়েনি। যতদূর চোখ যায়—দেখতে পেলুম, সৃষ্টি আর সংহারের সীমা-রেখা গিয়ে মিশেছে, নতুন দিল্লির টক্‌টকে লাল পাথরের কেল্লার পায়ের কাছে—ঠিক যেন আহত বীর যোদ্ধার পায়ের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্ত দিন রোদে পুড়ে পাথরগুলো থেকে একটা গরম ঝাঁঝ বেরুচ্ছিল; সেগুলোর উপর দিয়ে চলতে চলতে আমার মনে হচ্ছিল, আহতের তপ্ত শোণিতের উত্তাপে বুঝি পায়ের তলাটা একেবারে ঝল্‌সে গেল।

সেই জনশূন্য নির্জন শ্মশানে তার সঙ্গে আমার দেখা—

তখনো সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেহটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তাই বিশ্রামের জন্য একটা চাতাল দেওয়া কবরের উপর শুয়ে পড়েছিলুম। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। মনে হল, একটু গড়িয়ে নিয়ে, অন্ধকার হবার আগেই উঠে পড়া যাবে। একটুক্ষণ শুয়ে থাকার পরই আমি যেন কার গলায় আওয়াজ পেলুম। মনে হল, অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে। গানের আওয়াজটাই ভেসে ভেসে আমার কানে আস্‌ছিল: কোন্ ভাষা, কি সুর—তা' সেখান থেকে একেবারেই বোঝা যাচ্ছিল না। কৌতুহল হোলো, কে গায়! সেই নির্জন প্রান্তরে বুঝি বা একজন সঙ্গী পাওয়া গেল মনে করে, উঠে পড়লুম। আওয়াজ শুনে শুনে

সেইদিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিছুক্ষণ ঠোক্কর খেতে খেতে অগ্রসর হবার পর তার সঙ্গে দেখা হলো। সে গাইছিল—

"মনুয়া দিন তেরে কেইসে গুজারা—
আবু রাতি কারি ঘন—"

লোকটার চেহারা রুক্ষ, মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে, বাকিগুলো না পেকেই সাদা হয়ে রয়েছে,—বোধহয় ধুলোতে। গোঁফ একেবারে নেই বল্লেই হয়। চোয়ালের কাছে চাট্টি করে দাড়ি—মাঝখানে একটু ফাঁক আছে। আবার ঠোঁটের নীচে কয়েকগাছা দাড়ি। অত্যন্ত রোগা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও দেহের মতন। তার চেহারাটা তার চারপাশের ইট-পাটকেলগুলোর সঙ্গে এমনভাবে মিল খেয়ে গেছে যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে, তাদেরি একজন বুঝি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার জন্য এখনও এই জায়গাটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়সটা তার ঠিক অনুমান করতে পারলুম না—পঁয়ত্রিশও হতে পারে, আর তিপ্পান্ন বল্লেও অসম্ভব বলে মনে হয় না। আপনার মনে গান ধরেছে—"মনুয়া দিন তেরে কেইসে গুজারা—" সেইখানে বসে বসে তার সঙ্গে আস্তে আস্তে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে অনেকদিনের কথা। তার পর আমি অনেকবার দিল্লী গিয়েছি—অনেকবার সেই জনমানব-হীন ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি; কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। সেইখানে বসে বসে সে তার জীবনের কাহিনী আমায় শুনিয়েছিল। তারই যতটা আমার মনে আছে, এখানে বলছি—

"দিল্লীর কাছে বঁদলসর নামে এক গ্রাম আছে—সেই গ্রামে আমার বাড়ী। আমার বাড়ী মানে, সেইখানে আমি জন্মেছিলুম। এর বেশী সে জায়গা আমার কাছে আর কিছু দাবী করতে পারে না।

বাড়ীর কথা আমার বড় বেশী মনে নেই। স্বপ্নের মত মনে পড়ে, আমার একটি ছোট ভাই ছিল। আমার খেলার সঙ্গীদের কারো নাম বড় একটা মনে নেই—শুধু একজন ছাড়া। সে একটী ছোট্ট মেয়ে,—তার নাম ছিল রত্না। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি আমার বড় অনুগত ছিল। আমার কেন জানি না, আর সকলের চেয়ে তার সঙ্গেই বেশী বনিবনাও হত; তাকে আমি বড় ভালবাসতুম।

শৈশবেই মা মারা গিয়েছিলেন। শুনেছিলুম, আমার ছোট ভাই হ'বার মাসখানেক পরেই তিনি মারা যান। মাকে জান্‌বার অবসর আমার কখনো হয়নি। আমাদের বিমাতা ছিলেন। তিনি আমার উপর কেমন ব্যবহার করতেন, মনে নেই; আর সে সময় বিমাতার ব্যবহার বুঝতে পারবার মতন বয়স হয়নি। তবে একদিন বুঝতে পেরেছিলুম, বিমাতা কেন, অতি বড় শত্রুও সে রকম ব্যবহার করতে পারে না। সে কথাটা শেষে বলছি।

তখন আমার ছয় কি সাত বছর মাত্র বয়স, এমন সময় আমাদের গাঁয়ে এক বাজীকর এসে উপস্থিত হলো। তার হাতে একটা ডুগডুগি; সঙ্গে এক রামছাগল—তার পিঠে একটা পুঁটলীর মত কি চাপানো; বগলে একটা

ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলী—এই তার সম্বল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে তার বিদ্যের জোরে গ্রামের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে নিলে। পায়ের নীচে লোহার গুলি রেখে, সেটাকে নাক দিয়ে বার করা—হাতের ভিতর টাকা রেখে দিয়ে, বনমানুষের হাড় ঠেকিয়ে, সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া,—আমের আঁটি পুঁতে তখনি-তখনি গাছ বের করা,—এই রকম সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে, গ্রামের লোকেরা তাকে বাহবা ত দিলেই, সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও দিতে লাগল।

আমরা—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দল বেঁধে মাঠের ধারে তার বাজী দেখতে যেতুম। সে রোজই বিকেলবেলায় ডুগডুগি বাজিয়ে লোক জমিয়ে এই সব বাজী দেখাত, আর পয়সা উপায় করত।

একদিন দুপুরবেলা কি যেন একটা কাজে আমি রাস্তায় বেরিয়েছিলুম। সে সময় গরমের চোটে লোকে ঘরে বসেই আঁতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাইরে ঝাঁঝাঁ রোদ—মনে হচ্ছিল, যেন আগুনের বৃষ্টি হচ্ছে। সে সময় যে কি করতে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, তা ঠিক মনে নেই, বোধহয় রত্নাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম। যেতে যেতে দেখলুম, সেই বাজীকর একটা গাছের নীচে বসে রুটি খাচ্ছে, আর তারই একটু দূরে ছাগলটা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে আমি বল্লুম—"সেখজি সেলাম।" লোকটা খেতে খেতে মুখ তুলে আমায় বল্লে—"এই,—এত রোদে রাস্তায় বেরিয়েছিস্ কেন? তোর কি বাপ-মা নেই না কি?"

আমার কি খেয়াল হলো আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, তাকে বল্লুম—"আমায় তোমার বিদ্যে শেখাবে সেখজী?"

সে বল্লে—"আচ্ছা শেখাব; দাঁড়া আমার খাওয়াটা শেষ হোক।"

পাছে তার ছোঁয়া লাগে, এই ভয়ে আমি একটু দূরে বসে তার খাওয়া দেখতে লাগলুম। খেতে খেতে সে এক একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে লাগল, আর যেন বিড়বিড় করে কি বকতে লাগল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, সে আমাকে আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, আমার বাড়ীতে কে কে আছে, বাপ মা বেঁচে কি না ইত্যাদি সব প্রশ্ন। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটো থেকে থেকে জ্বলে উঠতে লাগল। মানুষের সে রকম চোখ একমাত্র তার ছাড়া আর আমি দেখিনি। ক্ষুধাতুর জানোয়ারের সামনে খাবার পড়লে তার চোখ যেমন হয়, এও ঠিক সেই রকম চাহনি দেখে, আমার শিশু হৃদয় ভয়ে আঁতকে উঠল। আমি ভয় পেয়েছি বুঝতে পেরে, সে আমার হাত দুটো ধরে বল্লে—"ভয় কি? কিছু ভয় নেই। আজ সন্ধ্যেবেলা কোন রকমে আমার কাছে আসিস্, আমি সব শিখিয়ে দেব। দেখিস্ সঙ্গে আর কাউকে আনিসনি তাহলে কিছু শেখা হবে না।"

ভয় মেশানো একটা আনন্দে সে দিন সমস্ত ক্ষণটা আমার কোথা দিয়ে কেটে গেল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভাল করে খেলায় যোগ দিতে পারলুম না। কথাটা আর কাউকে বলি নি; কারণ, সে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু রত্নাকে

না বলে থাকতে পারলুম না। আমার কথা শুনে সে বল্লে, "তবে আমিও যাব।" আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম, "অন্য লোক গেলে সে শেখাবে না বলেছে। ভয় কি, আগে আমি শিখে আসি তার পর তোমায় শিখিয়ে দেব।" সন্ধ্যা হবার একটু পরেই সকলের অজ্ঞাতসারে আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমার জন্য সেই গাছতলায় সে অপেক্ষা করছিল। আমি কাছে যেতেই সে আমার হাত ধরে বল্লে—"এখানে না—চল, একটু দূরে যাই। কেউ দেখতে পেলে হবে না।" এই বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

সেই জমাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কখনো রাস্তা কখনো মাঠ—কিছুক্ষণ দৌড়ে, কিছুক্ষণ হেঁটে—আমরা যে কতদূরে চলে গেলাম, তার ঠিকানা নেই। হাত পা সব অবশ হয়ে আসছিল ঘুমে চোখ ঢুলে আসতে লাগল। কোথায় যাচ্ছি—কেন সে আমায় এতদূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এ সব কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই, আমি এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লুম!

ঘুম যখন ভেঙে গেল, তখন দেখি, সকাল হয়ে গিয়েছে। জেগে দেখি, যে জায়গাটাতে শুয়ে পড়েছিলুম—সেখানে নেই,—একটা রেল স্টেশনের বেঞ্চির উপর আমি শুয়ে আছি। ঘুম ভাঙতেই বাড়ীর কথা মনে হল,—আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। আমার কান্না দেখে চুপি চুপি সে আমায় বল্লে,—"কাঁদিস নে; তাহলে কোতোয়ালে ধরে নিয়ে যাবে।" কোতোয়ালের নাম শুনেই ভয়ে আমার কান্না থেমে গেল। সে আমার হাতে কিছু খাবার দিয়ে বল্লে—"এই নে, খা। খবরদার আর কাঁদিস না।"

একটু পরে একখানা ট্রেনে করে সে আমায় এই সহরে নিয়ে এল। সহর থেকে মাঝে মাঝে গাঁয়ে গিয়ে সে তামাসা দেখাত আর আমায় নিয়ে যেত। কিন্তু সহরে থাকতে সে আমায় বাড়ী থেকে বেরোতে দিত না। লোকে জানত, আমি তার ছেলে,—ছেলে বলেই সে সকলের কাছে আমার পরিচয় দিত। অন্য সময়ে সে আমায় খুবই আদর যত্ন করত বটে; কিন্তু বাড়ী যাবার জন্য কাঁদলে, সে ভীষণ মূর্তি ধরত। শেষে আমি মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতুম না বটে; কিন্তু যখনই একমনে বাড়ীর কথা ভাবতুম,—কি করে যে বুঝতে পারত, তা বলতে পারি না। আমার মুখে মনের কথাগুলো ফুটে উঠত, না, আমার মনের কথাগুলো তার কানে গিয়ে বাজতে থাকত—ঠিক বুঝতে পারতুম না। কতদিন স্বপ্নে তার সেই সময়কার ভীষণ মূর্তি দেখে ভয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, তার ঠিকানা নেই।

ক্রমে এমন হয়ে গেল—আস্তে আস্তে বাড়ীর কথা দেশের সেই উন্মুক্ত মাঠ, শৈশব সহচারী রত্না এদের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যেতে লাগল। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই—মাঠে, ঘাটে পথে-পথে, এক সহর ছেড়ে অন্য সহরে, কোন দিন ভাল খাওয়া জোটে; কোন দিন আধ পেটা, কোন দিন অনাহারে এমনি করেই আমার দিন কাটছিল। প্রায় বছর কয়েক এমনি করে কাটবার পর, একদিন আমরা আলিগড় সহরে, রাস্তার এক জায়গায় লোক জমা করে বাজী দেখাচ্ছি এমন সময় ভিড়ের থেকে একজন লোক ঠেলে বেরিয়ে এসে,

আমার পালককে জিজ্ঞাসা করলে—"এ ছেলেটি কার ?" লোকটার প্রশ্ন শুনেই মোবারকের (তার নাম মোবারক) হাত থেকে লোহার গুলি, হাড় —মাটিতে ঠস্‌ঠস্‌ করে পড়ে গেল। আগন্তুক চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এই বদমাইস আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেটাকে আজ কয়েক বছর হল চুরি করে নিয়ে এসেছে। এ হিন্দুর ছেলে—একে মোসলমানের রুটি খাইয়েছে—" আর বলতে হল না—এই অবধি শুনেই ভিড় ভেঙে যত লোক তার উপরে গিয়ে পড়ল। কিল, চড়, লাথি মেরে তাকে সবাই মিলে প্রায় আধমরা করে ফেল্লে। তাকে মারার পর সকলে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। সে সময় একটা করুণ মিনতি ভরা দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। পৃথিবীতে সেই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। বাবু সাহেব আজও তার কথা মনে হলে, আমি চোখের জল রাখতে পারি না।'

এই বলে, সে একবার তার জলভরা, চক্‌চকে চোখ দুটো হাত দিয়ে মুছে নিলে।

"আগন্তুক আমাদের গাঁয়ের লোক, দু-একদিন বাদে সে দেশে যাবে।

সকলে মিলে ঠিক করে দিলে, সে আমাকে ও মোবারককে আমাদের গাঁয়ে ধরে নিয়ে যাবে। সেখানে পঞ্চায়েতের বিচারে তার যা সাজা হয় হবে—কিন্তু এখানে তাকে ছাড়া হবে না। কয়েকদিন পরে ট্রেনে চড়ে আমরা দেশে ফিরলুম। আমার জন্মভূমি,—যেখানকার মাটির উপর প্রথম আমি দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখি,—পৃথিবীতে এসেই যেখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম,—সেখানকার ধুলো বালি—সে যে আমার সোনা ;—অনেক দিন পরে আবার সেখানে পা দিতেই, আমার সর্বাঙ্গে একটা পুলক খেলে গেল,—চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। একেবারে ভুলে যাওয়া সেই রাস্তা, গাছ, জোয়ারের ক্ষেতগুলো বাতাসে দুলে উঠে এই অভাগাকে অভিনন্দন করতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের পঞ্চায়েত বসল। গ্রামশুদ্ধ লোক ছেলে বুড়ো সকলেই আমাকে দেখতে এসেছে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে, তারা আমায় দেখতে লাগল। কিন্তু কেউ আমার কাছে আসছিল না,—যেন আমি কি একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। আমার খেলার সঙ্গীরাও কেউ কেউ আমায় দেখতে এল। দেখলুম রত্নাও তাদের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলুম, তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন আমায় কিছু বলতে চায়,—কিন্তু সাহস করে বলতে পারছে না। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে আবার সেই রকম করে খেলে বেড়াবার জন্য আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

পঞ্চায়েত আরম্ভ হল। একজন উঠে তার বক্তব্য বলতে লাগল। কেউ বল্লে, মোসলমানের রুটি খেয়েছে—ওকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কেউ বল্লে

বদমাইসকে ধরে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাও। কেউ বল্লে, ওকে ধরে কয়েক ঘা দিয়ে টাকাকড়ি যা আছে সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দাও। একজন দয়ালু বৃদ্ধ উঠে বল্লে, ছেলে ফিরে পাওয়া গেছে আবার কি! ওকে ছেড়ে দাও। এইরকম প্রায় জন দশ-বারো লোকের মন্তব্যের পর আমার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিকে একবার চেয়ে নিয়ে, গলাটা একটু সাফ করে তিনি কি বল্লেন :— কি যে বল্লেন, তা শুধু আমি নয়, সেখানে কেউ শুনতে পেলেনা। সকলে বলতে লাগল "কিছু শুনতে পাচ্ছি না একটু জোরে।" একটুক্ষন বাদে এই কথাগুলো আমার কানে এসে পেঁছিল—"আমি অনেকদিন হল, এই মোসলমানকে আমার ছেলে দান করেছি ; ছেলের উপর আমার কোন দাবী দাওয়া নেই।" বাবার কথা শুনে, সেই জনসংঘ কয়েক মুহূর্তের জন্য একেবারে স্থির নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার পর একটা অস্ফুট আওয়াজ ভিড়টার একদিক থেকে আরম্ভ করে, ক্রমে সমস্ত জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হল, কে যেন আমার পা দুটো ধরে খানিক্ষণ জোরে ঘুরপাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পঞ্চায়েত ভেঙে গেলে যে যার বাড়ী ফিরে গেল। গ্রামের ধারের মাঠের উপর বাজীকর একটা ছোট তাঁবু ফেলেছিল। আমার হাত ধরে, সে সেখানে নিয়ে এসে, আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে,—"বেটা, দুঃখ করিস্‌নি। ও তোর বাপ নয়,—বাপ হলে এমন কথা বলতে পারত না।"

সে দিন কি পৃথিবীর যত অন্ধকার নিজেদের বাসা ছেড়ে আকাশে বেড়াতে বেরিয়েছিল? আমি তাঁবুর বাইরে একটা জায়গায় বসেছিলুম। সংসারের উপর একটা ভীষণ আক্রোশ আমার বুকের ভিতর ফুলে ফুলে গর্জে উঠছিল। ভাবছিলুম, আমার কি কেউ নেই? আমি কি কারো নই? প্রাণের ভিতরকার সেই ভীষণ অন্তর্দাহে আমি এক একবার নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলুম। উপরকার চাঁদটা অন্ধকারে চাপা পড়ে, দম আটকে মরবার উপক্রম হয়ে, মধ্যে মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল। একবার আলো, একবার অন্ধকার—দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে আরম্ভ করেছে। মাটির দিকে মুখ করে আমি চোখ বুজিয়ে ফেললুম। কতক্ষণ এ রকম ভাবে বসেছিলুম, বলতে পারি না। সেই রকম অবস্থায় আমার প্রাণের মধ্যে সাড়া পেলুম,— কে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ চেয়ে দেখি, সত্যই কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ;—সেই ভীষণ অন্ধকারের ভিতরেও সে মুখ চিনতে আমার দেরী হল না। দেখলুম সে কাঁদছে—সচল মুক্তোর মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে।

সংসার তার বন্ধন থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছিল,—সে মুক্তি ত আমি চাই নি। রত্নাকে দেখে আমার মনে হল, আবার বুঝি সংসার তার একজন অনুচরকে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। বেড়াল যেমন মুমূর্ষু ইঁদুরটাকে এক-একবার ছেড়ে দিয়ে দূরে বসে মজা দেখে,—আমার মনে হল, সংসার বুঝি আমার সঙ্গে সেই রকম মজা আরম্ভ করেছে। আমার

বিপদ যে একমাত্র সেই অনুভব করে আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেছে, তা তখন আমার মনে হয়নি—বুঝি সে কথা মনে হবার মত অবস্থা আমার তখন ছিল না। আমি তার হাতটা ধরে চীৎকার করে বল্লুম—শয়তানি! কি করতে এসেছিস? আমায় ভোলাতে? বল কে তোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে?” কাঁদতে কাঁদতে আমার নাম ধরে সে বল্লে, “মনুয়া—” রাগে দুঃখে আমার ইচ্ছা কচ্ছিল, তাকে ধরে তখুনি আছড়ে মেরে ফেলি। কিন্তু তা পারলুম না। তার কান্না দেখে আমারও কান্না আসতে লাগল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাকে বললাম, “রত্না, গ্রামশুদ্ধ লোকের মধ্যে তুমিই একমাত্র আমার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছ। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাব,—জানি না, আর আমাদের কখনো দেখা হবে কি না—” বলতে বলতে আমার গলাটা কে যেন চেপে ধরলে, আর আওয়াজ বেরুল না। অনেক কথা আমার তাকে বলবার ছিল, কিন্তু কিছু বলা হ'ল না। রত্না বল্লে, “তোমার বিমাতার মন্ত্রণায় তোমার বাবা এই রকম করেছে; নইলে—” আমি পাগলের মত চীৎকার করে উঠলুম, “নইলে—নইলে, কি হ'ত রত্না”—আমার চীৎকার শুনে সে থেমে গেল—আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে ফুটল না। অনেকক্ষণ আমরা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার পর আস্তে আস্তে সে ফিরে গেল। সেই আলো-আঁধারে-মেশা রাত্রির অন্ধকার ঠেলে, আমার সজল চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, তাকে দেখতে লাগলুম। দেখলুম রাত্রির সেই ক্ষুধিত অন্ধকার আমার প্রাণের আলোকে নিমিষের মধ্যে গ্রাস করে ফেল্লে। রত্না চলে যাবার পর আমার প্রথম কথা মনে পড়ল, আমার বিমাতার ব্যবহার। মনে হল, হায়, আমার নিজের মা যদি থাকত! নিজের মাকে মনে করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম; কিন্তু সে মুখ আমার মনে পড়ল না। প্রাণ খুলে একবার মা বলে চীৎকার করে উঠলুম! আমার সেই চীৎকারে উপরকার অন্ধকার কেটে গিয়ে, চাঁদের আলোতে পৃথিবীটা ভেসে উঠল। দূরের গাছগুলোও যেন সহস্র কণ্ঠে মা বলে' সাড়া দিয়ে উঠল! আমি তার সহ্য করতে পারলুম না, সেইখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, দেখলুম মোবারকের কোলে আমি শুয়ে রয়েছি।

পরদিন সেখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তারই সঙ্গে বেড়াই; সে যা করতে বলে কলের মত করে যাই। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন দিনগুলো কেমন ভাবে কাটত, তা বুঝতে পারতুম না,—বোঝবার কোন দরকারও ছিল না। সেই ব্যাপারের পর থেকে আমার উপর মোবারকের যত্ন যেন আরো বেশী বেড়ে গেল। আমার একটু অসুখ করলে সে অস্থির হয়ে পড়ত। আমার কিন্তু তার যত্ন একেবারেই সহ্য হ'ত না। আমি ভাবতুম, সংসারের আপনার লোকজন সব যখন আমাকে তাদের কাছ থেকে এমনি করে বিদেয় দিয়েছে, একজন বাইরের লোক কেন আমায় বাঁধবার চেষ্টা করছে? সময় সময় এমন হয়েছে, মাসাবধি আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিনি। এমনি করে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

বাড়ীর লোকেরা আমায় যেমন নিষ্ঠুরভাবে তাদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আমিও ঠিক তেমনি করে বাইরের আকর্ষণগুলোকে তাড়াতে থাকতুম। আমার পালক-প্রভু ছাড়া অন্য কেউ যদি আমার সঙ্গে কথা কইতে, কিম্বা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আসত, তাদের সঙ্গেও আমি সেইরকম ব্যবহার করতুম। ক্রমে এমন হল, কেউ আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইত না।

আমার বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সংযোগ-তন্তু ছিল এই মোবারক। এই সময়ে একদিন আমাকে মুক্তির নির্ঝঞ্ঝাট আরাম উপভোগ করবার অবকাশ দিয়ে, আমার নিদারুণ শত্রু,—আমার একমাত্র সহায়, বন্ধু ও প্রতিপালক হঠাৎ পৃথিবী থেকে সরে পড়ল।

মোবারকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সঙ্গে আমার বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটাও ছিঁড়ে গেল। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিশান উড়িয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। দুনিয়ার কারো খবর আমি রাখতুম না, আমার খবরও বড় একটা কেউ রাখত না। একদিন বাজী দেখিয়ে যা রোজগার করতুম, দশদিন ধরে বসে তাই খেতুম। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আবার রোজগার করতে বেরোতুম।

কেমন করে' আমার এই উড়ো প্রাণটা আবার বাঁধনে ধরা দিল, সেই কথাটা এবার বলব। দেখলুম, একেবারে মুক্ত হওয়া বুঝি ভগবানের বিধান নয়। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে পারে বটে; কিন্তু সে সময় তাঁকেও আমার অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা যে কেন হয়েছিল, তা আমি জানি না। আমার মনে হয়, মানুষই এর জন্য দায়ী।

একদিন বিকালবেলায় এই জায়গাটাতে বসেছিলুম। সেদিন সকাল থেকেই, কেন জানি না, আমার মনটা বড় উতলা হয়েছিল। সে রকম অনুভূতি আমার সেই প্রথম। সেটা কি রকম, তা' ঠিক করে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। পেটে ক্ষিধে পায় জানি; আমার ভাগ্যক্রমে সেটা আমাকে খুব বেশী করেই জানতে হয়েছিল। কিন্তু বুকেরও যে ক্ষিধে পায়, সেও যে খাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে—সেটা সেই দিনই প্রথম টের পেলুম। ভাবছিলুম, জীবনটা কেমন করে কাট্‌ল! এই কোলাহলময় পৃথিবীতে আমিই শুধু একা। যেখানে সবাই ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তমদের নিয়ে সুখে গলাগলি হয়ে দিন কাটাচ্ছে, সেখানে আমারই শুধু আপনার বলবার কেউ নেই। ভাবতে ভাবতে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সহচর এই নীরস ইট পাটকেলগুলোর মধ্যে এসে এক জায়গায় বসে পড়লুম।

কতক্ষণ এই রকম ভাবনায় বিভোর হয়ে বসেছিলুম, জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ কার গলার আওয়াজে আমার চমক্ ভেঙে গেল। দেখলুম, কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আমার সামনে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমার মনে হল, আকাশ থেকে একটা পৃথিবী জোড়া অন্ধকার নীচের দিকে নেমে আস্‌তে-আস্‌তে, হঠাৎ মাঝ-পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বহুদিন-বিস্মৃত ছেলেবেলাকার কথাগুলো একে-

একে মনে পড়্তে লাগল। আমার রত্না, আমার ভাই, আমার সেই সব সহচর—কোথায় তারা ?

তাদের ছুটোছুটি দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি আমার দম আট্কে মারা সেই ছেলেবেল্যাটা এতদিনে সুযোগ পেয়ে, আমার বুকের ভিতর থেকে পালিয়ে গিয়ে আমার সামনে খেলতে আরম্ভ করেছে। আমি বর্তমান হারিয়ে ফেলনুম ; তাদের সেই ছুটোছুটি, হাসির রোলে যোগ দেবার জন্য, আমি আমার জায়গাটা ছেড়ে, লাফিয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে ছুটে গেলুম। আমাকে তাদের কাছে যেতে দেখেই, একটি ছেলে চেঁচিয়ে তার সঙ্গীদের সাবধান করে দিলে— "ওরে পাগলা—পাগলা,—পালিয়ে আয়।"

আচম্‌কা গালের উপর জোরে একটা চড় এসে পড়লে যেরকম অবস্থা হয়, তার কথা শুনে আমার সেই রকম অবস্থা হল। দেখলুম, তারা সবাই ছুটে আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গেল। তাদের কোলাহল আমার এই দুঃসহ, বিষাদপূর্ণ জীবনটা হঠাৎ এক নিমেষের জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, বুঝতে পারলুম না। জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখতে পেলুম, দূরে স্মৃতি-সাগরের ওপারে আমার অতীত জীবনটা এই সুখ দুঃখ-মাখা সংসারের মধ্যে ফিরে আসবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপরে চেয়ে দেখলুম, সন্ধ্যা-সুন্দরী অস্তরবির সোনালী পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী পরে' পৃথিবীর সামনে এসে মোহন বেশে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝখানে আমার এই জীবনটা নিষ্ফলে কেটে গেছে। এতদিন কি অন্ধ ছিলুম ? কিসের মোহ আমাকে এই সুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল ? পূবের একটা দমকা বাতাস লেগে এই মৌন পাথরগুলো আমার দুঃখের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটা বিষাদের গান গেয়ে উঠল। আমি আস্তে আস্তে একটা পাথরের উপর শুয়ে পড়লুম।"

এই পর্যন্ত বলেই সে চুপ কর্‌লে। আমি একমনে তার কথা শুনছিলুম। সে চুপ করতেই, তার দিকে চেয়ে দেখি, ততক্ষণে সে উঠে পড়েছে। তার একটি কথাও না বলে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

সামনে চেয়ে দেখলুম দিনান্তের নিভন্ত চিতার শেষ রশ্মিটা তখনও কুতবমিনারের চূড়ার উপর ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। পূর্বদিক থেকে একটা বিরাট অন্ধকার পাখা মেলে সেই আলোটুকুকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আস্‌ছে !

নিশির ডাক

সে একদিন দেবতার খেয়ালে দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমেছিল। ক'দিন থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা করে ছিল, সেদিন চারদিককার যত মেঘ জড় হয়ে সহরটার ঠিক উপরেই একটা কালো চাঁদোয়া খাটিয়ে দিল। দুপুর বেলাতেই মনে হতে লাগল, যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সে দিন ছিল রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বৃষ্টির নামবার আগেই গুপীনাথের দরবারে আসর জমিয়ে বসেছিলুম।

আমাদের মধ্যে ঘোর তর্ক চলছিল যে মৃত্যুর পরে মানুষ আবার ফিরে আসতে পারে কি না, আর এলেও তারা জ্যান্ত মানুষের কোন ক্ষতি কিংবা ভাল করতে পারে কি না?

তর্কটা ওঠবার কারণ হচ্ছে আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে ভীষণ ভুতের উপদ্রব চলছিল। এক ভদ্রলোক স্ত্রী মারা যাবার মাস দুই যেতে না যেতে আবার একটা বিবাহ করেছিলেন এবং সেই প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়ার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করেছেন। মহিলাটী খেতে শুতে কোন কাজে সোয়াস্তি পাচ্ছেন না।

ব্যাপারটা যে কি তা আমরা অবশ্য কেউ প্রত্যক্ষ করি নি। তার কারণ আমরা এ সব বিষয় প্রত্যক্ষ না করেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিলুম।

গুপীনাথ কিন্তু এসব ভৌতিক ব্যাপার একেবারেই বিশ্বাস করতে চায় না, সে বলে, ও সব ভুয়ো কথা। আমবা সকলেই এক একটা শোনা ভুতুড়ে কাণ্ডকে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম, গুপীনাথ নির্বিকার ভাবে সে গুলোকে "আমি ও সব বিশ্বাস করি না" বলে উড়িয়ে দিতে লাগল।

নিশিকান্ত এতক্ষণ একধারে বসে একটা বড় তাওয়া দেওয়া কলকের সদ্ব্যবহার করছিল। সুখ টানটি মেরে সে একটু এগিয়ে এসে বল্লে—"আচ্ছা, আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তার উপরে যদি কলম চালাতে হয় ত চালিয়ো।" নিশিকান্ত বলতে লাগল,—"জন্মাবধিই বিধাতা আমাকে বেশ সুনজরে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। বারো বছর পেরোতে না পেরোতে আমার বাপ, মা, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল একেবারে মরে হেজে সব সাফ হয়ে গেল। আমার আজকের অবস্থা দেখে তখনকার বিচার কেউ করো না, এখন যদি আমার নাইতে খেতে একটু বেলা হয়ে যায় ত অন্ততঃ পঁচিশটি লোক আমার জন্য হায় হায় করতে থাকে। কিন্তু সেদিন, সেই বারো বছর বয়সে দুনিয়ার এমন কেউ ছিল না যে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করে "তোর খাওয়া হয়েছে কি না?"

আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে একটি বাঙালী চাকর ছিল, তার নাম অমৃত, তার সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। সে আমায় একদিন পরামর্শ দিলে—দেখ, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, তুমি এখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজকর্ম করবার চেষ্টা দেখ, বিদেশে গেলে চাকরী কি ব্যবসা যা হয় একটা সুবিধে লেগে যেতে পারে। সুবিধে লাগবার আশায় আমি সেই দিনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তার পর প্রায় দশটি বছর এদেশ সেদেশ ঘুরে সুবিধে ত লাগলোই না উল্টে এই ঘোরাটাই আমার একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেল। এই রোগের ঠেলায় কখনো আমি এক জায়গায় স্থির হয়েথ াকতে পারতুম না। একদিন এখানে, এক দিন সেখানে চাকরী করে, বাসন মেজে কখনো বা ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাহিসের কাজ করে আমার দিন কাটতে লাগল। আবার হাতে কিছু পয়সা এলে সেই দিনই সেখান থেকে সরে পরতুম।

এই ঘূর্ণী রোগ ঘোরাতে ঘোরাতে আমায় একদিন রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে এনে ফেল্লে।

রাজপুতনায় অন্য দেশের মত পয়সা রোজগারের সুবিধে মোটেই নেই, সেখানকার সবারই অবস্থা প্রায় আমার মত। কাজ দেবার চেয়ে কাজ করবার মত লোকই সেখানে বেশী। শুনেছিলুম, আমাদের দেশের এক কালী সেখানে আছেন। ইচ্ছে হল একবার তাকে দেখে যাই। বাঙলার সম্পদ ছেড়ে এই ভিখিরীর দেশে তিনি কি সুখে পড়ে আছেন, সেইটে দেখে যাবার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই দেবতা দেখতে যাওয়াই আমার কাল হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে দেবতাদের সঙ্গে আমার যেমন বনিবনা, সেইটে বুঝে না গেলেই চলত,—কিন্তু তখন ততটা খেয়াল হয়নি।

সন্ধ্যার ঝোঁকে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তখন দেবীর আরতি চলেছে। কাঁচা চামড়া আর কাঁসা পিটে যতটা আওয়াজ করা সম্ভব তা হচ্ছে। লোকজন অনেক জড় হয়েছে; স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো, তারা যেন এ ভিখিরীর রাজ্যের লোক নয়। সবাই হাত জোড় করে এক দৃষ্টে দেবীপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে আছে! আর থেকে থেকে তাল মাফিক বিকট একটা চীৎকার করে আবার নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই রকম প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আরতি চলল্ : তারপর একে একে সবাই দেবীকে প্রণাম করে যে যার ঘরে চলে গেল। আমি একলা মন্দিরের সামনে চাতালটাতে বসে বসে ভাবতে লাগলুম—আজকের দিন ত গুজরান হয়ে গেল।

মনে হচ্ছিল, এই সব বড়লোকেদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার অগাধ সম্পত্তির মালিক করে দেয় ত মন্দ হয় না। ভিতর থেকে আর একজন বলে উঠেলেন—দূর, তাও কখনো হয়?

যিনি কথাটা প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি অমনি মাথা নাড়া দিয়ে বল্লেন —কেন হয় না, এ রকম যে একেবারে কখনো হয় নি এমনো ত নয়।

ভাবতে ভাবতে রাত বাড়তে লাগল, পুরুত এসে আর একবার কি সব মন্তর আওড়ে প্রতিমার ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে চলে গেল।

রাত্তিরের ডাক তোমরা কেউ শুনেছ? হাঁ, রাত্তির ডাকে। সে একটা অখণ্ড আওয়াজ ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—আবার মধ্যে মধ্যে সেটা গুম্ হয়ে বাজতে থাকে, ঝম—ঝঝম্—ঝম। একমনে শুনতে শুনতে মনে হয় যেন রাত্তির ডাকছে—"আয়, চলে আয়, আমার এই নিবিড় কালো অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে খেলবি যদি আয়।" আমি মন্দিরের চাতালে একলা পড়ে পড়ে সেই রাত্তিরের ডাক শুনতে লাগলুম।

একমনে এই ডাক শুনছি হঠাৎ যেন মনে হল, সেই জমাট ঝাঁ, ঝাঁ, আওয়াজের মধ্যে থেকে একটা মিঠে আওয়াজ ফুটে উঠেছে! আস্তে আস্তে সে আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। যেন দূরে কে নূপুর পায়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমুরের আওয়াজ অনেক শুনেছি, কিন্তু এ যে তার চেয়ে কত মিঠে তা যে না শুনেছে সে বুঝতে পারবে না। কিছুক্ষণ শুনতে শুনতেই সেই অজানার প্রত্যেক চরণ বিক্ষেপের তালে তালে আমার বুকের ভিতরটা নাচতে শুরু করলে। তার প্রতি চরণক্ষেপে এমন একটা সুর, এমন একটা মিঠে রাগিণী বেজে উঠছিল যে তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গী আমার চোখের সামনে জেগে উঠতে লাগল। মনে হলো, বোধ হয় কোন বড় ঘরের মেয়ে এই রাত্রির ডাক শুনতে পেয়ে অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে। একবার ভাবলুম, পিছু নেব নাকি? আবার মনে হলো—কাজ কি বাবা! গরীবের ছেলে শুয়ে পড়—শুয়ে পড়, মনটা যদি বেশী উতলা হয় ত মাথা অবধি চাদরটা টেনে দাও।

মাথার উপর ত চাদরটা টেনে দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু মনের উপর যেই চাদর মুড়ে দেবার চেষ্টা করি অমনি সেই নূপুরের আওয়াজ যেন চাদরের একটা খুঁট তুলে ধরে বল্‌তে থাকে—কোথায়? দেখি—দেখি অত লজ্জা কিসের?

আওয়াজটা ক্রমে মন্দিরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে আর পারলুম না, মাথার চাদর তুলে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। উঠেই দেখি আমার সামনে একটু দূরে এক সুন্দরী এসে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপুতনার কাটখোট্টা বুকে এমন গোলাপ জন্মায় দেখে সত্য-সত্য আমার দেশটার উপর ভক্তি হতে লাগল। দূর থেকে দেখলুম সুন্দরীর সন্ন্যাসিনীর বেশ, গেরুয়া রংয়ের কাপড়ে তার শরীর ঢাকা, হাতে একটা বড় গোছের চিমটে। বুঝলুম, যেটা এতক্ষণ নূপুর হয়ে আমার বুকের মধ্যে নাগরদোলার তোলপাড় লাগিয়েছিল, সেটা আসলে নূপুরই নয়। মনে হলো, রাজপুতানা কি যাদুকরের দেশ বাবা! চিমটে বাজাবার বাহাদুরী আছে, বটে!

ভৈরবী আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। দু' এক পা চল্‌তে না চল্‌তেই বুঝলাম, কৈ, এ ত চিমটের আওয়াজ নয়! ঐ ত পায়ে

পায়ে বাজ্‌ছে রিণি ঝিণি, রিণি ঝিণি—নিজেকে তারিফ করে বল্লুম—আমর দ্বারা এত বড় ভুল হওয়াও কি সম্ভব? যা মনে করেছি, তা না হয়ে আর যায় না।

সুন্দরী পায়ে পায়ে একেবারে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলুম, দূরে থেকে তার উপর অবিচার করা হয়েছে, সে সুন্দরী নয়—অপরূপ সুন্দরী। সৌন্দর্য্যের দেবী বল্লেও তার রূপের বোধ হয় ঠিক বিচার করা হয় না। তার পাৎলা গেরুয়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে লাল মখমলের পেশোয়াজ দেখা যাচ্ছে, পেশোয়াজের উপরকার সাঁচ্চা জরির সলমা-চুম্‌কীর কাজগুলো সেই গেরুয়া রংয়ের উপর ঝিলিক মারতে লাগল। নিটোল বুক বহুমূল্য কাঁচুলী দিয়ে ঢাকা। কাঁচুলীর পর থেকে নীবি বন্ধনের সীমা অবধি অনাবৃত দেহের বর্ণ বিদ্যুতের মত ঠিকরে এসে আমার চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। একে এই রাজকুমারীর মতন বেশ-ভুষা, তার উপর সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বসনে ঢাকা, হাতে চিমটে ইত্যাদি দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই সে অভিসারে বেরিয়েছে। কিন্তু অভিসারেই যদি বেরুবে, তবে পায়ের পাঁয়জোর খুলে আসেনি কেন? আমার মনের ভিতর কি রকম যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

ভৈরবী মাথা নীচু করে আমার দিকে আরো অগ্রসর হতে লাগল। এবার সে এত ধীরে ধীরে পা ফেল্‌তে লাগল যে আমার মনে হল মাটিতে তার পা ঠেকছে না। ঠিক যেন প্রথম-প্রণয়-ভীতা সলজ্জ বধূ দয়িতের গৃহপানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। মনে হল, দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ততক্ষণে সে আমার পাশে এসে বসে পড়েছে। খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। ওঃ কি সে করুণ দৃষ্টি! জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সে চাহনি ভুলতে পারব না। সে চাহনির স্পর্শে আমার বুকের ভিতরটা একেবারে হিম হয়ে যেতে লাগল। আমার কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্লে—তবু যা হোক মনে পড়েছে!

—মনে পড়েছে!!! এ বলে কি? কার কথা বলছে?

সে আবার বল্লে—কি, কথা কইবে না? অভিমান হয়েছে!

কোন্ পাষণ্ডকে ভ্রম করে এ কথা কাকে বল্‌ছে সুন্দরী?—হায়, হায়,—সত্য সত্যই আমি যদি সে-ই হতুম! ভৈরবী আবার বল্লে—ওগো বল না, কতদিন—কতকাল আর এমনি করে কাট্‌বে? আমাদের কি মিলন হবে না? এবার সে আমার একখানা হাত চেপে ধরলে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফুটে বলে ফেল্লুম—সুন্দরী, আপনার ভ্রম হয়েছে: আপনি যাকে মনে করেছেন আমি সে ভাগ্যবান নই।

ভৈরবী একটু হেসে বল্লে, বাঃ! বেশ কথা বলতে শিখেছ তো! আমার ভুল হচ্ছে? আচ্ছা দেখ দিকিন এটা চিন্‌তে পার কি না? এই বলে

তার ডান হাতখানা আমার হাতের উপর ধরলে। তার হাতের আঙুলে একখানা বড় হীরের আংটি ঝক্‌ঝক্‌ করছিল, সেটাকে দেখিয়ে বল্লে—এ আংটি কার ?

সর্বনাশ আর কি! একটা রূপোর দোয়ানী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আশা যার তখন নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে সেই জ্বল্‌জ্বলে হীরের আংটি—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা না হলে আর এমন হয়! চুপ করে ভাবতে লাগলুম—কি বলা যায়। আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে সে বল্লে, কেমন, চিনেছো ত? আমি বল্লুম—আমায় মাপ করবেন! আমি কিছু বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বলুন।

—আবার সেই দীর্ঘ ইতিহাস খুলে বলতে হবে? ভৈরবী আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে। আমার মনে হল, যেন সেই নিশ্বাসের বাতাসে তার দুঃখের বোঝাটা সেই খানেই জমাট বেঁধে স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

—আর সে সব কথা বলবার আমার ধৈর্য নেই। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, যদি তোমার কিছু মনে পড়ে ত দেখি! কৌতূহল ক্রমেই বাড়তে লাগল। কোথায় দীন-ভিখারী আমি,—আমার উপর আজ এ কি সৌভাগ্য-বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ হয়েছে! মনে মনে বল্লুম, ভগবান তুমি আছ, নইলে আমার উপর কে এমন করে সৌভাগ্য ঢেলে দেবে। কি জানি কেন চট্‌ করে এতদিন পরে অমৃতের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম—জিতা রহো বাবা অমর্ত্ত, ঠিক বলেছিলি—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এবার দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় তোকে বালাখানা বানিয়ে দেবো।

চুপ করে আছি দেখে সুন্দরী বল্লে—কি গো ভয় হচ্ছে? তার কথা শুনে আমার চমক ভাঙল—আমি বল্লুম—ভয়! সুন্দরী তোমার সঙ্গে যদি যমের বাড়ীও যেতে হয় ত আমি সুড়সুড় করে চলে যাব। তড়াক করে উঠে বল্লুম—চল, কোথায় যেতে হবে।

ভৈরবী বল্লে—আমার হাত ধর। আমার হাত ধরে সে অগ্রসর হতে লাগল। দু-এক পা চলতেই আমার পা দুটো যেন মাটি থেকে উপরে উঠে পড়ল, আমরা শূন্যের উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটতে লাগলুম। মাটিতে পা লাগচে না অথচ সেই রকম ঠুমকি চালে তার পায়ের পাঁয়জোরের আওয়াজ হতে লাগল।

তাজ্জব করলে দেখছি! নিশ্চয় কোনো হুরীর পাল্লায় পড়েছি। এর সবই দেখি উল্টো রকমের, আচ্ছা যখন শুরু করা গেছে, তখন এর শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়চি না।

শন্‌ শন্‌ করে আমরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগলুম। সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে, হাত ছাড়তেই দেখি আমি মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ভৈরবী বাড়ীটা দেখিয়ে বল্লে—কেমন, মনে পড়ে এই বাড়ী?

—কৈ না, কিছুই ত মনে পড়ছে না।

—আচ্ছা, ঐ গাছটার কথা মনে পড়ে? দূরে যেন একটা ঘন অন্ধকার আকাশের দিকে কতকগুলো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত আঁধার সে জায়গাটা যে রাত্রির অন্ধকারেও সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি বল্লুম—কৈ, না।

তবে চল—বলে সে আবার আমার হাত ধরলে। আবার আমরা সেই রকম করে আর এক দিকে এগিয়ে চলতে লাগলুম। এবার খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা বড় প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালুম। প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটকে ক'জন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে, আমরা তাদের সামনে দিয়ে ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লুম কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পেলে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এটা কার বাড়ী?

—তোমার।

একটু রসিকতা করে বল্লুম—বহুত আচ্ছা, কিন্তু এই অনুগ্রহ মনে রেখো সুন্দরী, কাল সকালে আবু হুসেনের মত আবার পাগলা-গারদে ঠেলো না যেন।

তারপর আমরা বড় বড় ঘর পার হয়ে যেতে লাগলুম, এক একটা ঘরে হাজার ডালের এক একটা বেলোয়ারী ঝাড় জ্বলছে—আলোয় আলো! তিন চারটে ঘর পেরিয়ে আমরা একটা ঘরে এসে দাঁড়ালুম। ঘরের মাঝখানে একটা রেশমী পরদা টাঙান ছিল। আমরা সেখানে যেতেই পরদাটা সট করে সরে গেল। দেখলুম ঘরের মধ্যে উঁচু বিছানায় একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আমি বসে রয়েছি, আর পাশে রয়েছে এই ভৈরবী, যার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আমি এই দৃশ্য দেখচি। আমার একটা হাত সুন্দরীর গলাটা জড়িয়ে ধরেছে, আর একটা হাত তার চিবুক তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। যেন—প্রেয়সী রাগ করেছে! এই ভাব আর কি।

তারপর প্রতি ঘরে ঘরে সে আর আমি, কোথাও বসে গল্প করছি, কোথাও দুজনে পাশা খেলছি, কোন ঘরে সে বসে গান গাইছে, আমি তন্ময় হয়ে শুনছি, কোথাও বা কোন অলিন্দে বসে বসে আমি প্রেমের কবিতা পড়ছি সে শুনছে। দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদেরই দুজনকার ছবি, প্রাসাদের সর্বাঙ্গে যেন সে আর আমি, আমি আর সে।

অনেকক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখে আমরা প্রাসাদের বাইরে চলে এলুম। বাইরে এসে সে আমায় জিজ্ঞেস করলে,—এবার বুঝতে পেরেছ?

আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম দাঁড়িয়েছিল, তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমি তাকে বল্লুম—সুন্দরী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, অথচ মর্ম্মান্তিক কৌতূহলে আমি জর্জরিত হয়ে উঠেছি, আমায় সব খুলে বল। নইলে এই দণ্ডে তোমার সামনে আমি আত্মঘাতী হব।

—বটে—বলে সে আমার হাত ধরে একটা বড় জলাশয়ের ধারে নিয়ে গেল। কালো কুচকুচে সেই জলের বুকে পদ্মের মতন শাদা একটা ধবধবে বাড়ী দেখিয়ে

বল্লে—এটা রাণা উদয়সিংহের প্রাসাদ, আর এই দীঘিকে লোকে উদয়সাগর বলে। সেই দীঘি আর সেই প্রাসাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় সে আমার একটা হাত ধরে বসতে বল্লে। আমি বসে পড়লুম, সে আমার পাশে বসে বলতে লাগল—

ঐ যে পোড়ো বাড়ীটা, যেখানে প্রথমে তোমায় আমি নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটা এক রাঠোর সর্দারের বাড়ী। ঐ সর্দারের এক নাত্নী ছিল, তার নাম ছিল সম্পা। সম্পার মতনই তার দেহের বর্ণ আর সম্পার মতই সে চঞ্চল ছিল, তাই সর্দার তার ঐ নাম রেখেছিলেন। ছেলেবেলাতেই মেয়েটীর বাপ-মা দুই মারা যায়। বৃদ্ধ সর্দার তাকে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছিলেন। সংসারে বৃদ্ধের ঐ নাত্নীটি ছাড়া আর কেউ ছিল না।—এই বলে ভৈরবী একটুখানি চুপ করলে! তারপর আবার সে বল্তে লাগল,—সর্দার যৌবনে রাজার সেনা-নায়ক ছিলেন, বয়স হলে কাজ থেকে অবসর পাবার পর রাজার অনুগ্রহ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। বৃদ্ধ প্রায়ই তার নাতনীকে নিয়ে রাজার প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল বলে রাজ-অন্তঃপুরের সকলেই তাকে খুব ভাল-বাসত। সর্দার প্রাসাদে গেলেই নাত্নীটিকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিত। কখনো কখনো দু' একদিন সে অমন অন্তঃপুরেই থাকত কিন্তু বৃদ্ধ সর্দার তার সংসারের শেষ অবলম্বনটিকে ছেড়ে বেশী দিন থাক্তে পারতো না—কাজেই দু' একদিন যেতে না যেতে আবার তাকে সে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

রাজার একমাত্র ছেলে, ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটির বড় ভাব হয়ে গেল। সম্পা যখনি প্রাসাদে আসত, রাজপুত্র তার সঙ্গে খেলা করত, তাকে ছাড়তে চাইত না। যাবার সময় দুজনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকত। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাদের দু'জনের চোখ জলে ভরে উঠত।

এমনি করে দুজনকার বয়স বাড়তে লাগল। শিশুর ভালোবাসা শেষে যৌবনে প্রেমে পরিণত হল। অবশ্য এদের এই প্রেমের কথা আর কেউ জানতো না। তখন দুজনে আর সে রকম করে খেলবার কিম্বা মেশবার অবসর পেতো না বটে, কিন্তু সম্পা প্রাসাদে এলেই অরুণ ছল করে সহস্র আমোদ ফেলে অন্তঃপুরে ছুটে আসত। গোপনে তাদের দেখা শোনা আর প্রেমালাপ চলত।

সর্দার যখন কোন কাজে বাড়ী ছেড়ে বাইরে যেত, অরুণ ঘোড়ায় চড়ে সম্পাদের বাড়ী যেত। দূরে একটা বটগাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সে লুকিয়ে সম্পার সঙ্গে দেখা করত। এমনি করে তারা দিনে দিনে নিবিড়তর বন্ধনে আপনাদের বাঁধতে লাগল। শেষে এমন হল, একজন আর একজনকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারতো না।

ব্যাপার যখন এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে তখন কানাঘুষা হতে হতে কথাটা

রাণা ও সর্দার দুজনেরই কানে উঠল। রাজপুত্রের সঙ্গে সর্দারের মেয়ের বিবাহ রাণা কিছুতেই অনুমোদন করবেন না, এটা সর্দার জানতেন। তিনি তাঁর নাত্নীকে রাজপুত্রের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে বারণ কোরে দিলেন। সেইদিন থেকে সম্পার প্রাসাদে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তখন আর এ সব প্রতিবন্ধকে বাধা মানবার সময় ছিল না। অরুণ আর সম্পা গোপনে দেখা করে ঠিক করে ফেল্লে, একদিন রাত্রে অরুণ এসে সম্পাকে তার বাড়ী থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে। তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া যাবার ছল করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্দ্দারের বাড়ী অন্ধকার করে সম্পাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশীদিন চাপা রইল না। একমাস যেতে না যেতেই রাণা ও সর্দার দুজনেই টের পেলেন যে রাজপুত্রই এই কান্ড করেছে। রাণা উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে সম্পাকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। অরুণ রাজাকে জানালেন যে সে সম্পাকে বিবাহ করতে চায়। রাণা বল্লেন তা হতে পারে না, সর্দারের মেয়েকে রাণার ছেলে কখনো বিবাহ করতে পারে না, তা ছাড়া সর্দার জাতিতে রাণা-বংশ অপেক্ষা হীন, এক্ষেত্রে কি করে বিবাহ সম্ভব ?

রাণা সম্পাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্দারকে অনুরোধ করে পাঠালেন কিন্তু তিনি আর তাকে গৃহে স্থান দিলেন না, রাণাকে বলে পাঠালেন, যে কন্যা কুল ত্যাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাকে তিনি আর গৃহে স্থান দিতে পারেন না। এই অপমানের বোঝা বৃদ্ধকে আর বেশীদিন বইতে হয় নি, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ বীর এ নশ্বর দেহ ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পরের মেয়েকে নিয়ে রাণা মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ দিতে পারেন না, অন্য জায়গায় বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করলে সে আত্মহত্যা করতে চায়। এই সব ব্যাপারে তিনি বড় বিব্রত হয়ে উঠ্লেন। শেষে অনেক চিন্তার পর তিনি সম্পাকে ব্রহ্মচর্য্য নিতে উপদেশ দিলেন।

রাণার আদেশে সেইদিন থেকেই রাজপুরোহিত এসে সম্পাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। বহুমূল্য পেশোয়াজ, অঙ্গের অলঙ্কার খুলে তাকে যৌবনে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতে হল।

বিলাসের সজ্জা খুলে ফেলে সে গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করলে বটে, কিন্তু তার বুকের রাজ্য জয় করে যে প্রেমের নিশান পুঁতে গিয়েছিল তাকে সে কোন মতে ভুলতে পারলে না! গুরু এসে যখন বোঝাতেন—এ সংসার অনিত্য, এই পৃথিবী, তরুলতা, আকাশ, কানন সবই তাঁর সৃষ্টি। এর মধ্যেই তাঁকে অনুসন্ধান কর, তাঁর রূপ ধ্যান কর, দেখ্তে পাবে। সে একমনে দূরে শ্যামল বনের দিকে চেয়ে থাকত, উপরে আকাশের দিকে চাইত। তার ফুলে ফলে তরুলতায়, আকাশে বাতাসে, গ্রহ-তারার দিকে অরুণেরই মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। তার প্রেমের শিখায় যতই শাস্ত্রের

বোঝা চাপান হতে লাগল, সে আগুন গুমরে গুমরে ততই অন্তর্মুখী হয়ে তার ভিতরটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগল।

অরুণ তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য চেষ্টা করত, কিন্তু রাণার আদেশে সেখানে প্রহরীর এমন কড়া ব্যবস্থা ছিল যে তার মহলে কোন রকমে পুরুষ প্রবেশ করবার যো ছিল না।

রাজকুমারের তবুও মনটাকে অন্য দিকে দেবার নানা রকম উপায় ছিল। রাণার হুকুমে তাকে তখন দরবারে বসতে হত, মৃগয়ায় যেতে হত। কখনো বা সৈন্যদের সঙ্গে কুচ করতে হোত, এমনি করে তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত, কিন্তু সে অভাগিনীর দিনে রাতে অন্য চিন্তা ছিল না। কাজের মধ্যে ছিল তার শাস্ত্রপাঠ, কিন্তু বই খুললেই ছত্রে ছত্রে সে অরুণের নাম দেখতে পেত। কতদিন সে গুরুর সামনে পড়তে পড়তে তার নাম করে ফেলেছে। গুরুর কঠিন নির্মম দৃষ্টি বজ্রের মত তার চোখের উপর গিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।

এমনি করে রাজা ও রাজ্য এই দুটো প্রাণীর প্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের অস্ত্র চালিয়েছে আর ক্রমাগত তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে—দু'জনে মিলে নয়—একা—একা।

তাদের সেই অতৃপ্ত বাসনা ক্রমে রাজ্যকে ছারেখারে দিতে আরম্ভ করলে। তাদের অভিশম্পাতে রাণার রাজ্য যায়-যায় হয়ে উঠল। তবুও তিনি অটল হয়ে রইলেন। তাদের দু'জনের অতৃপ্ত কামনা ঐ প্রাসাদের শিরায় শিরায় প্রত্যেক পাথরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে।

এই অবধি বলেই ভৈরবী একবার চুপ করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর?—তারপর—তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া করতে গিয়ে বন্য জন্তুর কবলে প্রাণ হারালেন।

আমি শিউরে উঠে বললুম—অপঘাত! আচ্ছা, তারপর সম্পা কি করলে?

"—সে? সে আর কি করবে! তার কি অন্য গতি ছিল? তাদের মিলনের একমাত্র উপায় সে দেখতে পেলে—মৃত্যু—হয়ত জীবনে যাকে পায়নি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাকে পেতে পারে, এই মনে করে একদিন রাত্রে এই উদয়সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করলে।

এই উদয়সাগরের জলে যখন সে আত্মহত্যা করতে আসে, তখন এক সন্ন্যাসী তাকে বলেছিল—তোর মৃত্যুর পর কোন জন্মে কোন সময়ে যদি তোর প্রণয়ীর দেখা পাস্ ত তাকে এই উদয়সাগরের জলে তোর মত আত্মহত্যা করতে বলিস। তোর সুমুখে যদি সে এইখানে ডুবে মরে, তবেই তুই তাকে পাবি, নচেৎ নয়।" এই বলে সে আঙুল বাড়িয়ে আমাকে সেই কালো জলের দিকে কি যেন দেখাতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললে, "জন্ম জন্ম ধরে আমি তোমার জন্য এই সাগরের ধারে বসে আছি, কখন তুমি আসবে, কখন তুমি এই সাগরের জলে লাফিয়ে পড়বে! আমি এই জায়গাটার চারপাশ ছেড়ে কোথাও যেতে

পারি না, ভয় হয়, যদি কখনো তুমি আমায় খুঁজতে এসে ফিরে চলে যাও! আমি সন্ধান পেয়েছিলুম, আজ তুমি কালী-মন্দিরে আসবে। আমাদের সেই দিনগুলোর কথা একবার মনে কর। দেখ, ঐ কালো টলটলে জল। তারপর আমাদের অনন্ত সম্ভোগ।"

আমি তাকে বললুম—সুন্দরী, আমি ত জন্মস্মর নই। গত জন্মের কথা আমার একটুও মনে নাই। তবে ফিরে জন্মে যদি তোমার প্রেম পাই ত আমি এখনি এখানে ডুবে মরতে পারি। সুন্দরী তার তুষারের মতন ঠাণ্ডা অধর দিয়ে আমার অধর স্পর্শ করে বল্লে—"যাও' আর দেরী করো না।"

আমি ছুটে সেই সাগরের জলে লাফিয়ে পড়তে গেলুম—মনে হল, যেন, সেই কালো মর্মরের মত জল ফুঁড়ে একটা স্কন্ধবিহীন কদাকার জীব তার লম্বা হাত বাড়িয়ে আমায় লুফে নিতে এল। সম্মুখে তার বীভৎস মূর্তি দেখে আমি পেছিয়ে এলুম। ভৈরবীর কাছে সরে এসে দেখলুম, সে কাঁদছে, তার অশ্রু দেখে আমার মনের ভিতর থেকে মৃত্যু ভয়টা চলে গেল, আমি লাফিয়ে সেই সাগরের জলে ঝাঁপ দিলুম।

যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম, ক'জন লোক আমার পরিচর্যা করছে। একটু সুস্থ হতেই তারা আমায় ধরে রাণার রাজ্যের সীমার বাহিরে ছেড়ে দিয়ে এল, আর বলে দিলে, ফের যদি তারা আমায় তাদের এলাকায় দেখতে পায় ত আমার সাজা হয়ে যাবে।

তার পর অনেকবার লুকিয়ে আমি উদয়সাগরের জলে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু রাণার লোকেরা টের পেয়ে আমায় ধরে ফেলেছে, শেষকালে একদিন তারা আমায় ধরে একেবারে আমাদের দেশে চালান করে দিলে।

আজও কতদিন ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই, যেন সম্পা আমাকে সেই মরুভূমির দেশে ডাকছে, দেখতে পাই, উদয়সাগরের ধারে বসে সে যেন জলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে—এইখানে—এইখানে।

নিশিকান্তর কাহিনী শেষ হয়ে যেতে উমানন্দ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে—তোমায় নিশ্চয় নিশিতে ডেকেছিল। গুপীনাথ বল্লে—নিশিতে পাওয়া সে কি রকম?

—সে এক রকম ভূত আছে। তারা ঘুমের ঘোরে মানুষকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে মারে।

গুপীনাথের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে একেবারে আমসির মতন হয়ে গিয়েছে—শুকনো গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সে আমায় বল্লে—প্রাণে মেরে ফেলে?

ভবানন্দ একটু রসিকতা করে তাকে বল্লে—কি দাদু, ভূত বিশ্বাস হয়?

তার নাম লক্ষ্মীমণি। সে অন্ধ। রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়।

চির দিন তার এ অবস্থা ছিল না। তার রূপ যৌবন, ধন দৌলত সবই ছিল। আজ যারা তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, এমন দিন ছিল, যখন সে তার বিলাসিতার প্রাসাদ শিখরে বসে তাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করত। হাসি, গান, আর তার সঙ্গে শতশত পুরুষের তোষামোদ উপভোগ করেই তার সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কেটে যেত। আজ তার কণ্ঠস্বর বিকৃত, কিন্তু এই কণ্ঠই বিচিত্র সুরের লীলায় যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, তখন মনে হত যেন রাগ-রাগিণী মূর্তি ধরে শ্রোতাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝি আকাশে বাতাসে এমন সুর নেই যা তার গলার সুরে ধরা না দিয়েছে। কিন্তু আজ? আজ কোথায় সে সুর? প্রাণের বীণার তার ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে গেছে,—তাতে আর কোনো সুরই বার হয় না, একটা লজ্জাভরা ভিক্ষার কর্কশ ভাঙা সুর ছাড়া।

কেমন করে এমন হল? ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু তাই থেকে তার ভাগ্যে এতবড় একটা প্রলয় ঘটে গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা।

সে দিন আকাশে খুব ঘটা করে বর্ষার উৎসব লেগেছিল। তারই মৃদঙ্গের বোল্, বর্ষণের সুর আর নূপুর নিক্কনের তাল পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে এখানেও একটা ছোটখাট উৎসব জমিয়ে তুলে ছিল।

এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমণির মজলিসে একটা জলসা চলছিল। লক্ষ্মী ধরেছিল মল্লারের করুণ সুর। শ্রোতা ছিল যারা, তারা যে খুব রসিক সে কথা বলা যায় না—কিন্তু সুরের সেই কান্নার মত কাঁপুনি তাদের নিসাড় হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে যে তোলপাড় আরম্ভ করলে তাতে তাদের সমস্ত অন্তরটা কেমন একটা অজানা ব্যথায় গলে পড়তে লাগল—যেন সেখানেও একটা বর্ষণ শুরু হয়েছে। লক্ষ্মী গাইছিল যে করুণ সুরে তার করুণতা তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরে ছিল।

যখন এমনি করে আসর জমে উঠেছে—ভিতর বাহির চারিদিকে কান্নার একটা করুণ সুরে ভরে উঠেছে, যখন এই করুণতার সুর লক্ষ্মীমণির সেই ঘরে আর ধরে না, তখন হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে কে প্রবেশ করলে। মনে হল যেন বাইরের ব্যাকুল ঝড় পাগলের মত ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে। যে এল রুক্ষ তার কেশ, রুক্ষ তার বেশ, কে যেন তার শুষ্ক দেহ, মলিন বসনের উপর জল ও কাদার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ মনে হল এ যেন কোন আগন্তুক নয়, ঘরে বাইরে আজ যে করুণ সুরের স্রোত চলেছে তাই

থেকেই যেন এই মূর্তি ফুটে উঠেছে—এমনি করুণ তার দৃষ্টি। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সে বলে উঠল—"আমার ছেলে? আমার ছেলে কৈ?"

শুনে মনে হল এ যেন কথা নয়, কান্না!

গান থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার করুণ রেশ সমস্ত ঘরের মধ্যে শ্রোতাদের সমস্ত মনের মধ্যে তখনও ঘুলিয়ে উঠছিল। মনে হল সেই রেশের সঙ্গে বৃদ্ধের গলা যেন একসুরে বাঁধা।

শ্রোতাদের মধ্যে তারই ঝনঝনা বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বললে—"আমার ছেলে কোথায় গেল!"

কেউ কোন উত্তর করতে পারলো না—চুপ করে রইল।

লক্ষ্মীমণি বললে;—"কে তোমার ছেলে?

বৃদ্ধ বললে—"বিপিন।"

বলেই সে আর্তনাদ করে উঠল—"সর্বনাশ হয়েছে।"

তার সেই আর্তনাদের সুরে সকলের মনে হল, যেন একটা সর্বনাশ সত্যই ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে আকাশের বিদ্যুতের কাঁপুনি মেঘের ঝনঝনা যেন সজোরে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল—"আজ দুদিন সে বাড়ী যায় নি। কি করেছে সে জান? অফিসের টাকা ভেঙেছে। পুলিশ আজ সমস্ত দিন ধরে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করেছে—তারা বলে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উপর কি অত্যাচার করেছে দেখবে?"—বলে সে চাদরখানা খুলে শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাতে লাগল। রক্ত তখনো ঝুঁজিয়ে পড়ছে।

সেইদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখ থেকে বেরিয়ে উঠল—"আহা!" অমনি সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠল—"আহা!"

লক্ষ্মীমণি বললে—"কি করলে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাও? তোমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আচ্ছা, আমি রাজি আছি।

বৃদ্ধ বললে—"না না, তাতে কোনো ফল হবে না। টাকাগুলো তুমি ফিরিয়ে দাও, আমি অফিসের লোকদের হাত পায়ে ধরে যেমন করে পারি মিটিয়ে নেব।"

লক্ষ্মীমণি আশ্চর্য হয়ে বললে—"টাকা! কোন টাকা ফিরিয়ে দেব!" বৃদ্ধ বললে, "যে টাকা সে তোমায় এনে দিয়েছে। সে ত তোমার জন্যই চুরি করেছে, তার স্ত্রী পুত্র না খেয়ে মারা গেলেও তার মাথার টনক নড়ে না।"

লক্ষ্মীমণি বললে—"আপনি ভুল করছেন, টাকা সে আমায় দেয়নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে, নইলে সে চুরি করবে কেন? সে ত আগে এমন ছিল না, যে দিন থেকে তোমার কুহকে পড়েছে, সে দিন থেকেই তার মতিগতি বিগড়েছে।"

তার কুহকে পড়ে অনেকের মতিগতি বিগড়েছে লক্ষ্মীমণি সে কথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলে না, কিন্তু এ চুরির টাকা তার তহবিলে যে আসেনি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই সে মাথা নেড়ে চীৎকার করে বলে উঠল—"না না, আমি বলছি টাকা সে আমায় দেয়নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে। জানি তোমরা অনেক চাতুরী জান। এ বুড়োব সঙ্গে কেন চাতুরী খেলছ? নগদ টাকা না দিয়ে থাকে তোমার গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, দাও, সেগুলো ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি দাও।"—বলে বৃদ্ধ তার পা জড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মী পা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে গেল। তার নিজের গাওয়া সেই মল্লারের সুর তখনো তার মনের দ্বারে আঘাত দিয়ে দিয়ে ফিরছিল; মনের বাঁধকে আলগা করে দিয়ে তাকে কেমন যেন সব ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে তার চোখের পাতা ভিজে এল। সে বলে উঠল—"কত টাকা?"

বৃদ্ধ একটা আশার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"আট হাজার টাকা।" আট হাজার! লক্ষ্মীমণির মনে হতে লাগল একটা বুড়ো বামুন একটু চোখের জল ফেলে—এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে? সে হবে না। সে বলে উঠল, "না না, অত টাকা হবে না—তুমি যাও।"

ঝড়ের ঝাপটে শুকনো গাছ যেমন ভেঙে পড়ে বুড়ো ঠিক তেমনি করে ভেঙে পড়ল। সেই সময় আসর থেকে একজন উঠে বৃদ্ধকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দরজা অবধি যাবার আগেই লক্ষ্মী বলে উঠল,—"না না, কেন ওকে টানাটানি করছ! দাঁড়াও।" এই বলে দেরাজের টানাটা খুলে একখানা নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বললে—"এই নিন।"

বৃদ্ধ হাত পেতে তার কাছ থেকে নোটখানা নিয়ে করুণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—"এতে কি হবে? দাও, দাও, আরো কি আছে দাও, আর দেরি কোরো না। হতভাগা দুদিন বাড়ী যায় নি, তার বাড়ীতে যে কি কাণ্ড চলছে তা সে একবারও ভাবে না। আজ দুদিন আমরা সবাই একরকম অনাহারে কাটিয়েছি, তার ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো ক্ষিধের জ্বালায় সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে পড়েছে, এ সব না হয় সহ্য হবে, কিন্তু হতভাগার যদি জেল হয় তাহলে যে কচি কচি ছেলে-মেয়ে-গুলো না খেতে পেয়ে মারা যাবে—ওর স্ত্রীকে যে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।"

রাস্তায় দাঁড়াতে হবে! এই কথা ভাবতে ভাবতে বহুকাল বিস্মৃত একদিন সন্ধেবেলাকার একটি ছবি লক্ষ্মীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। আকাশের সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে এসে সেদিনকার সন্ধ্যা তার চোখের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই হাসি, নাচ, গান-ভরা পৃথিবী সেদিন তার চোখে কি বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল! কি ভয়ঙ্কর অসহায়তা, কি নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না তাকে লড়াই করতে হয়েছিল!—বিদ্রোহী মন যে পথে যাবার

বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল সেই মনকে কি নিষ্ঠুর শাসন করে, কি-রকম ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফিরতে হয়েছিল!—সে ব্যথা সে আজও ভুলতে পারেনি। তার গোপন হৃদয়ের পরতে পরতে অদৃশ্য লিপিতে যে কাহিনী লেখা ছিল অতীত আজ বর্তমানের মূর্তি ধরে সেগুলোকে তার মনের সামনে আজ স্পষ্টতর করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা!

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মী আলমারির দরজা খুলে গহনার বাক্সটা এনে বৃদ্ধের সামনে ফেলে দিয়ে বললে,—"যাও, আর একমিনিটও দেরী কোরো না, তাহলে হয়ত তোমার পুত্রবধূকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে। যাও, যাও—কি ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ!"

বৃদ্ধ বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে একবার গয়নাগুলোর দিকে আর একবার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে লক্ষ্মী দুহাত দিয়ে ঠেলে তাকে একেবারে ঘরের বার করে দিলে।

তার মাথা তখনও ঘুরছিল; মনে হতে লাগল গয়নাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রক্তও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে বর্ষণ তখন থেমে গেছে;—আকাশ যেন তার সমস্ত সম্পদ ঝরিয়ে দিয়ে ঠিক তারই মত নিঃস্ব হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মী রিক্ততার একটা ব্যাকুলতায় আত্মহারা হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

তার পর পিছনের বারান্দা থেকে একজন ছোকরার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে লক্ষ্মী বললে—"চুরির টাকা কোথায় রেখেছিস বল্। শিগ্গির বল্। সে টাকা আমায় এক্ষুনি এনে দে। আমার সর্বস্ব আজ তোর জন্যে বিলিয়ে দিয়েছি, জানিস?"

বিপিন বললে, "জানি। কিন্তু কেন দিলি?—টাকা আমার কাছে নেই।"

লক্ষ্মী বললে,—"কোথায় গেল টাকা?"

"কি হবে তা শুনে? সে টাকা ত আর ফিরে পাবিনি।"

"তবে তুই কাউকে দিয়েছিস্?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে দিলি? বল্, শিগ্গির বল্, কে তোর পেয়ারের লোক আছে!"

"আমি বলব না। শুনলে রাগ করবি।"

"না না তুই বল্!"

বিপিন জড়িতকণ্ঠে বললে,—"টাকা আমি কামিনীকে দিয়েছি—"

—"কামিনী—কামিনী! চোর কোথাকার, পাজি বদমায়েস বেরো এখান থেকে, বেরো!"

বিপিন লক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, "রাগ করিসনে ভাই!"

লক্ষ্মী সজোরে তার হাত ছিটকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল: বললে—"চোরকে আমি ঘরে ঠাঁই দিইনে—বেরো তুই চোর!"

বিপিন উত্তেজিত হয়ে বললে—"চোর চোর করিসনি বলছি !"

লক্ষ্মীমণি একটা অট্টহাস্য করে বলে উঠল—"ওরে আমার সাধুরে ! তুই চোর না ত কি !"

বিপিন আর সাম্‌লাতে পারলে না, সামনে থেকে একটা ঘটি তুলে নিয়ে লক্ষ্মীমণির গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সেই ঘটি তার মুখের উপর এসে লাগল—সে ঘুরে পড়ল—তার দুটো চোখ আর মুখের খানিকটা একেবারে থেঁতলে গেল।

বিপিন তাকে একা ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পথের বঁধু

নিতাইয়ের নেশাটা সেদিন কি রকম চড়ে গিয়েছিল, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে যেমন একটু তন্দ্রা এসেছে ঠিক সেই সময় দেয়ালের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নিতাইয়ের মনে হল কে যেন তার মগজে দু-ঘা হাতুড়ী মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পড়ে পড়ে সে ভাবতে লাগল ঘুম যদি একেবারে না হয়, তবে কালকে আবার আফিসে গিয়ে ঢুলতে হবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—আরে কালকে ছুটি যে। পরম আলস্যে সে পাশ বালিসটাকে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমের সাধনাতে মন দিলে।

বেলা তখন প্রায় ন-টা। মুখের উপর রোদ এসে পড়াতে তার ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রিতে নেশার ঝোঁকে বালিশ নিয়ে সে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছিল। সেইখানে শুয়ে শুয়ে সে দেখলে, খাটের উপর চারু পড়ে রয়েছে। তার একটা পা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে, আর একটা পা মাটির দিকে ঝুলে।—শোয়া ও বসার মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

ঘরের এককোণে দুটো দেশী মদের বোতল, একটা খালি, আর একটাতে তখনো একটু মদ রয়েছে। চারুর দিকে চেয়ে চেয়ে নিতাই বল্লে—ছোঁড়ার এখনও নেশা কাটেনি দেখ্‌ছি, এই চেরো উঠবিনে—

চারুর কোন জবাব নেই।

নিতাই পাশ ফিরে আবার চোখ বুঁজিয়ে ফেল্লে। আরও আধঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করে সে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। গত রাত্রির ফুর্ত্তির নিশানা তখনো ঘরময় এদিক-ওদিক ছড়ান রয়েছে। সে জিনিসপত্রগুলোকে গুছিয়ে রেখে ঘরটাকে বেশ করে ঝাঁট দিলে। তারপর জারুলকাঠের

টেবিলটার উপর থেকে একখানা আধপোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে সেটাকে ধরিয়ে ডাকলে—

এই চেরো উঠবিনে—

চারু চোখ না চেয়ে শুধু তার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে—হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান।

নিতাই একটা সুখ-টান দিয়ে চুরুটটা চারুর হাতে দিলে। চারু চোখ বুঁজিয়েই তাতে কষে একটা টান মেরে উঠে বল্লে—আজ ছুটি না—নিতাই টেবিল চাপড়ে গান ধরলে—

ছুটি ছুটি ছুটি
আজকে ছুটি কালকে ছুটি
পরশু ছুটিরে—
আমরা দুটি চালাই খাঁটি
মজা লুটিরে—

মকদুমপুরে রেলি ব্রাদার্সের যে তিষির আড়ত আছে, নিতাই ও চারু সেখানে কাজ করে। চারুর দুনিয়ায় কেউ নেই, দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়ীতে সে মানুষ হচ্ছিল। এই দূর সম্পর্কের মামাকে যেদিন সুন্দরের ডাকে তল্পী-তাল্পা গুটোতে হল, সেই দিন থেকে তাকে নিজে চরে খেতে শিখতে হয়েছে। নিতাইয়েরও তাই, পৃথিবীতে থাকবার মধ্যে তার এক ঠাকুরমা আছে, কাশীতে থাকে। ঠাকুরমা থাকার জন্য সাংসারিক সুবিধা তার কিছুই নেই বরং অসুবিধাই আছে। কারণ প্রতিমাসে কুড়িটাকা মাইনে থেকে পাঁচটি করে টাকা কাশীতে পাঠাতে হ'ত। দুজনে প্রায় সাত বছর এই মকদুমপুরে এক সঙ্গে বাস করছে, দুইটি সমান অভাগা, মিলেছেও ভাল।

চারু বল্লে, আজ রাঁধাবাড়ার কি হবে? ট্যাঁকে ত একটি আধলাও নেই।

—কাল কি সব খরচ করে ফেলেছিস্ নাকি!

—ছিলত মোটে তিনটে টাকা—আফিস খোলা থাকলেও না হয় পাওয়া যেত, গুডফ্রাইডের ছুটি পড়ে সব মাটি হয়ে গেল। নিতাই বল্লে—তবুত ছুটির একটা দিনও কাটেনি—দে আজ ভাতে-ভাত চড়িয়ে।

—আরে ভাতে-ভাত চড়াই কি দিয়ে, চালও যে নেই, ওদিকে মাংসওয়ালা ব্যাটা এমন তাগাদ জুড়েছে যে ও-পথ মাড়াবার যো নেই।

রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে জংলা সুরে কি একটা গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছিল, নিতাই সেই সুরে শিষ দিতে আরম্ভ করলে আর চারু তালে তালে টেবিল চাপড়ে তবলা বাজাইতে লাগিল।

মিনিট দুয়েক এই অপূর্ব ঐক্যতানবাদন চলবার পর শিষ থামিলে নিতাই বল্লে—আয় তবে এবেলা একাদশী করা যাক, ওবেলা কানাইয়ালালের ওখানে আমার নেমন্তন্ন আছে আসবার সময় গোটা কয়েক লাড্ডু পকেট ভরে নিয়ে আসব'খন!

খানিক পরে আপনার মনে সে আবার বলতে লাগল—ফরসা জামাও নেই, কি পরে যে যাই। আফিসের কোট এঁটে ত আর ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া যায় না।

দুই বন্ধুতে সেদিনকার মতন একাদশীর বন্দোবস্ত করে বেলা এগারোটার সময় আবার বিছানা নিলে। দিনটা প্রায় কাটিয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ দরজা ধাক্কার আওয়াজ শুনে চারু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখলে একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত। লোকটি বাঙালী, বয়স প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ। চেহারা ও সাজগোজ দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। আগন্তুক চারুকে নমস্কার করে বল্লে—মশায় আমি বাঙ্গালী, নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। আপনারা বাঙ্গালী তাই আপনাদের এখানে এসে হাজির হয়েছি।

নিতায়ের চোখ থেকে দিবা নিদ্রার জড়তা তখনো কাটেনি। রাত্রে তার ভাল করে ঘুম হয় নি, দিনেব ঘুমটা বেশ জমে এসেছিল কোত্থেকে এই লোকটা এসে লাখ টাকার ঘুমটা মাটি করে দিলে। চোখ বুঁজিয়ে পাশ ফিরতে-ফিরতে সে বল্লে—তা বেশ করেছেন, কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থানে আসার উদ্দেশ্য? প্রত্নতত্ত্ব বুঝি!

নরেশ বল্লে—আর সে কথা বলবেন না মশায়, যাচ্ছিলুম বাঁকিপুরে, এই স্টেশনে নেমে খাবার কিনতে-কিনতে ট্রেনখানা ছেড়ে দিলে। আপনারা একঘর বাঙালী আছেন শুনে এখানে এসেছি।

চারু বল্লে—তা বেশ করেছেন।

নিতাই একটা তান ধরলে——

আসিতে হে যদি নব যৌবনে
ওগো রাজ-অধিরাজ—

—বাঃ দিব্যি গলাটি ত আপনার—

চারু বল্লে—হ্যাঁ, উনি একজন উঁচুদরের গাইয়ে—নাম নিতাই মুখুয্যে। রেলির আড়তের তিষির প্রেমে মজে এখানে আশ্রম কোরেছেন।

নিতাই তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করলে—আর ইনি, এঁর নাম চারু দত্ত,—জাতিতে কায়স্থ বলেন বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বাস হয় না—ইনি একাধারে কবি, গল্প লেখক, সমালোচক—বাংলার সাহিত্যগগনের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—মশায়, ইনিও তিষি—

নরেশ বল্লে—আপনি চারুবাবু—আপনার লেখা ত প্রায়ই পড়ি। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হল। বেশ আছেন আপনারা দুটিতে—

নরেশের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে নিতাই আবার তান ছাড়লে—

আমরা দুটি
স্বর্গ লুটি
মর্ত্ত ভরেছি—

নরেশ নিতাইয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—আহা, বেশ আছে এরা—না আছে বড়বাবুর রক্তচক্ষু, না আছে সাহেবের দাবড়ী। দুনিয়া-

শুধু লোক গুড ফ্রাইডেতে চারিদিন ছুটি পায়, নরেশের বড়বাবু তাকে হুকুম করেছিলেন সোমবারে একবার বেরুতে হবে হে—কত কষ্টে বড় বাবুর হাতে-পায়ে ধরে চারিদিনের ছুটি নিয়ে সে একটু বেরিয়ে পড়েছে। কেরাণী জীবনেও এত আনন্দ থাকতে পারে দেখে তার মনটা আপনিই খুসী হয়ে উঠছিল।

তান থামিয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা কল্লে—এতক্ষণ ত আমরা নিজেদের বাহবা গাইলুম, এখন মশায়ের নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

—খুব পারেন, আমার নাম নরেশচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতায় চাকরী করি—

—চাকরী করেন! তবে ও নামটাতে আমার আপত্তি আছে, নামটা বদলে ফেলুন মশায়।

চারু নিতাইকে একটা ধমক দিলে—চুপ কর! তারপর সে নরেশকে বল্লে—কিছু মনে করবেন না মশায়, ও একটু—

নরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—না, না, মনে করব কেন, উনি ঠিক কথাই বলেছেন।

নিতাই খাটখানার উপর একটা চাপড় মেরে বল্লে—আচ্ছা বাবা, নরেশ নরেশই সই, নামে কি করে—

What's in a name
oh Romeo—

বাঁকিপুরে কি কাজে যাওয়া হচ্ছিল ?

—বাঁকিপুরে কাল সাহিত্য-সম্মিলন হচ্ছে দেখতে যাচ্ছি পথে এই কাণ্ড।

চারু বল্লে—জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, রাত বারটার গাড়ীতে যাবেন'খন। নরেশ জামা খুলতে লাগল, সেই অবসরে চারু নিতাইকে ইঙ্গিত করলে ভদ্রলোক এসেছে, এখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের কি হবে ?

নিতাই নির্ব্বিকার ভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—যীশু বলিলেন হে মনুষ্যপুত্র, তোমরা শুক্রবারে নিরম্বু উপবাসে কাটাইবে, কারণ ঐ'দিন আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য পাশ বিলি করিব।

চারু নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলে—আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?

নরেশ বল্লে এই স্টেশনে পুরী কিনেছিলুম কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের পুরোন পুরীতে প্রবেশ করতে সাহস হল না মশায়, ফেলে দিতে হল।

নিতাই বল্লে—চলুন তাহলে আমাদের সঙ্গে বাজারে। আপনার বেড়ানও হবে, আমরাও খাবার-দাবার কিনে এনে চড়িয়ে দিই। আপনি দয়া করে এসেছেন, অতিথি-সৎকার করতে হবে ত।

এই দুটি লোকের কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার দেখে শুনে নরেশ বেচারী একটু ভড়কে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ হয়ে তার একটা ধারণা ছিল যে তারা অন্য জায়গার লোকেদের চেয়ে একটু উচ্চ শ্রেণীর জীব। নিতাই আর চারু তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, না, তাদের ব্যবহারই ঐ রকম তাই নিয়ে সে একটু গোলমালে পড়ে গেল। যাক্, যতক্ষণ এখানে থাকা যায় চুপ করে বসে না থেকে দেশটা একটু ঘুরে দেখে নিলে মন্দ কি—ভেবে নরেশ বল্লে—চলুন।

পায়চারি করতে করতে তারা বেনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক দিন থেকে এই লোকটার তাগাদার চোটে তারা এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকানে এসে চারু মস্ত একখানা ফর্দ্দ দিয়ে বল্লে—এখুনি এই জিনিস গুলো যেন বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, দামটা দিন কয়েক পরে পাবে।

বাবুদের সঙ্গে নূতন লোক দেখে বেনিয়া মহারাজ পুরোন ধারের কথাটা আর পাড়েনি কিন্তু আবার ধারের কথা শুনে সে খাপ্পা হয়ে বল্লে—আগাড়ী যো উধার গিয়া—

—দাঁড়া না ব্যাটা, ভগা নেহি ভেজনেসে কাঁহাসে রুপেয়া দেগা ?

বেনিয়ার নন্দন অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চারুর দিকে চেয়ে থেকে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করলে—ভগা ! !

নিতাই বল্লে—হ্যাঁ—ভগাকা নাম নেহি শুন—এত্‌না বড়া ম্যাজিস্ট্রেট—উ চারু বাবুকা দাদা হায়।

মাংসওয়ালাকেও ভগার চেক দেখিয়ে তারা সন্ধ্যের সময় বাজার করে নিয়ে বাড়ী ফিরে রান্না চড়িয়ে দিলে।

নরেশ গায়ের কোট আর পাঞ্জাবীটা খুলে এক জায়গায় টাঙিয়ে রেখে তাদের সঙ্গে রাঁধতে লেগে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে নিতাই চারুকে ডেকে বল্লে—ওরে আমি কানাইয়ালালের বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি, বেচারা অনেক করে বলে গেছে—গোটা চারেক গান গেয়েই পালিয়ে আসব।

—আচ্ছা, বলে আবার চারু ময়দা মাখার দিকে মন দিলে।

নরেশ চারুকে সাহায্য করছিল আর ভাবছিল এখানে এসে বেচারীদের বড় ব্যেতিব্যস্ত করে তুলেছি, ভাবটা একটু জমিয়ে নেবার জন্য সে চারুকে জিজ্ঞাসা করলে—চারু বাবুর দেশ কোথায় ?

চারু একচোখ বুজিয়ে কাঠের উনুনে ফুঁ দিতে দিতে বল্লে—আকাশের তলায়—আপনার ?

—আমার বর্ধমান জেলায়, তবে দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ফুঁ দিতে দিতে উনুনটা যখন বেশী ধরে উঠল তখন চারু মাংসের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে গত রাত্রে যে বোতলটা শেষ করা হয়নি সেটাকে বের করে গেলাসে একটু ঢেলে নরেশকে বল্লে—আসুন।

নরেশ হাতজোড় করে বল্লে—মাপ কর্ব্বেন মশায়, ওসব অভ্যাস নেই।

—বিলক্ষণ, কলিকাতায় থাকেন আর অভ্যেস নেই কি রকম, সে কি একটা কথা হল।

শনিবার হলেই নরেশদের মেসের বাবুরা মদ খেয়ে হল্লা লাগাত। সোজা মানুষগুলো জলের মতন এই একটু পদার্থ খেয়ে কি রকম ওলটপালট হয়ে যায় দেখে ও জিনিসটার উপর তার একটা ভয় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে জীবনে কখনো মদ ছোঁয়নি একথা সে হলফ করে বলতে পারে না। মেসের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তাকে দু' একবার খেতে হয়েছিল কিন্তু নেশা হবার

মতন মদ সে কখনো খায় নি। কাজেই মদ খেতে যে কষ্টটুকু পেতে হয় তার অভিজ্ঞতা নরেশের ছিল, নেশার মজাটা সে কখনো পায় নি।

সে হাত জোড় করে বল্লে—আমায় মাপ করুন চারুবাবু—আবার বারোটার গাড়ীতে যেতে হবে।

চারু বল্লে—আপনি না খেলে বুঝব গরীব বলে এই ধান্যেশ্বরীকে অবহেলা কচ্ছেন। আমায় এখন তবে বিলাতী আনতে যেতে হল।

সে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে তাতে হাত গলাতে লাগলো।

চারুকে জামা পরতে দেখে নরেশ বল্লে—আহা—না—আপনি পাগল হলেন নাকি—আচ্ছা দিন মশায়—আপনার কথায় এটুকু খাচ্ছি, আর খেতে বলবেন না কিন্তু—সে চারুর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে চোঁ করে এক চুমুকে পাত্রটা নিঃশেষ করে ফেল্লে।

সমস্ত দিন রেলের ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে নরেশের শরীরে একটা অবসাদ এসেছিল। সুরার অব্যর্থ শক্তিতে তার সে অবসাদটুকু কেটে গিয়ে মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নরেশের মনে হচ্ছিল, একটা গান গাওয়া যাক্—কিন্তু চারু কি মনে করবে ভেবে এই অহেতুকী ফুর্ত্তিটাকে কোন রকমে চেপে সে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাইবাবুর গলাটি বেশ, না?

মাংস কষতে কষতে চারু জবাব দিলে—বেড়ে—

নরেশের মনে হচ্ছিল আর একটু খেলে হত। কিন্তু প্রথমে সে যে রকম আপত্তি করেছিল তাতে আর চাওয়া যায় না—সে ঠিক করে রাখলে এবারে বল্লে দেওয়া মাত্র খেয়ে ফেলব। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও চারুর কোন রকম উচ্চবাচ্য না পেয়ে নরেশ মুখ ফুটে বলে ফেল্লে—দাদা, খুব কম করে আমায় আর একটু দিন ত।

চারু নরেশকে একটুখানি দিয়ে বোতলে যেটুকু ছিল নিজে শেষ করে রান্নায় মন দিয়েছিল, নরেশ আবার চাওয়াতে সে একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। বোতলে ত এক ফোঁটা নেই, তা ছাড়া কাছে পয়সাও নেই যে আনিয়ে নেবে! তবু সে বল্লে—আর ত নেই দাদা, আচ্ছা দাঁড়াও, আনিয়ে নেওয়া যাচ্ছে—

নরেশ কোটের পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে বল্লে—চল দাদা, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক্, ওটা এনে তারপর রান্নার দিকে মন দেওয়া যাবে।

চারু একবার মুখ তুলে দেখলে, নরেশ যেখানে কোট আর পাঞ্জাবী খুলে রেখেছিল সেখানে শুধু কোটটা ঝুলছে। পাঞ্জাবীটা অন্তর্হিত হয়েছে দেখে সে আপনার মনে বিজবিজ করে কি বল্লে।

নরেশ বল্লে—দাদা আমাকে কিছু বলছ?

—না ভাই, ভাবছি, কাকে দিয়ে বোতলটা আনাই।

নরেশ ব্যাগটা খুলে জিজ্ঞাসা করলে—ক'টাকা লাগবে দাদা?

—ও কি, তুমি টাকা বার করছ কেন?

—ওই ত দাদা, আমাকে পর ভাবলে।

চারু পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে টাকাটা দিয়ে তখুনি তাকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে দেখতে পাওয়া গেল চারু মাটিতে পড়ে প্রাণপণে পাশ বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে আর বলছে—

—ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী।

আর নরেশ তার সামনে উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, তার গাল বয়ে টসটস করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে মোমবাতিটাকে নিবিয়ে দিয়ে গেল। ঐটুকু আলোর মধ্যে একরাশ জ্যোৎস্না কি রকমে লুকিয়ে ছিল, বাতিটা নিবে যেতেই ঘরটা চাঁদের আলোয় ভাসতে লাগল।

জ্যোৎস্না দেখে চারু পাশ বালিশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুরু করলে—

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণপূর্ণিমা,
অন্তরের অন্তরশায়িনী! নাহি সীমা
তব রহস্যের!

ওদিকে কানাইয়ালালের আসরে বসে মাংস পোড়ার গন্ধে নিতাই চমকে চমকে উঠতে লাগল।

নরেশ তন্ময় হয়ে চারুকে দেখছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল—মাংসটা বোধহয় পুড়ে গেল।

এ্যাঁ—বলে চারু একলাফে উঠে পড়ে দেশলাই খুঁজে বাতিটা জেবলে মাংসের হাঁড়ি নাবিয়ে ফেল্লে। তারপর নিজে একপাত্র খেয়ে নরেশকে একটা পাত্র ভরে দিলে।

নরেশকে পাত্রটা দিয়ে সে হাঁড়ি থেকে একটা মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে দেখছিল, সেগুলো খাবার অবস্থা পেরিয়ে গেছে কিনা। এমন সময় নরেশ বল্লে—দাদা পাঞ্জাবীটা ওখানে রেখেছিলুম দেখতে পাচ্ছিনা।

—এ্যাঁ, পাঞ্জাবী! তাইত গেল কোথায়। চারু বাইরের বারান্দায় গিয়ে ডাকলে—ভন্তু—নেতা ছোঁড়া সেই যে গেছে—তাইত মহা মুস্কিলে পড়লুম যে!

চারু ঘরে ঢুকতেই নরেশ বল্লে—খোঁজ পেলে দাদা? সেটাতে সোনার বোতাম ছিল।

—কিছু ভয় নেই, এই পাত্রটা টেনে নাও, ও পাঞ্জাবী কিছু মনে থাকবে না। নরেশ সে পাত্রটা নিঃশেষ করে গেলাসটা রাখতে রাখতে বল্লে—রেখে দাও তোমার পাঞ্জাবী—পড় দাদা, কবিতা পড়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা তুমি ছেড়ে তুই-তুকারি আরম্ভ করে দিলে। খানিকক্ষণ পরে চারু প্রতিজ্ঞা করে বল্লে—তোর অফিসের বড়বাবুকে আমি খুন করে ফেলব। ঘণ্টাখানেক পরে তারা দুজনে দিব্যি করে ফেল্লে—জীবনে আর কখনো ছাড়া-ছাড়ি হব না।

রাত্রি বারোটার সময় নিতাই টলতে টলতে দুম-দাম করে ঘরের মধ্যে এসে দেখলে একদিকে একতাল ময়দা মাটিতে গড়াচ্ছে আর একদিকে নরেশ আর চারু গলা জড়াজড়ি করে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

তাদের সেই অবস্থা দেখে নিতাই কীর্ত্তন ধরলে—

আমার নাগর, যায় পর-ঘর
আমারই আঙিনা দিয়া—

বারোটার গাড়ী তখন স্টেশনে এসে ভোঁ দিচ্ছিল, বাঁশীর শব্দ পেয়ে নরেশ ধড়মড় করে উঠে বল্লে—বারোটার গাড়ী কি চলে গেল দাদা ?

নিতাই বাতিটা ফু' দিয়ে নিবিয়ে ধড়াস করে খাটের উপর পড়ে সুর ভাঁজতে লাগল।

—যাচ্ছে যাক্, কিছু বোলো না, কিছু বোলো না।

হাত-ফের

নিবারণ বাড়ির বড় ছেলে হলেও সংসারের সব চেয়ে বড় বোঝাটা মাথায় তুলে নেবার মত শক্তি তার কাঁধে তখনো হয়নি। তার বাবা তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে কোন রকমে টাল খেতে খেতে একটা অজানা আঘাটায় তাদের নামিয়ে রেখে যখন সরে পড়েছিলেন, তখন সে নিতান্ত শিশু।

তার মা গ্রামের লোকদের বাড়ি কাজকর্ম করে কোনো রকমে তাদের ছোট সংসারটি চালিয়ে নিত ; কিন্তু সে রকম করে বেশীদিন আর চলল না ; কয়েক বছর যেতে না যেতেই দেশে দুর্ভিক্ষ এল ; কিছুদিন বাদে, যারা তাদের সাহায্য করত তাদেরই দিন চলা ভার হয়ে উঠল।

নিবারণ তখন গ্রামের এন্‌ট্রেন্‌স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার মা তাকে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শেখাচ্ছিল, কিন্তু শেষে এমন হল যে দিন আর চলে না। ছোট ভাইবোনদের ক্ষিধের কান্না আর মায়ের বুকফাটা চোখের জল দেখে দেখে নিবারণের দিন কাটানো অসহ্য হয়ে উঠল।

সে শুনেছিল শহরে গিয়ে চেষ্টা করলে নাকি অর্থ উপায়ের সুবিধা হতে পারে। লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে বড়লোক হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবার একটা দুরাশা অনেকদিন তাকে প্রলুব্ধ করে রেখেছিল কিন্তু শেষটা তাকে বাধ্য হয়ে তার মায়া কাটাতে হল।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল। রইল তার পড়া—শুনো, রইল তার ভবিষ্যতের সেই

রঙিন ছবিগুলো—কল্পনার তুলি দিয়ে যে গুলোর উপরে এতদিন ধরে সে হাত বুলিয়ে এসেছিল।

বর্ষার একটা সন্ধ্যায় সে শহরে এসে নামল। এখানে কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে এখন যায় কোথায়? একটা রেলের কুলি তাকে যাত্রীদের বিশ্রামের ঘরখানা দেখিয়ে দিলে, সেইখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার জন্যে হাজার যাত্রীর মধ্যিখানে একটু জায়গা করে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

রাত্রিটা একরকমে জেগেই কেটে গেল। এত আলো সে জন্মে কখনো দেখেনি; আর এত গোলমালও এর আগে কখনো শোনে নি। এই হট্টগোলের ভিতরেও মানুষ এমন স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারে দেখে সেদিন সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা ষ্টেশন ছেড়ে সে শহরের ভিতর ঢুকল। ঘোড়ারগাড়ী, ট্রামগাড়ী, মটরগাড়ীর মাঝখানে পড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে বেচারী পদে—পদে আপনাকে বিপন্ন করে তুলতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শহরের চারিদিক ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময় একটা দোকান থেকে দু-পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে সে বসল।

গঙ্গার ধারটা শহরের অন্য জায়গার চেয়ে অনেকটা নিস্তব্ধ। ঘাটের একটা ধাপের উপর চুপ করে বসে—বসে সে ভাবতে লাগল—মা, ভাই, বোন। সুদূর সেই পল্লীগ্রাম থেকে তাদের কান্না যেন বাতাসে ভেসে এসে তার কানে পেঁছিতে লাগল।

তার চোখে জল আসছিল। কি করবে সে একা এই শহরে? অসহায় অপরিচিত সে কি করে অর্থ উপায় করে বাড়িতে পাঠাবে? তার কেমন ভয়—ভয় করতে লাগল। একবার ভাবলে যাই বাড়ি ফিরে, যেমন করে হোক দিন সেখানে কেটে যাবে; না হয় সকলে একসঙ্গে গলাগলি হয়ে মরে থাকব! ট্যাঁকে তার যে ক'টা পয়সা ছিল একবার বার করে গুণে দেখে আবার সেগুলো ট্যাঁকে গুঁজে রাখলে। তারপর আবার মনে হ'ল বাড়ির সবাই অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, আমার আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছে। এইসব ভাবতে ভাবতে তার কান্নার বেগ ক্রমেই বেড়ে গেল,—মুখে কাপড় দিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।—"কিরে ছোঁড়া, এখানে বসে কি কাঁচ্ছিস?"

নিবারণ চমকে উঠল। শহরে এসে অবধি কারো সঙ্গে তার কথা হয় নি। হঠাৎ এই সম্ভাষণে সে একেবারে ভড়্কে গেল।

সে পাশ ফিরে দেখলে, একটা লোক—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বল্‌ছিল। সেই চেহারা দেখে নিবারণের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তার কান্না থেমে গিয়েছিল কিন্তু তখনো তার গলা দিয়ে থেকে—থেকে কান্নার একটা হেঁচকি উঠছিল। সে কি উত্তর দেবে কিছু ভেবে ঠিক করবার আগেই লোকটা বলে উঠল—'ইস্‌, আবার কান্না হচ্ছে?' আদুরে গোপাল আমার রে! কাঁদছিস্‌ কেন? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?"

অজ্ঞাতসারে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"হ্যাঁ।"

ক্ষিদে তার পেয়েছিল সত্যি। সমস্ত দিন অনাহারের পর দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে পাড়াগেঁয়ে ছেলের পেট ভরে না, কিন্তু সে লোকটাকে ক্ষিদের কথা জানাবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

লোকটা নিবারণের হাতখানা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্লে—"ক্ষিদে পেয়েছে ত এখানে বসে কি কচ্ছিস্? চল্।"

মন্ত্রচালিতের মত নিবারণ তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তাকে বল্লে—"ক্ষিদেই যদি পেয়ে থাকে তবে গঙ্গার ধারে মরতে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাবি খেয়ে—দেয়ে হাত-মুখ ধুতে, বুঝলি ছোঁড়া!"

নিবারণ ভয়ে ভয়ে একটা ছোট্ট "হ্যাঁ" বলে তার সঙ্গে সঙ্গে সুড়্ সুড়্ করে চলতে লাগল।

তারপর এ—গলি সে—গলি—এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে তারা একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

হোটেল—ওলাকে খাবার দিতে বলে লোকটা পকেট থেকে একটা মদের বোতল বার করে গেলাসে ঢেলে মাঝে মাঝে তাতে চুমুক মারতে লাগল।

খাবার যা এল তার আকার আস্বাদন সবই নিবারণের কাছে একেবারে নতুন। ক্ষিদের ঝোঁকে দু-এক কামড় খাবার পর তার আর খেতে প্রবৃত্তি হল না। মদ আর মাংসের একটা বিকট মিশ্র-গন্ধে তার পেটের ভিতর থেকে বমি ঠেলে উঠতে লাগল। সে লোকটা মদের গ্লাসটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়ান-জড়ান সুরে বলে—"একটু খাবি?"

নিবারণ ঘাড় নেড়ে জানালে—"না।"

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তোর নাম কিরে?"

সে ভয়ে ভয়ে বল্লে—"নিবারণ।"

এক গাল হেসে লোকটা বলে উঠল—"বা—রে, বেড়ে নাম ত—নি-বা-র-ণ!"

একটু চুপ করে থেকে খানিকটা আধসিদ্ধ মাংস চিবোতে চিবোতে সে আবার বল্লে—আমার নাম কেষ্ট, বুঝলি? আবার খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে কি করিস?"

নিবারণ উত্তর দিল—"টাকা রোজগারের চেষ্টায় এসেছি।"

হো-হো করে একটা বিকট হাসি হেসে কেষ্ট বলে উঠল—"বা-রে আমার মানিক! টাকা রোজগারের চেষ্টায় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিলি?—টাকা রোজগার করতে চায তো আমার সঙ্গে চল্। তুই নৌকা বাইতে পারিস?"

নৌকো বাইবার কথা শুনে নিবারণের মনে স্ফূর্ত্তি দেখা দিল; ছেলেবেলা থেকে খেলার মধ্যে এইটেই তার প্রধান খেলা ছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—"নৌকো চালানো? ওঃ, সে আমি খুব পারব।"

কেষ্ট তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বল্লে—"তুই ত খাসা ছেলে দেখছি—নে, নে, একটু টেনে নে।"

এই টেনে নেওয়ার কথাটার মানে যে কি, নিবারণ ভাল করে বুঝতে পারলে না। সে একটু থতমত খেয়ে নিজের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি টানব ?"

গেলাসটা একটু এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট বল্লে—"এইটুকু চোঁ—করে মেরে দে।"

নিবারণ মাথা নেড়ে বল্লে—"না আমি খাই না।"

"খাস না" ?—বলেই সে গেলাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে হাত ধুয়ে তাকে বল্লে—"চল্। পারবি ত ? দেখিস্ !"

নিবারণ জোরে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—"হুঁ, খুব পারব !"

তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে তারা আবার গলি—ঘুঁজি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। জেটির ধারে একখানা ছোট নৌকো বাঁধা ছিল তার উপরে তারা চড়ে বসল।

নিবারণের হাতে একটা দাঁড় তুলে দিয়ে কেষ্ট নিজে গিয়ে হালে বসল। তারপর একটু একটু করে নৌকো খানাকে মাঝ—গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বল্লে—"নে, দাঁড় টান, কিন্তু দেখিস্ বেশী তাড়াতাড়ি করিস্‌নি। অনেক দূর যেতে হবে, হাঁপিয়ে যাবি।"

--"আচ্ছা" বলে সে আস্তে আস্তে দাঁড় ফেলতে লাগল।

রাত্রির প্রথম প্রহর তখন প্রায় কেটে গেছে। বর্ষার এক—আধখানা পাতলা মেঘ চাঁদের পাশ দিয়ে দৌড়-দৌড়ি করছে। ক্রমে মেঘগুলো সব এক জোট হয়ে চাঁদখানাকে একেবারে ঢেকে ফেল্লে। চারিদিকে অন্ধকার, কেবল দূরে প্রাসাদের মতন বড় বড় জাহাজগুলোর ছোট ছোট জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা আলোর টুকরো নদীর জলের উপর লম্বা হয়ে পড়ে তখনি আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল ! একখানা জাহাজ থেকে একটা তীব্র বাঁশীর আওয়াজ নদীর দুকূল ঝন্‌ঝনিয়ে আবার হাওয়ার গায়ে মিলিয়ে গেল। জাহাজের বাঁশীকে যেন লজ্জা দেবার জন্যেই আকাশ থেকে একখণ্ড মেঘ একটা ছোটখাট হুঙ্কার ছেড়ে তখনি আবার চুপ করলে। মনে হল যেন উপরকার ঐ বিরাট কালো দেহটা নিজের গলাটাকে একটু শানিয়ে নিলে। অন্ধকারে উঁচু উঁচু জাহাজের মাস্তুলগুলো দেখে নিবারণ ভয়ে ভয়ে কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে—"ওগুলো কি ?"

কেষ্ট ত্রস্তভাবে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে—কোথায় কি ? নে, নিজের কাজ কর।"

—"ঐ যে উঁচু—উঁচু।"

—"ক্যাবলা ছেলে। ওগুলো জাহাজের মাস্তুল। নে, নে তাড়াতাড়ি বেয়ে চল্।"

জাহাজের ভিড়ের মধ্যে সরু সরু গলির ভিতর দিয়ে তারা সাবধানে বয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট আস্তে আস্তে নিবারণকে বল্লে—"দ্যাখ্ বেশী সপ্ সপ্ আওয়াজ করিস্ নি, জাহাজের লোকেরা টের পেলেই বড় ফ্যাসাদ বাধাবে।" তারপর

আপনা—আপনি বলতে লাগল,—"ব্যাটারা আজ ভারি ধর-পাকড় সুরু করেছে।"

কথাগুলো নিবারণের কানে যেতেই তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ভয়ে তার হাত-দুখানা গুটিয়ে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে, আওয়াজ না করে দাঁড় ফেলতে ফেলতে কখন যে তার দাঁড় টানা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল সে নিজেই বুঝতে পারলে না। কেষ্ট দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে—"কি, থামলি বড় যে ?"

হঠাৎ তাড়া খেয়ে সে আবার ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় বেয়ে চলতে লাগল।

এবার কেষ্ট তার জায়গা ছেড়ে উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটো নেড়েনেড়ে বলতে লাগল "ফের শব্দ করে! শেষটা নিজেও মরবি। যা বলচি তা যদি না শুনিস তবে একটি চড়ে কাবার করে দিয়ে এই গঙ্গার জলে তোকে ভাসিয়ে দেব।"

কেষ্টর সেই বিকট হাবভাব দেখে নিবারণের অন্তরাত্মা ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তার কেবলই মনে ভয় হ'তে লাগল এ কোন্ অজানার দিকে সে নৌকো বেয়ে চলেছে, যার অলক্ষ্যে চুম্বকের মত একটা বিপদ তাকে আকর্ষণ করছে। আজকের এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে যে লোকটা তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কর্ণধার, কে জানে সেই বা কে! নানান ভয় ও ভাবনায় বেচারী একেবারে মুষড়ে পড়ল। আরো একটু নৌকো বাইবার পর সে কাঁচু মাঁচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতদূর যেতে হবে ?"

সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কেষ্ট উত্তর দিলে—

—"আর একটু।"

আরও কিছুক্ষণ দাঁড় ঠেল্‌বার পর কেষ্ট তাকে বল্লে—দ্যাখ্, ঐ যে আলোটা দ্যাখা যাচ্ছে, ওটা একটা ঘাঁটি, ঐটে পেরোলেই আর কি—

আস্তে আস্তে দম বন্ধ করে নিবারণ জায়গাটা পার হয়ে চলে গেল। তারপর একটা সরু জেটির কাছে এসে কেষ্ট নৌকো ভিড়িয়ে নৌকোর খোলের ভিতর থেকে কতকগুলো কি জিনিস বার করে নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল।—"যতক্ষণ-না আমি আসি এইখানে বসে থাক্!"

নিস্তব্ধ সেই জায়গাটায় বসে থাকতে থাকতে নিবারণের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। তার বুকের ভিতর এতক্ষণ ভাবনা আর ভয় এই দুটো জিনিসেরই লড়াই চলছিল, এবার ভাবনাটা গিয়ে ভয়টাই তার মনের উপর সওয়ার হয়ে বসল। সে নিজের শরীরটা যতদূর সম্ভব ছোট করে এককোণে সরে গিয়ে বসল। একবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ল, তারপর ছোট ছোট অনাহার ক্লিষ্ট ভাই-বোনদের! ভয়ে দুঃখে যখন সে প্রায় আধমরা হয়ে নৌকোর খোলের উপর নিজের দেহটা বিছিয়ে দিয়েছে তখন হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে কেষ্ট ফিরে এল।

কেষ্ট নৌকোতে পা দিয়েই নিবারণকে একটা লাথি মেরে বললে—"চল্, চল্

আর এক-মিনিটও দেরি নয় পাহারা বদ্‌লাবার আগেই আমাদের ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে হবে।"

নিবারণ তাড়াতাড়ি উঠে আবার দাঁড়ে গিয়ে বসল।

নৌকোখানা একটু চলবার পরই কেষ্ট তাকে বল্লে—"তুই বেশ ছোকরা, তোকে আজকের কাজের জন্য দশ টাকা দেবো।"

নিবারণ কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর করলে—"আমার একপয়সাও চাই না, আমায় ছেড়ে দাও।" সে মনে মনে এতক্ষণ প্রতিজ্ঞা করেছিল, একবার এই লোকটার পাল্লা থেকে উদ্ধার পেলে, সটান বাড়ি চলে যাবে, শহরে একদণ্ডও আর থাকবে না।

কেষ্ট একটুখানি ভেবে বল্‌লে—"কেন দশটাকা কি কম হল? আচ্ছা, যা তোকে আরো পাঁচ টাকা দেবো কিন্তু দেখিস্—আজকের কথা কাউকে বলিস্‌নি যেন।"

অতগুলো টাকা এক সঙ্গে পাবার কথা শুনে নিবারণের একটু লোভ হতে লাগল। পাওয়া দূরে থাক্, অত টাকা পাবার আশা সে করতে পারেনি। সে মনে মনে একটা হিসেব করে দেখলে তাতে তাদের দু-মাস বেশ সুখে চলে যেতে পারবে। কিন্তু ভয়টা তখনও পুরো মাত্রায় তার মনের উপর রাজত্ব করছিল, কাজেই সে একটা ছোট রকমের 'আচ্ছা' বলে আবার দাঁড় বেয়ে চলতে লাগল।

একটু এগোবার পর কেষ্ট হঠাৎ চম্‌কে উঠে তাকে দাঁড় থামাতে বল্লে।

"এই রে, বুঝি দেখতে পেয়েছে! ঐ দ্যাখ্, দূরে একটা আলো নাড়চে—"দেখেছিস্?"

নিবারণ দেখলে নদীর ধারে একটা লাল লণ্ঠণ যেন হাওয়ায় দুল্‌চে। তার মনে হতে লাগল বুকের ভিতরের হাড় গুলো যেন খাঁচার পাখির মতন ছট্‌ফট্ করে পাঁজরা ভেঙে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে,—ভয়েতে তার সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়ে একটা কাঁপুনী ধরল, অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে দাঁড়টা খসে পড়ে গেল। কেষ্ট তখনি দাঁড়টা জল থেকে তুলে নিলে। নিবারণের সেই রকম অবস্থা দেখে তার ভয়ানক রাগ হল, তার পেটের ভিতর থেকে একটা গালাগালির ঢেঁকুর উঠে অস্বাভাবিক আওয়াজ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

নদীর ধারের আলোটা খানিকক্ষণ নড়ে চড়ে আবার স্থির হয়ে গেল, নিবারণও একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার নৌকো বাইতে আরম্ভ করলে; অন্ধকারে মিশিয়ে তারা ঘাঁটি পার হয়ে গেল।

ভয়ের সীমানা পেরিয়ে আসবার পর নিবারণ যেন একটু ভরসা পেলে। টাকা পাওয়ার লোভটা তখন তার মনের কোণে একটু একটু করে আবার উঁকি মারতে সুরু করেছে। সে ভাবছিল টাকাগুলো কতক্ষণে পাওয়া যাবে। কিন্তু একেবারে কেষ্টকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোচ্ছিল না; বুদ্ধি খাটিয়ে সে তাই জিজ্ঞাসা করলে—"ও পুট্‌লিতে কি আছে?"

কেষ্ট উত্তর দিলে—"ওতে কোকেন আছে। ওর দাম কত জানিস্?

হাজার টাকার ওপর। আচ্ছা যা—তোকে আরো পাঁচটাকা দেবো—কেমন, খুশী ত?"

পাওনার মাত্রা আরো বেড়ে গেল দেখে তার স্ফূর্ত্তির জোয়ারে নতুন স্রোত এসে লাগল; মনের আনন্দে সে বেয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট জিজ্ঞাসা করলে—"তোর বাড়ি কোথায় রে?"

নিবারণ বল্লে—"বিষ্ণুপুর।"

—"বিষ্ণুপুর! সে ত অনেক দূর রে! বলেই সে একটা তান ধরে দিলে—"বিষ্ণুপুরের তামাক এনেছি, খাও সে রাজা আমোদ করে।"

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও তখন খুব ঘন হয়ে এসেছে, আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না; রাস্তার আলোগুলো এমনভাবে জলের উপর এসে পড়েছে যেন আকাশের ঐ সব তারাগুলো নেমে এসে নদীর দুদিকে সার বেঁধে বসে গিয়েছে। অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে তাদের ছোট্ট নৌকোখানা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। দু'জনের কারো মুখে কথা নেই; থেকে-থেকে কেষ্ট এক-একটা গানের এক-আধটা পদ গেয়ে উঠছে,—কোনোটা হাসির, কোনটা দুঃখের, কোনটা প্রেমের। তার প্রাণের ভিতর স্ফূর্ত্তির যে তুফান বইছিল তারই একটু আধটু আভাস তার গানের সুর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। গান গাইতে গাইতে সে চেয়ে চেয়ে নিবারণকে দেখতে লাগল। হঠাৎ কি মনে করে নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলে—"এই টাকা নিয়ে তুই কি করবি?"

নিবারণ বল্লে—"বাড়ি পাঠাব।"

নিবারণ এমন আকুল মমতার সঙ্গে বাড়ির নামটা উচ্চারণ করলে যে কেষ্টর মনের ভিতর কেমনতর একটা ধাক্কা লাগল। কেষ্ট যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাড়িতে তোর কে আছে রে?"

"মা, ভাই, বোন।"—বলেই নিবারণ তাদের সেই দুঃখের সংসারের কথাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে সুরু করলে। এতক্ষণ পরে দুঃখ জানাবার একজন লোক পেয়ে তার মন খুলে গেল। একই কথা একশ বার করে বলেও যেন তার ভাল করে বলা হচ্ছিল না। নিবারণের সেই ব্যাকুল কথার ভিতর থেকে সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের গায়ের উপর একটি করুণ ছবি ফুটে উঠে কেষ্টর মনকে কেমন উতলা করে তুলতে লাগল। কেষ্ট সেই ছবিটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই সেটা গেল না। গঙ্গার জলস্রোতের সঙ্গে নিবারণের কণ্ঠস্বর মিশে কেমন একটা কান্নার মত সুর তুলতে লাগল যাতে কেষ্টর বুকের ভিতরটা ঝিরঝির করে কাঁপতে লাগল।

বাড়ী! বাড়ি ছেড়ে আজ কতদিন সে এসেছে। এই নিবারণেরই মত সেও অর্থের চেষ্টায় বাড়ি ছেড়ে এসেছিল। তারপর? তারপরের কথা মনে করতে গিয়ে কেষ্টর বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। সে চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল;—নৌকা ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

বাড়ির কথা ত তার মনে ছিল না, আজ কতদিন হ'ল তার স্মৃতি থেকে

বাড়ির ছবি একেবারে মুছে গেছে। তারপর থেকে তা মনে করবার তার অবসরই হয়নি—কেউ মনে করিয়েও দেয়নি। তার এই জীবনের মধ্যে যারা সঙ্গী ছিল তাদের কারোর মুখে সে কখনো বাড়ির কথা শুনেনি। আজ হঠাৎ এই নিবারণ কোথা থেকে এসে তাকে বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিলে! তার ঐ গলার সুরে, তার ঐ মুখের ভাবে কি ছিল যাতে কেষ্টর সমস্ত হৃদয়টা তোল্‌পাড় করে উঠল। সে চুপ্‌টি করে পড়ে সেই কথা ভাবতে লাগল। অনেক দিনের অনেক পুরোনো ছবি অস্পষ্টতার কুয়াশা ঠেলে তার চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

নিবারণ দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে ভাবছিল টাকার কথা। শহরে এসে কি করে টাকা উপায় করবে এই তার ভাবনা ছিল। সে কি জানে যে কিছু করবে? সামান্য এই নৌকো চালানো—যা ছেলেবেলায় সে খেলাচ্ছলে শিখেছিল—তাই তার সৌভাগ্যের পথ খুলে দিলে ভেবে সে যেমন আশ্চর্য্য হচ্ছিল তেমনি তার আহ্লাদও হচ্ছিল। টাকাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। সে আর থাকতে না পেরে বলে ফেল্‌লে—"টাকাটা কখন্‌ দেবে?"

কেষ্টর প্রাণে তখন জাগছিল জল-ভরা ডব্‌ডবে দুটি চোখ্‌—কি বেদনা, কি মর্মব্যথা সেই দু'টি চোখ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল! টাকার কথা কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিবারণকে বললে—"নিবারণ, তুই বড় ভাল ছেলেরে, আমার আজ যা উপকার করলি—"

আর নিবারণ ভাবছিল, বেশ ব্যবসা ত! খাটুনি নেই, কিছু নেই, এক রাতেই এত টাকা! এক মাসের ভিতরেই বড়লোক!

আরো অনেকক্ষণ বেয়ে আসার পর তারা একটা জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে ফেল্‌লে। কেষ্ট নিবারণকে বললে—"সারা রাত্রি ঘুমোস নি, এখন একটু ঘুমিয়ে নে, আমার আসতে একটু দেরী হবে, কোথাও যাস্‌নে যেন।"

নিবারণের ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে আসছিল, সে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে নৌকটার ভিতর শুয়ে পড়ল। কেষ্ট এক লাফে নৌকো আর ডাঙার ব্যবধানটুকু পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট যখন আবার নৌকোয় ফিরে এল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। সে নিবারণের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে তাকে তুলে দিয়ে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বল্লে—"নিবারণ, তোকে এই একশো টাকা দিলুম। এখুনি বাড়িতে পাঠিয়ে দে! তুই আমার বড় উপকার করেছিস রে!

নিবারণ নোটগুলো হাতে করে তুলে নিলে। তার হাত ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল!......

এই তার শহরের প্রথম অভিজ্ঞতা, এই তার প্রথম রোজগার। এমন সহজে যে এত রোজগার হ'তে পারে এ কথা নিবারণ কোনোদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। এর মধ্যে একটু ভয় আছে বটে, কিন্তু সে ভয়কেও তো এড়ানো

যায়—কেষ্ট তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আর ঐ ভয়টুকুর যে পুরস্কার সে তো সামান্য নয়। কাজেই রোজগারের এই পথ নিবারণকে প্রলুব্ধ করে তুল্লে। পরদিন কেষ্টর খোঁজে সে সন্ধ্যাবেলা থেকেই গঙ্গার ধারে এসে বসে রইল। কেষ্ট আর এল না বটে, সে কিন্তু তাই বলে কেষ্টর সেই নৌকাখানার মালিকের অভাব হল না। রাতদুপুরে কেষ্টরই মত একটা লোক এসে যখন সেটাতে চড়ে বসল তখন নিবারণ স্বেচ্ছায় তার কর্ণধার হ'ল। এমনি করে তার ব্যবসার সূত্রপাত হ'ল। এবং কেষ্টর সঙ্গে সে যে-যাত্রা সুরু করেছিল তারই আবৃত্তি রাতের পর রাত ধরে চলতে লাগল। ক্রমে সে চাকর থেকে মনিবের দলে গিয়ে উঠল। আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জন হতে লাগল। মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর হ'ল। তখন মাসে মাসে যথাসময়ে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হ'ত। তারপর যে নিশ্চিন্ত-মনটাকে নিয়ে সে যা খুসি তাই করতে লাগল। ক্রমে এই নিশ্চিন্ততার ফাঁক দিয়ে মা-ভাই-বোনের মুখ যে কবে সরে পড়ল, সে তা টেরও পেলে না। যারা তার সঙ্গী ছিল তাদের কারো কোনো দায় ছিল না। একটা দায় ঘাড়ে করে থাকাকে তারা পরিহাস করত। ক্রমে নিবারণেরও সেইটে সহজ অবস্থা হয়ে এল। তখন জীবনের মধ্যে যা রইল তা কেবল ঐ অন্ধকার রাত্রের কাজ, আর হল্লা-করে স্ফূর্ত্তি করা।

আদালতে সেদিন কয়েকটি পাকা বদমায়েসের বিচার হচ্ছিল। আসামীদের মধ্যে নিবারণকেও ধরে আনা হয়েছে। এখানে এই তার প্রথম আসা। এতদিন সে স্ফূর্ত্তি করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল;—ভয় একটা ছিল বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ভয়ের চেহারাটার সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি। আজ কাঠগড়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ব্যবসার ফাঁকে-ফাঁকে কি-সব ভয়ঙ্কর বিপদ জড়িয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে, তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠতে লাগল। তার মনে হতে লাগল এই সব বিপদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে সে কি-করে এতদিন কাটিয়ে এসেছে! উঃ!

নিবারণের চোখের সামনে তার সঙ্গীদের জেল হয়ে গেল। প্রমাণ অভাবে সে-ই কেবল ছাড়া পেলে। সে তাড়াতাড়ি কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল দরজার সামনে জেলখানার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কতবার এই গাড়িখানার কথা সে বন্ধু বান্ধবদের কাছে শুনেছে। কৌতুহলের ঝোঁকে অন্য লোকদের মত সে ও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। খানিক পরে হাতকড়া লাগানো তার বন্ধুদের পিঠে রুলের গুঁতো মারতে মারতে গোরা পুলিশ সেই গাড়িখানার অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে তাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিতে লাগল। তাই দেখে নিবারণের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। উঃ, ওই গাড়ীটার ভিতর কি ঘুটঘুটে অন্ধকার!—একটু আলো নেই, বাতাস ঢোকার পথ ও বন্ধ! উঃ, জেল!—

তার পা দুটো থর-থর করে কাঁপতে লাগল। একদণ্ডও আর সেখানে দাঁড়াতে না পেরে সেখান থেকে সে সরে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে হাওড়ার পুলের কাছে এসে দাঁড়াল।

পুলের দুদিক দিয়ে লোক চলেছে। নীচেকার জলস্রোতে মতন উপরকার

জনস্রোতেরও বিরাম নেই। নিবারণ অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে—"কিরে নিবারণ, চিনতে পারিস? ওঃ, কত বড় হয়ে গেছিস রে! আমি কেষ্টরে—কেষ্ট।"

নিবারণ প্রথমটা তাকে চিনতে পারেনি। সে নিজের নাম বলতেই তাকে চিনে ফেল্লে।

—"কেষ্ট। ওঃ তোমাকে সেই দেখে ছিলুম, কতদিন দেখা হয় নি।"

নিবারণ কেষ্টকে বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর মত হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর: কেমন আছিস?"

কেষ্টকে পেয়ে নিবারণের মন যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে তার হাত ধরে টানতে টানতে কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেল-ওয়ালাকে খাবার দিতে বলে নিবারণ কেষ্টকে নিয়ে একটা পর্দা-ঘেরা ঘরের ভিতর গিয়ে বসল। তারপর একটা চাকরকে ডেকে বলে দিলে—"ওরে একটা পাঁট নিয়ে আয় ত।

দুটো গেলাসে মদ ঢেলে নিবারণ একটা কেষ্টর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—"নাও দাদা, টেনে নাও।"

কেষ্ট একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলে উঠল—"না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি!"

নিবারণের বুকের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন কি একটা তীক্ষ্ন জিনিস যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। কেষ্ট মদ ছেড়ে দিয়েছে? যদিও কেষ্টর সঙ্গে তার মোটে একরাত্রির পরিচয় কিন্তু সেই একরাত্রেই সে তাকে যতটা চিনেছিল ততটা বোধ হয় আর কাউকে চিনতে পারে নি। তার কথাটা নিবারণের কাছে একটা রহস্যের মত ঠেকল। সে একটু অভিমানের সুরে বল্লে—"খাবে না?"

কেষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বল্লে—"না, তুই খা না।"

—"আচ্ছা বেশ, তবে আমিই খাই।" বলে উপরি উপরি দুটো গেলাসের মদ চোঁ-চোঁ করে দু-চুমুকে সাবাড় করে ফেল্লে।

কেষ্ট হাসতে-হাসতে বল্লে—"খুব ওস্তাদ হয়েছিস যে রে!"

নিবারণের মুখের উপর থেকে মদের তীব্র আস্বাদনের বিশ্রী ছাবটা তখনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি, একটা হাসের ভিতর আধখানা কামড়ে নিয়ে সে বল্লে—ওস্তাদ ত তুমিই করেছ দাদা।"

নিবারণের এই কথাগুলো কেষ্টর বুকে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলে। সে নিবারণের ভাব-ভঙ্গী কথাবার্তা যতই দেখতে লাগল ততই অবাক হয়ে যেতে লাগল। তার মনে হতে লাগল—সেদিনকার সেই ছোঁড়াটা! মদের নাম শুনে যার মুখ সিটকে উঠত—আজ তার এ কি!

হঠাৎ নিবারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"আজকাল কি হ'চ্ছে?

কেষ্ট বল্লে—"চাষবাস শুরু করেছি!"

নিবারণ অবাক হয়ে বল্লে—"অ্যাঁ, চাষবাস!

কেষ্ট বল্লে—"হ্যাঁ। তাতে আমার দিন বেশ কাটছে।"

নিবারণ তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে বেশ একটা তৃপ্তি এবং নিশ্চিন্ততায় সে মুখখানি ভরে আছে। সমস্ত শরীরের উপর একটি আরামের আবেশ বিছিয়ে রয়েছে। নিবারণ বার বার তাকে দেখতে লাগল। তার মনে জেগে উঠল আজকের আদালতের তার সঙ্গীদের সেই অবস্থা, তার নিজের সেই ভয়ের উৎকণ্ঠা। এতদিন সে ও সব কিছু ভাবেনি, কিন্তু আজ আদালত থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত তার বুকটা থেকে থেকে দুরুদুরু করছে।

কেষ্ট বল্লে—"বড় বেঁচে গিয়েছি নিবারণ! সব ছেড়েছুড়ে বাড়ি না গেলে জাহান্নামে গিয়েছিলুম আর কি!"

জাহান্নামে! নিবারণের বুকটা কেমন ধড়ফড় করে উঠল। সে আর এক গেলাস মদ এক চুমুকে টেনে নিয়ে বল্লে—"হঠাৎ কাজ ছাড়িয়ে পালালে যে?"

কেষ্ট বল্লে—এখানে আর মন টিকল না। মনে আছে তোর সেই রাত্রের কথা—যেদিন তোকে নিয়ে নৌকো বেরিয়েছিলুম?—তুই তোর বাড়ির কথা বলতে লাগলি, আর আমারও বাড়ির জন্যে প্রাণটা কেঁদে উঠল। কাজ কর্ম ভাল লাগল না।"

নিবারণ আর এক গ্লাস মদ নিঃশেষ করে একটা গম্ভীর শব্দে "হুঁ" বলে ঠক করে গ্লাসটা টেবিলের উপর আছড়ে রাখলে। সে যতই কেষ্টর সেই নিশ্চিন্ত মূর্তি দেখতে লাগল ততই কেমন একটা হিংসেয় তার শরীরের মধ্যে জ্বালা ধরতে লাগল। সে সেই জ্বালার উপর প্রাণ ভরে মদের ধারা ঢালতে লাগল।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ হয়ে রইল। তারপর কেষ্ট স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা কল্লে—"বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিস ত নিবারণ?"

কেষ্টর মুখে এই বাড়ির কথায় নিবারণের দেহের রক্ত যেন সাপের মত এঁকে-বেঁকে তার মাথার ভিতরে গিয়ে জমা হতে লাগল। তার মনে জাগতে লাগল সেদিনকার কথা—যেদিন এই লোকটার সঙ্গে ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে নৌকো বেয়ে সে চলেছিল, সেদিনকার জীবন যাত্রায় এই লোকটাই ছিল কাণ্ডারী! সে তাকে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! আর সে নিজে কোথায় এসে পড়েছে। কেষ্ট যাকে বল্লে জাহান্নম—তাই ই ত পাপে! কে তাকে এখানে এনে ফেল্লে! এখন কোথায় পড়ে রইছে তার সেই মা, তার সেই ভাই-বোন—যাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল।

কেষ্টর দিকে চেয়ে তার মনে হতে লাগল, কেষ্ট যেন দূরে দাঁড়িয়ে তার অবস্থাটা দেখে মুচকে মুচকে হাসছে। তার সেই হাসিতে নিবারণের মনে হল যেন সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরে উঠল। দেখতে দেখতে তাদের সেই গ্রাম, তাদের সেই বাড়ি, তার ভাই বোন মা সবাই যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল! চোখের সামনে জাগতে লাগল কেবল শূন্যতার অন্ধকার!

প্রাণপণ শক্তিতে সেই শূন্যতার ভিতর দিয়ে চোখ দুটোকে ঠেলে বার করে নিবারণ কেষ্টকে দেখতে লাগল।

তার সেই রকম চাহনি দেখে কেষ্ট ভয়ে ভয়ে ভাঙা চেয়ারটা একটু পিছনে সরিয়ে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে মারবি নাকি ?"

কি করলে যে নিবারণের মনের ঐ জ্বালাটা দূর হয় সে এতক্ষণ ঠিক করতে পারছিল না ; হঠাৎ কেষ্টর মুখে মায়ের কথা শুনে সে যেন একটা উপায় দেখতে পেল। দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে সে বল্লে—"মারলেও তোর যথেষ্ট সাজা হয় না, আমার কি করেছিস জানিস ?"

কেষ্ট তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে, "বেশী চালাকি করিস্ নি, এখনি পুলিশ ডেকে দেবো : নেশা ছুটে যাবে।"

—"পুলিশ দরকার হবে না"—বলেই সে বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে কেষ্টর টুঁটিটা চেপে ধরলে।

তারপর ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ, গেলাস ভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দ, গোলমাল লোকজনের হাঁকাহাঁকির ভিতর এখন্ যে কি হয়ে গেল তা তাদের দুজনে কেউ ঠিক করে বলতে পারে না :

তারপর নিবারণকে যখন জমাদার এসে ধরলে তখন তার নেশা এড়িয়ে এসেছে, ভাল করে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। পাহারাওয়ালার গুঁতোর চোটে মাঝে মাঝে তার চেতনা ফিরে আসছিল, আবার তখুনি তাদের গায়ে নেতিয়ে ঢলে পড়ছিল।

খানিকটা হিঁচড়ে আর খানিকটা কোলপাঁজা করে তারা তাকে টেনে নিয়ে চলল্।

কেষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। নিবারণের পিঠে রুলের গুঁতোগুলো যেন হাতুড়ির ঘায়ের মত তার বুকে বাজতে লাগল ; তার মুখের অস্ফুট এড়ানো কথাগুলো সহসা অর্থ নিয়ে তার কানে এসে ঢুকতে লাগল। পথ চলতি অনেক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল, কেউ বুঝুক আর না বুঝুক সে কিন্তু কথাগুলোর মর্ম বুঝতে পারছিল। ভিড় ঠেলে সে একটু ফাঁকে এসে দাঁড়াল। নিবারণের সঙ্গে তার সেই প্রথম দেখার দিনে তার সেই ফুঁপিয়ে কান্না, সেই সরল হাব ভাব, সেই ত্রস্ত সভয় মুখ—সমস্ত ছবিগুলো তার চোখের সামনে এক এক করে ফুটতে লাগল।

দিন কয়েক পরে এই মারপিটের মোকদ্দমা উঠল। নিবারণের সামনে যখন জেলের ছবি জাজ্জ্বল্য হয়ে উঠেছে, এমন সময় কেষ্ট সাক্ষী দিতে এল। সবাই ভাবলে এইবার নিবারণের দফা শেষ। কিন্তু তার সাক্ষীতেই মোকদ্দমা একেবারে ফেঁসে গেল। নিবারণ বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বেরুতেই কেষ্ট ছুটে এসে নিবারণের হাত দুটো চেপে বল্লে—"চল ভাই, আমার সঙ্গে চল্ !"

নিবারণ তার দিকে কটমট করে চেয়ে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে জনস্রোতে মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট নিরুপায় হয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও সমাধি হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, যেন যমুনার উচ্ছল, উদ্দাম গতি থেমে গিয়ে, হঠাৎ তার বুক ফুঁড়ে, একটা বিস্তীর্ণ বালির চড়া ফুটে উঠল। হাজার বৎসর ধ'রে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় আর্যাবর্তে যে সুরের প্রাসাদ তৈয়ের হ'য়ে উঠেছিল, তার অভ্রভেদী গম্বুজের চূড়ার ঠিক ওপরেই যে আকাশের বাজ বাসা ক'রে বসেছিল, সেটা কেউ বুঝতে পারে নি। আত্মীয় স্বজনের সহস্র আদর ও ভালবাসার অবিরাম বর্ষণ সত্ত্বে, মাতৃহীনের বুকের ভিতর যেমন একটা ক্ষুধাতুর খালি জায়গা পড়ে থাকে, বাদশার মৃত্যুর পর সঙ্গীতকে জাগিয়ে তোলবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, শহরের সঙ্গীত পিপাসুদের প্রাণের মধ্যে তেমনি একটা জায়গা হা-হা করতে লাগলো। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চাঁদনী চকের সামান্য দরজীর দোকান থেকে আরম্ভ করে, শাহানশার দরবার অবধি কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে মুখরিত হ'য়ে উঠত, একটিমাত্র লোক চলে যাওয়াতে সেখানকার সমস্ত আনন্দ একেবারে থেমে গেল।

বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য সৌখিনদের সখও কমে এল; বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গীত প্রতিভা জঠরাগ্নির তাপে শুকিয়ে উঠতে লাগলে। কেউ কেউ বিরক্ত হ'য়ে অন্য জায়গায় চাকরী নিয়ে চলে গেলেন, কেউ বা গান বাজনা ছেড়ে দিয়ে অন্য ব্যবসা ধরলেন। দু একজন সৌখিন লোকের বৈঠকে মাঝে মাঝে 'জলসা' চলতে লাগল বটে, কিন্তু দিল্লীশ্বরের মুক্ত হস্ত মুহুর্মুহু যাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, ছোট-খাটো রাইসদের অনুগ্রহ-ভিখারী হ'য়ে থাকা তাদের অপমানজনক বোধ হ'তে লাগল।

দিল্লীতে সে সময় সবশ্রেষ্ঠ বাজিয়েছিল সের খাঁ। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন গাইয়ে বাজিয়ে কেউ ছিল না, যে সের খাঁকে না চিনত। দরবারে সে যে দিন বাজাত, সে দিন ত দূরের কথা, তার পরেও ছয় সাত দিন আর কারো বাজনা আসরে তেমন জমতো না। অন্য জায়গা থেকে বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েরা এসে যখন দিল্লীর সঙ্গীতের গরিমা ক্ষুণ্ণ ক'রে দেবার উপক্রম করত, দিল্লী বাদশার মান সে সময় সের খাঁ না হ'লে বজায় থাকা মুস্কিল হ'য়ে পড়ত। সমস্ত ভারতে সের খাঁর বাজনার কথা প্রবাদের মত রটে গিয়েছিল, লোকে বলত, সে যখন বাজায় তখন স্বয়ং সরস্বতী তার কাছে এসে বসেন।

সে সময় ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে আর একটি প্রতিভাবান্ গাইয়ে বাজিয়ের দল তৈরী হ'য়ে উঠেছিলে। তাদের প্রধান আড্ডা ছিল হায়দ্রাবাদে। সঙ্গীতের আলোচনা নিয়ে দুই দলে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলত, কেউ কাউকে মানত না,

দিল্লী থেকে গান বাজনার চর্চা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, হায়দ্রাবাদের দল মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্ল। শুধু তাই নয়, তারা দিল্লীর বড় বড় ওস্তাদদের মাইনে করে নিজের দরবারে রেখে দিল্লীর মুখে চুন-কালি লাগিয়ে দিতে লাগ্ল।

সের খাঁকে এই সময় চারিদিক থেকে সৌখীনেরা অনেক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগ্ল, কিন্তু সে দিল্লীর মায়া কাটিয়ে কোন জায়গায় যেতে পারলে না—সংসারের সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে দিয়ে সে সুর-বাহার নিয়ে নিজের ঘরে বস্‌লে। পৃথিবীতে বন্ধু, সহায়, সম্পদ বল্‌তে তার যা কিছু ছিল—সে তার বিবি মুন্না, আর বাদশার নিজের হাতে উপহার দেওয়া সুর-বাহার। তার বাজনার কদর তার বিবি যতটা করত, বাদশাও ততটা করতে পারতেন না। সকাল সন্ধ্যে সে সুর-বাহারে রাগিণী ভাঁজত, মুন্না বসে-বসে শুনত, আর ভাবত—মিঞা বোধহয় কোন দেবতা, তা না হ'লে মানুষের হাতে এমন বাজনা কখনো বেরোয় ?

বিদেশের দুই-একজন বড়লোক প্রায়ই সের খাঁর বাজনা শোনবার জন্য তার কাছে লোক পাঠাত, কিন্তু মুন্না তাকে কোথাও যেতে দিত না। সে যেতে চাইলে মুন্না বল্‌ত, "এই বুড়ো বয়সে কোথায় যাবে ? সেখানে কি তোমার গুণের আদর করবার মতন সমজদার আছে ?" বৃদ্ধ মুন্নার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাব্‌ত—তাই ত, এমন সমজদার কোথায় পাব !

এই সময় হায়দ্রাবাদে চান্দোলাল নামে একজন বিখ্যাত ধনী লোক ছিলেন। তাঁর গান বাজনার খুব সখ ছিল। শুধু গান বাজনা নয়, তাঁর মতন দাতা সে সময় আর ছিল না। এই চান্দোলাল দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত বড় ওস্তাদদের মাইনে ক'রে রেখেছিলেন। দিল্লীর ওস্তাদরা যখন ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল তখন তাদের মধ্যে অনেকেই এসে চান্দোলালের অধীনে চাকরী নিয়ে হায়দ্রাবাদে বাস করতে লাগল। দিল্লীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদের অনেকদিন ধ'রে যে রেশারেশি চ'লছিল, এতদিন পরে সেটা বড় বিশ্রী আকার ধারণ করলে। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদরা নিজেদের কোর্টে পেয়ে দিল্লীর ওস্তাদদের যখন-তখন নির্যাতন ও অপমান করত, আর দিল্লীর ওস্তাদরা পেটের দায়ে সেই সব নির্যাতন নীরবে হজম ক'রত। সাত-শ মাইল দূরে থাকলেও সের খাঁর কানে দিল্লীর এই অপমানের কথাগুলো এসে পৌঁছুতে দেরী হোত না—অপমানে বৃদ্ধের আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠত।

একদিন সে মুন্নাকে বল্লে—"একবার ছেড়ে দাও,—যাই একবার, দক্ষিণের গুমর ভেঙে দিয়ে আসি। দিল্লীর অপমান, আমাদের বাদশার অপমান আর ত সহ্য হয় না।" তার উত্তরে মুন্না যে সব কথা বল্‌ত, সাত-শ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদী ওস্তাদদের কানে সেগুলো পৌঁছুলে, সে বিষয়ে তারা যে সের খাঁর চেয়ে বেশী চঞ্চল হোয়ে উঠত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাদের সৌভাগ্য যে সে সব কথা হায়দ্রাবাদে পৌঁছুত না।

চান্দোলালের দরবারে দিল্লীওয়ালারা প্রায়ই সের খাঁর নাম করত,—হুজুরকে

জানাত, যদি শুনতে হয় ত সের খাঁর বাজনা। চান্দোলাল অবজ্ঞার হাসি হেসে নিজেদের দলের দিকে চেয়ে দেখতেন। খোসামুদেদের দল তখনি হাত নেড়ে ব'লে উঠত, অনেক খাঁকেই দেখা গেল,—এখন বাকী আছে সের খাঁ।

মহম্মদ শাহের সেই প্রশান্ত মুখ মনে পড়ে, দিল্লীর ওস্তাদদের মাথা হেঁট হোয়ে যেত, চোখে জল আসত।

সের খাঁর গুণগান শুনতে-শুনতে একদিন চান্দোলালের সত্যিই তার বাজনা শোনবার ইচ্ছা হ'ল। তখনি তাকে নিয়ে আসবার জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লীতে লোক ছুটল।

হায়দ্রাবাদ থেকে তলব এসেছে শুনে সের খাঁ বেচারা একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। তার হায়দ্রাবাদ যাবার ইচ্ছা মনে মনে ছিল; কিন্তু মুন্নাকে রেখে কেমন ক'রে যাবে, এই ভাবনাটা এতদিন কিছু করতে দেয় নি। চান্দোলালের লোককে সে বল্লে, "দুই-একদিন সবুর কর, যদি বন্দোবস্ত করতে পারি ত তোমার সঙ্গেই চলে যাব।"

কি করে মুন্নার কাছে কথাটা পাড়বে, সেই ভাবনায় সের খাঁ দিন-রাত ছটফট্ করতে লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজনার সুর বাঁধতে বাঁধতে সে মুন্নাকে বলে ফেল্লে—"ক'দিন থেকে হায়দ্রাবাদের লোক আসা-যাওয়া করছে"—মুন্না স্বামীর বিছানার একপাশে একটা বালিস নিয়ে শোবার যোগাড় করছিল,—হায়দ্রাবাদের নাম শুনতেই তার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথা থেকে লোক এসেছে ?"

"হায়দ্রাবাদ থেকে।"

"কেন ?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্য।"

বিচ্ছেদ ভয়কাতরা মুন্নার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। সে ভাবতে লাগল—হায়দ্রাবাদ, সে কতদূরে যেতে-আসতেই ত লোকের ছ'মাস কেটে যায়। সেখানে গেলে আর কি দেখা হবে ? হয় ত ওরা তারে আসতে দেবে না,—বোধহয় আর দেখাও হবে না। ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সের খাঁ তখন আফিংয়ের রঙিন নেশায় স্বপ্ন দেখছিল জগতের যত গুণী লোক তার তারিফ করছে। কেউ বা পায়ের জানোয়ার, কেউ বা গলার হার খুলে দিচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা আনাড়ি রকমের মোচড় দিতেই, পঞ্চমের তারটা পট্ করে ছিঁড়ে গেল। সে মুখ তুলতেই দেখতে পেলে, মুন্নার গাল বয়ে জল পড়ছে। মুন্নার চোখের জল দেখেই তার নেশাটেশা সব ছুটে গেল। সে তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে; তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ফেল্লে, সে কখনও সেখানে যাবে না। সুর বাহারকে সেই রকম অবস্থায় রেখে দিয়ে সে মুন্নার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল। সেদিন যদি লুকিয়ে কেউ তার গল্প শুনত তবে মনে হত, সের খাঁ বুড়া বয়সে নিশ্চয় ক্ষেপে গিয়েছে।

পরের দিন চান্দোলালের লোককে সের খাঁ বলে দিল যে সে যেতে পারবে না। চান্দোলালের অনুচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিলে, সেখানে সমজদার কে আছে? তার বাজনার তারিফ করতে পারে এমন লোক দাক্ষিণে নেই। সমস্ত শহরে কিন্তু রটে গেল, বুড়ো বয়সে সের খাঁ বিবির মায়া কাটিয়ে যেতে পারলে না।

সেদিন চান্দোলালের দরবারে একজন বিখ্যাত বীণকারের মুজরা ছিল। শহরের যত বড় বড় গুণী ও ধনী তার দরবারে হাজির,—বাণের আওয়াজে আওয়াজে আসর একেবারে জমজম্ করছে, এমন সময় দিল্লী থেকে সের খাঁর খবর নিয়ে লোক ফিরে এসে বল্লে, "সের খাঁ বলে দিয়েছে, তার মতন লোক চান্দোলালের দরবারে মুজরা করতে যায় না,—দাক্ষিণে গান বাজনার সে কি জানে?"

দূতের কথা শুনে দরবার শুদ্ধ লোক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বীণার তান আগেই থেমে গিয়েছিল। মুমূর্ষুর শেষ নিঃশ্বাসগুলোর মতন তারগুলো এক একবার ঝন্‌ঝন্ করে উঠতে লাগল। আসরের মধ্যে একটা উঁচু তক্তের উপর চান্দোলাল মোটা মখ্‌মলের তাকিয়া হেলান দিয়ে জড়োয়া ফরাসীতে তামাক টান্‌ছিলেন,—টপ্ করে মুখ থেকে নলটা খসে তাঁর কোলের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল।

সের খাঁর বেয়াদবি সেই আসরের অধিকাংশ লোককেই চঞ্চল করে তুল্‌লে; শুধু দিল্লীওয়ালারা মনে-মনে বল্‌তে লাগল সের খাঁ সের বাচ্ছার মতই জবাব দিয়েছে।

সেদিনকার সেই ভাঙা আসর আর জমল না, আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে যে যার বাড়ি চলে গেল। সেই নিস্তব্ধ, উজ্জ্বল ঘরে একলা বসে রইলেন চান্দোলাল। দূতের কথাগুলো যেন তখনো সেই বড় দরবার ঘরের খিলানগুলোতে ঠেকে দ্বিগুণ জোরে তাঁর কানে বাজতে লাগল।

চান্দোলাল তাঁর লোকজনকে ডেকে বলে দিলেন, "ছলে বলে কৌশলে জীবিত কিংবা মৃত সের খাঁকে হায়দ্রাবাদে আনতেই হবে, যেমন করে পার তাকে নিয়ে এস।" যো হুকুম বলে আবার তারা দিল্লী ছুটল।

সেদিন বোধহয় নাচটা একটু বেশী হোয়ে গিয়েছিল। [illegible] ঘোরে সের খাঁ স্বপন দেখছিল, বেহেস্ত থেকে চারজন জিন্ তাকে নিতে এসেছে, সেখানকার দরবারে তাকে বাজাতে হবে। প্রথমটা তারা অনুনয় করতে লাগলে; সে কোথাও যেতে পারবে না ঘরে তার বিবি একলা থাকবে, সে যেতে পারে না। তারা বল্লে, ভাল! তা যদি না গেলে তাকে জোর করে নিয়ে যাবে। এই বলে খাটিয়ার চার কোণে চারজন গিয়ে দাঁড়াল। সে তাড়াতাড়ি চার পায়া ছেড়ে নেমে পড়বে, এমন সময়ে তাঁকে শুদ্ধ তারা খাটিয়াখানা তুলে আকাশে উড়তে আরম্ভ করে দিলে।

চিলের মতন ঘুরে-ঘুরে তারা উপরে উঠতে লাগল। ক্রমে পাখীদের রাজ্য, তারপর সাদা মেঘ, সোনালী মেঘের রাজত্বের ভেতর দিয়ে তারা উড়ে চল্‌তে

লাগল। সের খাঁ একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে সেখান থেকে তার বাড়ীটা একটা ছোট কাল দাগের মতন দেখা যাচ্ছে। ক্রমে সেটুকুও মিলিয়ে গেল। নিরুপায় সের একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে, জিনদের জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতটা যেতে হবে বাবা?" মাথার দিকের একটা জিন ধমক দিয়ে তাকে বল্লে—"এই চুপ কর,—বেশী গোল করলে এখনি এইখান থেকে তোকে ছেড়ে দেবো,—একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবি।" সে আর কোন কথা না বলে, আল্লার নাম জপতে লাগল।

সোনালী মেঘের রাজত্ব ছাড়িয়ে তারা আঁধারে মেঘের রাজত্বের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। ওঃ! সে কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! কিছু দেখতে পাওয়া যায় না,—শুধু একটা শাঁ শাঁ আওয়াজ তার কানে আসতে লাগল। আঁধারে মেঘের সীমানা পেরিয়ে তারা চাঁদের রাজত্বে এসে পড়ল। এইখানে দরবার হবার কথা,—জিনেরা এইখানে এসে তার খাটিয়াটা নামিয়ে দিলে।

দরবার তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। একজন হুরী জর্দা ও ফিরোজা মেঘে বোনা একটা ওড়না উড়িয়ে গান ধরেছে,—এমন সময়ে জিনেরা তাকে নিয়ে এসে দরবারে হাজির করলে। একটা জিন সভাপতিকে নিবেদন করে বল্লে,—"হুজুরে, লোকটা কিছুতেই আসতে চায় না,—তাই জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি।" সভাপতি তার পালকের সারা দাড়িতে একবার হাতটা বুলিয়ে, গম্ভীরভাবে—"বেশ করেছো"—বলে, তাকে বাজাতে বল্লে।

চাঁদের দরবারের চকচকানি দেখে, সের খাঁ বেচারা বাজাবে কি, সে একেবারে হকচকিয়ে গেল, ভাল করে সুর বাঁধতেই পারলে না। সবাই বলতে লাগল—লোকটা কিছু জানে না। তারপর বাজনা শুনে ত তারা হেসেই অস্থির। রাজা বল্লে—"থাম না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়, ও কিছু জানে না।" সের খাঁ তার যন্ত্রটা নিয়ে কোন রকমে আসর থেকে উঠে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

জিনেরা আবার তাকে খাটের ওপর উড়িয়ে নামাতে লাগল। তারপর সেখান থেকে তার বাড়িটা ছোট একটা কাল দাগের মত দেখা যাচ্ছিল, সেই জায়গাটাতে এসে তারা তাকে বল্লে—"ঐ দেখ তোর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এইখান থেকে আমরা তোকে ছেড়ে দেবো, তুই একেবারে ঠিক তোর বাড়ির ছাদের ওপর গিয়ে পড়বি?" সের বেচারী এই প্রস্তাব শুনে ত ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলে, কিন্তু তার কোন রকম ওজর না শুনে, তাকে শূন্য থেকে ছেড়ে দিলে। শোঁ শোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে খাটিয়াখানা মাটির ওপর দড়াম করে এসে পড়ল।

অত উঁচু থেকে পড়ে তার মাথাটা চট্ করে ভেঙে গেল। "ইয়া আল্লা" বলে সে উঠে পড়ে যখন দেখলে যে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, তখন একটা নিশ্চিন্দির হাঁফ ছেড়ে পাশ ফিরে শুল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পূর্ব গগনে সোনার আলো আজান দিয়ে জগতের লোকদের ডাকছিল, "ওঠো—ওঠো, জাগরণের সময় হয়েছে। সের খাঁ নমাজ পড়বার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে দেখলে, বাড়ির সেখানে সে

শুয়েছিল, এ ত সে জায়গা নয়! এই গভীর জঙ্গলের ভিতর সে কি করে এসে পড়ল? রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। সে ভাবছিল, তবে কি! এমন সময়ে একটা ভদ্রবেশী লোক এসে তাকে অভিবাদন করে অতি মোলায়েম ভাষায় বল্লে,—অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তাকে নিদ্রিত অবস্থায় তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। মহারাজের হুকুম, তাকে হায়দ্রাবাদে যেতে হবে।

সের খাঁর চোখের সামনে তখন মান্নার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানা ভাসছিল। নির্বাক হয়ে সে আবার নিজের খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল। সেদিন সকালে তার আর নেমাজ পড়া হোল না।

এমনি করে কখনো হাতী, কখনো ঘোড়া, পালকী চড়ে প্রায় দু'মাস পরে তারা সের খাঁকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে এল। সের খাঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না যে, কি করে ঘুমন্ত অবস্থায় একটা লোককে খাটিয়া সমেত বাড়ির ভেতর থেকে এরা তুলে নিয়ে এল!

দেখতে দেখতে শহরে রটে গেল, দিল্লী থেকে সের খাঁ এসেছে। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদেরা দিল্লীওয়ালাদের না মানলেও, সের খাঁর বাজনা শোনবার জন্য তারা মনে মনে উৎসুক হোয়ে ছিল।

একদিন চান্দোলাল ঠিক করলেন, আজ সের খাঁর বাজনা হবে। দেশ-বিদেশে রটিয়ে দিলেন, যে কোন লোক সেদিন তাঁর দরবারে এলে, সের খাঁর বাজনা শুনতে পাবে। সের খাঁর নামে দলে দলে লোক সেদিন আসরে এসে জমতে লাগল।

সের খাঁর বাজনা হবার আগে অন্য অনেক জনের বাজনা হল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন চান্দোলাল নিজের জায়গা থেকে সেরকে ডেকে বল্লেন,—“খাঁ সাহেব, এবার তুমি বাজাও।” সের মাথা নিচু কোরে—‘যো হুকুম’ বলে নিজের বাজনা সুরে মিলিয়ে বাজাতে শুরু করলে।

সের খাঁর বাজনা কিন্তু সেদিন একেবারেই জমল না। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদেরা প্রথমে হাসি, শেষে টিট্‌কারী পর্যন্ত দিতে আরম্ভ করলেন। চান্দোলাল ভাবতে লাগলেন—এই সের খাঁ! এরি নাম সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে! এত কষ্ট, অর্থ ব্যয় করে কি এই বাজনা শোনার জন্য দিল্লী থেকে একে জোর করে নিয়ে এলুম! নিজের মূর্খতায় চান্দোলাল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলেন।

চান্দোলাল হাত নেড়ে বাজনা বন্ধ করতে বল্লেন। সের খাঁ যন্ত্রটি তুলে আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল।

দিল্লীর অপমানের যেটুকু বাকী ছিল সেদিন সের খাঁর বাজনার পর সেটুকুও হোয়ে গেল। চান্দোলাল হেসে তাদের বল্লেন—“এই তোমাদের সের খাঁ!” তারা আরজি করলে, হয় ত দেশ থেকে এসে খাঁ সাহেবের মন-মরজি খারাপ আছে, সেই জন্য বাজনা সেদিন জমেনি। হুজুর আর একদিন দয়া করে হুকুম দিলে, হয় ত অন্য রকম হোতে পারে। চান্দোলাল ভাবলেন, হয়ত বা

হোতেও পারে। প্রকাশ্যে বল্লেন—"আচ্ছা দেখা যাবে।"

সের খাঁ নিজের ঘরে একলা বসে ভাবছিল বাড়ির কথা। সেখানে মন্না একলা কি করছে! বিবাহের পর এই পঞ্চাশ বছর একদিনও সে চোখের আড়াল হয় নি। তাকে ছেড়ে আজ সে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে। একটা ভাবনা সেরের বুকের ভেতর গুমরে-গুমরে উঠছিল। কিছুতেই সেটার হাত থেকে নিজের মনকে ছাড়াতে পারছিল না। সে ভাবছিল, যদি আর তার সঙ্গে না দেখা হয়! ভাবতে ভাবতে তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠতে লাগল। সের খাঁ ভাবতে লাগল, কেমন করে এখান থেকে পালান যায়। চারিদিকে খাড়া পাহারা, পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে প্রাণ পর্যন্ত যাবার সম্ভাবনা। নানা রকম আকাশ পাতাল ভাবতে ভবতে তার মাথা ঘুরতে লাগল। এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিলে, এখনি মহারাজের দরবারে বাজনা নিয়ে হাজির হোতে হবে। 'আচ্ছা' বলে যন্ত্র নিয়ে আবার সেদিনকার মত সে দরবারে গিয়ে বসল। সেদিন সের খাঁর মন বড় খারাপ ছিল। মন্নার চিন্তা তার সমস্ত মনকে এমন করে ঢেকে রেখেছিল যে, অন্যদিকে কিছুতেই সে মন দিতে পারছিল না। আগেকার দিনে সে তবু একটু বাজাতে পেরেছিল;—এদিনে ত একবারে কিছুই বাজাতে পারলে না। মিনিট পাঁচেক বাজাতে-না-বাজাতেই তার হাত কাঁপতে লাগল। হায়দ্রাবাদী ওস্তাদদের দল চেঁচিয়ে বলে উঠল—"হুজুর, একটা পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে ভাল বাজাতে পারে।" চান্দোলাল কিন্তু সেদিন তাদের ঠাট্টায় যোগ দিতে পারলেন না। তিনি ভাবছিলেন, নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু গোলমাল আছে, তা না হলে, যার এত নাম, সে কি এই রকম বাজায়! সভা ভেঙে গেলে সকলেই উঠে চলে গেল; শুধু বসে রইল সের খাঁ আর চান্দোলাল। চান্দোলাল আস্তে আস্তে নিজের জায়গা থেকে নেমে এসে, সের খাঁর পাশে বসে, তাকে ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—আচ্ছা, ভাই খাঁ সাহেব, এই কি তোমার বাজনা? এই বাজনায় তুমি সমস্ত ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করে রেখেছো?" সের খাঁর মনে হচ্ছিল, এই অপমানটা সহ্য করবার জন্যই বুঝি আল্লা এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। চান্দোলাল আবার বলতে লাগলেন—"দিল্লীর সব চেয়ে বড় ওস্তাদ তুমি—কিন্তু সেখানকার ছোট ছোট ওস্তাদরা যে তোমার চেয়ে ঢের ভাল বাজাতে পারে।" সের খাঁ চোখ মুদে জবাব দিলে—"হুজুর, আমি আপনার চাকর, হুকুম দিলেই আমাকে বাজাতে হবে। কিন্তু এই যে আমার সুর-বাহার, এ যন্ত্র দিল্লীর বাদশার নিজের হাতের। বাদশার যন্ত্র ত আপনার তাবেদার নয়। এর যেদিন মরজি হবে, সেদিন বাজাবে। আমি কিংবা আপনি শত চেষ্টা করলেও এ থেকে সে সুর বার করতে পারব না, যে সুরে সমস্ত ভারতবর্ষ মজেছে।"

চান্দোলাল ভাবলেন—তাই ত! একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "আচ্ছা, বলতে পার, এ কবে বাজবে?

সের খাঁ বল্লে—"তা ত বলতে পারি না জনাব! তবে হুকুম করে দিন

আপনার লোকদের যে, এ যখন বাজবে তখন আপনি যে রকম অবস্থায় যেখানে থাকবেন, আমি যেন সেখানে যেতে পারি। যখনি এর মরজি হবে, আপনার কাছে ছুটে আস্‌ব!"

চান্দোলাল বল্লেন—"আচ্ছা, তাই হবে!"

সেদিনকার মত সভা ভেঙে গেল। চান্দোলাল বাড়ির লোকজন, এমন কি, অন্দরের প্রহরীদের পর্যন্ত হুকুম দিয়ে ছিলেন যে, সের খাঁ যখন তার কাছে আসতে চাইবে, তাকে যেন আসতে দেওয়া হয়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা চান্দোলাল সবেমাত্র দরবারে এসে বসেছেন, দুই একজন করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় শুনতে পেলেন যে, সের খাঁ পাগল হোয়ে গিয়েছে। লোক পাঠিয়ে খবর নিতে না নিতে সের দরবারে এসে উপস্থিত হোল। আলুথালু বেশ, মাথায় চুলগুলো রুক্ষ, ঠিক যেন পাগল। এক হাতে সুর বাহার, আর এক হাতে কুর্নিশ করে সে সভায় বসেই চান্দোলালকে ডেকে বল্লে, মহারাজ, "আজ শুনুন, সুর বাহারের মেজাজ আজ বড় ভাল।"

সুর বাহারটিকে তুলে ধরে প্রথমে সে একটা ঝঙ্কার দিলে। দু'দিন যার বাজনা শুনে চান্দোলালের মনে হোয়েছিল, এ রকম বাজনা যে সে বাজাতে পারে, আজ কিন্তু এই প্রথম ঝঙ্কারেই তিনি বুঝতে পারলেন, যার তার হাতে এ রকম ঝঙ্কার ওঠে না। বাতাস লাগলে ঝাড়ের বাতিগুলো যেমন চন্‌মন করে ওঠে, প্রথম ঝঙ্কারেই তাঁর প্রানের ভেতরটা তেমনই চন্‌মনিয়ে উঠল।

সের খাঁ মাটির দিকে নীচু করে আস্তে আস্তে একটা রাগিণী বাজাতে আরম্ভ করলে। প্রত্যেক মীড়ে সূক্ষ্ম শ্রুতি বেরিয়ে চান্দোলালের অন্তরে ধীরে ধীরে গিয়ে আঘাত করতে লাগল। তাঁর অন্তরটা বুঝতে পাচ্ছিল না এরকম বাজনা তিনি জীবনে কখনো শোনেন নি। সের খাঁর বাজনা শুনে তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। তাঁর মনে হতে লাগল, একি ভাষা বুঝতে পারা যায় না, অথচ বুকের ভেতর যে রক্ত বয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে এর পরিচয় আছে। এ যেন লক্ষ বৎসর পূর্বে জন্মের বিস্মৃত কোন একটা সুখ স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। বিস্মৃতির আবছায়াটা মুছে গিয়ে সেটা একটু ফুটে ওঠবার আগেই, আবার সুরের জালে সমস্তটা ঢাকা পড়ে। কার যেন অতি ক্ষীণ স্বর কানে আসছে, এ যেন কতদিনের পরিচিত, কোথায় শুনেছি কবে,—আবার সব মিলিয়ে গিয়ে গমগম্ করে তারের ঝন্‌ঝনায় সব ঢাকা পড়ে। প্রত্যেক মূর্ছনায় মনে হোতে লাগল, যেন দেওয়ালের বাতি গুলি পর্যন্ত মূর্ছিত হোয়ে পড়বে। প্রতি গমকে মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি সুর বাহারের বুক ফেটে, ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুবে।

চান্দোলাল নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে আসন ছেড়ে সের খাঁর সামনে এসে বসেছেন, তার মাথার তাজ কখন যে সেরের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে, তা সভা শুদ্ধ কারো নজরে পড়ে নি। দরবারের আজ সকলেই তাঁরি মত মুগ্ধ।

বাজনা শুনতে শুনতে চান্দোলালের বুকের ভেতর একটা ব্যথা জাগতে লাগল। তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না, কিসের এ ব্যথা। চিরসুখী রাজার দুলাল চান্দোলালের অগাধ আনন্দ পূর্ণ প্রাণের তলায় এত যে ব্যথা কোথায় লুকিয়ে ছিল, তার খোঁজ তিনি জানতেন না। অলক্ষ্যে তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তার পর আর এক ফোঁটা। চান্দোলাল তার রেশমী রুমালে চোখ ঢেকে, বাজনা শুনতে লাগলেন।

তাঁর সেই ব্যথা, যেটা বুকের ভেতর গুমরে গুমরে চোখ ফেটে ঝরে পড়ছিল, ক্রমে সেটা বাড়তে বাড়তে কান্নায় পরিণত হল, মহাবীর চান্দোলাল নিজেরই অজ্ঞাত বেদনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শুধু যে চান্দোলালই কাঁদছিলেন তা নয়; সভায় যত লোক উপস্থিত ছিল, সবারই চোখ ছলছল করছিল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে যখন চান্দোলালের প্রায় দমবন্ধ হোয়ে এসেছে, এমন সময় তিনি চোখ থেকে রুমাল নামিয়ে বল্লেন,—"বাস্, খাঁ সাহেব, খুব হোয়েছে, আর না। ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তুমি! আর তোমার বাজনা শুনে আজ আমিও ধন্য হলুম। এই নাও আমার গলার মালা, এই নাও আমার তাজ, আর এই সমস্ত লোকের সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো।"

সের খাঁ মাথা নীচু করে বল্লে,—"হুজুরকে খুশী করতে পেরেছি, এটা আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আর কিছুই চাই না।"

চান্দোলাল উঠে সের খাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বল্লেন—'দাক্ষিণাত্যের সমস্ত ওস্তাদ আমায় যা দিতে পারে নি, তুমি আজ আমায় তাই দিয়েছ।"

দিল্লীর যে সব ওস্তাদ এতদিন ধরে নির্যাতন সহ্য করে আসছিল, তারা সবাই মিলে চীৎকার করে উঠল,—"জয়, সের খাঁর জয়।"

সের খাঁ সেই বুড়ো বয়সের ভাঙা গলায় আর এক বার গেয়ে উঠল—"জয়, মহম্মাদ শার জয়।" সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আবার আর্যাবর্তের জয় গান বেজে উঠল। সের খাঁ হাত জোড় করে চান্দোলালকে বল্লে—"মহারাজ, যদি সুখী হোয়ে থাকেন, তবে আমায় যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, আবার সেইখানে রেখে দিয়ে আসতে হুকুম করে দিন—আজকেই যেন রওনা হতে পারি।"

ছ'মাস পরে আবার একদিন সন্ধ্যেবেলা চান্দোলালের লোকেরা দিল্লীর এক কোণে সের খাঁকে নামিয়ে বিদায় দিল। যেদিন তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে দিন আর আজকের দিনের কত প্রভেদ! অনেক দিন পরে আবার হিন্দুস্থান সের খাঁর যশোগান করতে আরম্ভ করেছে, উদ্ধত দাক্ষিণাত্য মাথা নিচু করে তার গলায় জয়মালা পরিয়ে দিয়েছে।

দুপুরবেলাকার জ্বলন্ত সূর্য তখন ঠাণ্ডা হোয়ে, পশ্চিমের নীল সমুদ্রে আধখানা গা ডুবিয়ে, পৃথিবীর দিকে একবার শেষ চাওয়া চেয়ে নিচ্ছিল। ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সের খাঁর মনে হোল, আমার যশোসূর্য এখনো অস্ত যায় নি। নবীন উৎসাহে তার বুকে আবার যুবকের বল ফিরে এসেছে।

প্রশংসার নেশায় মাতাল সের খাঁ নিজের দরজায় এসে ঘা দিলে, "মুন্না—"

দরজা খোলা ছিল। সে বাড়ির ভেতর গিয়ে ডাকলে, "মুন্না—মুন্না—" ছাদের ওপর থেকে কে যেন বিদ্রূপের সুরে তারি গলায় জবাব দিলে—মুন্না। এ ঘর ও-ঘর করে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর একজন প্রতিবেশী এসে খবর দিলে, মুন্না নাই—সে নিরুদ্দেশ হবার সাতদিন পরে সে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। মাথা ঘুরে সে সেইখানেই বসে পড়ল।

দিগ্বিজয়ী সের খাঁ ভাবতে লাগলে, যাকে জয় করবার জন্য তাকে কোনদিন কষ্ট পেতে হয় নি, আপনি এসে যে ধরা দিয়েছিল, হঠাৎ দেবতার মতন নিষ্ঠুর হোয়ে সে কেন এমন করে চলে গেল!

দিনের আলো একটু করে কমতে কমতে একেবারে নিভে এল, যেন কার মাসীমাখা করস্পর্শে পৃথিবীটা হঠাৎ কালো হোয়ে গেল। আর সেই ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে একটা করুণ সুর সের খাঁর কানে এসে বাজতে লাগল— কোথায় তুমি! চোখের সামনে একখানা সজল মুখ দু একবার চক্‌মক্‌ করে আবার মিলিয়ে গেল। সের খাঁ উঠে দাঁড়াল, মাথায় চান্দোলালের দেওয়া যে জরীর পাগড়ীটা ছিল, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোথায়! কার সন্ধানে?

মঙ্গল মঠ

আমাদের আড্ডার দেশ জোড়া নামডাক ছিল। সেখানে যে এসে আধঘণ্টার জন্য বসেছে, তাকেই বলতে হয়েছে—হাঁ একটা আড্ডার মতন আড্ডা বটে! এক একটি লোকের হালচাল এক এক-রকমের, কোন দুটি লোকের স্বভাবে মিল পাবার যো ছিল না। তবে এক জায়গায় আমাদের সবারই মিল ছিল, আমরা সবাই ছিলুম লক্ষ্মীছাড়া। হাড়-লক্ষ্মীছাড়া না হলে সেখানে কেউ পাত্তা পেত না। লোকে এই আড্ডার নাম দিয়েছিল "লক্ষ্মীছাড়ার দল"।

ভৈরবচন্দ্র ছিলেন আমাদের মধ্যে সব থেকে বাবু। শান্তিপুরের ধুতি, রেশমের ফতুয়া, ঢাকাই আদ্দির পাঞ্জাবি, ভাল বার্নিশের লপেটা এ সব ছাড়া সে এক-পা-ও নড়ত না। তার এই সব বিলাসিতার বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু ছিল না, তবে তার মাথার সেই শাঁস বার করা থাক্‌ কাটা চুল ছাঁটা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সে বলত—লোকের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তোমাদের কেমন একটা বদ অভ্যেস—

বিলাসকুমার ছিল ভৈরবের ঠিক উল্টো। সে পরত গেরুয়া বসন, মুণ্ড

কচ্ছ, নেড়া মাথা, খালি পা—বিলাস দিন কতক সন্ন্যাসীও হয়েছিল, সম্প্রতি জঙ্গল ছেড়ে আবার সে শহরবাসী হয়েছে। হঠাৎ তার এই মত পরিবর্তনের কারণটা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেনি।

বাইরে এদের যেমন পার্থক্য ছিল তেমনি অন্তরেও তারা দুই বিভিন্ন ভাবের রাজ্যে বিচরণ করত। ভৈরবের মুখে ছিল দিন রাত বেদান্তের ছড়াছড়ি। শান্তিপুরে ধুতির কোঁচান কোঁচাটি বাঁ হাতে আলগোছে ধরে যখন সে বেদান্তের ব্যাখ্যা করত তখন সেটা শোনবার না হোক একটা দেখবার জিনিস হত বটে। আবার ওদিকে গেরুয়া বসন পরা বিলাস যখন নেড়া মাথা দুলিয়ে চার্বাক দর্শনের সরল অর্থ ও ভাষ্য জুড়ত, তখন আমাদের আড্ডাধারী অতুল চার্বাকের একজন উঁচুদরের শিষ্য হলেও চঞ্চল হয়ে বলে উঠত—বিলাসদা একটু সামলে—

মহেন্দ্রের বয়স ছিল প্রায় সত্তর। আমরা সবাই তাকে দাদা বলে ডাকতুম। ভৈরব ও বিলাসের অন্তর বাইরের এই তারতম্য নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত, মহেন্দ্র দা তখন বলত—কি জানিস্! ওরা মাঝে মাঝে পাষাণ ভেঙে দাঁড়িপাল্লাটাকে ঠিক করে নেয়—

এত রকমের লোক থাকা সত্ত্বেও রোজই এক সঙ্গে মেলামেশার জন্য আড্ডা মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ত, সেই সময়ে আমরা যে-যার এক-একদিকে চলে যেতুম; দিন কয়েক আড্ডা ঘরের দরজায় চাবি পড়ত।

ঠিক এমনি একটা সময়ে যখন সবারই মনে পালাই পালাই ডাক দিতে আরম্ভ করেছে সেই সময় একদিন ভৈরবচন্দ্র নতুন বেশে আড্ডায় এসে হাজির হলেন।

আমরা ত তার চেহারা দেখে একেবারে অবাক। তার মাথায় সেই এক আনা পনেরো আনা চুল কি করে চৌরস হয়ে কদম-ছাঁটে পরিণত হয়েছে। গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবির বদলে একটা মোটা কুর্তা, আর তার উপরে একখানা বোম্বাই বিছানার চাদর, পরনে একখানা মোটা থান ধুতি, পায়ে সাদা বেলোয়াড়ী চামড়ার একজোড়া চটি আর তার হাতে শঙ্কর দর্শনের এক খণ্ড।

ভৈরব বল্লে—ব্যস, সংসারের সঙ্গে তার ইতি হয়ে গেল। সে শীগ্‌গীরই হিমালয়ের মঙ্গল মঠের সেবক হয়ে সেখানে চলে যাচ্ছে। মঙ্গল মঠের প্রতিষ্ঠাতা একজন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তার মনের মধ্যে এখন এই দ্বৈতাদ্বৈতের ভয়ানক লড়াই চলেছে; সেই সন্দেহটা কেটে গেলেই একদিন সে বেরিয়ে পড়বে।

ভৈরবের মুখে এই সব লম্বা চওড়া কথা ইতিপূর্বে আমরা অনেক শুনেছি কিন্তু তেমন মনোযোগ কখনো দিইনি। আমরা জানতুম দুনিয়াশুদ্ধ লোক মিথ্যাবাদী আর আমরা সত্যবাদী। ও-সব দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীর ধার কখনো ধারতুম না। মহেন্দ্রদাদা বলত ওগুলো মিথ্যেবাদীদেরই নামান্তর মাত্র।

আমাদের এই অবহেলায় ভৈরবচন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে দিনে দিনে

আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছে দেখে আমরা তাকে ভণ্ড বলে ডাকতে আরম্ভ করে দিলুম। প্রথমে দিন কয়েক সে এই ডাকে কিছুমাত্র আপত্তি জানায় নি, তারপর হঠাৎ একদিন ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বল্লে—আড্ডায় আসা তাঁহ'লে ত্যাগ করতে হল—

ভৈরবের আপত্তির মূলে একটু ইতিহাস ছিল। একদিন আমরা তাকে ভণ্ড বলা মাত্র নফর তার প্রতিবাদ করে বল্লে—কেন তোমরা ওকে ভণ্ড বল?

নফরটা ছিল কিন্তু ভণ্ড চূড়ামণি। তার মন ভাবত এক কথা, আর মুখে বলত আর এক কথা। তার এই অসাধারণ গুণের জন্য আড্ডার থেকে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল—অন্তঃসারশূন্য। সে এই রকম করে এক জনের পক্ষ নিয়ে তাকে গরম করে দিত, তারপর হঠাৎ ব্যাপারটা যখন বেশ পাকিয়ে উঠত তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্য লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ত।

নফরের কথা শুনে আমাদের সত্যিই মনে হয়েছিল—তাইত ভৈরবকে ভণ্ড বলাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। তাই তাকে একটু আপ্যায়িত করবার জন্য আমরা বল্লুম—ভয় নেই ভৈরব, ও ভণ্ড সাজতে সাজতে সাধু হয়ে যায়—

নফর বল্লে—কখনই না—

নফরের কথা শুনে ভৈরব আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বল্লে—অসত্য যার ভিত্তি তার উপরে কখনো কোন ভাল কাজ হতে পারে না—

তর্কটি গোলমেলে ঠেকে। নরবচন্দ্র সরে পড়লেন।

ভৈরব তখন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি বয়েৎ ছেড়ে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। বিলাস এক মনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আফিংয়ের নেশায় ঢুলছিল। থেকে থেকে তার মাথাটা বোলের ওপর লুটিয়ে পড়ছে—এই রকম অবস্থা। হঠাৎ ভৈরবের একটা হুঙ্কারে সে চমকে উঠে বল্লে—ব্যাপার কি? ভৈরব এত চেঁচাচ্ছে কেন হে?

ভৈরবের মুখে তর্কের কারণ শুনে বিলাস বল্লে—আচ্ছা আমাদের পক্ষে যদি আমরা প্রমাণ খাড়া করতে পারি?

ভৈরব বল্লে—তা হলে অন্ততঃ তর্কে হেরে গেলুম এটা স্বীকার করব।

বিলাস বল্লে—তবে শোন—

আমরা বিলাসকে ঘিরে গোল হয়ে বসলুম। অতুল মনে করলে বিলাস হয়ত চার্বাক দর্শনের কোন একটি অপ্রকাশিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শুরু করবে, তাই সে একটু ভয়ে ভয়ে বল্লে—বিলাস দা একটু আস্তে ভাই, বাড়ির ভেতরে যেন শুনতে না পায়—

বিলাস বলতে লাগল—তোমরা সবাই জান যে জপেন আমার সহোদর, কিন্তু তা নয়। আমি বাপের এক ছেলে, জপেনও বাপের এক ছেলে, আমরা দুজনে মাসতুত ভাই। আমার মাতামহ গোষ্ঠি খুব ধনী ছিলেন। আমি যে আজ চার্বাক দর্শনে এত বড় এক জন পণ্ডিত হয়ে উঠেছি—এই পাণ্ডিত্য বংশ পরম্পরায় আমি আমার মাতামহের দিক থেকে

পেয়েছি। তবে তাঁরা চারু বাক্যগুলির সঙ্গে চারুকার্য গুলিকেও বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। বাক্য ও কার্য বিজ্ঞানের প্রথম এবং সর্বপ্রধান স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে, ঐ দুটো জিনিসের মিলন যেখানে সেখানেই অনর্থপাত। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। মাতামহের পূর্বপুরুষেরা এই বাক্যগুলিকে কার্যে পরিণত করে করে তাহাদের বিশাল বিষয়ের বোঝাট যখন আমার মাতামহের পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন তখন দেখা গেল যে, বিষয়ের খোলসটি ঠিক আছে বটে কিন্তু তার ভেতরটায় ঘুণ ধরে গেছে।

মাতামহের পুত্রসন্তান ছিল না। গরীবের ঘরে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইদের তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন। জামাইরা গরীবের ছেলে, বড়লোক শ্বশুর বাড়িতে এসে দু-দিনেই তাঁদের বানিয়াদি চাল চলন আয়ত্ত করে ফেল্লেন। আয়ত্ত করলেন বটে কিন্তু গরীবের হাড়ে তাঁদের সেটা আর সহ্য হল না। কাজেই আমাকে আর জপেনদাকে জ্ঞান হবার আগেই পিতৃহীন হতে হয়েছিল। আমাদের মাতামহ মারা যাবার আগেই মার আর মাসীমার মৃত্যু হয়েছিল তাই দাদামশায়ের মৃত্যু দিনেই পাওনাদারদের হাতে বাড়িখানা ছেড়ে আসবার সময় নিজের ভাবনা ছাড়া আর কারো ভাবনা ভাবতে হয় নি!

আগেই বলেছি, পিত্রালয় কখনো দেখিনি, দাদামশায়ের বাড়িকেই নিজের বাড়ি বলে জানতুম। তার প্রত্যেক থাম, এমনকি প্রত্যেক ইঁটখানার সঙ্গে আমাদের দুই ভাইয়ের এমন পরিচয় ছিল যে, কেউ যদি আমাদের চোখ বেঁধে দিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেত ত আমরা দেওয়াল স্পর্শ করে বলে দিতে পারতুম—এটা ঠাকুরদালান, এটা দাদামশায়ের বসবার ঘর—

ছেলেবেলার এই খেলাঘর যেদিন ছাড়তে হল সেদিন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আমার চোখে জল দেখে জপেনদা সেদিন বলেছিল—চলে আয় বিলে কাঁদিস নি, আমি বেঁচে থাকলে তোকে পঞ্চাশখানা বাড়ি বানিয়ে দেব।

সেইদিন থেকে কিন্তু জপেনদার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমার বাবার দুই সহোদর ছিলেন, তারা আমায় নিয়ে গেলেন। জপেনদার পিতৃ-পুরুষের কেউ ছিল না, তাকে নিতেও কেউ এল না। সেই বয়সে সে যে কোথায় গেল, কার কাছে আশ্রয় নিলে তা জানি না!

এই ব্যাপারের দশ বারো বছর পরের কথা বলছি—আমি তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোন একটা সওদাগরি আপিসে পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি করি। একদিন গড়ের মাঠে কিসের একটা খেলা দেখতে গিয়ে জপেন দাদার সঙ্গে দেখা—তাকে দেখে ত আমি চিনতেই পারি নি! তার দুই হাতে গোটাদশেক হীরের আংটি, ঘড়ির চেন, সোনা বাঁধান ছড়ি—

দাদা জিজ্ঞেস কল্লে—বিলে কি কচ্ছিস? পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী করি শুনে সে বল্লে—দূর দূর চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে আরম্ভ

কর। বিশ্বাস করতে পারি এমন একটা লোক পাইনে, বড় মুশকিলেই

মেলায় একটুখানি ঘুরে তার গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড কালো জুড়ি। গাড়ি পা-দানিতে পা দেওয়ামাত্র ভেতরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। আমার ত দেখে শুনে তাক্ লেগে যাবার উপক্রম হল।

একটুখানি পরে গাড়িখানা একটা প্রকাণ্ড ফটক পার হয়ে এক বাড়ির মধ্যে ঢুকল। প্রাসাদের মত বাড়ি, যেমন বাড়ি তেমনি তার আসবাবপত্র। জপেনদা বল্লে কোন এক ইংরেজের সাজান বাড়ি সে কিনেছে। দাম কত—পঁচিশ না পঞ্চাশ লাখ কত বল্লে ঠিক মনে নেই। দাদার সঙ্গে অনেক কথা হল। সে দালালীতে বিস্তর পয়সা রোজগার করে, তবে তার একজন সহকারী না হলে আর চলছে না। বিশ্বাস করে কার হাতেই বা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, মাসতুত ভাই হলেও আমি তার সহোদরেরই মতন ইত্যাদি—

নানা কথাবার্ত্তার পর সে বল্লে—কি খুড়োদের ওখানে পড়ে আছিস, আমার এখানে চলে আয়, দুই ভাইয়ে মিলে আবার আগেকার মতন থাকা যাবে।

পরদিন খুড়োদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দাদার বাড়িতে চলে এলুম। দুই-এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে মোটর গাড়ি করে কাজে বেরুতে আরম্ভ করা গেল। দাদা দুহাতে পয়সা রোজগার করত, আমাকে পেয়ে তার রোজগার আরও বেড়ে গেল। দুই ভাইয়ে মিলে আফিস খোলা হল। দালালীটা ছিল আমাদের প্রধান ব্যবসা, তবে তার সঙ্গে জাল জুচ্চুরি, বাটপাড়ি, জুয়া, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি অনেক রকমের পয়সা উপায় হতে লাগল। দাদা বলত—দুনিয়াময় পয়সা ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিতে জানতে হয়।

বছর দুয়েকের মধ্যে ধনী বলে আমাদের নাম জাহির হয়ে গেল। ব্যবসা অর্থাৎ জচ্চুরিতে আমরা যে অদ্বিতীয় সে কথা শহরের আপামর সবাই জেনে গেল।

পয়সা যে কি রকম আমদানি হতে লাগল তা বল্লে তোমরা বিশ্বাসই করবে না। এক একদিন আমরা লাখ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছি। যেমন আমদানী প্রত্যহ তেমনি অজস্র পয়সা খরচও করতুম। রোজ রাত্রে আমাদের বাড়িখানা যেন ইন্দ্রপুরী হয়ে থাকত। শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, বাইজীর নাচগান আর বন্ধু-বান্ধবদের হাল্লায় সেই প্রাসাদের মতন বাড়িখানা একেবারে জমজম করত। কোথায় কোন দেশে এক বাইজী ভাল নাচতে পারে, কোন রাজার কাছে একজন ভাল গাইয়ে আছে এই সব খবর জুটিয়ে আনবার জন্যে আমাদের মাইনে করা মোসাহেব ছিল, তারা সব খবর আনত আর যত টাকা লাগে তাই দিয়ে তাদের নিয়ে আসা হত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে দিল্লী থেকে ফৈজী বিবিকে আনিয়ে ছিল শুনে তোমাদের তাক্ লেগে যায়, আর আমাদের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন দেখো লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে ও-রকম দশটা বাইজী আমরা আনিয়েছি। আজকে আমার এই শিরীষ কাগজের মতন মোলায়েম গায়ের চামড়া দেখে তোমরা সব

ঠাট্টা কর, একদিন দুধ আর গোলাপ জল দিয়ে এই চামড়া পরিষ্কার করা হত, আর এর পালিশ ঠিক রাখবার জন্য কত রকমের যে মলম লাগানো হত তার নাম করতে গেলে এখন একটা বড় অভিধান হয়ে যাবে।

ব্যবসা যত জোর চলতে লাগল জাল জুচ্চুরিতেও ততই পাকা হতে লাগলুম। মাসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে একটা বচন প্রচলিত আছে লোকে আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়ে সেই বচনের সত্যতা প্রমাণ করত।

একবার দাদার একটা চালের ভুলে আমাদের ভয়ানক লোকসান হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কে যা কিছু নগদ ছিল তা আর বাড়িখানা চলে গেল। টাকা যেমন জলের মতন আসত তেমনি জলের মতন বেরিয়ে গেল। লোকসান সামলে একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আবার লোকসান খেলুম। লোকসানের সময় লোকের মাথার ঠিক থাকে না। বুড়ো ঘাগী ব্যবসাদারেরাই ডিগবাজী খায় তো আমরা—আমাদের দুজনের কারোই তখন ত্রিশ পার হয় নি।

জাল, জোচ্চুরি, বাটপাড়ি ইত্যাদিতে কোন দিক দিয়ে সামলাতে না পেরে একদিন আমরা দুজনে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লুম। দাদার এক-মাড়োয়ারী বন্ধু বড়বাজারে থাকত, তার বাড়িতে মাস কয়েক গা ঢাকা দিয়ে বসে থেকে একদিন সন্ধ্যে বেলা দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল। পালিয়ে কোথায় যাওয়া হবে সেটা দাদা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, আমি জিজ্ঞেস করাতে সে একটা ধমক দিয়ে বল্লে—কিছু জানতে চাসনে এখন, সোজা চলে আয়—

দুজনে সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে গোরক্ষপুরের দুখানা টিকিট কিনে রেলে উঠে বসলুম। দিন দুই পরে এক সন্ধ্যেবেলা গোরক্ষপুরে নেমে এক ধর্মশালায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলুম। দাদার হালচাল দেখে মনে হল তার এসব রাস্তা যেন বেশ চেনা আছে। খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমি আবার তাকে প্রশ্ন করায় সে বলল—আমাদের প্রায় সাতদিন হাঁটতে হবে। হিমালয় পাহাড়ে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী আছেন, আমরা গিয়ে তাঁর শিষ্য হব, সেই খানেই থাকব। ভাবলুম—এ মন্দ হলনা, অনেক পাপ করা গেছে, এবার সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্—

কয়েকদিন অনবরত হেঁটে আমরা সচ্চিদানন্দ স্বামীর মঠে গিয়ে পেঁছিলুম। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় সব আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, তারই মাঝখানের উপত্যকায় ছোট্ট খানকয়েক বাড়ি—সন্ন্যাসীদের থাকবার মতন জায়গা বটে।

দাদা ত গিয়েই আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে সচ্চিদানন্দের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে—প্রভু আমরা মহাপাপী আমাদের কি উদ্ধার হবে না—

স্বামীজি তখন কি একটা বই পড়ছিলেন, দাদা ও রকম হাঁউমাঁউ করে গিয়ে পায়ের ওপর পড়াতে তিনি চমকে দশহাত পেছিয়ে গেলেন। তারপর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হেসে বল্লেন—বৎস, তোমাদের কিছু ভয় নেই, অনুতাপে পাপের ময়লা কেটে যায়, তোমাদের অনুতাপ এসেছে, কিছু ভয় নেই—

সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ অদ্ভুত লোক ছিলেন। যেমন তাঁর গৌরবর্ণ সুবিশাল দেহ, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে একবার শুনলেই মোহিত হয়ে যেতে হত। কি তাঁর গভীর জ্ঞান, অথচ শিশুর মতন সরল। বক্তৃতা করবার তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি আজ পর্যন্ত তা কারো দেখিনি।

মঠে আমরা পাঁচ-সাতজন সেবক ছিলুম। সকালবেলা ঘণ্টা কয়েক শাস্ত্র পাঠ হত তারপর আর কোন কাজ ছিল না, আমরা যে যার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম।

আমাদের মঠ থেকে দূরে একটা পাহাড় দেখা যেত তার মাথায় সব সময়ই বরফ জমে থাকত। পাহাড়ীরা এই পাহাড়টার নাম দিয়েছিল সতী। এই সতী নানা ছলে আমাকে এই পাহাড়ের বুকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করত। তার দিকে যখনই তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে নূতন সাজে সেজে রয়েছে। সকালে সূর্য্য ওঠবার আগেই তার চুড়োটা সলজ্জ নববধূর মুখের মতন গোলাপী রংয়ে রঙিন হয়ে উঠত। আমার মনে হত মহেশ্বরের প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে নববধূ সতী যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কোন কোন দিন দুপুর বেলা সূর্যের লাল রশ্মি পড়ে পাহাড়টা এত লাল হয়ে উঠত যে, তার দিকে চাওয়া যেত না। সে সময়ে তার চেহারা দেখে মনে হত যেন দক্ষের দরবারে সতী দেবী পতিনিন্দা শুনে ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে এখুনি তার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, আর তার তরল আগুন চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ে পৃথিবীতে প্রলয় কাণ্ড সুরু হবে। অমাবস্যার অন্ধকারে যখন পৃথিবীর আর কিছুই দেখা যেত না তখনও তার দিকে চেয়ে দেখেছি, মনে হয়েছে, সতী যেন একটা গাঢ় নীল রংয়ের ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঢেকে কার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে, ওড়না ভেদ করে ধবধবে সাদা রং ফুটে বেরিয়েছে। ক্রমে এই মঠ আর দূরের ওই সতী আমার সমস্ত মন প্রাণ গ্রাস করে ফেলতে লাগল। আমার অতীত যেন আমার মন থেকে মুছে যেতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন আগেই আমি যে একটা মস্ত শয়তান, মস্ত জোচ্চোর ছিলুম সে কথা আমি নিজেই ভুলে যেতে লাগলুম। সময়ে সময়ে আমার মনে হত যে, আমি যেন চিরকাল এই পাহাড়ের কোলেই বেড়ে উঠেছি, আমার চারিদিকে এই যে ছোট বড় সব পাহাড় ওরা আমারই আত্মীয়। আমারই মতন একদিন তারাও এই বুকে খেলে বেড়াত হঠাৎ কোন জাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তারা এই রকম নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়েছে, আবার কবে কে এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাদের জাগিয়ে দেবে সেই আশায় তারা দিন গুণছে।

দাদার কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন পরিবর্তন হল না। সে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাকে দিয়ে আফিং আনিয়ে খেত। পাহাড়ীদের ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে রকম বে-রকমের নেশা করত। তা ছাড়া আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দুই একটা পাহাড়ী মেয়েকেও দেখেছি। অবশ্য সচ্চিদানন্দ কিংবা তাঁর কোন শিষ্য ঘুণাক্ষরে এ-বিষয়ে জানতে পারত না। বরং সে দিন-কয়েকের

মধ্যেই স্বামীজির প্রধান শিষ্য হয়ে দাঁড়াল।

সচ্চিদানন্দের নিয়ম ছিল যে পাঁচ বছর অন্তর তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে তাঁর কাছে জীবনের পাপ স্বীকার করতে হবে। আমরা সেখানে থাকবার কিছুদিন পরে সেই পাপ স্বীকারের দিন এগিয়ে এল। সেদিন মঠে নিজেদের মধ্যেই একটা উৎসব করা হত। পাপ স্বীকারের ব্যবস্থা শুনে আমি ত চঞ্চল হয়ে উঠলুম, দাদা কিন্তু নির্বিকার। দেখলুম সে আফিংয়ের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলে মাত্র।

স্বীকার-উৎসবের দিন দুই আগে দাদা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে—আমায় একটু ধুনো জোগাড় করে দিতে পারিস্ ?

আমার কাছে মঠের ভাঁড়ার থাকত, হঠাৎ এত জিনিস থাক্‌তে তার ধুনোর কি দরকার পড়ল তাই তাকে জিজ্ঞেস করলুম—ধুনো দিয়ে কি হবে ?

—দে তো খানিকটা ধুনো, একটা ওষুধ তৈরী করতে হবে। ভাঁড়ার থেকে খানিকটা ধুনো তাকে দিয়ে তক্কে-তক্কে ফিরতে লাগলুম। দেখলুম যে, দাদা নিজের ঘরে গিয়ে ধুনোটাকে গুঁড়িয়ে তিন চার গুলি পাকিয়ে টপ্ টপ্ করে গিলে ফেল্লে।

পরদিনই দাদা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার দুদিন পরে মঠের উৎসব। উৎসবের দিন দাদার অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে দাঁড়াল। তার অসুখের জন্য আমায় তার কাছে থাকতে হল বলে পাপ স্বীকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। সন্ধ্যের একটু পরে দাদার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে তার চোখ দুটো লাল হয়ে কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। অবস্থা দেখে আমার মনে হতে লাগল যে, এখুনি তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

দাদা আমায় বলে—স্বামীজিকে একবার ডাক। তাঁর কাছে পাপ স্বীকার না করলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। দাদা পাপ স্বীকার করলে আমার অবস্থাটাও বিশেষ সুবিধের হবে না ভেবে তাকে বল্লুম—দাদা এ সময় আর কেন—

সে বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে বল্লে—তোর কিছু ভয় নেই, তুই স্বামীজিকে ডেকে নিয়ে আয়।

স্বামীজিকে ডেকে আনলুম। তিনি কাছে এসে দাদার অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। দেখলুম, তার কষ্ট দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। কাতর স্বরে দাদাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—জপেন বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল,—

—প্রভু, দেবতা, আমার বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু যাবার আগে আমি যে পাপ করেছি তা আপনার কাছে স্বীকার করে না গেলে আমি মরেও সুখ পাব না—

সচ্চিদানন্দ বল্লেন ; তাঁর সেই কথাগুলো মনে পড়লে আজও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বল্লেন—তীর্থযাত্রার আগে আর উপদেবতাকে প্রণাম কেনবাবা—পাপ স্বীকার করার উদ্দেশ্য, চোখের সামনে নিজের কীর্ত্তির একখানাজ্বলন্ত ছবি রেখে দেওয়া—ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার পথে ঠিক হয়ে চলবার

একটা উপায় মাত্র। তোমার আত্মা এখন অনন্তের পথে পাখা বিস্তার করেছে, দেহীর নিক্তির ওজনের পাপ পুণ্যের বিচারে সেখানকার কোন লাভ নেই তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সচ্চিদানন্দের এই সব কথা শুনেও দাদা পাপ স্বীকার করবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগল। তার সেই কান্ড দেখে আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল— দিই গলাটা টিপে, পাপ স্বীকারের মজাটা একবার বার করে দিই।

দাদার জেদ দেখে স্বামীজী তাকে প্রশ্ন করলেন—নিজের পত্নী ছাড়া কখন অন্য কোন স্ত্রীলোকের—

সচ্চিদানন্দের কথা থামিয়ে দিয়ে দাদা বল্লে—প্রভু, আমি অবিবাহিত, তা ছাড়া মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু সে বিষয়ে যেমন নির্দ্দোষ থাকে ঐ বিষয়ে আমিও সেই রকম নিষ্কলঙ্ক।

দাদার কথা শুনে ত আমার মাথাটা লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল। ওঃ কি ভয়ানক! জীবন—মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যে এইরকম মিথ্যে বলতে পারে তার গুণ নির্দেশ করবার মতন বিশেষণ বোধহয় পৃথিবীর কোন ভাষার অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কথাটা শুনে বোধ হয় স্বামীজিরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি একটু চুপ করে থেকে তাকে বল্লেন—বৎস, এ বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ঢের উন্নত। তুমি ধন্য।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আমি শুনেছি তুমি ব্যবসাদার ছিলে। ব্যবসায় অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হয়, তাছাড়া অর্থের ওপরেও লোভ অত্যন্ত বাড়ে। তুমি কি কখনও সেই লালসায় অভিভূত হয়েছিলে।

প্রশ্ন শুনে দাদা বিকট একটা হাসির আওয়াজ করলে, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারলুম যে সেটা হাসি নয়, কান্না! হাউ হাউ করে কেঁদে সে বলতে লাগল—প্রভু, আমি অতি লোভী, বিবাহ না করলেও আমার সংসার ছিল খুব বড়, কিসে কেমন করে আমি আমার বাবা-মা, ভাই, বোনদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবো রাত-দিন কেবল সেই চিন্তাই করেছি, আর সেই লোভে তন্ময় হোয়ে অর্থ উপার্জন করেছি। আমার মুক্তি কি হবে না? এই বলে সে সচ্চিদানন্দের পা জড়িয়ে ধরলে।

স্বামীজি তাকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, কিন্তু সে সব কথা কি তার কানে যায়—সে থেকে থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে আর বলে—প্রভু আমার কি হবে?

সচ্চিদানন্দ আর কোন প্রশ্ন না করে তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। উত্তেজনায় তার শ্বাস প্রশ্বাসের ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে সে একটুখানি শান্ত হল।

কিছুক্ষণ এই রকম স্থির হয়ে পড়ে থেকে আবার সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। আমি ভাবলুম—আবার কি হল!

দাদা আবার শুরু করলে—প্রভু আমি অতি পাপী, আমি অতি চোর,

জোচ্চোর—যখন ব্যবসা করতুম তখন একদিন হিসেব মিলিয়ে বাড়ি যাবার সময় দেখি যে, কয়েকটা টাকা তবিলে বেশী পড়ে রয়েছে। বোধ হয় কেউ ভুলে বেশী দিয়ে গিয়েছে মনে করে আমি আমার কর্মচারীদের টাকাটা আলাদা করে রেখে দিতে বলেছিলুম। আজ মনে হচ্ছে টাকাটা ত কাউকে দেওয়া হয় নি। আমার কি হবে ?—বলে সে কপাল চাপড়াতে লাগল আর থেকে থেকে উঠে বসতে আরম্ভ করলে।

সামনে একটা নরহত্যা হয় দেখে স্বামীজি সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

দাদার আগ্রহে আবার তাঁকে ডেকে আনতে হল। এবার সে তাঁকে কি বল্লে জান ? বিলাস একবার গলাটা সাফ করে ভৈরবের দিকে চেয়ে একটু নীচু গলায় বল্লে—এবার সে কি বল্লে জান ? এবার দাদা বল্লে—প্রভু আপনি বলুন আমার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার হতে পারবে কি ? আমার ইচ্ছা যে আমি এইখানেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাই। আপনি যদি আশ্বাস দেন ত এবারের মতন আমি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আপনার আশীর্বাদে আমার সে শক্তি আছে।

দাদার এই কথা শুনে আমার মাথার ভেতরে কি রকম একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হতে লাগল। সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলল না। কোন ক্রমে দেওয়াল ধরে ধরে বাইরে চলে এলুম।

সমস্ত রাত্রি ধরে স্বামীজিতে আর দাদাতে কি কথাবার্ত্তা হল জানিনে। সকালবেলা উঠে দেখি সে দিব্যি হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সে আমায় ডেকে বলেদিলে—ধুনোর কথাটা কাউকে বলিস নি—

আমি মনে মনে ভাবলুম—ও বাবা ধুনোর এত গুণ !

এই ব্যাপারের মাসখানেক পরে আমি আর আমাদের মঠের আর একজন সেবক ত্রিকুট মঠের একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে আমরা প্রায় ছ-মাস ছিলুম। এই ত্রিকুট মঠ আমাদের মঙ্গলমঠ থেকে মাস-খানেকের রাস্তা। এই ত্রিকুট মঠে বসেই আমরা শুনতে পেলুম যে আমাদের মঠে আনন্দ স্বামী নামে একজন মস্ত অদ্বৈতবাদী পুরুষ এসেছেন। সচ্চিদানন্দ এই সন্ন্যাসীকে গুরু করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে এই মহাত্মাকে দেখতে আসছে। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়ে দিচ্ছেন।

নিজেদের মঠে এমন একজন মহাত্মার সমাগম হয়েছে শুনে আমরা সেইদিনই ত্রিকুট ত্যাগ করে মঙ্গলমঠের দিকে যাত্রা করলুম।

মঠে এসে দেখি সেখানে চারিদিকে ধুম ধাড়াক্কা লেগে গিয়েছে। সেবকদের থাকবার জন্য বড় বড় বাড়ি হচ্ছে। একদিকে একটা বড় আতুর-আশ্রম খোলা হয়েছে, লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে বড় লোকই বেশী। স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্প্রতি গুরুর আদেশে প্রচারে গিয়ে অনেক অর্থ ও অনেক শিষ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। আনন্দস্বামী থাকবার জন্য সুন্দর একখানা শ্বেতপাথরের মন্দির হয়েছে, স্বামীজি তার মধ্যে ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন।

মন্দিরে ঢুকে স্বামীজীকে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—হার ! হরি ! আনন্দ স্বামী আর কেউ নন, আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

মঠের একজন সেবককে ব্যাপার কি তা জিজ্ঞেস করে জানলুম—স্বামীজি একজন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ, সচ্চিদানন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ছলনা করতে এসেছিলেন। সচ্চিদানন্দ একদিন স্বপ্নে এই কথা জানতে পেরে সকালে উঠে তাঁর পায়ের ওপর পড়াতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন। ক্রমে শুনলুম যে আমার অবর্তমানে সেখানে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আনন্দকে একদিন সাপে ছোবল মেরেছিল, আসল জাতসাপ। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে সে বিষ নামিয়ে দিয়েছেন। এই রকম অনেক অলৌকিক কাণ্ড তিনি কয়েকমাসের মধ্যে করে ফেলেছেন।

দেখে শুনে আমার মনে অহঙ্কার হল যে, এমন দাদার ভাই আমি। কিন্তু সচ্চিদানন্দের মতন অমন মহাপুরুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলুম না। একদিন দাদাকে আড়ালে পেয়ে আমি খুব গালাগালি দিলুম। গাল খেয়ে সে আমায় গোটাকয়েক হীরের আংটি দিয়ে বল্লে—এগুলো নিয়ে তুই সংসারে ফিরে যা, বিক্রি করে যা হবে তাতে তোর সারাজীবন সুখে কেটে যাবে।

বুঝলুম তার চক্ষুলজ্জা এখনও কাটেনি।

মঙ্গলমঠ আর আনন্দস্বামীর নাম দিনে দিনে প্রচার হয়ে পড়তে লাগল। মঠ থেকে অনেক সৎ কাজ হতে লাগল। চারদিক থেকে নতুন নতুন সেবক জুটতে আরম্ভ করল। এত গোলমালের মধ্যেও দাদার অহিফেন সেবন ও মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চলতে লাগল। একবার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তিনদিনের জ্বরে আনন্দ পঞ্চত্ব পেলেন।

সেবকরা বল্লে—স্বামীজি দেহত্যাগ কল্লেন—বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা লিখলে—একে একে নিভেছে দেউটি—সমস্ত ভারতবর্ষ বল্লে—দেশের একজন মহাত্মা অকালে চলে গেলেন।

আমি সেইদিনই মঠ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলুম। কলকাতার বাঁডন-কুঞ্জে মহতী সভা হল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পড়ে আমায় সেই সভায় দাঁড়িয়ে একঘণ্টা ধরে আনন্দের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। আনন্দস্মৃতি-সমিতি হল, আনন্দধনভাণ্ডার খোলা হল। ভাণ্ডার-রক্ষকটি মাসকয়েক হল টাকা-কড়ি মেরে দিয়ে ফেরার হয়েছেন।

এখনও এই আনন্দস্বামীর নামে মঠ চলেছে, দেশ-বিদেশে এই মঠের শাখা পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। দলে দলে রোগী তার সমাধির পাশে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। তারা ওষুধও পায়, শুনেছি তাতে রোগও সারে।

বিলাসের গল্পের পর আমাদের সেদিনকার মতন আড্ডা ভাঙল। পর দিন ভৈরব এসে বল্লে—সে ত্রিকূট মঠে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছে।

আঁধিয়া

আমার এই দুঃখের কাহিনী কাউকে শোনাব বলে' যে লিখতে বসেছি তা নয়। আমার মনের কথা মুখ-ফুটে বলতে না পেরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দুঃখের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দুঃখ যে দূর হয় না, তা সবাই জানে। কিন্তু তবু চুপ করে থাকতে পারে না। আমার কাছে যে কেউ নেই। কাকে বলি? তাই আপনার মনে নিজের কাহিনী লিখতে বসেছি।

মনে পড়ে সেইদিন, যেদিন উৎসবের একটা ঝট্‌কা বাতাস নিয়ে শ্বশুরবাড়ি প্রবেশ করেছিলুম, শাঁক, ঢাক, শানাইয়ের আওয়াজ আর চেঁচামেচির মধ্যে আমাকে বরণ করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমায় ঘরে তুলে নিলে। আমাকে দেখে আমার শাশুড়ীর পছন্দ হল, তিনি বল্‌লেন, বেশ বৌ হয়েছে—চির এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক।

আমার স্বামী আমার বিবাহে একটি পয়সাও নেননি ; আর একটি পয়সাও না নেবার মতন লোক এতদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি বলেই যোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে থুবড়ো আইবুড়ী থাকতে হয়েছিল।

আমার নাম সুরবালা ; বাবা আমায় সুরো বলে ডাকতেন। আমি তাঁর বড় আদুরে মেয়ে ছিলুম। বাপের বাড়ি বাবার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়েছে, —এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার শ্বশুরবাড়ী বল্‌তে কিছু আছে কি না?

ছেলেবেলাতেই মা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে পড়ে না, বাবা একলাই দুজনের স্থান অধিকার করে আমায় মানুষ করছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী করিতেন ; কখনো এখানে, কখনো সেখানে—এমনি করে, তাঁকে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে হত। আমাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারতেন না। তাঁকে ছেড়েও আমি থাকতে পারতুম না। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমাকেও ঘুরতে হত। চাকরী করা ছাড়া তাঁর একমাত্র কাজ ছিল আমায় লেখাপড়া শেখানো আর টাকা জমানো। তিনি বলতেন, "সুরো, তোর এমন জায়গায় বিয়ে দেবো যে—"

বাবার সদা-সহাস্য মুখের সেই কথাগুলো আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে আর হাসি আসে।

জীবনের ধারা এইরকম শুভ্র, স্বচ্ছ, তরঙ্গহীন গতিতে বেশ একটানা বয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘটনায় বিপরীত তরঙ্গ ছুটল।

একদিন বাবা আফিস থেকে ফিরে আসবার পর, রোজ যেমন যাই তেমনি হাসিমুখে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। দেখলুম তাঁর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ, চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে। আমার হাতদুটো তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি গুমরে কেঁদে উঠে বললেন,—"সুরো আমাদের সর্বনাশ হয়েছে মা—"

জিজ্ঞাসা করে জানলুম, যে-ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকত সেটা ফেল হয়ে গিয়েছে। তাঁর অনেক কষ্টে জমানো টাকাগুলোর একটা পয়সাও পাবার আশা নেই।

তাঁর চোখের জল জীবনে সেই একদিন মাত্র দেখেছি। এর আগে তাঁকে কখন সামান্য বিষণ্ন হতেও দেখিনি। আমি চিরদিন হাসতেই দেখেছি,—খালি হাসি আর হাসি। এই হাসির আবহাওয়াতেই আমি মানুষ হয়ে উঠেছিলুম, চন্দ্রসূর্য্য, রাত্রিদিন, আকাশ-পৃথিবী চিরকালই আমাকে সহাস্য মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়ে এসেছে, দুঃখের সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। সেদিন বাবার চোখে জল দেখে আমার মনে কি ভাব এসেছিল, এত দিন পরে ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে এই ছবিটা এখনো মনে আছে যে, আমি যেন দেখতে লাগলুম তাঁর চোখের জলে আমার সেই হাসির রাজ্যটা ভাসতে ভাসতে দূরে মিলিয়ে গেল;—উপরের নীল আকাশ এমন গাঢ় হয়ে এল যে সে অন্ধকার ভেদ করে কাউকে চিনতে পারবার যো রইল না, আর সেই অনন্ত অশ্রু পারাবারের মধ্যে আমি একা—

ওঃ, মানুষের চোখে এত জলও থাকতে পারে!

সমস্ত রাত্রি ভাবনায় কেটে গেল, সে কত-রকমের ভাবনা! একটা থেকে আর একটা, আবার সেটা শেষ হবার আগেই আর-একটা, এমনি করে যেন একটা চিন্তার পৃথিবী আমার মাথার ভিতর পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপন-হারা হয়ে বসেছিলুম, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই চমকে উঠলুম! মনে হল, সামনে থেকে কে যেন সরে গেল।

তখন বুঝতে পারিনি, সে কে? আজ মনে হয় সর্ব্বনাশের দূত এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল, শুধু বাবার জন্যে সে সাহস করে ঢুকতে পারিনি।

তখনো একেবারে ফরসা হয়নি, মুমূর্ষু রাত্রির প্রাণটা তখনো আলো-ছায়ার একটা সূক্ষ্ম রেখার উপর দোল খাচ্ছে, অবশ পা-দুটোকে কোন-রকমে সোজা করে সে দুটোর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি, সামনে বাবা দাঁড়িয়ে।

তিনি বললেন—সারা রাত্রি জেগে এখানে বসে আছিস মা?

আমি আর কোন কথা বলতে না পেরে তাঁর বুকে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলুম।

তিনিও আমায় জড়িয়ে ধরলেন; একটা কথা কানে গেল—"টাকাগুলো গেল বুঝি! তোর উপায় কিছু করে যেতে পারলুম না।"

কিছুক্ষণ পরে একটা আশীর্ব্বাদী চুমু আমার মাথার উপর দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন বাবা আফিসে গেলেন, বুঝতে পারিনি এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। বিকেলবেলায় আফিসের লোকেরা তাঁকে কোলে করে বাড়ি নিয়ে এল, শুনলুম, তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছে। ডাক্তার ডাকা হল। তিনি বললেন

এ মূর্চ্ছা ভাঙবে না, আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে এইবেলা খবর দিন, বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টার বেশী বাঁচবেন না।

সর্বনাশ এত কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায় অথচ মানুষ তার গন্ধও পায় না।

মামার বাড়িতে আমায় বেশী কষ্টভোগ করতে হয়নি। প্রথমটা একটু কষ্ট মনে হত। তার কারণ কষ্ট কাকে বলে এর আগে একেবারেই জানা ছিল না, আজকের হিসেবের খাতায় সে দিনগুলোর সুখ-দুঃখের জমা-খরচ খতিয়ে দেখলে দেখতে পাই তখন সুখের মাত্রাই বেশী ছিল।

মামা আমার আপনার মামা নন্, মার মাসতুত ভাই। বাবার মৃত্যুর আগে তাঁকে আমি বারকয়েক দেখেছিলুম মাত্র। তাঁর সঙ্গে বাবার পত্র-ব্যবহার চলত। তিনি আমায় নিয়ে এলেন।

তিনি বেশ দিলখোলসা লোক ছিলেন। সামান্য চাকরী করতেন, যা মাইনে পেতেন তাতে কোনরকমে সংসার চলে। তার উপর আমার মত একটা ধাড়া মেয়েকে এ-রকম ভাবে আশ্রয় দিয়ে ঘরে নিয়ে আসাতে মামী আমাকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। কিন্তু ক্রমে সেটাও আমার সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

মামার বাড়ি আসার মাসখানেক পরে প্রায় বছর দুই ধরে আমার জন্যে তাঁদের বড় অশান্তিতে কাটাতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে আমার বিবাহ নিয়ে। টাকা না পেলে কেউ বিয়ে করতে চায় না! মামা মনে করেছিলেন, সুন্দরী মেয়ে টাকা না হলেও চলবে, কিন্তু সুন্দরী মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর অর্থের জোগাড় করতে না পারলে যে পাত্রের অভিভাবকের মন টলে না, এই অভিজ্ঞতাটা তাঁর আমার উপর দিয়েই হয়ে গিয়েছিল।

মামীর তাড়না আর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও তাঁকে একটা কটু কথা বলতে শুনিনি। ধন্য তার ধৈর্য! পরের মেয়ের জন্য এতটা সহ্য করতে পারে, এ রকম লোকও দুর্লভ নয়।

তারপর সেইদিন সত্যি সত্যিই এল। শুনলুম, আমাকে দেখে একজন পছন্দ করেছেন। তিনি এক পয়সাও চান না, তাঁর অবস্থা ভাল, হাতে শুধু দুগাছা রুলি পরিয়ে নিয়ে যাবেন।

যখন এই খবর পেলুম, শুনলুম তিনি এক পয়সাও নেবেন না, শুধু আমাকেই চান, তার দামটা আমার এই নিঃস্ব মামা বেচারাকে দিতে হবে না, কৃতজ্ঞতায় প্রাণটা তখন কানায় কানায় ভরে উঠল। মনে মনে তাঁকে প্রণতি জানিয়ে বললুম—কে তুমি শুকতারার মত আমার দুঃখের রাত্রিতে এসে দেখা দিলে? তোমায় চিনিনা আমি, কিন্তু তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছি। হে দেবতা, আমায় নিয়ে যাও তুমি তোমার মন্দিরে, বড় দুঃখী আমি, ভালবাসার কাঙাল আমি আমায় ভালোবাসো।

আনন্দের আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লুম। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, তন্দ্রা,

নিদ্রার মধ্য দিয়ে কেমন করে কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। সকালে উঠে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে সংসারের কাজে লেগে গেলুম।

স্বামীকে দেখলুম। তিনি পরম রূপবান না হলেও সুশ্রী বটে। ফুলশয্যার দিন তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা হল। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে কথা, সে— যাক্ সেদিনকার কথা আর তুলব না।

শ্বশুরবাড়ি যখন এলুম, তখন প্রকৃতির বীণায় বসন্ত-রাগিণীর পুরোদমে মহড়া চলেছে! গাছে গাছে, ফুলে ফুলে, পাখির ডাকে বাইরে যেমন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল, বাড়িখানাও তেমনি নাচ-গান, খাওয়া দাওয়ার রোলে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

ঘর আর বাহির দুইয়ে মিলে আমায় অভিষেক করে সেবারকার বসন্তের রাণী বলে ঘরে তুলে নিলে।

শ্বশুরবাড়িতে আমার পদার্পণের পর বাড়ির চেহারা ফিরে গেল। আমার শাশুড়ী অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন; শুনলুম বিধবা হওয়ার পর তাঁর মুখে কেউ হাসি দেখেনি, আমি বাড়ি আসার পর তাঁকে সবাই হাসতে দেখলে।

আমার স্বামী সদা-প্রফুল্ল লোক। আনন্দের আস্বাদন আমি জীবনে এই প্রথম যে পেলুম তা নয়, কিন্তু এ যেন নতুন রকম! সামান্য সামান্য ঘটনা আমার প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের ঝড় তুলে দিয়ে যেত। বাতাস লাগলে আমার পা থেকে মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়াগুলো অবধি শিউরে উঠত। ফুলে এত রংয়েরবাহার, এতদিন ত লক্ষ্য করিনি। দীঘির জল এমন টলটলে জীবনে এর আগে ত তা দেখিনি। সন্ধ্যায় দিগন্তের ধার ঘেঁষে দিনের তরী সোনালী পাল উড়িয়ে অস্ত-অচলের উদ্দেশে চলে যেত, শুক্ল চতুর্দশীর নিটোল গোল চাঁদখানা আমাদের কালো আয়নার মত দীঘিটার বুকের উপর পড়ে নির্জনে নীরব প্রেমালাপ আরম্ভ করত, আমি আত্মহারা হয়ে দেখতুম, আর মনে হত ঠিক এমনধারা ত এর আগে কখনও দেখিনি!

আনন্দের প্রবাহ আমার মধ্যেই যে শুধু প্রবাহিত হচ্ছিল, তা নয়, দেখলুম আমাকে ছাড়িয়ে সেটা গ্রামময় তার রঙিন নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে।

বিকেলবেলায় আমি গা ধুয়ে ছাদের উপর অনেকক্ষণ বেড়াতুম। একদিন দেখি সামনের বাড়ির একটা ছেলে আমাকে দেখছে। একটু লক্ষ্য করে বুঝলুম আমি যেন তাকে না দেখতে পাই এমনিভাবে একটা জানালার আড়ালে সে দাঁড়িয়েছে। সেই ম্যালেরিয়া-জীর্ণ চেহারাটা দেখে আমার মায়া হতে লাগল। সে কতদিন যে স্নান করেনি তার ঠিকানা নেই; হাঁ করে তন্ময় হয়ে আমাকে দেখছিল। দুই একদিন বাদে দেখলুম ছেলেটা স্নান করতে শুরু করেছে। আবার কিছুদিন পরে সেও আমার মত ছাদে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে। তার সেই শুয়োর-কুচি চুলে বেশ তেল দিয়ে টেরি বাগানো আর গুন-গুন করে গান গেয়ে ছাদে বেড়ানো দেখে আমার হাসি পেত।

বাড়ির পিছনদিকে আর-একজনেরা থাকত। সে-বাড়িরও একটা ছেলে

হঠাৎ সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করলে। বাপ রে বাপ, সুর সাধনা মনে পড়লে আজও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! দিনরাত্রি জানালার ধারে বসে হারমোনিয়ামে গলা ভাঁজা। নিশ্চয়ই বলতে পারি, যদি তার সাধনা সেই রকম ভাবে চলে থাকে তবে এত দিনে নিশ্চয় সে একজন গুরুগম্ভীর ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

রাস্তার ধারে একটা জানালা ছিল, আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতুম। কিছুদিন যেতে না যেতে দেখি পাড়ার লোকগুলো জানালা-মুখী ব্রত নিলে। এমন তাদের তন্ময়তা যে একদিন সত্যিই একটা লোক গাড়ি চাপা পড়ে প্রাণটা হারাবার যো করেছিল। কিন্তু তবুও বিরাম নেই। উঃ, কি গভীর সাধনা!

কেউ কেউ বেশী সাহসী হয়ে মাঝে মাঝে জানালার ধারে এসে শিষও দিত। প্রথম প্রথম এদের ব্যাপার দেখে আমার বেশ মজা লাগত, কিন্তু ক্রমেই সেটা অসহ্য হয়ে উঠল। একদিকে সেই কদাকার চেহারাটার দিনরাত উঁকি-ঝুঁকি, পিছনদিকে সুর-সাধনার সেই বিকট-চীৎকার, আর সামনে রাস্তার ধারে জানালার কাছে লোকের ভিড় দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। ক্রমেই তারা বেশী সাহসী হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইচ্ছে হত বাইরে গিয়ে সব কটাকে ধরে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার উপায় নেই, আমি যে কুলবধূ!

ঘরের চারদিকের জানালাগুলো আমি দিনকয়েক বন্ধ করে রেখে দিলুম। একদিন আমার স্বামী বললেন, জানালাগুলো বন্ধ রেখে কি দম আটকে মরবে!

জানালা বন্ধ করার কারণ শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই হাসিতে আমি থতমত খেয়ে কিছু বলতে পারলুম না। তিনি নিজের হাতে জানালাগুলো খুলে দিয়ে, আমায় একটা জানালার ধারে বসিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

আমাদের কয়েক ঘর শরিক ছিল, কিন্তু বিনোদ ছাড়া আর-কারো সঙ্গে আমার স্বামীর তেমন বনিবনাও ছিল না। সে সম্পর্কে তাঁর ভাই। বয়স দুজনের প্রায় সমান। বিনোদ যখন-তখন আমাদের বাড়ি আসত। বৌভাতের দিন থেকেই সে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগল। আমি তার সামনে প্রথমে ঘোমটা খুলতুম না। সে একদিন আমার স্বামীকে বল্লে—"দাদা, বৌদি যদি অমন করে মুখ ঢেকে থাকেন, তাহলে আমি তোমার ঘরে আর আসছি না।" স্বামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে ঘোমটা খুলতে বললেন। আমি তার ইচ্ছায় ঘোমটা খুললুম, কিন্তু বিনোদের চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগল না। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ঘোমটাটা টেনে দিই কিন্তু তাহলে স্বামীর মান থাকে না, তাই ঘোমটা খুলেই রইলুম। বিনোদকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, স্বামীর পাশে সে যেন একটা কীটাণুকীট!

কিন্তু কি আশ্চর্য, যাকে সংসারে তুচ্ছ বলে জানলুম, সেই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু হল।

স্বামীর অজ্ঞাতেই বিনোদের সঙ্গে আমি কথা বলতেও শুরু করলুম। কথা আমি কইতুম না, কিন্তু দেখলুম তা না হলে স্বামীর আঁতে ঘা লাগে। আমাদের বাড়ির কেউ বিনোদকে ভাল চোখে দেখত না, সবাই সন্দেহ করত যে আমার স্বামীটিকে কোনদিন বা সে অধঃপাতে টেনে নিয়ে যায়। সেই জন্য সবাই তাকে ভয় করত, ঘৃণাও করত। আমাদের বাড়িতে তার এই অনাদরের জন্য স্বামীর মনে ভারী একটা ক্ষোভ ছিল। আমিও যদি তাঁর বিনোদকে অবহেলা করতে শুরু করি তবে সেটা তাঁর বুকে খুবই বাজবে, আমি বুঝলুম। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বিনোদের উপর তোমার এত দরদ কেন ? ও কি তোমার যোগ্য ?" স্বামী বললেন—"দেখ সুরো, ও লক্ষীছাড়া আমি জানি। কিন্তু ও যে আমার আশ্রয় নিয়েছে। ও বলে, ওর স্বভাবের জন্যে সবাই ওকে ত্যাগ করেছে, এখন আমিও যদি ত্যাগ করি তাহলে ও অধঃপাতের অতলে একেবারে তলিয়ে যাবে। ওর বিশ্বাস, আমাকে অবলম্বন করেই ও ওঠে দাঁড়াবে।

আমার স্বামীর এই দয়া দেখে আমার সমস্ত হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল। আমার মনে হল আমার এমন স্বামী—তাঁর কাজে আমি প্রতিবন্ধক হব ?

বিনোদের সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা আমার শাশুড়ীর চোখে ভাল ঠেকেনি। তিনি মধ্যে মধ্যে রাগ করে বকতে লাগলেন। শাশুড়ীকে অমান্য করবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিতেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠত বিনোদকে নিয়ে আমি মুশকিলে পড়লুম।

এ ছাড়া আরও মুশকিল ছিল এই যে বিনোদের হাবভাব মোটেই ভাল লাগত না। তাকে দেখলে মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা ঘিনঘিনে ভাব আমাকে পীড়া দিত। ঠাট্টার সম্পর্ক বলে সে সময়ে সময়ে যে রকম ঠাট্টা করত তাতে তার মুখ-দর্শন করা উচিত ছিল না, এবং তার এমন একটা গায়ে-পড়া স্বভাব ছিল যার জন্য তার কাছ থেকে চলে যাবার জন্য মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ভাবলুম স্বামীকে সব খুলে বলি। মনে মনে কথাটা নিয়ে তোলাপাড়া করতুম, তারপর সাজিয়ে গুজিয়ে কথাটা যা দাঁড় করাতুম তা মনের মধ্যে আবৃত্ত করে এমন শোনাত যে স্বামীর সামনে তা বলতে পারতুম না। তিনি কি এসব বুঝতেন না ? কে জানে ? হয়ত পুরুষ মানুষ বলে' আমাদের এই নারীবৃত্তিগুলো অনুভব করার শক্তি তাঁর ছিলনা। আমি তাঁকে একদিন বললুম—"দেখ, বিনোদ একটু বাড়াবাড়ি করচে না ?" স্বামী আমার কথাটা বুঝলেন কি না জানি না, তিনি সহজভাবে বলিলেন—"দেখ সুরো, বিনোদ বাড়াবাড়ি করে করবে কি ? তুমি যদি খাঁটি হও তাহলে দুনিয়ায় ভয় কাকে ? তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কাজেই বিনোদের চেয়ে সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে আমি ডরাই না।"

স্বামীর এই কথায় আমার মনের সমস্ত কুয়াশাটা যেন এক মুহূর্তে কেটে গেল। নিজের মধ্যে একটা শক্তির চেতনা অনুভব করতে লাগলুম। সত্যিই ত আমি যদি খাঁটি হই ত ভয় কাকে! তারপর, আমার উপর স্বামীর

প্রগাঢ় বিশ্বাস ! আত্ম-অভিমানে আমার সমস্ত হৃদয় ফুলে উঠল, আমি মনে মনে প্রার্থনা করলুম—হে ভগবান, স্বামীর এই বিশ্বাস যেন চিরদিন অটুট রেখে মরতে পারি, আমাকে এই বর দাও।

আমার স্বামী তখন বাড়ি ছিলেন না, জমিদারীর কাজে তাঁকে বিদেশে যেতে হয়েছিল। তাঁকে বছরের মধ্যে বার দুই এমনি করে বাইরে যেতে হত। হাতে কোন কাজ নেই, তিনি বাড়ি নেই, তাই ঘরে যাবারও তাড়া নেই। রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে ছাদের উপর একটু বেড়াতে গেলুম।

সেদিন চাঁদ তার ফিরোজা রঙে ঘোমটাখানা দূরে ফেলে দিয়ে মনের আনন্দে তার সমস্ত বিবরণ কণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পৃথিবী তারই পেলবাম্পর্শ আরামে অবশ হয়ে উপভোগ করছিল। বাগানে বড় বড় গাছ আর কামিনী ফুলের ঝাড়গুলো পাতায় রূপালী দেয়ালী সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেইগুলোর পাশে পাশে মোটাসোটা নানান আকারের এক-একটা অন্ধকার দৈত্য উপুড় হয়ে বসে আছে—এক-একটা রাজ্যহীন রাজার মত।

চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, কোথাও একটু আওয়াজ নেই, আমি তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের এই খেলা উপভোগ করতে লাগলুম।

হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া কোথা থেকে দৌড়ে এসে আধ ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথাটা ধরে বেশ জোরে একটা নাড়া দিয়ে তাকে সজাগ করে তুলে পালিয়ে গেল। বড় বড় গাছগুলো মাথা নাড়া দিয়ে তাদের মরমর ভাষায় একবার একটা আর্তনাদ করে উঠল। মনে হল তাদের পাতার রূপোর প্রদীপগুলো মাটির উপর গিয়ে পড়ল, ঝোপ ঝাড়ের পাশে পাশে যে বিকট আকার দৈত্যগুলো এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল তার ইঙ্গিতে সেগুলো তাড়াতাড়ি উঠে একবার এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে আবার একজায়গায় স্থির হয়ে গিয়ে বসে পড়ল। রাত্রির সে নিস্তব্ধ ভাবটা আর ফিরে এল না। হঠাৎ এই রকমভাবে তার শান্তি ভঙ্গ হওয়াতে সে আর স্থির হতে পারলে না। আমি এতক্ষণ আনন্দে যে দৃশ্য দেখছিলুম তার পট পরিবর্তন হওয়াতে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, নীচে নেমে এলুম।

শোবার ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানার কাছে দেখি খাটের উপর মনুষ্যমূর্ত্তি ! ঘরের মধ্যে মিট্ মিট্ করে প্রদীপ জ্বলছিল। আমি ভয়ে এমন কাঠ হয়ে গেলুম যেন মাটির সঙ্গে আমার পা দুটো একেবারে গেঁথে গেল ! আমার শোবার ঘরে স্বামীর লোহার সিন্দুক থাকত, তাতে জমিদারী থেকে টাকা এলে জমা হত। তিনি এবার জমিদারী থেকে যত টাকা পাঠাচ্ছিলেন আমি গুণেগেঁথে তার মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলুম। তিনি ফিরে এলে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার সর্বপ্রথম নজর পড়ল সেই লোহার সিন্দুকের দিকে। দেখলুম, সেটার গায়ে এখনো হাত পড়েনি। এখনো সময় আছে ভেবে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চোর-চোর বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। লোকটা ছুটে এসে দরজা চেপে দাঁড়াল। তার মুখ দেখতে পেলুম—সে বিনোদ !

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তাকে বললুম, "তোমার দাদা ত এখানে নেই —তুমি এত রাত্রে কেন ?" বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"তোমার কাছে এসেছি।" আমি রেগে বললুম—"যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" সে এমন একটা কথা বললে যাতে আমার সর্বশরীর জ্বলে উঠল। আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম—"পথ ছাড়, আমি বেরিরে যাই।"

বিনোদ দরজার গায়ে সজোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে পদাঘাতে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সেই অন্ধকার তার চোখদুটো হিংস্র পশুর চোখের মত এমন ভয়ঙ্কর জ্বলছিল যে তার কাছে যেতে ভয় করতে লাগল। আপি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে যতই দেখতে লাগলুম ততই একটা আতঙ্ক আমার সর্বশরীর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাঘের সামনে পড়লে মানুষের কেমন ভয় হয় জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ ভয় যেন সেই রকমের! প্রাণ সংশয় হলে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের মন যেমন ধারা হোক একটা অস্ত্রের জন্যে যেমন লোলুপ হয়ে ওঠে, আমিও অন্তর থেকে তেমনি একটা তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠলুম। দেয়ালে স্বামীর অনেকগুলো ছোরা-ছুরি টাঙানো ছিলো। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়াতে আমি একখানা বড় ছোরা টেনে নিলুম।

ছোরা খানা হাতে পেয়ে মনে হল, একা বিপদের মধ্যে, যেন হঠাৎ আত্মীয় বন্ধুর দেখা পেলুম—মনটা একটু আশ্বস্ত হল।

আমি এবার খুব জোরের সঙ্গে বললুম—"যাও ঘর থেকে বেরিয়ে।"

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"এরি মধ্যে যাব কি ?"

আমি রেগে ছোরাখানা হাতে করে দাঁড়ালুম। তবু তার ভয় হল না, সে বললে—"জীবনে অমন ছোরা হাতে মেয়েমানুষ ঢের দেখেছি।"

আমার ইচ্ছে হল এখুনি ওর গায়ে ছোরাটা বসিয়ে দিই। কিন্তু হাত উঠল না। সে বোধ হয় আমার দুর্বলতা বুঝতে পারলে। ধীরে ধীরে সে হাত দুখানা বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার সেই বিশ্রী ভঙ্গী দেখে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যে কেমনধারা একটা ঝড় উঠল বলতে পারি না। আমার মনে হল এই ঝড়ে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা প্রলয় হয়ে গেল। তারপর আমি কি করলুম, কি না-করলুম কিছুই মনে নাই। কেবল মনে আছে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে আমার হাত-পা মাথা চোখ সব ঘুরছে।...

সকালে যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, বিনোদের দেহের রক্তের উপর আমি পড়ে আছি।

হাজতে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এল না। মনে করেছিলুম, আমার স্বামী বোধ হয় ঠিক সময়ে ফিরতে পারেননি, কিন্তু পরে জানলুম, তিনি এসেও আমার জামিনের জন্য চেষ্টা করেননি।

বিচারে আমি বেকসুর খালাস পেলুম।

তখন শীত পড়েছে, বেলা ছোট। আদালত ভাঙবার পরেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম, সদর দরজা

দিয়ে ঢুকতে কি জানি কেন, সাহস হল না, বাগানে খিড়কী দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লুম। তখন অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় একটা ছোট কেরোসিনের আলো জ্বলছিল। ঝীর নাম ধরে ডাকলুম, কারো সাড়া পেলুম না। বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। আরও দুই-তিনবার ডাকাডাকির পর ঝী ঘর থেকে বেরিয়ে এল, শুনলুম বাড়ীতে কেউ নাই, আমার শাশুড়ী তাঁর বাপের বাড়ী চলে গেছেন। স্বামীও নিরুদ্দেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন ?"

সে বল্লে "লোকনিন্দের ভয়ে। তুমি যে কাণ্ড করেচ তাতে কি আর দাদাবাবুর মুখ দেখবার যো আছে ! চারিদিকে একেবারে ছি ছি !"

আমি ঝীর কথা কানে তুললুম না। আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু সে ঝী, তাকে কি বলব ? তার টিট্‌কারি আমি গ্রাহ্য করলুম না। কারণ আমার মন এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও একটি আশার প্রদীপকে তখনো জ্বালিয়ে রেখেছিল। "আমি যদি খাঁটি থাকি তবে ভয় কিসের !"—স্বামীর সেই মন্ত্র, শুধু তখন কেন,—এ জীবনেই যে ভুলতে পারিনি। ভগবানের কাছে যে-বর চেয়েছিলুম তা ত তিনি পূর্ণ করেছেন—স্বামীর বিশ্বাসের উপর ত এতটুকু আঁচ লাগতে দিইনি ! তবে আমার ভয় কিসের ?

আমি জোর করে বললুম—"আমার দরজা খুলে দে !"

দাসী বললে—"ঘরের চাবি ত আমার কাছে নেই।"

আমি বললুম—"তবে আমি থাকি কোথায় ?"

দাসী বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বললে—"থাকতে যদি চাও তবে বাগানের মধ্যে আমার এই খোড়ো ঘরটাতে থাক।'

আমি তখনকার মত সেই ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু আমার স্বামী গেলেন কোথা ? দিনের পর দিন যায় তাঁর দেখা পাই না কেন ? তাঁকে না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণ যে আকুল হয়ে উঠল। বাগানে বসে-বসে ঐ শূন্য বাড়ীখানার দিকে চেয়ে কত কথাই ভাবতুম। ঐ ঘর শূন্য করলে কে ? কতবার এ প্রশ্ন মনে উঠেছে। কিন্তু এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি।

এই বিজন-বাসে কারো দেখা পেতুম না, কেউ আমার কাছে আসত না, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু স্বামীর দেখা পাচ্ছি না এ যে অসহ্য বেদনা ! আমি কেবল তাঁরই প্রতীক্ষা করতুম। কেবলি মনে হত—কেন তিনি আসচেন না ?—কেন আসচেন না।

তারপর শীতের শেষ দিনগুলো বসন্তের গায়ে ঢলে পড়ল। প্রকৃতির মহলে মহলে একটা প্রকাণ্ড উৎসবের আয়োজন পড়ে গেল। চারিদিকেই আনন্দ, কেবল দাখণের বাতাস আমাদের বন্ধ বাড়ীখানার কাছে এসে গুমরে উঠত।

এমনি একটা দিনে দেখলুম আমার ঘরের জানালা খোলা হয়েছে। আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না। বাড়ীর ভিতরে যাবার খিড়কীর কাছে ছুটে গেলুম। আশ্চর্য, সেখানে ত দরজা নেই। ভুল হয়েছে ভেবে

মনের আবেগে পাঁচিলটা আঁচড়াতে লাগলুম। কিন্তু কোথাও দরজা পেলুম না। আমার অলক্ষ্যে সেখানে কবে যে পাঁচিল গাঁথা হয়ে গিয়েছে আমি কিছুই জানি না! আমি ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওখানে পাঁচিল গাঁথা হল কেন?"

সে বলল—"জানি না।"

আমি বললুম—"শীগ্‌গির যা, খবর নিয়ে আয়। আমি বাড়ি ঢুকবো কেমন করে?"

ঝি চলে গেল। আমি বসে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। মনে হল এতদিনে আমার বিরহের অবসান হল। আজ স্বামীর পায়ে একটি প্রণাম দিয়ে তার ধুলো নিয়ে কয়েদখানার সংস্পর্শে আমার এই অশুচি দেহকে পবিত্র করে নেব। এই সব ভাবছি এমন সময় ঝি স্বামীর হাতের ছোট্ট একখানি চিঠি নিয়ে এসে দিলে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানা হাতে তুলে নিলুম। তাতে এইটুকু লেখা ছিল—

—"আমি তোমায় ত্যাগ করিনি, কিন্তু সমাজ নরহত্যার পাতকীকে গ্রহণ করতে নারাজ। কি করব!"

কি করব!—এই সামান্য একটা কথা যেন বজ্রাঘাতের মত আমার মাথায় এসে পড়ল। আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

স্বামী কেবলমাত্র বলেছেন—কি করব! তার আর কিছুই বলবার নেই? আমাকে বলবার তার সব কথা হঠাৎ এমনি করেই ফুরিয়ে গেল? ওগো আমার দেবতা, তুমি যে মন্ত্র আমায় দিয়েছিলে তার অপমান তো আমি করিনি, তবে তুমি কেন বলেছ, কি করব? তুমি কিনা করতে পার?

তুমি তো আমার মত অবলা নও—তবে কেন অমন হতাশ হয়ে বল্লে, কি করব? কি করব? ওগো আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি যা করবে, সে তো তোমারই হাতে। কিন্তু আমি যে তোমা ছাড়া জানিনা—তুমি বলে দাও আমি কি করব? আমার মন যে নিরুপায় হয়ে কেবল এই কান্নাই কাঁদচে—ওগো আমি কি করি? কি করি?

স্বর্গের চাবি

প্রায় পাঁচ বছর পরে আবার একদিন আমাদের আড্ডাঘরের দরজা-জানলা খোলা হ'ল। এতদিন পরে সহসা এই দ্বারোদ্ঘাটনের ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে।

বছর পাঁচেক আগে এক ঘোরতর বর্ষার সন্ধ্যায় আমরা আড্ডায় এসে দেখি যে, ঘরখানা অন্য লোকে দখল ক'রে ব'সে আছে। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে, ঘরের মালিক অতুলচন্দ্র ঘরখানা এক দোকানদারকে ভাড়া দিয়ে কোথায় স'রে পড়েছে। সেদিন হঠাৎ সেই ভাবে আড্ডাহীন হয়ে আমাদের আট জোড়া নাসারন্ধ্র দিয়ে যে দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হয়েছিল, তার ঝাপটে মাস কয়েকের মধ্যেই দোকানদার মশায় গিয়ে পড়লেন একেবারে প্রেসিডেন্সি জেলের দেওয়ালের ওপাশে, আর অতুল—অতুল যে কোথায় গেল তার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না।

দিন কয়েক আগে আড্ডার অন্যতম স্ফটিকস্তম্ভ নলিনীর মৃত্যু হওয়ায় রাত-দুপুরে শ্মশানে যাবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে কোথা থেকে অতুল এসে হাজির। পরদিন থেকে আবার নিয়মিতরূপে আড্ডার দরজা খোলা হতে লাগল।

সেদিন আলোচনা হচ্ছিল, নলিনী স্বর্গে গেছে, কি নরকে গেছে?

নরেন বললে, নলিনী কিন্তু স্বর্গ অথবা নরক কিছুই মানত না।

শচীন ব'লে উঠল, কে বললে এ কথা? নলিনী স্বর্গও মানত, নরকও মানত। আর সে যে স্বর্গে গিয়েছে, এ কথা আমি লিখে দিতে পারি।

নরেন বললে, কিসে?

শচীন হাসতে হাসতে বললে, আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।

কি প্রমাণ শুনি?

শচীন বললে, বছর দশেক ডাক্তারি করার পর তখন রোজই স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ চলছে, ঘোড়ার দালালি জিনিসটা মন্দ নয়। এমন সময় পশ্চিম থেকে হঠাৎ একটা হাওয়া এল মহাকালের নিশান উড়িয়ে। ছুটি নেবার আগে আপিসের কেরানীবাবুরা যেমন যেন তেন প্রকারে পুরনো ফেলে-রাখা কাজ মিটিয়ে ফেলে, চিত্রগুপ্তও যেন সেই রকমে যেন তেন প্রকারে কাজ মিটিয়ে ফেলতে আরম্ভ করলেন।

ঘোড়ার দালালিটা তখনকার মতন চাপা দিয়ে মহা উৎসাহে ডাক্তারিতেই মন দেওয়া গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি 'কলের' আর বিরাম নেই। বড় বড় চিকিৎসকদের চিকিৎসার ফল আর আমার চিকিৎসার ফল হুবহু মিলে যেতে লাগল। বলব কি, দশ বৎসর প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তখনও আমি 'বদ্যি' হতে পারি নি, কিন্তু সেই দু মাসেই শুধু 'চিকিৎসক' নয়, একজন বড় চিকিৎসক হয়ে দাঁড়ালুম।

প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি রুগী মেরে মেরে যখন দস্তুরমত খুনে চেপে গিয়েছে, সেই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা খেটে-খুটে বাড়ি ফেরামাত্র ছেলে খবর দিলে, নলিনীকাকার বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে।

দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, আবার গিয়ে উঠলুম।

নলিনীর ওখানে গিয়ে দেখি যে, সে দু হাতে পেট টিপে ধ'রে কাতরাচ্ছে আর এপাশ-ওপাশ করছে। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বললে, যকৃতানন্দ ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, কদিন হয়েছে ?

নলিনী গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বললে, দিন দুই থেকে ব্যথাটা উঠেছে। আজ একেবারে অসহ্য হওয়ায় তোমায় খবর পাঠিয়েছিলুম। ঘুষঘুষে জ্বরও একটু আছে, গা-বমি-বমিও করছে···সমারোহের কোন ত্রুটিই নেই।

রোগের বিবরণ শুনে দ'মে গেলুম। বছর তিনেক আগে লিভার পেকে একবার সে যায়-যায় হয়েছিল, নেহাত পরমায়ু ছিল ব'লে বেঁচে গিয়েছিল। হতভাগা আবার সেই ব্যামো বাধিয়ে বসল !

চুপ ক'রে আছি দেখে সে হাঁপাতেহাঁপাতে বললে, কি দাদা, কি রকম বুঝছ ?

বললুম, যা বুঝছি সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। দেখি পেটটা।

পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, লিভারটা বেশ টসটসে হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, আবার শুরু হয়েছে বুঝি ?

নলিনী বললে, ওই শুরুই তো করেছি বন্ধু, শেষ করবার আর অবসর প্যাচ্ছি কই ?

পেটটা আর একবার পরীক্ষা ক'রে বললুম, দেখ, আমার মনে হচ্ছে, একবার জুবার্ট সাহেবকে এনে দেখানো উচিত।

নলিনী বললে, যা করবার ভাই তুমি কর, ও আর আমি কি বলব ?

পরের দিন জুবার্ট সাহেবকে ডেকে আনা হ'ল। তিনি আধ ঘণ্টা পেট পরীক্ষা ক'রে রায় দিলেন, অস্ত্রোপচার অনিবার্য।

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, রুগীর অবস্থা কি রকম দেখলেন ?

তিনি বললেন, বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অস্ত্র করলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে, তবে না বাঁচারই সম্ভাবনা বেশি।

কেস হাতে নিয়ে আমি পড়লুম মহা মুশকিলে। নলিনী আমার বাল্যবন্ধু। কাছাকাছি বাড়ি ব'লে ছেলেবেলা থেকেই তাদের বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা। সংসারে এখন তার কেউ নেই, একমাত্র বড়মানুষ বিধবা পিসী ছাড়া। ছেলেবেলা মা ম'রে যাওয়ায় এই পিসীর হাতেই সে মানুষ হয়েছে। নলিনীর এই অবস্থার কথা আমি এখন বলি কাকে ? পিসীমাকে বললে তো তিনি কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধাবেন। অথচ দু-এক দিনের মধ্যে অস্ত্র না করলে তখন অস্ত্র করা আর না করা সমান হবে।

অনেক ভেবে চিন্তে সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় পিসীমাকে নলিনীর অবস্থা খুলে বলা গেল !

কান্নাকাটির পালা শেষ ক'রে তিনি আমাকে বললেন, তবে বাবা, তুমি একবার ওর মামাকে খবর দাও। আমি মেয়েমানুষ, আমি আর কি করব? কতদিন ওকে বলেছি, ওই যাচ্ছেতাই জিনিসগুলো খাস নি, এখন দেখ, হতভাগা কি ক'রে বসে!

নলিনীর মামার কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। তাঁর নাম রাধারমণবাবু, তিনি ব্রাহ্ম। শুধু ব্রাহ্ম নন, তিনি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ লোক ছিলেন। ভাগ্নেরা যে মামার পন্থা অনুসরণ করে—নলিনী তার জীবনে এ প্রবাদ-বাক্য প্রতি পদে ব্যর্থ করেছিল।

রাধারমণবাবুকে নলিনীর অবস্থা জানাতে বড় সঙ্কোচ হতে লাগল। কিন্তু তখন আর সঙ্কোচের সময় ছিল না, তাঁকে গিয়ে সব কথা খুলে জানাতে হ'ল।

নলিনীর অবস্থা শুনে রাধারমণবাবু একেবারে চমকে উঠলেন। তাঁর ভাগ্নে যে যাচ্ছেতাই সব জিনিস খায়, আর এমন খায় যে তার ধমকে লিভার পর্যন্ত পেকে ওঠে, এ কথা তিনি বিশ্বাসই করতে চান না। শেষকালে সমস্ত শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, নলিনীকে তার অবস্থার কথা জানানো হয়েছে?

আমি বললুম, না, সেটা ঠিক জানানো হয় নি, তবে কাল অস্ত্র হবে সে কথা সে জানে।

রাধারমণবাবু বললেন, নলিনীকে তার অবস্থাটা জানানো দরকার। কি বল তুমি?

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দরকার বইকি। আজ সন্ধ্যেবেলা আমি তার ওখানে যাব।

রাধারমণবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তখুনি ভাগ্নেকে দেখতে ছুটলেন। আমি ছুটলুম জুবার্ট সাহেবের কাছে, কালকের ব্যবস্থা করতে।

সন্ধ্যেবেলা নলিনীর ঘরে গিয়ে দেখি যে, ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরখানা প্রায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলছে, মেঝেতে একখানা কার্পেট পাতা হয়েছে। তার মাঝে একটা জলচৌকি, তার ওপরে খানকতক বই।

নলিনীকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি হে? এসব আয়োজন কিসের?

নলিনী বললে, এসব মামার কাণ্ড। মামা কি ক'রে টের পেয়েছেন যে, অনেক পাপের ফলে আমার এই ব্যারামটি হয়েছে। ওদিকে কাল যে আমার নিশ্চিত অপমৃত্যু হবে, সে সংবাদটিও কে তাঁকে দিয়ে এসেছে। মৃত্যুর পরে ভাগ্নের স্বর্গে যাবার পথটা যাতে পরিষ্কার থাকে, তাই আজ স্বর্গের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে একটু ঘুষ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বলতে বলতে পিসীমা এসে উপস্থিত। তিনি ঠাকুরঘর থেকে কি একটা এনে নলিনীর কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন।

নলিনীর ব্যারামের কথা তার জলচর বন্ধুমহলেও রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। দু চারজন খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সবার শেষে রাধারমণবাবু তাঁর কয়েকটি ধর্মবন্ধু নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

নলিনী পিঠে একটা মোটা তাকিয়া দিয়ে আধ-বসা আধ-শোয়া গোছের হয়ে রইল। একটি গানের পর ব্রহ্মোপাসনা শুরু হ'ল।

একমাত্র ভাগ্নের হঠাৎ এই অবস্থার কথা শুনে রাধারমণবাবু সত্যিই আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি এমন মর্মস্পর্শী প্রার্থনা করলেন যে, প্রার্থনা শেষ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ আমরা কোন কথাই বলতে পারলুম না। কিছুক্ষণ এই রকম নিস্তব্ধতায় কাটবার পর নলিনীই বললে, মামা, পিসীমা, বন্ধুবান্ধবেরা—যারা এখানে উপস্থিত আছ, তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

রাধারমণবাবু উৎসুক হয়ে নলিনীর কাছে এগিয়ে এলেন। নলিনী বললে, দেখ মামা, তোমারা যাকে পাপ-কাজ বল, তা আমি অনেক করেছি। তাতে তোমাদের মতে আমার নিজের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আমি তোমার কখনও কিছু ক্ষতি করেছি? ঠিক বলবে।

রাধারমণবাবু বললেন, এখন আর ওসব কথা কেন?

নলিনী বললে, না না, বল, তোমার কখনও কিছু ক্ষতি করেছি?

না বাবা, আমার কি ক্ষতি তুমি করেছ? কিছুই না।

নলিনী বললে, আচ্ছা, পিসীমা এবার বল। তুমি তো আমায় মানুষ করেছ, তোমার কোন ক্ষতি করেছি কখনও?

পিসীমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুমি তো আমার ভাল ছেলে বাবা, শুধু ওই যাচ্ছেতাইগুলো খেয়ে—

পিসীমাকে থামিয়ে দিয়ে নলিনী আমার দিকে ফিরে বললে, যাক বন্ধুদের প্রতি যদি কোন অন্যায় কখনও ক'রে থাকি, তা হ'লে তোমরা মাপ ক'রো ভাই।

নলিনী এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে যে, উপস্থিত সকলের চোখ ছলছল করতে লাগল। আমি বললুম, নলিনী, এখন কেন ভাই ওসব কথা তুলছ?

রাধারমণবাবুর যে ধর্মবন্ধুটি গান করেছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল পড়তে লাগল।

নলিনী বললে, কথাটা তুলছি, তার কারণ আছে। কাল তো আমার অপারেশন। মৃত্যুর সময় তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সেই অনুরোধটি তোমাদের রাখতে হবে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই, সকলেই জানি যে, তার মৃত্যু অনিবার্য, তবুও মুমূর্ষুর সঙ্গে সে অপ্রীতিকর আলোচনা করতে প্রবৃত্তি কারুরই হচ্ছিল না।

নলিনী বললে, মৃত্যুর পরে আমার দেহটার একটা ব্যবস্থা আমি এখনই ক'রে যেতে চাই।

সঞ্জীব বললে, নলিনী ভাই, মারা যদি যাও, দেহের কি কোন ব্যবস্থা হবে না?

নলিনী বললে, দেহ পুড়িয়ে ফেলবে তো ?

সঞ্জীব বললে, তুমিই যদি গেলে, দেহ আর রেখে কি হবে ?

নলিনী বললে, না, ওইটিতে আমার আপত্তি আছে।

পিসীমা এতক্ষণ রুদ্ধ-নিশ্বাসে নলিনীর কথা শুনছিলেন। দেহ পোড়াতে আপত্তি আছে শুনে তিনি ব'লে উঠলেন, তবে—তবে তুই খ্রীষ্টান হয়েছিস নাকি ?

নলিনী ব'লে উঠল, আঃ পিসীমা, তুমি চুপ কর। আজ বুঝতে পারলুম যে, ভাইপোটাকে তুমি এখনও চিনতে পার নি।

রাধারমণবাবু বললেন, তোমার কি ইচ্ছা প্রকাশ কর, আমরা তাই করব।

নলিনী বললে, আমার মৃত্যুর পর এই দেহটা যেন কোনও তান্ত্রিক শব-সাধকের জিম্মায় দিয়ে আসা হয়।

উপস্থিত সকলে একেবারে স্তম্ভিত। একটি নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত নেই।

সবাইকে সচকিত ক'রে নলিনী আবার শুরু করলে, শব-সাধকেরা শবের বুকের ওপরে ব'সে তার মুখে পাত্রের পর পাত্র কারণ দিয়ে সাধনা করে। আমার দেহ পেলে তার ও আমার উভয়েরই উপকার হবে। আমার মত শব খুব কম সাধকেই পেয়েছে। সাধন-পথে অগ্রসর হবার তার যেমন সুবিধে হবে, তেমনই তার প্রদত্ত কারণবারির গুণে পরকালের পথশ্রান্তি আমার ঘুচে যাবে।

রাধারমণবাবুর একটি ধর্মবন্ধু ব'লে উঠলেন, স্কাউণ্ড্রেল।

কারও মুখে কোনও কথা নেই। মিনিট পাঁচেক নীরবে ব'সে থেকে রাধারমণবাবু একটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। নলিনী চক্ষু বুজে শুয়ে রইল। বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে উঠে গেল। শুধু পিসীমা খাটের একটি কোণ ধ'রে পাষাণ-প্রতিমার মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যা হোক, পরের দিন দুপুরবেলা নলিনীর অঙ্গে অস্ত্রোপচার হ'ল। সাহেব তার বুক পরীক্ষা ক'রে আমাকে গোপনে জানিয়ে গেলেন, সেই দিনই বিপদ হতে পারে।

কাজেই সন্ধ্যা অবধি তার কাছ থেকে নড়তে পারলুম না। নলিনীর দুই মামাতো ভাই—সুরেন আর দ্বিজেন তার সেবা করছিল, তাদের ব'লে এলুম, দরকার মনে হ'লেই আমাকে যেন টেলিফোন করা হয়।

রাত্রে কোন টেলিফোন এল না। সকালবেলা যথাসময়ে তাকে দেখতে গিয়ে দেখি যে, দিব্যি গল্পগুজব করছে। বেশি কথা বলতে বারণ ক'রে এলুম। পরদিন জুবার্ট সাহেব এসে দেখে বললেন, অনেকটা ভাল, তবে এখনও কিছু বলা যায় না।

কিন্তু সবার অনুমান ব্যর্থ ক'রে নলিনী দিন দিন সেরেই উঠতে লাগল।

একটুখানি ঘা আর কিছুতেই শুকোয় না, এই রকম একটা সময়ে একদিন সন্ধেবেলা তাদের বাড়িতে ঢুকেই পিসীমার কান্না শুনে চমকে উঠলুম। সন্তর্পণে বাড়ির মধ্যে ঢুকে শুনলুম, পিসীমা চীৎকার ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, ওরে, তোর বাপ-মা যে যাবার সময় আমার হাতে তোকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল রে—

ভেতরে ঢুকতে আর পা সরে না। মনে হ'ল, এইখান থেকেই চ'লে যাই। কিন্তু তাও পারলুম না। ধীরে ধীরে ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলুম, পিসীমা!

আমার ডাক কানে যেতেই পিসীমা একেবারে হাউমাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে এসে বললেন, কে বাবা? শচীন? দেখগে, হতভাগা আবার কি করছে!

কি করছে?

আবার সেই যাচ্ছেতাই জিনিস আনিয়ে গিলছে। বোতল খোলবার ইস্কুরুপটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলুম। পোড়ারমুখো সুরেনকে দিয়ে সেটাকে বার করিয়ে, রক্ষে-কবচের মতন গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

কথাটা শুনে নলিনীর ওপর সত্যিই ভারি রাগ হ'ল। মনে হ'ল, এ রকম ক'রে যে আত্মহত্যা করতে চায়, তাকে মরতে দেওয়াই ভাল।

রেগে তার ঘরের মধ্যে ঢুকেই বুঝতে পারলুম, ব্যাপারখানা কি। সুধার সুরভিতে ঘর একেবারে ভরপুর। নলিনীর কাছে গিয়ে বেশ একটু ঝাঁজালো সুরেই বললুম, এই অবস্থায় আবার কোন্ আক্কেলে—

নলিনী একটু হেসে বললে, আসতে না আসতেই পিসীমা কানে তুলেছেন বুঝি?

তারপর আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে বললে, আমি খাই নি। ওই সুরেন-দ্বিজেনের জন্যে একটু আনিয়েছি। বেচারারা এতদিন ধ'রে আমার সেবা করছে, তাই মর্ত্যেও যে স্বর্গসুখ উপভোগ করা যায়, তারই একটু হাতে-খড়ি ওদের দিয়ে দিলুম। ভবিষ্যতে ওরা বলতে পারবে, একটা লোকের মতন লোকের কাছে হাতে-খড়ি হয়েছিল।

তাই বল।

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

নলিনী বললে, ডাক্তার, আজ তোমাকেও একটু খেতে হবে ভাই। তুমি তো রোজই সন্ধ্যেবেলায় খাও, আজ না হয় আমার এইখানেই হোক। দ্বিজেন, ডাক্তারকে একটা পাত্র দাও।

দু-একজন ক'রে বন্ধু-বান্ধব এসে জুটতে লাগল। যে আসে, নলিনী তাকেই পাত্র দিতে বলে। এক পাত্র দু পাত্র ক'রে সকলেই গলাধঃকরণ করে। নলিনী বলতে লাগল, তোমরা আমার শুভানুধ্যায়ী, তোমাদের খাওয়ালে আমার আত্মা তৃপ্ত হয়।

দেখতে দেখতে একটা বোতল শেষ হয়ে গেল। আর এক বোতলও প্রায়

শেষ, ঘরের মধ্যে বেশ হট্টগোল শুরু হয়েছে, এমন সময় ঝি এসে বললে, ডাক্তারবাবুকে পিসীমা ডাকছেন।

আনন্দের উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন বন্ধু বিস্মিত হয়ে বললে, পিসীমা ডাকছেন কথার অর্থ কি?

আমার তখন 'ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা। যে কঠিন মন নিয়ে নলিনীর ঘরে এসে ঢুকেছিলুম, উপর্যুপরি তিন চার পাত্র তরল অনল সে কাঠিন্যকে গলিয়ে একেবারে জলবৎ ক'রে এনেছিল। তখন আমার মনের যা অবস্থা, তাতে নলিনীও যদি এক পাত্র চায় তো খুব জোরে আপত্তি করি না। এই সময়ে পিসীমার আহ্বানকে পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অকস্মাৎ মৃত্যুর আহ্বানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নলিনীর দিকে একবার চেয়ে দেখি যে, সে চক্ষু বুজে নির্বিকার অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে বললুম, ওহে, পিসীমা ডাকছেন যে! দেখ দিকিন, তোমার জন্যে এই বিপদ!

নলিনী সেই রকম চোখ বুজেই বললে, বেশ ক'রে রুমালে খানিকটা ইউক্যালিপ্টাস ঢেলে নিয়ে যাও, বিপদ আবার কিসের?

এক শিশি তেল রুমালে ঢেলে দশ হাত দূরে থেকে পিসীমাকে বলা গেল, কিছু ভয় নেই পিসীমা, নলিনী কিছু খায় নি। সে শুধু বন্ধু বান্ধবদের জন্যে একটু আনন্দের আয়োজন করেছে।

পিসীমা আমার আপাদমস্তক একবার ভাল ক'রে দেখে বললেন, ওই যাচ্ছেতাইগুলো না খেলে কি আর আনন্দ হয় না?

প্রশ্নটা যে ঠিক কার ওপরে বর্ষিত হ'ল, তা বোধগম্য না হওয়ায় পকেট থেকে রুমালটা বের ক'রে নাকে চেপে ধরলাম।

পিসীমা আবার বললেন, হতভাগার কাছ থেকে সেই বোতল খোলবার ইস্কুরুপটা কেড়ে নিয়েছ?

আমি বললাম, আচ্ছা, আমি সেটা কেড়ে নিয়ে আপনার কাছে দিয়ে যাব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বন্ধুরা আমার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে ছিল। ঘরে ঢোকামাত্র তারা জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার হে? চ্যাঁচামেচি কি বেশি হচ্ছে?

বারম্বার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে নলিনীকে বললুম, নলিনী, তোমার কাছে একটা কর্ক-স্ক্রু আছে, সেটা দাও তো ভাই, পিসীমাকে দিয়ে আসি। ওটা যতক্ষণ তোমার কাছে থাকবে, ততক্ষণ পিসীমার সন্দেহ মিটবে না।

নলিনী বললে, পিসীমার সন্দেহ মেটাবার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত নই। তুমি একটু ব'স তো। ওহে বিজন, ডাক্তারদাকে একটা বড় ক'রে পাত্র দাও।

বলতে না বলতে বিজেন পাত্র এনে হাজির। দেখলুম, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে সেই ক'দিনেই নলিনী মামাতো ভাই দুটিকে এমন তালিম দিয়েছে যে, সংসার মরুপথে জলকষ্ট তাদের কখনও ভোগ করতে হবে না।

পাত্রটি শেষ ক'রে নলিনীকে বললুম, এবার দাও তো কর্ক-স্ক্রুটা, ওটা পিসীমাকে দিয়ে আসি।

নলিনী এবার বললে, মাপ কর দাদা, ওটি আমার স্বপ্নাদ্য জিনিস, ওটি আমি হাতছাড়া ক'রতে পারব না।

সবাই চমকে উঠলুম, সে আবার কি হে ?

নলিনী বললে, হ্যাঁ, ওটার সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িত আছে। চুপ ক'রে ব'স, শোন তো বলি।

সবাই নিজের নিজের চেয়ার নলিনীর খাটের চারিপাশে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘিরে বসা গেল। সে বলতে আরম্ভ করলে—

সেবারে কি একটা কাজে না অকাজে পাঞ্জাবে যেতে হয়েছিল। পাঞ্জাব মানে মীরাট নয়, সেখানকার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। বৈশাখ মাস, দারুণ গরম। সে গরম যে কি, তা যারা বৈশাখ মাসে সেখানে না গিয়াছে, তারা বুঝতে পারবে না।

এই ধর, চাল বা চিঁড়ে ভাজতে হ'লে রান্নাঘরে না গিয়ে ছাতে উঠলেই চলে। সেইখানে অভাবনীয়রূপে এক রাজার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রাজা তো রাজা, একেবারে রাজা। যেমন তার দশাশই চেহারা, ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তেমনই তার চৌগোঁপ্পা গোঁফ দাড়ি, তেমনই তার দিলদরিয়া মেজাজ। রাজোচিত গুণের তার কোন অভাবই নেই, একমাত্র যা অভাব, সেটি হচ্ছে রাজ্যের; কারণ তখনও নাবালক, রাজ্যটি হাতে আসতে তখনও বছর দেড়েক দেরি।

রাজার পিতামহ ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের একজন বড় কর্মচারী। তাঁর অধীনে ছিল মস্ত এক পরগণা। ইংরেজরা যখন রণজিৎ সিংহের রাজ্য আক্রমণ করলে, তখন আমাদের রাজার পিতামহ যুদ্ধের উদ্যোগ না ক'রে হিসেব করতে বসলেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যার অর্থ— মহাজনদের চিন্তার ধারা একই সূত্রে বাঁধা। আমাদের রাজার পিতামহটিও ছিলেন মহাপুরুষ। তাই তাঁর হিসেবের ফল ও তাঁর প্রভু মহাপুরুষের হিসেবের ফল একেবারে হুবহু মিলে গেল। অর্থাৎ বিনা, সব লাল হো যায়েগা।

সবই যদি লাল হো যায়েগা, তা হ'লে আর যুদ্ধ ক'রে কি হবে ? অতএব তিনি নিজের কেল্লার দরজা খুলে ইংরেজদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। এই বিচার-বুদ্ধিটুকুর অভাব ঘটেছিল ব'লেই রণজিৎ সিংহের বংশধরের আজ কোন উদ্দেশ নেই, আর সেটুকুর অভাব হয় নি ব'লেই তাঁর কর্মচারীর বংশধর সেই দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের তৃষিত আত্মায় প্রেমবারি সিঞ্চন ক'রে অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

গ্রীষ্ম কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। শেষকালে বিনা আগুনে চাল ভাজা থেকে যখন মাংস ভাজাও চলতে পারে এমন অবস্থায় দাঁড়াল, তখন আমরা একদিন রাজাকে বললুম, এইবার ছুটি দিতে অনুমতি হয়। গরম যদি আরও বাড়ে, তা হ'লে এখানেই ইহলীলা শেষ করতে হবে।

রাজা বললেন, এই কথা ! চল, দিন কয়েক আমার বাগানে কাটিয়ে আসি। সেখানে গরম ঢের কম।

তখুনি ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। শহর ছেড়ে দিন কয়েকের জন্যে যাওয়া হবে বাগানবাড়িতে। স্থানটি শহর থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে। সমস্ত দিন ধ'রে মোটর লরিতে ক'রে ঠাণ্ডা হবার সরঞ্জাম সব সেখানে চালান হতে লাগল। পরদিন বেলা দশটার সময় তিনখানা বড় মোটর বোঝাই হয়ে আমরা রওনা হলুম।

যাত্রী ছিলুম আমরা তিনটি বাঙালী, আর একটি পাসীর ছেলে, নাম তার জিমি। আসল নাম তার জামশেদজী, সেটি এখন জিমিতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন দুটি কঙ্কণা ব্রাহ্মণ। তার মধ্যে যোশী দিন পনরো থেকে গরমের ঠেলায় অত্যন্ত কাতর। পেটে যা পড়ে, তাই বমি হয়ে উঠে যায়। মদ্য মাংস সেবন করা তার শাস্ত্রে বারণ, তবে আমাদের পাল্লায় প'ড়ে মাঝে মাঝে সন্ধ্যের সময় এক-আধ বোতল বীয়ার পান করে।

সপ্তম ব্যক্তি হচ্ছেন দেওয়ান স্বরূপ সিং। দেওয়ানজীর একটু ইতিহাস আছে। আমাদের রাজা-সাহেবের পিতামহের মত তাঁর পিতামহও রণজিৎ সিংহের রাজত্বের এক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তবে দেওয়ানের পিতামহ হিসাব-পত্রে দেওয়ানের মতন অমন পাকা ছিলেন না। ইংরেজরা তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করামাত্র তিনিও 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে আসরে নেমে পড়েছিলেন। তার ফলে দেওয়ানজী এখন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে মাসিক কয়েক শো টাকা বৃত্তি পান। শহর থেকে একশো মাইল দূরে কোথাও যেতে হ'লে তাঁকে সরকারী হুকুম নিতে হয়। পাস না পেলে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হয় না।

দেওয়ানজী খুব করিৎকর্মা লোক। তিনি নিঃস্বার্থভাবে রাজার মোসাহেবি করেন। সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁরই হাতে। তিনি না হ'লে রাজার একেবারেই চলে না। কারণ রাত দুপুরে বাঘের দুধ যদি দরকার পড়ে, দেওয়ান ছাড়া নাকি আর কেউ তা সংগ্রহ ক'রে আনতে পারে না।

অষ্টম ব্যক্তি হচ্ছেন উজির। ইনি এক সময়ে রাজার গৃহশিক্ষক ছিলেন, এখন হয়েছেন প্রধান সচিব ও একজন অপ্রধান পার্শ্বচর। নবম ব্যক্তি হচ্ছেন লাল সিং। ইনি রাজার খাস মোটর চালক, তাঁর প্রাণের ইয়ার ও একমাত্র বিশ্বস্ত কর্মচারী।

এরা ছাড়া আরও গোটা কয়েক লোক মিলে তো হে হে ক'রে বেরুনো গেল। বেলা প্রায় চারটের সময় প্রকাণ্ড এক কেল্লার তোরণের ভেতর আমাদের মোটর গাড়িগুলো প্রবেশ করল। এই কেল্লাই হচ্ছে রাজার বাড়ি। কেল্লাটা পুরনো, মোগলদের আমলে তৈরি। তারপরে তাদের হাত থেকে শিখরা কেড়ে নিয়েছিল। কেল্লার অধিকাংশ ঘরই এখন অব্যবহার্য।

গাড়ি থেকে নাবামাত্র দেওয়ানজী আমাদের একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে তোফা সারি সারি খাট পাতা। রাজা বললেন, আপাতত একটু বিশ্রাম করা যাক, তারপরে সন্ধ্যাবেলা উঠে যা হয় হ'বে খন।

হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, বীয়ার আর ধুলোয় শরীরের অন্দর বাহির কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠেছিল। বিছানা দেখে একেবারে জুতো সমেত গিয়ে লম্বা হয়ে পড়া গেল।

সন্ধ্যেবেলায় স্নান সেরে দেওয়ানী আমে গিয়ে বসা গেল। থামওয়ালা বড় পাথরের ঘর—দিল্লীর দেওয়ানী আমের ধাঁচে তৈরি। একটা দিকে ঢালা বিছানা হয়েছে।

আমরা গিয়ে বসামাত্রই রাজা হাঁক দিলেন, দেওয়ান!

দেওয়ান ছুটতে ছুটতে এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন, হুজুর?

সোডাগুলো সব বরফে দেওয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ হুজুর।

টিকিয়া-কাবাব তৈরী?

হ্যাঁ হুজুর।

তা হ'লে আর কেন? অতিথিদের পানীয় বিতরণ করতে শুরু কর।

সুধা বিতরণ আরম্ভ হ'ল। দেওয়ানী আমে ব'সে স্কট্ল্যাণ্ডজাত সুধা পান ক'রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব মিলনানন্দ উপভোগ করছি, এমন সময় রাজা চমকে উঠে বললেন, এ কি জিম! তুমি কিছু খাচ্ছ না যে? এই দেওয়ান! দেওয়ান রাস্কেল গেল কোথায়?

ছুটতে ছুটতে দেওয়ান এসে উপস্থিত। রাজা তাকে ধমকে বললেন, স্টুপিড, জিমি কিছু খাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছ না?

জিমি আমার পাশেই ব'সে ছিল। সে আমার কানে কানে বললে, আমাকে বাঁচাও। ওসব আমি খাই না, খেলে এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব।

ইতিমধ্যে দেওয়ান বললেন, জিমিকে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে ওসব খায় না।

রাজার কাছে গালাগাল খেয়ে দেওয়ান ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লেন। বুদ্ধিমান রাজা সেটা বুঝতে পেরে তাকে বললেন, এবার তুমি এখানে এসে ব'স, আমাদের সঙ্গে একপাত্র খাও।

নিমেষের মধ্যে সমস্ত ক্ষোভ অপসারিত হয়ে গেল। দেওয়ান এক গাল হেসে আসরের মধ্যে ব'সেই বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সোডার বদলে বীয়ার দিয়ে একটা বড় পাত্র পান করা যাক।

চারিদিক থেকে সম্মতিসূচক প্রশংসাধ্বনি উঠল, বাজী দেওয়ান, বহুৎখুব!

হুইস্কিতে বীয়ার ঢেলে পাত্র বিতরণ করা হ'ল। আমার পাত্রটায় তখনও একটি চুমুকও দিই নি, এমন সময় জিমি কানে কানে বললে আমায় একটু বীয়ার দিতে পার?

পাত্রটি তুলে জিমির হাতে দেওয়ামাত্র একটি চুমুকে সে সেটি শেষ ক'রে ফেললে।

দেওয়ানকে গালাগালি দেওয়ার জন্যে রাজার মনে বোধ হয় তখনও অনুতাপ হচ্ছিল। তিনি ব'লে উঠলেন, দেওয়ানকে বোধ হয় তোমরা চেন না। ও রাজার ছেলে, আজ দেখ ওর দুর্দশা!

দেওয়ান বললেন, এক বৃন্তে দুটি ফুল ফোটে, তার একটি হয়তো কোন প্রেমিক যুবক তুলে নিয়ে গিয়ে তার প্রিয়তমাকে উপহার দেয়, অন্যটি আর একজন তুলে নিয়ে গিয়ে কবরের ওপরে ফেলে দিয়ে আসে। মহারাজ, আমরা

একই বৃন্তের দুটি ফুল। শুধু স্থান-মাহাত্মে আপনি রাজা, আর আমি—আমি কিছুই না।

রাজা বললেন, সাবাস দেওয়ান, সাবাস! বড় খুশি করেছ। এবার একটু গান হোক।

যোশী ভাল গাইতে পারত। রাজা বললেন, যোশীজী, একটা গান গাও।

যোশীজীর বীয়ারের মাত্রা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে পড়েছিল দেখা গেল যে, সে একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সেই নিদ্রা দিচ্ছে। রাজা বললেন আহা, ওকে ঘুমোতে দাও। বেচারার শরীরটা খারাপ আছে। জিমি, একটা গান গাও।

হুইস্কি মেশানো বীয়ারের পাত্র পেটে প'ড়েই জিমির কি রকম একটা হেঁচকি উঠছিল। সে সেই রকম হেঁচকি তুলতে তুলতেই বললে, আমি একটা নাটকের গান জানি।

আমরা বললুম, বহুৎ আচ্ছা, নাটকেরই গান গাও।

জিমি আস্তে আস্তে গান ধরলে—

এ—এ—

বাসগৃহে পিয়ারী—হেউ—এ—এ—

বাসগৃহে পিয়ারী—ওয়া—হেউ—

ব্যাপার দেখে দেওয়ান এসে টপ ক'রে জিমির হাত ধ'রে আসর থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দূর থেকে ওয়াক, হেউ, ইয়া প্রভৃতি অত্যন্ত শ্রুতিকটু আওয়াজ কানে ভেসে আসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দেওয়ান ফিরে এসে বললেন, বেচারী একটু ইয়ে হয়ে পড়েছে। ওকে একেবারে শুইয়ে রেখে এলুম।

রাজা বললেন, তোমরা কেউ গাইতে পারলে না তো? আচ্ছা, দেওয়ান, সব ঠিক আছে?

দেওয়ান উত্তর দিলেন, হুজুর, সব ঠিক।

রাজা হুকুম দিলেন, আচ্ছা, নিয়ে এস।

হুকুম পেয়েই দেওয়ান বেরিয়ে গেলেন। দেওয়ান কোথায় গেলেন, কি করতে গেলেন, তাই আন্দাজ করছি, এমন সময় দেওয়ানী আমের এক দিককার একটা দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রথমে দেওয়ান ও তাঁর পেছনে দুটি আস্তৈক বিদ্যাধরী। লাল, নীল, গোলাপী, ফিরোজা, যোগিয়া রঙের চাদর তাদের অঙ্গে, পরনে পা দেখা-যায়-না এমন ঢোলা রেশমের পাজামা, রঙিন রেশমের হাঁটু-অবধি-ঝোলা পাঞ্জাবি।

হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে একেবারে চমকে উঠলুম! আমার মনে হতে লাগল, মেরুর অরোরা যেন নতুন রূপে ধরে মর্ত্যে এসে নামল।

রাজা সবার পরিচয় দিলেন—আমিরা, নাদিরা, হাসনু ইত্যাদি।

নাচগান শুরু হল। আকাশে চাঁদের আলো, আশপাশে সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ,

সাদা পাথরের দেওয়ালে কাঁচের ফানুসে মোড়া বিজলীর আলো, আর পেটের মধ্যে তরল বিদ্যুৎ। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল একাকার। এই তুরীয় আনন্দে ডুবে আছি, এমন সময় রাজা আমার কানে কানে বললেন, জিমি বেচারাকে ডেকে নিয়ে এস। বিয়ারের নেশা এতক্ষণে নিশ্চয় কেটে গিয়েছে।

দেওয়ানী-আমের একতলার একটা খোলা ছাতে জিমিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। টলতে টলতে সেখানে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিতেই কি একটা বলে পাশ ফিরলে। তাকে আবার ধাক্কা দিলুম। সে শুয়ে শুয়েই বললে, মাপ কর দাদা।

তার সেই কাতর অনুনয় শুনে আমি সুর ক'রে বললুম—

আমারে ক্ষমিয়ো আমারে ক্ষমিয়ো
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি
হরিণীর মত ছুটে চ'লে এনু
শরমের শর মর্ম্মে বিঁধি।

আমার সুরে শুনে জিমির বোধ হয় অনুপ্রেরণা এল। সে তারস্বরে চীৎকার ক'রে গান শুরু করলে—

ম্যয় খাটিয়া পর রোতি
কাঁহা গয়ী মেরী মোতি
মোতি বিনা নেই শোতি
হো ব্যসগম্মে—হো ব্যসগম্মে—

বললুম, ওঠ বৎস। দেখবে চল, ওদিকে মোতির বাজার ব'সে গেছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! জিমি আবার সেই রকম চীৎকার শুরু করলে, ম্যয় খাটিয়া পর রোতি—

শেষকালে সে সত্যিই চীৎকার ক'রে মড়াকান্না জুড়ে দিলে। তার কান্না শুনে রাজা ও তাঁর সঙ্গে আমিরা-নাদিরার দল আসর থেকে সেখানে ছুটে এল। জিমিকে তাদের হাতে সমর্পণ ক'রে আমি ছাতের এক কোণে স'রে গেলুম। সেখানে দাঁড়িয়ে জিমির কেরামতি দেখছি, এমন সময় দেওয়ানজীর গলা কানে যেতেই নীচের দিকে চেয়ে দেখি যে, সেখানে তিন চারজন কি একটা গণ্ডগোল করছে। আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দেওয়ানজী, কি হয়েছে?

আমাকে দেখেই দেওয়ানজী চীৎকার ক'রে বললেন, ভাই সাহেব, শিগগির নেমে এস, ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে।

তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের গোপালকে দেওয়ানজী জাপটে ধ'রে আছেন, আর একজন পাঠান চাকর লাল সিংকে ধ'রে রয়েছে।

ব্যাপার কি?

দেওয়ানজী বললেন, গোপালবাবু আর এই লাল সিং সবার অগোচরে আসর থেকে উঠে এসে এইখানে ব'সে ছিল। এইখান দিয়ে উমর খাঁ যাচ্ছিল, এরা তাকে ধ'রে বলে যে, ওরা এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে আর

উমর খাঁকে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলুম!

ইচ্ছে হ'ল, গোপালের গালে ঠেসে একটি চড় কষাই। কিন্তু সে ইচ্ছাকে সম্বরণ ক'রে তাকে বললুম, এ কি ছ্যাবলামি হচ্ছে! চল ওখানে।

নেশার চোটে গোপালের কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। তবুও সে এড়িয়ে এড়িয়ে বললে, তুমি জান না, আজকাল "কাওয়ার্ড" বলে বাঙালীর ভারি একটা দুর্নাম হয়েছে। সেই দুর্নাম ঘুচিয়ে তবে এখান থেকে নড়ব।

তাকে বললুম, রাস্কেল, এই ষাট ফুট ওপর থেকে লাফালে যদি বা কাওয়ার্ড নাম ঘোচে, তবু লোকে বলবে "ফুল"। সেটা কাওয়ার্ডের চেয়ে কম দুর্নাম নয়।

গোপাল আবার বললে, তুমি জান না, বাজি হয়েছে যে, লাল সিং আগে লাফাবে।

আমার হাতে গোপালকে জিম্মা ক'রে দিয়ে দেওয়ান ছুটে গিয়ে রাজাকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাদের লাফিয়ে পড়ার কথা শুনে রাজা তো একেবারে শিউরে উঠলেন। কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ভাই-সাহেব, চল, আমরা বারা-দুয়ারীতে যাই। সেখানে গিয়ে বাচ খেলা যাক।

রাজার কথা শুনে গোপাল তাঁর পিঠ চাপড়ে ব'লে উঠল, বহুৎ আচ্ছা, এই না হ'লে রাজা। চল, এবার ওপরে যাওয়া যাক।

সবাই মিলে ওপরে উঠে আসা গেল। রাজা দেওয়ানকে বললেন, বারা-দুয়ারীতে গিয়ে আটখানা কিস্তিতে বিছানা কর। আমরা ষোলজন যাব, জলদি।

দেওয়ান 'যো হুকুম' বলে তখনই ছুটলেন; আমরা আবার দেওয়ানী-আমে এসে বসলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব্যসাচী দেওয়ান ফিরে এসে সংবাদ দিলেন, হুজুর, সব তৈরি, দয়া ক'রে উঠলেই হয়।

আটজন পুরুষ ও আটজন বিদ্যাধরী গাড়িতে বোঝাই হয়ে ওঠা গেল। একটা গাড়ি হুইস্কি ও বরফ বোঝাই হয়ে আমাদের সঙ্গে চলল।

প্রায় চারশো বছর আগে মোগলদের এক শৌখিন রাজপুত্র এখানে তাঁর-গ্রীষ্মাবাস তৈরি করিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড বাঁধানো দীঘি, এপার ওপার নজর চলে না। এই দীঘির মাঝখানে বারো-দরজার খিলানের উপর এক প্রাসাদ। আমাদের রাজার পিতামহের আমল থেকে এই প্রাসাদ এঁদেরই অধীনে আছে। জায়গাটি দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দূরে।

মিনিট পনরোর মধ্যেই আমরা সেই দীঘির ধারে এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে অনেকগুলি চওড়া নৌকোতে সাদা ধবধবে বিছানা পাতা হয়েছে। রাজা এক একটি নৌকোতে একটি ক'রে হুইস্কির পাঁইট, একটি গেলাস, একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে চড়িয়ে ঠেলে এক এক দিকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেও একটি নৌকোতে সওয়ার হলেন।

রাজা তাঁর নৌকোতে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, ভাই সব, একটু দাঁড়

টেনে সব দূরে দূরে চ'লে যাও। যদি দরকার কিছু হয়, তাহ'লে বারা-দুয়ারীর কাছে এসে দেওয়ানকে ডাক দিলেই সাড়া পাবে।

আমার সঙ্গে যে সুন্দরী এসেছিল, সে বললে, চল, আমরা নৌকো ওই পুলের তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে ওদিকের কিনারায় চ'লে যাই।

নৌকো বেয়ে একেবারে এক কোণের দিকে গিয়ে বিছানায় চ'লে পড়া গেল। আমার অবস্থা দেখে সঙ্গিনী বললে, ঘুমুলে নাকি?

না, ঘুমুই নি, নৌকো বেয়ে হাঁপিয়ে পড়েছি। তুমি একটা গান গাও।

সুন্দরী আস্তে আস্তে কি একটা পাঞ্জাবী গান গাইলে, তার একটি কথাও বোধগম্য হ'ল না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বাড়ি কোথায়?

সে বললে, বাড়ি আমার এই গাঁয়ে, শহরে থাকি।

তা শহর থেকে তোমাদের আগমন হয়েছে বুঝি?

সে বললে, হ্যাঁ, শহর থেকে রাজা-সাহেব যখন অতিথিদের নিয়ে এখানে আসেন, তখন আমাদের ওপর পরোয়ানা হয়। আমরা বিশ-পঁচিশ ঘর আছি। যাদের ওপর রাজার হুকুম হয়, তাদের আসতে হয়।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা কি রাজার চাকর?

সে বললে, ঠিক চাকর নয়। তবে হ্যাঁ, চাকর বইকি।

সে আবার কি?

সুন্দরী বললে, এই রাজার বাবা ছিলেন ভারী শৌখিন লোক। তিনি নানা জায়গা থেকে বিশ-পঁচিশ ঘর বাইজী এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তারা এখনও বিনা খাজনায় জমি ভোগ করে, তার বদলে মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে রাজা ও তার বন্ধুদের খুশি করতে হয়।

একটু থেমে সে বললে, কেন, এ রকম কি তোমাদের দেশে হয় না?

আমি বললুম, না সুন্দরী, এ রকম নিয়ম আমাদের দেশে নেই। তবে আমি যদি কখনও জমিদার হই, তা হ'লে নিশ্চয় সেখানে এই নিয়ম করব।

চিত হয়ে বুকে হাত দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে ভবিষ্যতে জমিদারী পাবার কোন আশা আছে কি না ভাবছিলুম, হঠাৎ আমার সঙ্গিনী আমার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে অত্যন্ত মিঠা সুরে বললে, দেখ, একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

কি কথা, বল?

রাজাকে বলবে না?

না।

আমার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে আসবে। আমায় যেতে দেবে?

এই রাত-দুপুরে এখানে তোমার সঙ্গে কে দেখা করতে আসবে?

সে বললে, সে একজন। আমি এখানে এসেছি জানতে পেরে সে কেল্লায়

খবর পাঠিয়েছিল। আমি তাকে রাত্রে আসতে বলেছিলাম। সে নিশ্চয় কেল্লায় যাবে, সেখান থেকে খবর নিয়ে এখানে আসবে।

বললুম, বেশ তো, তোমার লোক যদি কেউ এখানে আসে তা আমাকে ব'লো। আমি তোমায় ধারে না নিয়ে দেব।

সুন্দরী হঠাৎ খুশি হয়ে আমার ডান হাতখানা তার হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করতে শুরু ক'রে দিলে। নেশায় চোখ জুড়ে আসছিল, তার ওপর সুন্দরীর সেই আদরের আবেশে দুই চোখ মুদে এল।

হঠাৎ হাতে একটা ঝাঁকুনি লাগতেই চোখ দুটো একটু ফাঁক ক'রে দেখি যে. সুন্দরী আমার হাতখানা তুলে ধ'রে একদৃষ্টে আংটিটা দেখছে।

আমি বললুম, কি দেখছ ?

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি ফিরোজা ?

ফিরোজা ব'লেই তো মনে হয়।

আংটিটা আমায় দিতে হবে।

ব'লেই সে আঙটিটা ধ'রে টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলে।

তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম, আংটিটা আমার নয়।

তোমার নয় ? তবে কার, তোমার আশনাইয়ের ?

চুপ ক'রে আছি দেখে সে ধাক্কা দিয়ে বললে, বল না।

বললুম, আংটিটা আশনাইয়েরই বটে। আজ রাতে তোমার সঙ্গে যেমন আশনাই হয়েছে না ? তেমনই বছর পাঁচেক আগে আর এক রাত্রে আর এক-জনের সঙ্গে এই রকম আশনাইয়ের ফলে, চাঁদের আলোতে বালির ওপরে প'ড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিলুম। যেখানে ওই ফিরোজার আংটি দেখছ, সেদিন রাতে ওইখানে ছিল একটা হীরের আংটি, সকালবেলা উঠে দেখি, আশনাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হীরের আংটিটাও অন্তর্ধান হয়েছে। তার বদলে ওইখানে ওই ফিরোজার আংটিটা রয়েছে।

কাহিনীটা শুনে সুন্দরী দস্তুরমতন উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বললে, তবে—আচ্ছা, আমিও আমার হাতের এইটা আংটি তোমায় দিচ্ছি।

মনে হতে লাগল, এর চাইতে, এখানে না এসে কেল্লার দাঁড়িয়ে গোপাল আর লাল সিংয়ের লম্ফঝম্প দেখা যে ঢের ভাল ছিল।

সুন্দরী তার গলায় একটুখানি অশ্রুর আমেজ দিয়ে বললে, কোথাকার কে এসে হীরের আংটিটা নিয়ে গেল, আর আমি ফিরোজাটা চাইছি—

যুক্তির মতন যুক্তি বটে। বললুম, সুন্দরী, সেদিন আমার এক পাশে ছিল সমুদ্র ; সে তার অবিশ্রান্ত উদাসী ঝঙ্কার তুলে আমাকে ডাকছিল, মাথার ওপরে ছিল সুধা ও কলঙ্কে ভরা অতন্দ্র শশী, আর এক পাশে ছিল তারই মতন সৌন্দর্য সুধা ও কালিমায় ভরা তোমারই মতন আর একজন। আজও মাথার ওপরে সেই চাঁদ, পাশে সেই সুন্দরী, তবে সেদিন সমুদ্রের ধারে প'ড়ে থাকলেও জলে পড়ে নি, আর আজ তো স্বেচ্ছায় এই পারাবারে নৌকো

ভাসিয়েছি। নাও সুন্দরী, ফিরোজাটা টেনে নাও, ওটা তোমার জন্যেই এতদিন ছিল, ওটা তোমারই প্রাপ্য।

সুন্দরী ফিরোজাটা খুলে নিয়ে আমার আঙুলে তার একটা আংটি পরিয়ে দিলে। চাঁদের আলোতেও বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেটা আনা দুই দামের মুলতানী সাদা পাথরের আংটি।

আংটিটা নিজের আঙুলে প'রে নিয়ে সে বললে, এবার আমাকে কিনারায় নামিয়ে দাও। সে এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

বিছানার ওপরে উঠে বসলুম। দূরে যেন একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ব'লে মনে হতে লাগল। সুন্দরী সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ওই দেখ, বেচারা অনেকক্ষণ থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে নৌকোখানাকে তীরের দিকে বেয়ে নিয়ে চললুম। এবার সে আমার পাশে এসে বললে, আমাকে কি বকশিশ দেবে দাও।

মহা মুশকিলে পড়া গেল। এই শেষরাত্রে জলের ওপরে বকশিশ এখন পাই কোথায়? তাকে বললুম, সঙ্গে তো কিছু আনি নি, কাল দোব।

সে বললে, কাল কি ক'রে হবে? কাল তো তোমরা চ'লে যাবে।

আমি বললুম, পাগল, এখানে অন্তত দশ-পনরো দিন থাকব।

কিন্তু আমি তো কাল চ'লে যাব। কাল আবার নতুন দল আসবে, আমায় যা দেবার এখুনি দাও।

আমি বললুম, এখুনি দিই কোথা থেকে? কাছে যে কিছুই নেই। আচ্ছা, শহরে ফিরে তোমার বাড়িতে গিয়ে একদিন দেখা করব, তখন বকশিশ দোব।

ওরকম সবাই বলে। আমি এখুনি বকশিশ আদায় ক'রে তবে ছাড়ব।

বড় ফ্যাসাদেই পড়লুম দেখছি। যা হোক, আর কথা না বাড়িয়ে নৌকোখানাকে আস্তে আস্তে ধারে নিয়ে যাওয়া গেল। মেয়েটি টপ ক'রে নেমে নৌকোটা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। সে যায় না দেখে আমি বললুম, বকশিশ আজ নয়, এখন যাও। ওই দেখ, তোমার সেই লোক এদিকে আসছে।

লোকটা, সত্যিই দেখলুম, দীঘির দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটা বললে, ও এদিকে আসছে বকশিশের জন্যে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম। মনে হ'ল এই নির্জন জায়গায় কি ধ'রে মারধোর দেবে নাকি? সুপ্ত স্মৃতি থেকে দু-একটা পূর্ব-অভিজ্ঞতার ছবিও চোখের সামনে হিনামিনি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি বলে ফেললুম, দেখ, বেশী চালাকি যদি কর, তা হ'লে এখান থেকে আমি দেওয়ানকে হাঁক দেব। সে এসে ভাল ক'রে বকশিশ দেবে 'খন।

কথাগুলো শুনেই সে নৌকোটা ছেড়ে দিলে। তার পরে মিনিট খানেক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আচ্ছা, যাই। কিছু মনে ক'রো না।

যাবার সময় নৌকোখানা জলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ধীরে ধীরে সে মাঠে চ'লে গেল। জ্যোৎস্নায় মাঠ ভেসে যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে তার দেহটা চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল।

নৌকোর বিছানায় আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, আহা, বেচারী বড় ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল। ভাবতে লাগলুম, শহরে ফিরে গিয়ে ওকে খুশি ক'রে দোব। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল, খুশি করবার মতন আমার কি আছে? যদি আমার রাজার মতন অর্থ থাকত, তা হ'লে নিশ্চয় ওকে খুশি করতে পারতুম। আমি শুনেছিলুম, এককালে আমাদের বিষয়-আশয় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা এই ভাবে বিদ্যাধরীদের খুশি ক'রে যৌবনেই বিষয়টি ফাঁক ক'রে দিয়ে মারা গিয়েছিলেন। মনে হতে লাগল, ঠাকুরদার সেই বিষয় যদি আজ আমার থাকত! কিন্তু হায়, যা গিয়েছে তা আর কিছুতেই ফিরবে না।

দুঃখে ক্ষোভে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ঠাকুরদাকে কখনও দেখি নি, কিন্তু তাঁর ওপরে দারুণ অভিমানে বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে আরম্ভ করলে।

একমনে ভাবতে ভাবতে, বোধ হয়, ঘুমিয়েই পড়লুম। কতক্ষণ পরে জানি না, কে যেন মধুর কণ্ঠে আমায় ডাকলে, দাদু!

সেই কণ্ঠস্বরে কি মেশানো ছিল জানি না। আমার সমস্ত ক্ষোভ নিমেষে মিটে গেল। দেখলুম, গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ আমার পাশে ব'সে বলছেন, বিষয়টি আমি উড়িয়ে দিয়েছি ব'লে দুঃখ হচ্ছে দাদু?

বুঝতে পারলুম, আমার স্বনামধন্য পরোলোকগত ঠাকুরদাদা, তাঁর নাতির দুঃখে বিচলিত হয়ে পরলোক থেকে নেমে এসেছেন। মনের মধ্যে আবার অভিমানের মেঘ জমা হয়ে উঠতে আরম্ভ করল। ঠাকুরদা আবার বললেন, কি দাদু, কথা কইবে না?

এবার আমি বললুম, দাদু, বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে গিয়ে তুমি বড় খারাপ কাজ করেছ। দেখ, তোমার নাতির কি দুর্দশা!

ঠাকুরদা বললেন, হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল ভাই। আমি ভেবেছিলুম, আমাদের বংশে আমিই বুঝি শেষ মহাপুরুষ। তুমি যে আসছ, সেটা তখন খেয়ালই হয় নি। যাক, দুঃখু ক'রো না, যা গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না।

আমি বললুম, দুঃখ তো এতদিন কখনও হয় নি। আজ একটা কারণে মনে বড় আঘাত পেয়েছি। যাকগে, আমার দুঃখের কথা ছেড়ে দাও। তোমাকে কখনও দেখি নি, তোমার কথা বল। কেমন আছ তুমি?

বেশ আছি ভাই।

কোথায় আছ?

স্বর্গে। কেন বল তো?

বললুম, আমার বিশ্বাস ছিল যে, তুমি নরকে গিয়েছ।

ঠাকুরদা বললেন, দাদু, যতদিন পৃথিবীতে ছিলুম, ততদিন নরকে যাবার কল্পনাও কখনও মনে আসে নি। যতদিন বেঁচে ছিলুম, ততদিন সেখানে মনের মত স্বর্গরাজ্য তৈরি ক'রে তার মধ্যে বাস করেছি। মৃত্যুর সময় স্বর্গের কথা ভাবতে ভাবতেই মরেছি, আর মরবার পর সোজা স্বর্গেই চ'লে গিয়েছি।

ঠাকুরদার কথা শুনে মনে বড় ভয় হ'ল। তাকে বললুম, দাদু, ঠিক তোমার মতন না পারলেও, ওরই মধ্যে সাধ্যমত আমিও নিজের একটা স্বর্গরাজ্য তৈরি ক'রে বাস করছি। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, ইহলোকে স্বর্গভোগের মাত্রা যতই বাড়ছে, পরলোকে নরকভোগটা ততই কায়েমী হচ্ছে। ঠিক জানি, স্বর্গের দরজার কাছে গিয়ে দেখব সেখানে চাবি লাগিয়ে প্রহরীরা স'রে পড়েছে। একটা কিছু বিহিত করতে পার দাদু ?

দাদু বললেন, এর জন্যে এত ভাবনা ? আচ্ছা, মৃত্যুর পর সেখানে গিয়ে স্বর্গের দরজা যদি বন্ধ দেখ তো, এই চাবি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, এইটে দিয়ে সে দরজা খুলে নিও।

হাত বাড়াতেই স্বর্গের চাবিটা আমার হাতে দিয়েই দাদু অদৃশ্য হলেন।

নৌকোর বিছানায় ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলুম, তখন আকাশের চত্বরে ঊষা ও অরুণের শাশ্বত লুকোচুরি-খেলা সবে আরম্ভ হয়েছে। হাতের মুঠো খুলে দেখি, আমার দাদুর দেওয়া স্বর্গের চাবি—এই কর্ক-স্ক্রুটা রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নলিনী বললে, এটাকে পিসীমার জিম্মায় দিলে আমার আর কি থাকে ভাই ?

উপরি-উপরি তিন বছরে হাজার পঞ্চাশেক টাকা লোকসান দিয়ে হরিদাস আবার আমাদের আড্ডার খাতায় নতুন ক'রে নাম লেখালে। বছর দশেক আগে সিন্ধবাদের বণিকপুত্রের মত হঠাৎ একদিন সে ব্যবসা সমুদ্রে তরণী ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারপরে লাভের পণ্য বোঝাই ক'রে ফেরবার মুখে মাঝ-সমুদ্রে নৌকো বানচাল হয়ে প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় বন্দরে ফিরে লক্ষ্মীর পায়ে গড় ক'রে একদিন বেলা দশটার সময় সে আড্ডার দরজায় এসে দেখা দিলে।

আমাদের আড্ডার অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। কেবল দুটো-তিনটে অত্যন্ত পরিচিত স্থানের গুটিকয়েক লোক স'রে গিয়েছে মাত্র। হরিদাস অদৃশ্য হবার পর আমাদের মধ্যে আরও দু-চারজন লক্ষ্মীর দরজায় কিছুদিন ক'রে ধন্না দিয়েছিল; কিন্তু দেবার সেদিকে কোন রকম আকর্ষণ না থাকায়, দিন থাকতে থাকতেই ফিরে এসে, তারা সুবোধ বালকের মতন আড্ডার পরমানন্দে তুরীয়ভাবে জীবনযাপন করছিল।

অনেকদিন পরে হরিদাস ফিরে আসায় আমাদের আড্ডার মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। আর একটু কারণও ছিল। লাভ-লোকসানের জমা খরচে তার লাভের অঙ্কটাই ছিল বেশি। অবশ্য অঙ্কটির সঠিক সন্ধান আমরা কেউ জানতুম না; অঙ্কশাস্ত্রের তিন লাইনের সেই রহস্যময় অক্ষরটার মত সেটাও আমাদের কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছিল।

যাক, হরিদাসের সিন্দুকের সন্ধান না পেলেও আমাদের দুঃখ ছিল না। মাথার ওপরকার অসীম নীল রহস্যের কোন সংবাদ না রাখলেও বৃষ্টিধারা দিয়ে সে যেমন ধরণীকে তার পরিচয় দিয়ে যায়, আমাদের দারুণ অনাবৃষ্টির সময় হরিদাসের সিন্দুকও মাঝে মাঝে তার পরিচয় দিয়ে যেতো। এতে আমরা খুশিই ছিলুম।

একদিন বেলা প্রায় তিনটে। আড্ডাধারীরা যে যার আহার্য সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়েছি, শুধু আমি আর পঙ্কজ ব'সে আছি। পঙ্কজ প্রায় ছ মাস দেশে ছিল। সম্প্রতি ফিরে এসে কাজকর্মের চেষ্টা দেখছিল। সেদিন দুপুরবেলা তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকতে দেখে আমি বললুম, ওহে, অত ভেবো না, ভেবে কি হবে?

পঙ্কজ বললে, না, ভাবনা কিসের! তবে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

হঠাৎ মন খারাপের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পঙ্কজ যা বললে, তার তাৎপর্য এই সম্প্রতি তার বহুকালের পুরাতন পোষ-মানা পত্নীটি অনেকদিন ধ'রে শাসিয়ে শাসিয়ে কোন রকম অবসর না দিয়ে দেহপিঞ্জর ছেড়ে পলায়ন করেছেন। এরই কিছুদিন পরে তিন পুরুষ ধ'রে দুধ-কলা দিয়ে পোষা একটি বাস্তু সাপ তার একমাত্র ভাইটিকে নিখরচায় খেয়াপারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। স্পষ্ট

বোঝা গেল, সর্পজাতির এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা এমন আকস্মিকভাবে তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় পঙ্কজ বেচারী একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়েছে। আরও বললে যে, তার একটিমাত্র পিতৃমাতৃহীন ভাগ্নে, যাকে তার স্ত্রী নিজের ছেলের মতন মানুষ করেছে, সেটিও প্রায় যায়-যায়।

কাহিনী শেষ ক'রে পঙ্কজ বললে, সময়টা একটু খারাপ যাচ্ছে।

আমাদের বিলাসকুমার দিন-কতকের জন্যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সে হাত-টাত গুনতে পারত। পঙ্কজের কথা শুনে আমি তাকে বললুম, তোমার সময়টা সত্যিই খারাপ যাচ্ছে দেখছি; বিলাসকে একবার হাতটা দেখিও তো। আর কদিন সময় খারাপ আছে সে ব'লে দিতে পারবে।

পঙ্কজ বললে, বিলাস-দাকে হাত দেখিয়েছিলুম। তার থিওরি হচ্ছে—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। অর্থাৎ একটা ক'রে খারাপ সময়ের পরেই একটা সুখের সময় আসে। সে ব'লে দিয়েছে, স্ত্রী ভাই মারা গিয়েছে, এবার ভাগ্নেটা মারা গেলেই তোমার সুখের সদর রাস্তা একেবারে সাফ হয়ে যাবে, কিছু ভাবনা নেই।

পঙ্কজের মনটা খারাপ আছে দেখে মৃত্যু সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করা গেল। শেষে বললুম, বাড়িতে কেউ মারা যাবার আগে জানতে পারলে প্রস্তুত হয়ে থাকা যায়।

দেখলুম, পঙ্কজ এ বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের দার্শনিক। সে বললে, হ্যাঁ, তা হ'লে ঘাট খরচটা যোগাড় ক'রে রাখতে পারা যায়। না হ'লে সে সময় তাড়াতাড়িতে টাকা ধার পাওয়াও মুশকিল।

পঙ্কজ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কিন্তু ভাই, আমার এ বিষয়ে অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমার স্ত্রী ও ভাই যে মারা যাবে, সে কথা আমি অনেক আগেই জানতে পেরেছিলুম।

ব'সে ব'সে আমার একটু ঘুম ধরেছিল, কিন্তু পঙ্কজের কথা শুনে চটকা ভেঙে গেল। ব'লে উঠলুম, বল কি! স্বপ্নে নাকি?

সে বললে, স্বপ্নে নয়, একজন আমায় গুনে ব'লে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, কে বল দিকিন? বিলাস-দা নাকি?

পঙ্কজ বললে, না, বিলাস দা নয়, তবে তার নাম করলে তুমি তাকে চিনতে পারবে: সে আমাদের মধ্যেই একজন।

পঙ্কজ অবাক করলে! আমাদেরই মধ্যে এতবড় একজন গুণী আত্মগোপন ক'রে ব'সে আছে, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হ'ল না। লোকটির নাম জানবার জন্যে জেদ করতে লাগলুম। শেষে আমার কাছ থেকে নানা রকমের দিব্যি আদায় ক'রে নিয়ে সে বললে, প্রায় মাস ছয়েক আগে হরিদাস তার হাত দেখে ব'লে দিয়েছিল।

হরিটা ভেতরে ভেতরে এতবড় একজন গুণী হয়েছে শুনে বিশ্বাস হ'ল না। পঙ্কজ তার ভবিষ্যদ্বাণীর আরও দুটো চারটে প্রমাণ দিয়ে বললে, হরিদাসকে কিছু ব'লো না দাদা, তা হ'লে সে আমায় খেয়ে ফেলবে।

পঙ্কজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম, হরিকে কিছু বলব না।

প্রতিজ্ঞা-রক্ষার সনাতন রীতি অনুসারে প্রথম দিন কয়েক চুপচাপ থেকে একদিন নির্জন পেয়ে হরিদাসকে ব'লে ফেললুম, দাদা আমার অদৃষ্টটা একটু হাতড়ে দেখতে হবে আর তো পারি না।

মুখের ওপর কপট বিস্ময় এনে সে এমন অজ্ঞতার ভান করলে যে, আমার মনে হ'ল, পঙ্কজ নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করবার বিদ্যায় পারপক্ক হ'লেও অভিনয় বিদ্যায় হরিদাস ছিল অত্যন্ত কাঁচা। একটু চাপাচুপি করতেই তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। সে কাগজ পেড়ে তাতে রাশিচক্র ফেলে বিচার ক'রে আমায় ব'লে দিলে, সময়টা তোমার এখন ভারি খারাপ। তুলা লগ্নের ওপর শনি ও মঙ্গল এই দুই গ্রহ এখন ঘোড়দৌড় খেলা খেলছে; মাঝে মাঝে দু-একটা চাঁট এসে লাগতে পারে। মোটের ওপরে, অবস্থাটি বিশেষ সুবিধের নয়।

অবস্থা কোনও কালে বিশেষ সুবিধের ছিল ব'লে মনে না পড়লেও হরির কথা শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, যেন পাহাড়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, সামনে শনি ও মঙ্গল ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটে আসছে, পালাতে গেলে খাদের মধ্যে পড়তে হবে, আর দাঁড়িয়ে থাকলে মাথার খুলি ছাতু হবে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম কি করা যায় বল দিকিন?

সে বললে, যেমন ক'রে পার হাতে একটা নীলা, গলায় একটা পলা আর ডান পায়ের কড়ে-আঙুলে একটা লোহার আংটি ধারণ কর।

হরিদাসের ব্যবস্থা অনুসারে কয়েকদিন বাদে সেই রত্ন-আভরণে সজ্জিত হয়ে আড্ডায় উপস্থিত হওয়ামাত্র চতুর্দিক থেকে প্রশ্নবৃষ্টি হতে লাগল, ব্যাপার কি?

অনন্যোপায় হয়ে হরির গুণের কথা সবার সমক্ষে প্রকাশ করতে হ'ল। আমার কথা শুনে ভূপতি বললে, আরে ছি ছি, শেষকালে তোমার এই অবনতি!

কিন্তু ভূপতির অনাস্থা থাকলেও, দেখলুম, আড্ডার আর সকলেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্রমেই সতর্ক হয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। সবার অবস্থা দেখে হরিরও উৎসাহ লেগে গেল। বাবলালব্ধ যে ক'টা টাকা তখনও সিন্দুকে অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে মোটা মোটা পাঁজি পুঁথি কেনা হতে লাগল। আড্ডায় দিবারাত্র আর কোনও কথা নেই। কেবল মকর, বৃশ্চিক, কর্কট ইত্যাদি জলে স্থলে যত রকম সাংঘাতিক জীব আছে তাদের নাম আর তারই সঙ্গে বৃহস্পতি, রাহু, মঙ্গল, কেতু, বুধ, সোম, শনি সব গ্রহের ধরন-ধারণ। স্বাতী বা অনুরাধার অমাবস্যার অন্ধকারেও অভিসারে বেরুবার জো নেই, সব আমাদের কাছে ধরা পড়তে হবে। অতবড় বিশাল নভোমণ্ডল একেবারে নখদর্পণে এনে ফেলা গেল।

একে একে আড্ডাধারীদের হাত পা গলা গোমেদ, জামিরা, চুনি প্রভৃতি রত্নে শোভিত হতে লাগল। একদিন ভূপতির পকেট থেকে মস্ত একটা লোহার পুরনো গজাল পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল। জেরায় জানা গেল যে, হরি সম্প্রতি একখানা একশো বছরের পুরনো ভাউলে কিনেছে। সে বলে যে, একশো বছরের জোয়ার-ভাঁটা-খাওয়া এই লোহা, জীবন-যাত্রায় পাকা মাঝির কাজ তো করেই, এমন কি

মৃত্যুর পর বৈতরণীও বিনা মাশুলে পেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়।

সেদিন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে আড্ডা থেকে হরিদাসকে 'লগ্নাচার্য' উপাধি দেওয়া হ'ল।

দিনগুলো নিজেদের মধ্যেই বেশ হুল্লোড়ে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সৎকার্যের দীপ্তি চাপা কখনও থাকে না। হরির এই অসামান্য গুণের কথা কেমন ক'রে আড্ডার চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। তারপরে সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর হরির আর বিরাম নেই। দলে দলে লোক দিনরাত তাকে ঘিরে ব'সে আছে। সকলেরই সময়টা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। হরিদাস মহা উৎসাহে মঙ্গলে পলা, শুক্রে হীরা, রাহুতে গোমেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে লাগল। ক্রমে একশো বছরের পুরনো ভাউলের গজাল পর্যন্তও দুর্লভ হয়ে উঠল।

কিছুদিন যেতে না যেতে আমাদের আড্ডাটি রীতিমত জ্যোতিষের টোল হয়ে দাঁড়াল। কোষ্ঠীবিচারের জন্যে বাইরে থেকে মহা মহা দিগ্‌গজ পণ্ডিত আমদানি হতে লাগল। কেউ মুখ দেখেই ব'লে দেন, এখনও দেরি আছে। কারুকে বা প্রশ্ন করলে একটা নদী কিংবা ফুলের নাম করতে বলেন। কেউ বা প্রশ্ন শুনে নাকের তলায় হাত দিয়ে দেখেন, ইড়া বইছে কি পিঙ্গলা বইছে। সেসব পণ্ডিত-দের হাল-চালই আলাদা। কেউ বা ভৃগুর শিষ্য, কেউ বা অষ্টোত্তরী, কেউ বা বিংশোত্তরী। এই নিয়ে দিনরাত তর্ক, ঝগড়া, গোলমাল। পুরাতন আড্ডা-ধারীরা পালাই পালাই ডাক ছাড়লে।

সেদিন তিথি ছিল অমাবস্যা। দুপুরবেলা আড্ডাঘরে একলা ব'সে আছি। সন্ধ্যেবেলা একটা কোষ্ঠী নিয়ে বিচারসভা বসবার কথা আছে, এমন সময় আমাদের নন্দনন্দন জ্যোতিষার্ণব মশায় এসে উপস্থিত হ'ল। এ পণ্ডিতটি আমাদের আড্ডায় নবাগত। সে ভৃগুসংহিতা অনুসারে বিচার করে। সেদিন তাকে একলা পেয়ে খোলসাভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা পণ্ডিতজী, সত্যি ক'রে বল তো, আমার আর কত দেরি আছে?

পণ্ডিত কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নাকে টেনে নিয়ে বললে, দেরি আছে। আপনি পূর্বজন্মে একটি মহাপাপ করেছিলেন, এ জন্মে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

কি পাপ করেছিলুম দাদা?

পুনরায় আর এক টিপ নস্যি গ্রহণ, তৎপরে কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ক'রে পণ্ডিত বললে, গত জন্মে আপনার যখন নব্বই বৎসর বয়স, সেই সময় একটি এক বৎসরের ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপীড়ন করেছিলেন। এই বিবাহের কয়েক মাস পরেই আপনার মৃত্যু হয়। কন্যাটির এই বৈধব্যের কারণ আপনি। সেই পাপের এখন প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

পণ্ডিতেরা প্রায়ই এই ধরনের কথাবার্তা বলতেন বটে, কিন্তু সেগুলো আমার মোটেই হজম হ'ত না। আমি স্পষ্টই ব'লে ফেললুম, ওসব কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। যদি—

পণ্ডিত ইতিমধ্যে আর এক টিপ নস্যি নাকের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল।

আমার বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়েই সে দস্যির মতন গর্জন ক'রে বললে, কি ! ভৃগুর কথা অবিশ্বাস ! আপনার পত্নী এখনও জীবিত। তাঁর বয়স এই আপনার চাইতে বছর দশেকের বেশি হবে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে যদিও বড় বড় রুইকাতলা মযদার টোপও গিলে থাকে, তবুও পূর্বজন্মের প্রিয়ার এই টোপটা আমি গিলেও গিলতে পারলুম না, বেধে গেল।

কথাটা তেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ না করায় পণ্ডিতজী বললে, কি, তোমার বিশ্বাস হ'ল না বুঝি ?

অতি বিনীতভাবেই বললুম, এতবড় একটা সংবাদ সাদা চোখে কি ক'রে বিশ্বাস করি দাদা ?

পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে বললে, ভৃগুর গণনা কখনও মিথ্যে হবে না। আমি বলছি, তিনি এখনও জীবিত আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় আছেন ?

পণ্ডিত বললে, তা বলতে পারি না, সেটা গুনে দেখতে হবে। তবে এটা বলতে পারি যে, তিনি এখনও জীবিত এবং বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী।

পণ্ডিত অনেককাল জ্যোতিষশাস্ত্র নাড়াচাড়া করেছে, মানবচরিত্র তার নখদর্পণে। এই শেষ চালটিতে সে আমায় একেবারে মাত করলে। কিন্তু সেদিন তার সঙ্গে এই কথা নিয়ে আর আলোচনা হ'ল না। লোকজন এসে পড়ায় অন্য কথা শুরু হ'ল।

তারপরে তিন দিন ধ'রে শয়নে স্বপনে আমার পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার চিন্তা আমায় একেবারে পাগল ক'রে তুলল। ঘুমের ঘোরে সে আমার কানে কানে এসে বলে, আর কত ঘুমুবে ? আমি যে আর থাকতে পারি না, এবার আমার যাবার সময় হ'ল।

স্বপ্নে দেখি, আমি যেন আমার পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে বেরিয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে চ'লে গেছি ভারতের অন্য এক প্রান্তে। প্রিয়ার সঙ্গে দেখা হ'ল। আমার প্রাসাদের সোপানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর রূপরাশি দেখছি। শিপ্রা নদীর জল কল্লোল বাতাসে ভেসে আমার কানে এসে লাগছে, তার মধ্যে কত শত বিস্মৃত কাহিনীর ইতিহাস। প্রিয়ার হাতে বিজয়মালা, মরণযজ্ঞের অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে এসে আমি তার সম্মুখে জানু পেতে বসেছি। প্রিয়া হাসিমুখে আমার গলায় জয়মালা পরিয়ে দিলেন। হঠাৎ আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে জ্যোতিষার্ণবের হাঁচি আমার স্বপ্নের জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। ক্ষোভে বুক ফেটে দীর্ঘনিশ্বাস বইতে থাকে।

একদিন নন্দনন্দনকে চেপে ধরলুম, দাদা, আমার প্রথম প্রিয়ার ঠিকানাটা গুনে ব'লে দাও, মনটা বড় উচাটন হয়েছে।

পণ্ডিত কোন জবাব দিলে না, চুপ ক'রে রইল। আমি আবার বললুম সে ধনী, তার অর্থে আমারও অধিকার আছে। পূর্বজন্মের হ'লেও সে তো আমারই অর্থ।

পণ্ডিত এবার নাকে নস্যি ঠেসে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। তোমার পরধন-প্রাপ্তি যোগ আছে। তার ওপরে তোমার কেন্দ্রে বৃহস্পতি, তোমার টাকা মারে কে?

ব'লেই সে শ্লোক আওড়ালে—

কিং কুর্বন্তি গ্রহাসর্বে কেন্দ্রী যত্র বৃহস্পতি
মত্ত কুঞ্জর নাশয়েৎ কেশরী যথা—

ব্যাস! ধনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংস্কৃত সাক্ষী রয়েছে দেখে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা চ'লে গেল। পণ্ডিতকে বললুম, ঠিকানাটা দাও দাদা, তোমার দুঃসময়ে আমি এ উপকারের কথা ভুলব না।

পণ্ডিত একটু গম্ভীরভাবে থেকে বললে, ঠিকানা জানতে হ'লে এখন কুলকুণ্ডলিনী যাগ করতে হবে। কিছু খরচ আছে।

কত খরচ?

পণ্ডিত ভেবে-চিন্তে বললে, পঞ্চাশটি টাকার কম হবে না।

ধনপ্রাপ্তির আগেই এতখানি ধনক্ষয়ের চিন্তা আমার উৎসাহকে একটু খর্ব ক'রে দিলে। কিন্তু আশাই শেষকালে জয়লাভ করলে। পঞ্চাশটি টাকা যোগাড় ক'রে পণ্ডিতকে দিয়ে বললুম, যা থাকে কপালে, লাগাও তুমি কুলকুণ্ডলিনী।

যজ্ঞের কথা যাতে গোপন থাকে সে বিষয়ে পণ্ডিতকে প্রস্তাব করতেই বুঝতে পারলুম যে, এ সম্বন্ধে আমার চাইতে তার আগ্রহ অনেক বেশি।

যা হোক, অমাবস্যা দেখে যাগ হ'ল। যজ্ঞস্থলে আমায় যেতে হয় নি, পণ্ডিত নিজের দেশেই যজ্ঞ করতে লাগল। আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে থাকা ছাড়া এ যজ্ঞে আমার আর অন্য কাজ রইল না।

দিন দশেক পরে নন্দনন্দন ফিরে এসে বললে, বাস্, সব ঠিক। ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে, আর কোন চিন্তা নেই।

আগ্রহে আমার তালু শুকিয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায়? এই শহরেই তো?

পণ্ডিতজী এবার হাসতে হাসতে বললে, তা বলছি না, আগে বল, অর্থপ্রাপ্তি হ'লে আমায় কত দেবে?

চার আনা, বারো আনা। যা পাব, তার চার ভাগের এক ভাগ তোমার।

পণ্ডিত উৎসাহিতভাবে বললে, রাজি, রাজি, খুব রাজি।

আমি বললুম তা হ'লে কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

পণ্ডিত তাতেও বিশেষ আপত্তি করলে না। যাত্রার সব আয়োজন হতে লাগল। প্রথমে শহর থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে যেতে হবে। সেখানে শতাধিক বৎসরের পুরাতন এক স্থাপিত বটগাছ আছে সেই গাছকে দক্ষিণে রেখে প্রায় মাইল পাঁচেক পশ্চিমে গিয়ে আবার মাইল দুয়েক উত্তরে গেলেই আমার পূর্বজন্মের জন্মভূমিতে পদার্পণ করা যাবে। সেইখানে আমারই বাড়িতে আমার পূর্বজন্মের প্রিয়া সমারোহে বাস করছেন।

পণ্ডিত ঠিক করলে, আমাদের সন্ন্যাসীর বেশে বেরুতে হবে। উপলক্ষ্য নিয়ে হাঙ্গামা ক'রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল, তাই পণ্ডিতের সব কথাতেই তখন আমি রাজি। যাত্রা সম্বন্ধে কিছুকাল গোপনে পরামর্শ চলবার পর একদিন অমাবস্যার অন্ধকারে অর্ধদেহ গৈরিক বসনে আবৃত ক'রে দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল।

পণ্ডিতজীর আদেশ অনুসারে আমি হলুম গুরু, আর সে হ'ল শিষ্য। সারারাত্রি চলি, দিনের বেলায় গ্রামে ডেরাডাণ্ডা ফেলে বসি। কাছে সামান্য কিছু অর্থ ছিল, তা ছাড়া পণ্ডিতের সংস্কৃত শ্লোকের বন্যায় গৃহস্থের ভাণ্ডার থেকে চাল ডাল ঘি ভেসে এসে আমাদের চরণমূলে আশ্রয়লাভ করতে লাগল। যাত্রা শুভই ছিল।

পণ্ডিত গণনা অনুসারে পথ চিনে চলতে লাগল। প্রায় আট-দশ দিন পরে একদিন গভীর রাতে এক গ্রামে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে সে অঙ্ক ক'ষে দেখলে যে, ঠিক স্থানে আমরা পৌঁছেছি, এইখানেই আমাদের আস্তানা করতে হবে।

নন্দনন্দন আমায় উপদেশ দিলে, সমস্ত দিন ধুনির সামনে চোখ বুজে আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে থাকতে হবে; বাকি যা কাজ তা সে করবে এখন। রাতারাতি এদিক সেদিক থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ ক'রে সে ধুনি জ্বালিয়ে দিলে। ভোর হতে না হতে আমি আগুনের সামনে আসন নিয়ে ব'সে পড়লুম।

সকালবেলা গ্রামের মেয়েরা পুকুরে নাইতে এসে সন্ন্যাসী দেখে অবাক! তারা এসে আমার চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ বা স্নান ক'রে ফেরবার সময় আমায় নমস্কার করতে লাগল। একবার চোখ খুলে ব্যাপার দেখেই প্রাণপণে চোখ দুটোকে চেপে বন্ধ ক'রে রাখলুম। থেকে থেকে পণ্ডিত ভীষণ চীৎকার করতে থাকে তারা—তারা। সে চীৎকার শুনে আমারই বুকের মধ্যে গুরগুর করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কাটাবার পর পণ্ডিত তাক বুঝে একটি মেয়েকে ব'লে ফেললে, মা, তোর স্বামীর বড় অসুখ, না?

মেয়েটি তক্ষুনি সজলকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ বাবা, স্বামীর আমার বড় ব্যারাম। পিত্তশূল আছে, ক'দিন বুকের ব্যথায় উঠতে পারছে না।

পণ্ডিত তাকে আর কোন কথা না ব'লে একটা বিকট চীৎকার করলে, তারা।

চোখ বোজা থাকলেও সেবারের চীৎকার শুনে বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেটা অব্যর্থ শর-সন্ধানীর উল্লাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রমণী আবার জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ বাবা, কি হবে? সে কি আর ভাল হবে না?

পণ্ডিত অত্যন্ত উদাসীনভাবে বললে, যা বেটী, যা, ঘরে ফিরে যা। জীবন মৃত্যু এ তো সংসারের নিত্য খেলা।

চোখ বুজেই বুঝতে পারলুম যে রমণী কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাবা, সংসারে

আমার কেউ নেই, আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও বাবা।

পণ্ডিত বললে, গুরুর কৃপা থাকলে বেঁচে যাবে। আমি কে, আমি ওঁর দাস মাত্র।

তা বাবা, তুমি যদি—

রাত্রি বারোটার সময় ওঁর ধ্যান ভঙ্গ হবে। সে সময় আসিস, ওষুধ মিললেও মিলতে পারে।

এই সময় আরও কয়েকটি রমণীকণ্ঠের অস্ফুটধ্বনি আমার কানে ভেসে এল। বুঝলুম, পণ্ডিত বিদাবা আসর জমিয়েছে।

পূর্বোক্ত রমণীটি আবার কাতরস্বরে বললে, দিনের বেলায় ওষুধ পাওয়া যায় না বাবা?

পণ্ডিত 'ওঃ বাবা' বলে শিউরে চীৎকার ক'রে উঠল।

সাপ টাপ কিছু বেরিয়েছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেললুম। কিন্তু পণ্ডিত তক্ষুনি ব'লে ফেললে, গুরুর ধ্যান ভেঙে কি কোটি কল্পকাল নরকগামী হব? কিছু বুঝতে পারিস না বেটী?

বড্ড রক্ষা পেয়েছি মনে ক'রে চোখ দুটোকে চেপে বন্ধ ক'রে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে আবার ধ্যানস্থ হওয়া গেল।

মেয়েটি বললে, আচ্ছা বাবা, তাই আসব।

তারপরে সমস্ত দিন ধ'রে গ্রামের নরনারী একে একে আমার চারপাশ ঘুরে গেল। কেউ বললে, ব্যাটা পাকা ভণ্ড। কেউ বা বললে, না হে, কার মধ্যে যে কি গুণ রয়েছে, কিছু বলা যায় না। বর্ষীয়সীরা বললে, বাবাজীর বয়সটা বড় কাঁচা।

সন্ধের পর যখন ভিড় স'রে গেল, তখন আমার প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। সমস্ত দিন ব'সে ব'সে শিড়দাঁড়া আর সোজা রাখতে পারলুম না, সেইখানেই দেহযষ্টি বিছিয়ে দিলুম। পণ্ডিত প্রায় দু ঘণ্টা ধরে সর্বাঙ্গে তেলমালিশ ক'রে দিয়ে আমায় চাঙ্গা ক'রে তুলে বললে, ওরকম করলে চলবে না, একটু শক্ত হতে হবে। আজ রাতে একজন চরণামৃত নিতে আসবে, তার স্বামীর আরোগ্যের জন্যে। এইটে যদি লেগে যায় তো বাস্, আর দেখতে হবে না।

প্রায় সমস্ত দিন ও অর্ধেক রাত্রির পর পণ্ডিতের হাতের তৈরি খিচুড়ি খেয়ে একটু আরাম ক'রে বসলুম। পণ্ডিতের কিন্তু আর বিরাম নেই। সে খেয়ে উঠেই আসন-পিঁড়ি হ'য়ে ব'সে চীৎকার ক'রে মোহ-মুদ্গর আওড়াতে লাগল, কা তব কান্তা—

এমন সময় সেই অভাগ্যের কান্তা আরও দু-তিনটি রমণীকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে প্রণাম ক'রে একটু দূরে গিয়ে বসল।

পণ্ডিতের শিক্ষামত আমি শিষ্যের উদ্দেশ্যে বললুম, মা লক্ষ্মীরা বড় ভক্তিমতী। এই রাতে সাধুদর্শন করতে এসেছে।

পণ্ডিত বললে, বাবা, এর স্বামীর বড় অসুখ, একটু চরণামৃত দিতে হবে।

একটু হেসে বললুম, আমি আশীর্বাদ করছি, সেরে যাবে।

পণ্ডিত হাতজোড় ক'রে বললে, না বাবা, ওকে দয়া করুন। একটু চরণামৃত দিন।

অত্যন্ত অবহেলাভরে আবার বলা গেল, যার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাকে আমি কি ক'রে বাঁচাব? আমি অতি সামান্য লোক।

বলা বাহুল্য, সব কথাই পণ্ডিতজী আমায় আগেই শিখিয়ে রেখেছিল। আমি কিছুতেই দোব না, সেও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষকালে শিষ্যের আগ্রহে চরণামৃত দিতেই হ'ল। মেয়েরা সবাই প্রণাম ক'রে ঘরে ফিরে গেল।

গুরু সুপ্রসন্ন ছিল, কি অপ্রসন্ন ছিল, বলতে পারি না। দু দিন পরে সেই মেয়েটি আবার এসে প্রণাম ক'রে জানালে যে চরণামৃতের গুণে তার স্বামীর অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে, ভয়ের আর কোন কারণ নেই। আর একটু অমৃত পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পণ্ডিত তাকে ব'লে দিলে, সেই বাটি ধুয়ে জল খাওয়াও, তা হ'লেই চলবে।

যেদিন সেই মেয়েটির স্বামী পথ্য পেলে, সেদিন আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। সকালবেলা স্নান ক'রে সে আমাদের ষোড়শো-পচারে সিধে দিয়ে গেল। তারপর গ্রামের প্রায় সমস্ত নরনারী আমার সামনে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, বাবা, রক্ষে কর।

ধ্যানস্থ হয়ে থাকা আর চলল না। চোখ খুলে সবাইকে হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলুম। পণ্ডিত সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগল। কেউ বললে, ছেলের কালাজ্বর, তাকে সারিয়ে দিতে হবে। কারুর বা মামা মরলে কিছু পাবার আশা আছে, তারই একটা সুরাহা করাতে হবে। কারুর বা মাদুলি চাই। কেউ বা হাত দেখাবে। সবারই চোখে উৎকণ্ঠা আর মুখে বুলি, বাবা, রক্ষে কর।

এতবড় সাংঘাতিক বিপদ মাথায় নিয়ে লোকগুলো এতদিন কি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে ছিল, তা ভেবে আশ্চর্য হতে লাগলুম। সকাল থেকে ভিড় আর ভাঙে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পণ্ডিতের অমন যে বৃষ-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, তাও ভেঙে গেল।

সন্ধেবেলা জলযোগ ক'রে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি, এমন সময় একটি লোক এসে বললে, রাণীমা আপনাদের প্রণাম দিয়েছেন, একবার যেতে হবে।

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে তাকে বললে, আমরা কোন গৃহস্থের আশ্রমে যাই না। রাণীমার প্রয়োজন থাকে, তাঁকে এখানে আসতে বল।

লোকটি বললে, রাণীমা একটু নির্জনে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান।

পণ্ডিত বললে, বেশ, রাত্রি বারোটার পর আসতে ব'লো, তখন লোকজন থাকে না।

লোকটি চ'লে যেতে নন্দনন্দন আমায় বললে, এইবার, এইবার তোমার পূর্বজন্মের পত্নী আসবে। তুমি দেখলেই চিনতে পারবে। তাড়াতাড়িতে কি কিছু হয়? শনৈঃ পন্থা—

উৎসাহের আবেগে সে প্রায় এক মুঠো নস্যি নাকে ঠেসে দিলে।

রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। আমি ব'সে ব'সে প্রিয়তমার কথা ভাবছি। পণ্ডিত বলেছে, দর্শনমাত্রেই তাকে চিনতে পারব। মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, একতরফা চিনলে তো চলবে না, সে আমাকে চিনতে পারবে কি না! এই চেনাশোনার কল্পনায় মশগুল হয়ে গিয়েছি, এমন সময় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে এসে আমাকে একে একে প্রণাম করলে। তাদের সঙ্গে একজন দরোয়ান লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল, সে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলে, রাণীমা এসেছ ?

রমণীদের মধ্যে একজন বললে, হ্যাঁ বাবা, এই এসেছি আমি।

পণ্ডিত বললে, এস মা লক্ষ্মী, গুরুদেবকে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন কর।

রাণী এগিয়ে এসে আমায় প্রণাম ক'রে সামনে বসল। পণ্ডিতজী দরোয়ানের হাত থেকে উজ্জ্বল লণ্ঠনটা নিয়ে আমাদের দুজনের সামনে রেখে দিলে।

আমার বুকের স্পন্দন তখন মিনিটে প্রায় দুশোর কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বেশিক্ষণ চোখ চেয়ে থাকতে পারলুম না। চোখ বুজে স্মৃতিসাগরে ডুব দিলুম, যদি এ মুখের সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায়। হায় হায়! কোথাও তার দর্শন পেলুম না। স্বপ্নে যে দেবী আমায় দেখা দিয়ে আজ এই দুঃসাহসে ব্রতী করিয়েছে, তার মুখ স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও বিস্মরণের সে কঠিন যবনিকা টলল না।

আমার সেই সমাধিস্থ অবস্থা দেখে রাণী বললে, আমি আপনার কাছে কিছু উপদেশ শুনতে চাই। আমি বড় দুঃখী।

চোখ বুজে থাকা আর চলে না। নন্দনন্দনের শিক্ষামত বলতে হ'ল, জানি, আমি সব জানি।

রাণী যেন চমকে উঠল। বললে, আপনি জানেন! আপনি—

জ্যোতিষার্ণব তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, কিছু সঙ্কোচ ক'রো না। ও'কে জীবনের সব কথা খুলে বল, ও'র কৃপা হ'লে তোমার সমস্ত সন্তাপ চ'লে যাবে।

রাণী আর একবার নিজেকে বেশ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে ব'সে বললে, এ দুঃখিনীর জীবন-কাহিনী বড় রহস্যময়, আপনি কি দয়া ক'রে শুনবেন ?

আমি বললুম, শুনব বইকি। বল তুমি।

রাণী একবার এদিক ওদিক চেয়ে বললে, আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলুম। কিন্তু দরিদ্র হ'লেও তিন ছেলের পর মেয়ে হওয়ায় আমার বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র জানতেন। নিজের কোষ্ঠী বিচার ক'রে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, মেয়ে থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু তাঁর এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না। কারণ, আমার কোষ্ঠী বিচার ক'রে তিনি জানতে পারলেন যে, আমার অদৃষ্টে আছে চিরবৈধব্য। অদৃষ্টের এই লিখনকে ফাঁকি দেবার জন্যে তিনি চিন্তা ক'রে আমার বৈধব্যযোগ

খণ্ডাবার এক উপায় আবিষ্কার করলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ও তার তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপের জন্যে তাঁর অনেক ধনী শিষ্য ছিল। এই শিষ্যদের মধ্যে একজন অতিবৃদ্ধের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গোপনে তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। তখন আমার বয়স মাত্র এক বৎসর। সেই সময়ে বিয়ে দেবার উদ্দেশ্য এই যে, বৃদ্ধ মারা গেলেই আমি বিধবা হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্যযোগ যা ছিল তা কেটে যাবে, পরে বয়স হ'লে অন্য লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন।

কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য রকমের। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, মরবার সময় কি মনে ক'রে সে আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আরও পাঁচজন সাক্ষীর সামনে তার বিশাল জমিদারি আমায় দিয়ে গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে এ প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব হ'ল না তিনি নিজ গ্রামের বসবাস তুলে সপরিবারে আমার স্বামীর বাড়িতে এসে বাস করতে লাগলেন। তারপরে আমার যখন বাইশ বছর বয়স, তখন আমার বৈধব্যের বিনিময়ে পাওয়া এই সম্পত্তি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বাবা ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

রাণী এই অবধি ব'লে চুপ করলে। তার কথা শুনে বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। উঃ! নন্দননের কি অদ্ভুত জ্যোতিষ-জ্ঞান! তক্ষুনি তার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতুম, কিন্তু তখনকার মতন সে ইচ্ছা সম্বরণ ক'রে বললুম, আশ্চর্য তোমার জীবন-কাহিনী!

রাণী বললে, ইহকাল তো গিয়েছে, এখন পরকালের জন্যে কিছু সংগ্রহ করতে চাই। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমি বললুম, দীক্ষা নেবার আগে কিছুকাল তোমাকে ধর্ম-উপদেশ শুনতে হবে। সময় হয়েছে বুঝলে আমি নিজেই দীক্ষা দোব।

রাণী বললে, কবে থেকে আমায় উপদেশ দেবেন?

আমি বললুম, যেদিন থেকে তোমার ইচ্ছে। কাল থেকেই এস। তবে এই রকম রাত্রে আসবে, নির্জন না হ'লে অসুবিধে হবে।

রাণী আবার পায়ের ধুলো নিয়ে সে রাত্রের মত উঠে চ'লে গেল।

তারপর থেকে রাণী রোজ রাত্রে আমার কাছে উপদেশ শুনতে আসতে লাগল। রোজ রাত্রে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে আসতে তার অসুবিধে ব'লে সে তাদের বাড়ির পেছন-দিককার বাগানের এক কোণে আমাদের জন্যে সুন্দর একটি কুটীর তৈরি করিয়ে দিলে। সেখানে তার দরোয়ানদের তাড়ায় বাইরের লোকজন বেশী আসতে পেত না। রাণী প্রায় সকল সময়ই আমাদের কুটীরে আসত যেত। সকালে আমি যোগস্থ ব'লে সে আমার শিষ্য নন্দনের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, আর রাত্রিবেলা ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে আমি তাকে শাস্ত্র শোনাতুম। শাস্ত্র মানে চাণক্য শ্লোক, তার বেশী শাস্ত্র আমার জানা ছিল না।

পণ্ডিতজীর ঘর ছিল আমার ঘরের পাশেই। একই চালার মাঝে দেওয়াল দিয়ে দুটো ঘর করা হয়েছিল। সে যা বলত, তা আমি প্রায় সবই শুনতে পেতুম। একদিন শুনলাম, পণ্ডিত রাণীকে বলছে, রাণীমা তোমার স্বামী

আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয় ?

স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তার সঙ্গে ইতিপূর্বে রাণীর এ সম্বন্ধে আরও কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতের প্রশ্ন শুনে রাণী বললেন, কোথায় আছেন তিনি একবার দেখাও বাবা।

নন্দনন্দন মুখে একবার চকচক আওয়াজ ক'রে যেন আপনার মনেই বললে, বেটী, এখনও চিনতে পারলি না ! যাক, সময়ে সবই চিনবি।

চাণক্য-শ্লোক শেষ হয়ে গেল। হিতোপদেশের গোটাকতক শ্লোক তখনও মুখস্থ ছিল ; তাই আওড়াতে লাগলুম। শ্লোকগুলোর মধ্যে বেদান্তদর্শনের এমন গূঢ় অর্থ গোপন রয়েছে দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগলুম। সংস্কৃত শ্লোক আওড়াবার ধরন-ধারণ দেখে আমার প্রতি রাণীর ভক্তির মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। ওদিকে জ্যোতিষার্ণব প্রত্যহ সকালে দু ঘণ্টা তার গুরুর গুণবর্ণনা ক'রে রাখে, রাণীর মনটা আমার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করবার মতন তৈরি ক'রে রাখে, এই রকমে দিন কাটছে, এমন সময়ে একদিন পণ্ডিতকে বললুম, ওহে আসল কাজের কি হ'ল ? এ অবস্থায় আর কতদিন কাটাতে হবে ?

পণ্ডিত বললে, আর কটা দিন সবুর কর। এখন ব্যস্ত হ'য়ো না, তীরে এসে তরী ডুবিও না।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন নন্দনন্দনের শিক্ষামত রাণীকে বললুম, দেখ, তুমি কাশীতে একটি বাবার ও একটি মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। উপযুক্ত সেবায়েত নিযুক্ত কর। তোমার পরকালে সদ্গতি হবে।

রাণী যেন আমার মুখে এই পরামর্শটি পাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে বললে, আপনি যদি সেবার ভার নেন, তা হ'লে আমি টাকা দিতে পারি। আমি আর কাকেই বা চিনি, বিশ্বাসই বা কার কাকে ?

আমি বললুম, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আজ এখানে আছি তো কাল সেখানে। ওসব টাকাকড়ির ভার আমি নিতে পারব না।

রাণী বললে, টাকাকড়ির হিসেব আপনার শিষ্য দেখবে, আপনি খালি তাদের খাটাবেন আর বাবা-মার সেবা করবেন।

আমি এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে পারব না ব'লে তখনকার মতন রাণীকে বিদায় করলুম, কিন্তু শেষ কালে সে কিছুতেই ছাড়লে না। হ্যাঁ-না করতে করতে নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হ'ল।

পরদিন থেকে আমরা তিনজনে মিলে মন্দিরনির্মাণের খরচ ও অন্যান্য বিষয়ের হিসেবপত্র শুরু করলুম। অনেক পরামর্শের পর স্থির হ'ল মন্দির তৈরির জন্যে লক্ষ টাকা খরচ হবে। রাণী এই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আমার নামে লিখে দেবে। আমি টাকা নিয়ে কাশীতে গিয়ে মন্দির স্থাপন করব। তারপর ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে তাদের খরচের জন্যে সে একখানা তালুক লিখে দেবে।

সেদিন রাত্রে আনন্দের আতিশয্যে আমাদের ঘুমই হ'ল না। ঠিক হ'ল, মন্দির তৈরির টাকা থেকে বেশ দু-পয়সা থাকবে, তার ওপর সেবায়েতের টাকা আছে। যাক, ভবিষ্যৎ জীবনটা নিরুদ্বেগে কাটবার এতদিনে একটা সুবিধে হ'ল।

পরদিন রাণী এসে বললে, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কথা শুনে তার ভাইয়েরা ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

কথাটা শুনে একেবারে দশ হাত মাটির নীচে ব'সে গেলুম।

পণ্ডিত প্রশ্ন করলে, বিষয় আশয় কি ভাইদের নামে লিখে দিয়েছ নাকি?

রাণী বললে, না, তা দিই নি, কিন্তু তারা সব দেখা-শোনা করে। টাকাটা তারাই তুলবে কিনা।

আমাদের মুখের ভাব দেখে রাণী আশ্বাস দেবার জন্যে বললে, কিন্তু তা হ'লেও আমি টাকা দোবই।

টাকা হাতে এসে ফসকে যায় দেখে দ'মে গেলুম। পণ্ডিত বললে, টাকা আসবেই আসবে। দেখ না, এমন একটা ক্রিয়া করব যে ভাইয়েরা এক লাখের জায়গায় দু লাখ এনে হাজির করবে।

পণ্ডিত এক অমাবস্যা দেখে খুব সমারোহ ক'রে কি একটা যজ্ঞ করলে। কিন্তু সেবার সে নিশ্চয় গুনতে ভুল করেছিল, কারণ সে ক্রিয়া রাণীর ভাইদের মনে কোন ক্রিয়াই করতে পারলে না।

রাণীও ক্রমে নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। সে বললে, আমি বিষয়ের মালিক হ'লেও ভাইয়েরা সব দেখে শোনে ব'লে প্রায় গ্রামসুদ্ধ লোক তাদের অনুগত। গ্রামের সবাই নাকি রাণীর এই সৎকার্যে বাধা দিচ্ছে।

রাণী আরও বললে, ভাইয়েরা বলেছে যে, যদি তাদের অমতে টাকা দেওয়া হয়, তবে সন্ন্যাসীকে তারা দেখে নেবে।

সেইদিন রাতেই পণ্ডিতকে বললুম, আর নয় দাদা, এই বেলা স'রে পড়ি, এস। নইলে বরাতে দুঃখু আছে। এ বয়েসে অনাহার যদি বা দু-একদিন সয়, লাঠি সহ্য হবে না, সে কথা আগে থাকতে ব'লে রাখছি।

পণ্ডিত হুংকার ছেড়ে বললে, কি, আমাদের মারবে! দেখি না কত বড় মারণবাজ তারা! বাণ মেরে সব ঠাণ্ডা ক'রে দোব না!

নন্দনন্দন আমার কথা না শুনে রাণীকে সৎকাজে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগল। শেষে রাণী একদিন আমাকে বললে শিগগির একটা তালুক থেকে হাজারতিরিশ টাকা আসবার কথা আছে। টাকার সিন্দুকের চাবি থাকে আমার কাছে, সেই টাকা আপনাকে এনে দোব। এমনই ক'রে দু-তিন বারে লাখ টাকা পুরিয়ে দোব।

পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হল, লাখ টাকা যখন পাওয়া গেল না, তখন আপাতত তিরিশ হাজারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে বললে, এই টাকা নিয়ে তুমি কাশী গিয়ে জমি কেনবার ব্যবস্থা কর, আমি এখানে থেকে বাকি টাকার তাগাদা করি।

সে আমাকে ভরসা দিয়ে বললে, তোমার কোন ভয় নেই। আমি আছি, টাকা না নিয়ে এক পা নড়ছি না।

সেই সাব্যস্ত হ'ল। পণ্ডিত থাকবে আর আমি যাব। সে রোজই রাণীকে তাগাদা দিতে লাগল, কই গো মা লক্ষ্মী, টাকার কতদূর কি হ'ল?

রাণী রোজই আশ্বাস দেয়, এইবারে আসবে বাবা।

সেদিন সন্ধ্যের সময় আমার ঘরের মধ্যে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নি। আমি ও পণ্ডিত অন্ধকারে ব'সে ভবিষ্যতের পরামর্শ করছি, এমন সময়ে ধীরে ধীরে রাণী সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

পণ্ডিত উঠে বাতি জ্বালাতে গেল। আমি বললুম, এস রাণী, আজ সমস্ত দিন বড় ব্যস্ত ছিলে বুঝি?

রাণী আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। আমি তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, কি হয়েছে, এত কান্না কিসের?

রাণী কাঁদতে কাঁদতে যা বললে তার অর্থ এই যে, আমেদপুরের নায়েব ত্রিশ হাজার টাকা খাজনা পাঠিয়েছিল, পথে ডাকাতেরা সে টাকা লুঠে নিয়েছে। সে স্পষ্টই বললে, ডাকাত-টাকাত সব মিথ্যে কথা, এ নিশ্চয় আমার ভাইদের কাজ।

রাণী আবার আমার পায়ে মাথা গুঁজে পড়ল। সে বললে, আমার ইহকাল তো গিয়েছেই, ঠাকুরকে মানত ক'রে দিতে পারলুম না, আমার পরকালও গেল।

রাণীর অবস্থা দেখে আমার সত্যই দুঃখ হ'ল। নিজের দোষের কথা আর মনে পড়ল না, যত রাগ হতে লাগল নন্দনন্দনের ওপরে। সেই তো যত নষ্টের গোড়া। ভদ্রলোকের মেয়ে সুখে ভাইদের নিয়ে সংসার করছিল, কোথা থেকে আমরা জুটে তার মনের শান্তি তো নষ্ট করলুমই, সংসারের শান্তিও গেল। আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম, রাণী, ঠাকুরের কাছে মানত করেছ ব'লে যে আজই দিতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। তোমার যখন সুবিধে হবে, তখন দিও। তার ওপরে বিশেষ একটা কাজে এখান থেকে আমায় চ'লে যেতে হচ্ছে। এখন টাকা পেলেও কাজের সুবিধে হবে না।

রাণী আমার কথা শুনে কান্না শুরু করলে। সে বললে, না না, আপনি কোথাও যাবেন না। এখানকার সবাই আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, একমাত্র আপনারাই আমার বন্ধু। কাশীতে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে এই পাপ-পুরী ছেড়ে আমিও আপনাদের সঙ্গে চ'লে যাব। আপনি আমায় চরণে ঠেলবেন না।

এই কথা ব'লে রাণী আবার আমার পায়ে মাথা গুঁজলে। নন্দনন্দন দূরে ব'সেছিল, একবার চেয়ে দেখলুম যে, মুখখানা তার বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠেছে। আমার মুখে সান্ত্বনার ভাষা যোগাচ্ছিল না, ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

এই ভাবে কতক্ষণ কেটেছিল বলতে পারি না, হঠাৎ একটা বিরাট গোলমালে

চমক ভাঙল। রাণী আমার পা থেকে মাথা তুলতেই ঘরের মধ্যে একেবারে দশ-বারোজন লোক চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকে পড়ল। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালুম, ব্যাপার কি ?

রাণীর এক ভাই চেঁচাতে লাগল, ব্যাটা বদমাইস, ভদ্রলোকের কুল মজিয়ে বেড়াও !

আর এক ভাই ব'লে উঠল, যবে থেকে ঢুকেছে, সংসারটা একেবারে লণ্ডভণ্ড ক'রে খাচ্ছে !

বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চীৎকার করতে লাগল, মারো, মারো—

আমি যে কি করব, তা ঠিক করতে পারলুম না। ততক্ষণে আমায় ঘিরে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। রাণী আমার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার দিকে কিছুক্ষণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে ঘুরে মাটিতে প'ড়ে গেল।

রাণীকে ওই ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়তে দেখে লোকগুলো যেন আরও ক্ষেপে উঠল। চারিদিকে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু হ'ল, জল নিয়ে এস, হাওয়া কর, জায়গা ছাড়—

আমি যে কি করব, কিছু ঠিক করতে না পেরে সেই অবসরে চিমটেটা মাটি থেকে তুলে নিলুম।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, আগে চ্যালা ব্যাটাকে মারো, সেইটেই আসল বদমাইস।

সবাই মিলে চ্যালার অনুসন্ধান করতে লাগল। কিন্তু কোথায় সে ? চ্যালা যে গুরুর চেয়ে কত বেশি ওস্তাদ, সে খবর তো আর তারা জানে না ! পণ্ডিতকে না পেয়ে তারা আবার আমাকে আক্রমণ করলে। এতক্ষণ তারা আমায় কিছু বলে নি, কিন্তু এবার তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হতে লাগল, দু-এক ঘা না দিয়ে বোধ হয় ছাড়বে না। সাবধান হতে না হতে এক গাছা লাঠি পেছন থেকে ধাঁ ক'রে আমার বাঁ কাঁধে এসে পড়ল। বাল্যকাল থেকে লাঠির সঙ্গে সম্পর্কটা আমার খুব ঘনিষ্ঠ হ'লেও, সেদিন সে আমায় কর্তব্য নির্ধারণের পথ যত সহজে চিনিয়ে দিলে, এমন আর কোনও দিন দেয় নি। কোনও চিন্তা না ক'রে চিমটে ঘোরাতে ঘোরাতে সামনের দরজা দিয়ে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম। দু-চারজন লোক তেড়ে এসেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে চিমটের ত্যাগচায় একজন ধরাশায়ী হতেই তারা দাঁড়িয়ে গেল। তারপরে আঁদাড় পাঁদাড় পগার ডোবা পেরিয়ে, কাঁটানটে শেয়ালকাঁটা বাবলাকাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা করা গেল।

তারপর প্রায় দশ-বারো দিন পদব্রজে ঘুরে ঘুরে শহরে ফিরে এলুম। পূর্বজন্মের প্রিয়ার বরাতে নেহাত দ্বিতীয় বার বৈধব্যযোগ ছিল না, তাই কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলুম।

আড্ডায় ফিরে আসতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এস এস, কোথায় ছিলে এতকাল ?

বক্তৃতা সেসব অনেকদিন চুকে গিয়েছে, আর নয়।

আমরা তাকে ধ'রে বললুম, কেন চুকে গিয়েছে?

জগদীশ বলতে লাগল—

নারীর উন্নতি ও নারীর কল্যাণসাধনাকে একদিন জীবনের প্রধান ব্রত করেছিলুম। সভা সমিতিতে আমার বক্তৃতা, মাসিকে সাপ্তাহিকে আমার প্রবন্ধ দেশের সনাতনপন্থীদের ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। আমাদের বংশ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। আমার মা, খুড়ী, পিসী, ঠাকুমা এঁরা সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে পেতেন না। পাল্কি ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আমার বাবার এক পিসীর সদ্য সদ্য গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছিল। ছেলেবেলায় খুড়োদের এই নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি। এমনই পবিত্র পরিবারের একমাত্র বংশধর আমি যখন আমার স্ত্রীকে নিয়ে সভা-সমিতিতে যেতে আরম্ভ করলুম, বন্ধুসমাজে স্ত্রীকে অবাধে মিশতে দিলুম, তখন সমাজে একটা বিপুল আন্দোলনের ঢেউ উঠল। দু-একখানা বাংলা খবরের কাগজে ব্যঙ্গচিত্রও ছাপানো হয়েছিল। কিন্তু এসব বাধা উপচে আমার উৎসাহের স্রোত গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের আকারে ছুটতে লাগল। উভয় পক্ষে তুমুল মসীযুদ্ধ, সভা সমিতিতে বাক্‌যুদ্ধ দু এক জায়গায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেল। কয়েক বছর এই রকম অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিপক্ষদলের উৎসাহে যেন ভাটা প'ড়ে এল। আমার দলে তখন অনেক লোক; বিপক্ষদলের অনেকেও কেউ সোজা ভাষায় কেউ বা ভাবে আমাদের মত সমর্থন করতে আরম্ভ করেছে, কোনও রকম বাধা না থাকায় আমাদের কাজ ধা ধা ক'রে এগিয়ে চলেছে, স্ত্রীশিক্ষার দুটো তিনটে প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়েছে, এই রকমে জয়ের নেশায় মন যখন আমার ভরপুর, ঠিক সেই সময় উড়ো চিঠি একখানা কানে এসে ব'লে গেল—নির্মলের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর ব্যবহারটা একটু সন্দেহের চোখে দেখো। এখন থেকে সাবধান না হ'লে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে। ইতি তোমার বন্ধু।

আমি তখন টেবিলে ব'সে কি একটা কাজ করছিলুম। কাজ-টাজ সব চুলোয় গেল। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। নির্মল! সংসারে সবচেয়ে বড় বন্ধু আমার সে। সে আমায় এতবড় আঘাত দেবে?

নির্মল, আমি ও শান্তি আমরা একই গ্রামের ছেলেমেয়ে। আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি বললেও চলে। আমি ও নির্মল একসঙ্গে স্কুল ও কলেজে পড়েছি; কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনে হাত-ধরাধরি ক'রে সংসারের কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছি। সে আমার সমস্ত কাজের সর্বপ্রধান সহায়, সেই নির্মল! আমার মাথার ভেতর ঝিঁ ঝিঁ বাজতে লাগল, টেবিলে মাথা দিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইলুম। বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা হতে লাগল, আর সে রকম ব'সে থাকতে না পেরে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার সময় শান্তি বললে, এখন বেরোচ্ছ যে? অপেরা হাউসে যাবে না, সীট বুক করা হয়েছে যে! আমি বললুম, তুমি যেও, বিশেষ একটা কাজে আমার যাওয়া হ'ল না।

শান্তি অবাক হয়ে আবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি আর কথা না ব'লে তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে চ'লে গেলুম।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে নির্মল ও শান্তির ব্যবহারটা ভাল ক'রে আলোচনা করতে লাগলুম। নির্মল সর্বদাই আমার বাড়িতে আসে। আমার অনেক বন্ধুই আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করত, কিন্তু নির্মলের মত ঘনিষ্ঠতা আর কারও সংগে ছিল না। নির্মলের প্রতি শান্তির বিশেষ পক্ষপাতিতা দেখা যেত। অন্য বন্ধুদের চাইতে নির্মলের সংগ তাকে বেশী আনন্দ দিত। অনেক সময় রাত্রে বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, সে আর শান্তি ব'সে গল্প করছে। শান্তি আমাকে না জানিয়ে দিয়ে তাকে অনেক জিনিস কিনিয়ে আনত। আমি জানতে পারলে সে বলত, তোমার এত কাজ—

ওঃ, এতদিন যেসব ঘটনাকে অতি তুচ্ছ ব'লে মনের কোণেও স্থান দিই নি, আজ সেই সব ঘটনা এক একটা রহস্যের ভাণ্ডার ব'লে মনে হতে লাগল।

কিন্তু শান্তি! তার প্রবৃত্তি কি এত নীচ হবে? তাই যদি হয়, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আপনার ব'লে যাদের বুকে জড়িয়ে ধরেছি, সকলের চেয়ে বড় বেদনা যদি তাদের কাছ থেকেই পাই, তবে আর বিশ্বাস করব কাকে? নির্মল আমার জীবনবন্ধু, আর শান্তি আমার প্রিয়তমা।

সংসারের ওপর একটা দারুণ ঘৃণা আমার মনের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলোকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল। বার বার মনে হতে লাগল, এই নারী! এরই কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি? ধিক আমাকে।

রাত্রি দশটা অবধি দম-দেওয়া পুতুলের মত শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন দেহ ও মন আমার অবসাদে ভ'রে গিয়েছে। শান্তি তখনও থিয়েটার দেখে ফেরে নি। খেতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, জুতোজোড়া খুলে ফেলে আমি শুয়ে পড়লুম। বুকের পকেটে সেই উড়ো চিঠিখানা ছিল, তারই মারাত্মক স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে বিষের দাহন ছড়িয়ে দিচ্ছিল; তবু সেখানাকে অন্য কোথাও রেখে শুতে পারলুম না। বিছানায় প'ড়ে ছটফট করতে লাগলুম।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। দরজায় মোটর দাঁড়াবার শব্দ হ'ল, বুঝলুম, শান্তি এসেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে খটখট ক'রে উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল, আমি চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম। শান্তি কাপড় ছাড়ছে, এমন সময় নির্মল নীচে থেকে চেঁচিয়ে বললে, জগদীশ এসেছে? না আমি একটু বসব?

শান্তি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, উনি এসেছেন। নির্মল বোধ হয় চ'লে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে শান্তি আমায় ঠেলে তুলে জিজ্ঞাসা করলে, খাও নি কেন?

শরীরটা ভাল নেই।—ব'লে আবার পাশ ফিরলুম। আমার ব্যবহারে শান্তি বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। সে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ খাটের ধারে ব'সে রইল, তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

আমার চোখে নিদ্রা নেই। নানা রকম অদ্ভুত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে

মাথার ভেতর নাচন শুরু করেছিল। থেকে থেকে শান্তির উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখে চোখে কানে এসে লাগছিল, মুমূর্ষু রোগীর কানের কাছে শ্যালিকার পরিহাসের মত। এক-একবার মনে হতে লাগল যে, শান্তিকে জিজ্ঞাসা করি, কিসের জন্যে সে আমাকে ছেড়ে নির্মলের প্রতি আসক্ত হয়েছে? নির্মল, সে আমার চেয়ে কিসে বড়, কোন বিষয়ে উন্নত? জিজ্ঞাসা করি, আমার এই বুক-ভরা ভালবাসার কি এমনই ক'রেই প্রতিদান দিতে হয়? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ল না, আমার সমস্ত পৌরুষ উদ্যত হয়ে সে প্রলোভনের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে লাগল।

হঠাৎ শান্তির একখানা হাত আমার গলার ওপর এসে পড়ল। তার সেই হাতে কি মাখানো ছিল, জানি না, সেই হাতের স্পর্শ পাবামাত্র আমার দগ্ধ অন্তর যেন জুড়িয়ে গেল। আমি দু হাতে তার হাতখানাকে চেপে ধ'রে বুকের ওপর রাখলুম। এই শান্তিকে আমি অবিশ্বাস করেছি! ছি ছি, আমার মত পাষণ্ড আর নেই। কে কোথায় নিজের মনের বিষ উদ্গার ক'রে চিঠি লিখেছে, আর আমি সেই চিঠিতে বিশ্বাস ক'রে নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করছি! কি নির্বোধ আমি! শান্তির স্পর্শ আমার দেহ ও মনে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল। তার হাতখানা বুকের ওপর রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন উঠলুম, তখন বেলা প্রায় নটা।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার মনের অবসাদ একেবারে কেটে গিয়েছে। আমার জন্যে নির্মল ব'সে ছিল। সেদিন বিকেলে এক সভায় আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। নির্মল সেই সম্বন্ধে কি বলতে এসেছিল। সভার কথা ওঠবামাত্র শান্তি বললে, না না, উনি আজ সভায় যাবেন না ওঁর শরীর খারাপ।

তারপর সে আমার দিকে ফিরে বললে, তুমি দিনকয়েক এই সব হুল্লোড় ছেড়ে দাও। দিনে দিনে শরীরের অবস্থা কি হচ্ছে, একবার দেখেছ? শরীর গেলে নারীর উন্নতি যা হবে তা বুঝতেই পারছি, মাঝ থেকে ঘরের নারীটির প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবে।

শান্তির কথা শুনে নির্মল হো-হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল। তারপর সে বললে, এ কথাটা বেশ বলেছ বউদি, কিন্তু ভাই আজকের মতন জগদীশকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি, না হ'লে আমার মাথা কাটা যাবে। সকালবেলাটা হাসি-ঠাট্টায় মন আমার একেবারে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, গত রাত্রির চিন্তার জন্যে নিজের মনে অনুতাপ হতে লাগল। নিজের মনকে বার বার ধিক্কার দিয়ে বললুম, শান্তিকে কি ব'লে অবিশ্বাস করেছিলুম? আর নির্মল, সে যে আমার ভাইয়ের চেয়েও বেশি। তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সে যা ছেলে, আমার কথা শুনলে পাছে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে, এই ভয়ে কাউকে কোন কথা না ব'লে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে চেপে গেলুম। বিকেল নাগাদ সেই উড়ো চিঠির কথা আর মনেই রইল না।

শান্তি যা আশঙ্কা করেছিল, ঠিক তাই হ'ল। কয়েক মাস অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সাংঘাতিক রোগে আমাকে শয্যাশায়ী হতে হ'ল। এই রোগে প্রায় পাঁচ মাস আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। রোগের প্রথম অবস্থায় কে আমার সেবা করছে, কে আমার চিকিৎসা করছে, তার কোনও জ্ঞানই আমার ছিল না। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে আমার মস্তিষ্কের গোল হয়ে গিয়েছিল। সংসারে আমার নিকট-আত্মীয় কেউ ছিল না, কিন্তু আমার যা সহায় ছিল, তা আত্মীয়ের চেয়ে ঢের বেশি। আমার অর্থ ছিল, আমার স্ত্রী ছিল, আর ছিল আমার বন্ধু নির্মল। এদের সেবা ও শুভ ইচ্ছা আমার রোগে সঞ্জীবনী সুধার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছিল।

রোগের মধ্যে প্রথম যেদিন আমার জ্ঞান হ'ল, সেদিনকার কথা কখনও ভুলব না। তখনও আমার অজ্ঞানের কুয়াশা ভাল ক'রে কাটে নি; সব কথা আমি ভাল ক'রে গুছিয়ে ভাবতে পারছিলুম না। চোখ চেয়ে দেখলুম, ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। শান্তি আমার বিছানায় আমার পাশে ব'সে ছিল। অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকেও তাকে চিনতে পারলুম না। খালি মনে হতে লাগল যে, এই শীর্ণ ম্লানা নারীটি কে আমার পাশে ব'সে রয়েছে? আমার সেবার জন্যে কি নার্স আনা হয়েছে? আমাকে তার কাছে রেখে শান্তি স্নান করতে গেছে মনে ক'রে আবার চোখ বুজলুম। কিন্তু চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে আমার কষ্ট হতে লাগল, শান্তিকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি চোখ চেয়ে বললুম, শান্তি কোথায়, একবার তাকে ডেকে দিন না।

শান্তি আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে শান্তি।

তুমি শান্তি! তোমার এই দুর্দশা হয়েছে!

আমি আর তার দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না, চোখ বন্ধ ক'রে ফেললুম। শান্তি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রোগ শয্যা ছেড়ে উঠলুম। দিনে দিনে আমার শরীর সুস্থ হতে লাগল বটে; কিন্তু আমার দেহের সমস্ত রোগ আমার মনটাকে আঁকড়ে ধ'রে রইল। দেহ সুস্থ অথচ মন অসুস্থ, এ অবস্থা যার না হয়েছে, সে তা কল্পনা করতে পারবে না। যুক্তি-তর্ক-মন দিয়ে নিজের বুদ্ধিকে আমি টেনে রাখতে চেষ্টা করছি, অন্য দিকে একটা বিরাট শক্তি আমার বুদ্ধিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। মনের মধ্যে দিবারাত্রি এই দুই শক্তিতে টানাটানি চলতে চলতে কখনও কখনও আমি যুক্তি হারিয়ে ফেলতুম। সে সময় আমার আর জ্ঞান থাকত না, আমি যা-তা কাণ্ড ক'রে ফেলতুম। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দু-একটা এমন কাণ্ড ক'রে ফেললুম যে, তারা বিরক্ত হয়ে আমার বাড়িতে আসা বন্ধ ক'রে দিলে। শান্তিকে যখন তখন যা-

তা বলতুম, সে কখনও রাগ করত, কখনও বা একলা ব'সে কাঁদতে থাকত। আমার মনের খোঁজ কেউ করত না। মনের খোঁজ করবে কি, আমার মাথার অবস্থা তখনও কেউ ভাল ক'রে বুঝতেই পারে নি। নির্মল কিন্তু তখনও আমার বাড়িতে আসত, সে যে ছিল আমার জীবনবন্ধু।

আমি দেখতুম, মাঝে মাঝে শান্তি ও নির্মল কি পরামর্শ করে। তাদের কথাবার্তার মাঝখানে যদি কখনও গিয়ে পড়েছি, বেশ বুঝতে পারতুম যে, তারা আগের কথা থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা শুরু ক'রে দিয়েছে।

আবার সেই উড়ো চিঠি উড়ে এসে আমার কানে বিষ ঢেলে দিয়ে যেতে লাগল। আমার অসুস্থ মন তখন আর কোন যুক্তি-তর্ক মানতে চাইত না। চিন্তার ধারা একবার বইতে আরম্ভ করলে উধাও হয়ে ছুটে চলত, তাকে কিছুতে রোধ করতে পারতুম না।

মধ্যে মধ্যে আমার মনে হ'ত, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? এই কথা মনের মধ্যে উদয় হবামাত্র আমি অস্থির হয়ে পড়তুম। নিজেকে সামলাতে পারতুম না, একটুখানি আশ্রয় পাবার জন্যে ছুটে শান্তির কাছে পালিয়ে যেতুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতুম, নির্মল ব'সে আছে। হতাশায় মাথা ঘুরতে থাকত, টলতে টলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরের চৌকিতে শুয়ে পড়তুম।

তখন আমার মাথা ও মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় একদিন বিকেলে আমি ছাতের ওপর আলসের ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি; রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, কি জানি কেন, মনে হ'ল যে, এখান থেকে প'ড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আগেই বলেছি যে, চিন্তা একবার শুরু হ'লে তাকে অন্য পথে ফেরানো আমার অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। সে কথা ভাবতে ভাবতে কে যেন আমাকে ছাদের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বার প্রলোভন দেখাতে লাগল। আর একটু হ'লেই আমি সেদিন নীচে লাফিয়ে পড়েছিলুম আর কি! আলসের কানায় আমার ধুতিখানা কি ক'রে বেধে গিয়ে টান পড়তেই আমার চমক ভাঙল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন চড়াক ক'রে একটা তড়িৎ-তরঙ্গ খেলে গেল; আমি ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে একটা ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে দেখি, শান্তি আর নির্মল ব'সে গল্প করছে। সেদিন আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, মুখে যা এল, তাই ব'লে দুজনকে গালাগালি দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

নির্মল মুখটি চুন ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর শান্তি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে আমার হাত ধ'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগল। শান্তি আমায় একটি কথাও বললে না, আমিও আর তাকে কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম।

সকালবেলা আমাকে দেখবার জন্যে একজন নতুন ডাক্তার এলেন, সঙ্গে নির্মল। ডাক্তার আমাকে বায়ু-পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন।

বায়ু-পরিবর্তনের কথা শুনে আমি প্রস্তাব করলুম যে, দেশে যাওয়া যাক। দেশে আমাদের পুরনো বাড়ি ভেঙে আমি নতুন ধরনের বাড়ি তৈরি করেছিলুম।

আমার বাগান দেখবার জন্যে গ্রামান্তর থেকে লোক আসত। আমাদের দেশ তখন বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা ছিল। আমার প্রস্তাবে শান্তিরও অমত হ'ল না। আমরা দেশে গিয়ে বাস করতে লাগলুম।

দেশে ফিরে এসে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে আমার স্বাস্থ্যের একটু একটু ক'রে উন্নতি হতে লাগল, মাথার অসুখটাও অনেক ক'মে এল। আমি আমার আগের স্বাস্থ্য প্রায় ফিরে পেলুম।

মনের অবস্থা একটু ভালো হতে না হতেই আমি আবার কাজে মন দিলুম। একখানা উপন্যাস অর্ধেক লেখা হয়ে প'ড়ে ছিল, দিনরাত ব'সে সেখানা শেষ করতে লাগলুম। দেশে সভা-সমিতির হাঙ্গামা কিছুই ছিল না, ভাববার সময়ও যথেষ্ট, কাজে একটু একটু ক'রে উৎসাহও লাগছিল। ভাবলুম, দেশে এখন কিছুদিনের জন্যে থাকব।

ওদিকে শান্তি শহরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অবশ্য, মুখে কিছু বলত না, কিন্তু আমি বুঝতে পারতুম যে, শহরের কর্মকোলাহল, সভা-সমিতির উন্মাদনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ব'সে একঘেয়ে রোগীর সেবা করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। শহরে থাকতে আমি সব সময় শান্তিকে নিয়ে ঘুরতে পারতুম না, নির্মল অনেক সময় তাকে এখানে সেখানে নিয়ে যেত। এখানে নির্মল নেই, সে কলকাতায় ব্যবসা করে; সেসব ছেড়ে নিয়ে গ্রামে এসে আমার মতন চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও সে প্রায়ই এসে গ্রামে দিন কতক ক'রে থেকে যেতে লাগল। নির্মল যে কটা দিন থাকত, বেশ বুঝতে পারতুম যে, সে দিনগুলো শান্তির বেশ আনন্দেই কাটছে। শান্তি নির্মলের সঙ্গে অবাধে মিশত ব'লে গ্রামের লোকেরা অনেক কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু সেসব কথা আমি গ্রাহ্যই করতুম না। তবুও আমার মন বুঝতে পারছিল যে, আমার সঙ্গ শান্তিকে আর তেমন আনন্দ দিতে পারছে না। আমি মনে মনে স্থির করলুম যে, উপন্যাসখানা শেষ ক'রে কলকাতায় যাব, তারপর যে দিকে চোখ যায়, সেই দিকে বেরিয়ে পড়ব। শান্তি যদি আবার কোনও দিন আমার অভাব অনুভব করে, তবেই ফিরে এসে আবার কাজে মন দোব, নচেৎ এই শেষ।

শান্তিকে ছেড়ে চ'লে যাব—এ চিন্তা আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল। কিন্তু তবুও যেতে হবে; উপায় নেই। সমস্ত ব্যাপারটা আমি শান্তির দিক দিয়ে বিচার করতে লাগলুম। শান্তি আমায় ভালবাসত, আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সে অমাকে তার চেয়ে কিছু কম ভালবাসত না। কিন্তু একজন নারী অথবা একজন পুরুষ যদি সারা জীবন ধ'রে একজনকেই ভালবাসতে না পারে? সকলের পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। জীবনধারণ তো ওষুধ গেলা নয় যে, কোন রকমে সেটা ঢোক ক'রে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। এই রকম কথা ভাবতে ভাবতে আমি পাগলের মত হয়ে উঠতুম, এক-একবার মনে হ'ত শান্তিকে খুন ক'রে নিজে আত্মহত্যা করি; কিন্তু তখনই আবার মনে হয়েছে, শান্তিকে কি ক'রে খুন করব?—না না,

তা পারব না। তবে? —তবে আমাকেই বিদায় নিতে হবে। তার সুখের পথে কাঁটা হয়ে আমি থাকব না। সে থাক্‌ সুখে থাক, আমি চ'লে যাব—এই আমার ভালবাসার পুরস্কার।

আমি ঠিক ক'রে ফেললুম যে, উপন্যাসখানা শেষ ক'রেই একদিন নিঃশব্দে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ব। বিশাল এই সংসারের বুকের ওপর দিয়ে কাজ ও অকাজের যে স্রোত ব'য়ে চলেছে, তারই মুখে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভেসে চ'লে যাব, দিনের শেষে সে আমায় যে ঘাটে তুলে দিয়ে যায় যাবে, কোনও দিকে ফিরে চাইব না। শান্তিকে ছাড়তে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু আমি চলে গেলে সে সুখে থাকবে। আমি বাড়িতে থাকতে থাকতেই তাকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলুম। তাকে দেখলে দূরে স'রে স'রে যেতুম, কথা কইতে এলে কাজের ছুতো ক'রে আমি অন্যত্র চ'লে যেতুম। উপন্যাস লেখবার নাম ক'রে লেখবার ঘরেই শুয়ে কাটাতুম। এমনই ক'রে আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগল।

তারপর সেই রাত্রি, শান্তির সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা। রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছে। আমি টেবিলে বসে একমনে মাথা হেঁট করে লিখছি, এমন সময় শান্তি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিলুম যে, নির্মল আর আমাদের বাড়ী আসছে না। শান্তির বোধ হয় একা মন-কেমন করছিল। ইদানীং আমি তার সঙ্গে কথা বলা এক রকম বন্ধ ক'রেই দিয়েছিলুম। শান্তি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরেও আমি মুখ তুললুম না। একটু পরেই সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, চল, শুতে যাই, আর লিখো না। আমি বললুম, তুমি যাও শোও গে, আমি এইখানেই শোব।

কথাগুলো আমার নিজের কানেই কর্কশ শোনাল। আমি অনুভব করছিলুম, শান্তির হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের ওপর থেকে ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তারপর সে হঠাৎ হাতখানা কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালবেলা উঠে শুনলুম, শান্তি নেই।

আমাদের বিয়ের সময় শান্তিদের বাড়ি থেকে তার সঙ্গে এক ঝি এসেছিল। সে আমাদের বাড়িতেই থাকত, সে এসে আমায় সংবাদ দিল যে, কাল রাত্রি থেকে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাকে ব'লে দিলুম শান্তির নাম যেন আমার বাড়িতে আর কেউ মুখে না আনে।

শান্তির এই পলায়ন আমি যতই হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগলুম, আমার ভেতরের মানুষটা যেন ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল।

ভেতর থেকে বার বার কে বলতে লাগল, তোমার দোষেই আজ তুমি শা-
হারালে। যদি আগে থাকতে একটু সাবধান হতে!

মনে পড়ল সেই উড়োচিঠির কথা! অজ্ঞাত বন্ধু আমার, তখন যদি সে
কথা শুনে সাবধান হতুম!

শান্তির পলায়নের কথা সন্ধ্যার আগেই গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার নামে নানান কুৎসা আমার কানে ভেসে আসতে লাগল। অনেকে এমন কথাও বললে তারা নির্মল ও শান্তিকে নৌকা ক'রে যেতে দেখেছে। আমার মনে তখন কি রকম অবস্থা, তা বোধহয় বুঝতে পারছ। একে আমার অসুস্থ মন নানা চিন্তায় অধীর, তার ওপর গ্রামের লোকদের নিন্দায় গৃহ আমার নরক হয়ে উঠল। একটুখানি সহানুভূতি পাবার আশায় আমি ছটফট করে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু কে আমায় সহানুভূতি জানাবে! গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আমায় দেখতে আসতে লাগল, যেন আমি একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। সবার মুখেই এক কথা, জগদীশের বউ পালিয়ে গিয়েছে।

সাত দিন যেতে না যেতে আমি আমার কর্মচারীদের ওপর বাড়ি ও বিষয়ের ভাব দিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বহুকাল দেশে-বিদেশে পাগলের মতন ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু শান্তি তো পেলুম না! নারীর স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলুম, সেই নারীই আমাকে সকলের চেয়ে বড় বেদনা দিলে; যে বন্ধুর উপকারের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলুম, সেই বন্ধু আমার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করলে। শুধু আমার নয়, আমি দেখলুম, আমার চারিদিকেই মানুষ এই ভাবে মানুষের বুকে, বন্ধু এই ভাবে বন্ধুর বুকে, স্বামী স্ত্রীর বুকে, স্ত্রী স্বামীর বুকে অবিশ্বাসের ছুরি হেনে চলেছে। তবে কি সমাজ, ধর্ম স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া যা কিছু শুনতে পাই, সব মিথ্যে? মানুষ তার আসল চেহারাটা এই সব রঙিন খোলস দিয়ে ঢেকে রেখেছে! সবাই সমান শুধু সুযোগের অভাব! অবসর ও সুযোগ হ'লেই আপনা থেকেই তার এই খোলস ঝরে প'ড়ে গিয়ে তার স্বরূপ মূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে! অনেকদিন চিন্তার পর আমি স্থির করলুম, আমাদের সমাজ নারীর জন্যে যে ব্যবস্থা করেছে তা ঠিকই করেছে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা যে বিদ্যা ও বুদ্ধির দম্ভতা ক'রে অন্য সবাইকে পায়ের নীচে চেপে রেখেছিল, তা ঠিকই করেছিল। নিজে বাঁচতে হ'লে তা না ক'রে আর উপায় নেই। ব্রাহ্মণ যতদিন অন্য সবাইকে পায়ের নীচে রাখতে পেরেছিল, ততদিনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মনত্ব ছিল। আমি নতুনপন্থীদের গালাগালি দিয়ে আমাদের দেশের সনাতন ব্যবস্থার স্বপক্ষে এক প্রবন্ধ লিখে ছদ্মনামে এক মাসিকে ছাপিয়ে বিপক্ষবাদীদের দ্বন্দ্বে আহ্বান করলুম।

আমার প্রবন্ধ প্রকাশ হবার পর আট-দশটা মাসিকে তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হ'ল। সরকলের প্রতিবাদের জবাব দিয়ে আবার আমি প্রবন্ধ লিখলুম। এই রকম ক'রে দুই পক্ষে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। আমার শেষ প্রবন্ধের

জবাব যিনি দিয়েছিলেন, তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখা পড়ে পড়ে মনে হ'ল এতদিনে একজন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছি। এই প্রবন্ধের জবাব দিতে আমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমি স্থির করেছিলাম এর পরে আর লিখব না। আমার সমস্ত বুদ্ধিকে নিংড়ে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। লেখা প'ড়ে নিজেরই মনে হতে লাগল, এর আর উত্তর হতে পারে না। নারীর প্রতি মমতায় শেষ স্মৃতিটুকু মনে থেকে মুছে ফেলবার আগে, কি জানি কেন, একবার দেশে গিয়ে আমার বাড়িখানা দেখে আসবার ইচ্ছে হ'ল। সেখানে আমার শৈশব কেটেছে, যে ঘরে আমি আমার প্রেয়সীকে নিয়ে এসে সুখের নীড় বাঁধবার আয়োজন করেছিলুম, ইহজীবনের সর্বোত্তম সুখ ও দুঃখ আমি যেখানে ব'সে পেয়েছি আমার সেই খেলাঘরের ইটকাঠগুলো আমাকে তাদের কোলে আহ্বান করতে লাগল। আমি স্থির করলুম, দেশে গিয়ে একবার বাড়িটা দেখে এসে এই প্রবন্ধ ছাপতে দিয়ে সন্ন্যাস নোব।

৪

ঠিক পনেরো বছর পরে।

পনেরো বছর পরে আবার একদিন সন্ধ্যের সময় আমি আমাদের গ্রামের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঠিক করেছিলুম যে, অন্ধকার হ'লে তারপর গ্রামের ভেতরে ঢুকব, তাই মাঠের মধ্যে দিয়ে যে লাল মাটির পথ এঁকে-বেঁকে দূরে বনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তারই এক ধারে ব'সে অন্ধকারের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। আমার চোখের সামনে বনের ওপরে হোলি খেলতে খেলতে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই আমি উঠে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

গ্রামের আর সে শোভা নেই। রাস্তা অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। চারিদিকে জঙ্গল আর বিশ্রী গন্ধ। অনেকখানি পথ চ'লে আমি হাটতলার মাঠে এসে দাঁড়ালুম। সেখানে তখনও অনেকগুলো ছোট-বড় চালা দেখে বুঝতে পারলুম যে, এখনও সেখানে হাট বসে। হাটের এক দিকে একটা বটগাছ ছিল. গাছটা প্রায় চারশো বছরের পুরনো। ডাল থেকে বড় বড় শেকড় নামিয়ে দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে তখনও সে পুরোদমে সেখানে রাজত্ব করছিল। আমরা যখন ছোট ছিলুম, তখন রোজ বিকেলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে এই গাছের তলায় এসে লুকোচুরি খেলতাম, এর শেকড় ধ'রে দোল খেতুম।

চোরের মতন চুপেচুপে হাটতলার মাঠ পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সেই বটগাছটা একটা আনন্দের চিৎকার ক'রে উঠল। তার লক্ষ্য পাতার হাতছানির আকর্ষণ আমি এড়াতে পারলুম না; অপরাধীর মত সেখান থেকে ফিরে ধীরে ধীরে তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তার পল্লবে পল্লবে করতালি বেজে উঠতে লাগল। নানা রকম অঙ্গভঙ্গীতে সেই

পুরনো বন্ধুকে তার হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাতে লাগল। সেখান থেকে চ'লে যাবার শক্তি আমার ছিল না, কিসের একটা মাদকতায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়তে লাগল। আমি সেইখানেই ব'সে পড়লুম। নানা রকম চিন্তায় আমার হৃদয় ভ'রে উঠেছিল। এই গাছের তলায় আমাদের সন্ধ্যাগুলো কেমন ক'রে কাটত! আমি, শান্তি, নির্মল ও গ্রামের আরও অনেক ছেলেমেয়ে এই খানে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলে বেড়িয়েছি, আজ তারা সব কোথায়? আমার ছেলেবেলার সখা ও সখীরা, তারা কি সুখে আছে? তারা কি সবাই বেঁচে আছে? শৈশবে আমিই ছিলুম তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী। অভাব কাকে বলে, তা আমি কখনও জানতে পারি নি। আমার ধন ছিল, রূপ ছিল, বংশ মর্যাদা ছিল। আমার যা ছিল, তা তো সবই আছে, জীবনপথে চলতে চলতে যা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তাই আমার হারিয়ে গিয়েছে; তাই আজ আমার মতন দুঃখী কে আছে? ওগো বনস্পতি! তুমি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এইখানে দাঁড়িয়ে আমার গ্রামের সবারই সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে আছ, আমার মতন দুঃখী কি আর দেখেছ?

খেলার সাথীর প্রতি সহানুভূতিতে গাছটা স্থির হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল।

কতক্ষণ সেই গাছটার তলায় ব'সে ছিলুম, তা বলতে পারি না, যখন সেখান থেকে উঠলুম, তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর: পূব-আকাশে চাঁদটা ঢ'লে পড়েছে।

সেখান থেকে উঠে পায়ে পায়ে বাড়ি অবধি এসে পাঁচিল টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম। সারারাত বাতাসের সঙ্গে খেলা ক'রে চাঁদের ঘুম-পাড়ানি-মন্ত্রে আমার বাগানের ফুলেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুর মতন তালে তালে তাদের নিশ্বাস পড়ছিল; পাছে তাদের ঘুম ভেঙে যায়, তাই সন্তর্পণে আমি আমার ঘরের পেছন দিকটায় এসে দাঁড়ালুম। আমি বাড়িতে না থাকলেও আমার বাড়ি সেই রকমই ঝকঝক করছে, বাগানের যত্ন হচ্ছে দেখে আমার উদাস প্রাণেও একটা আনন্দের তরঙ্গ খেলে গেল। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই রকমই মায়া বটে!

বাড়ির সমস্ত জানলা বন্ধ ছিল। আমি আমার শোবার ঘরের জানলাটার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলুম। বাতাসের বেগে বইয়ের পাতাগুলি যেমন তাড়াতাড়ি উল্টে যায়, আমার মনের ভেতর দিয়ে অতীত-জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি তেমনই ভাবে উল্টে যেতে লাগল।

হঠাৎ শোবার ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, জানলায় একটি রমণীমূর্তি! আমার কোন কর্মচারী খালি বাড়িতে এসে বাস করছে ভেবে আমি জানলার সামনে থেকে স'রে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালুম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই জানলাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে এবার বেরিয়ে পড়ব মনে করছি, এমন সময় দেখলুম, সেই নারীমূর্তি বাগানে নেমে এসেছে, সে আমার দিকেই আসতে

লাগল। আর স'রে যাবার উপায় নেই দেখে আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। নারীমূর্তি ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। শান্তি!

আমার চোখের সামনে গাছপালা, বাগানবাড়ি, মাঠ সব যেন বনবন ক'রে ঘুরতে আরম্ভ করল। তারপর সব মিলিয়ে গিয়ে রইল কেবল—শান্তি।

শান্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এই পনরো বছরে তার চেহারার কোনও পরিবর্তন হয় নি। বরং আমার মনে হচ্ছিল, যেন সে দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। তাকে পনরো বছর দেখি নি, এই পনরো বছরে আমার জীবনের কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শান্তি তো বেশ আছে!

কিছুক্ষণ পরে দেখলুম যে, শান্তির ঠোঁট যেন নড়ছে, সে কি বলছে, অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, শান্তি, আমায় কিছু বলবার আছে? শান্তি আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি আবার বললুম, আমি শুনেছিলুম যে, তুমি এখান থেকে বহুদূরে চ'লে গিয়েছ; যদি গিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে এলে কেন?

এবার শান্তি বললে, আমি আমার স্বামীকে দেখতে এসেছি।

আশ্চর্য! আমি এতদিন আমার অস্তিত্ব সবার কাছ থেকে একেবারে গোপন ক'রে রেখেছিলুম। আমি কোথায় আছি, না আছি, সে কথা আমার একজন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ জানত না। টাকাকড়ির প্রয়োজন হ'লে তাকে জানাতুম, সেই কি শান্তির কাছে আমার কথা বলছে? কিন্তু আজ রাত্রে এমন সময় আমি এখানে থাকব, সে কথা সেই বা জানবে কি ক'রে? আমি একটু শ্লেষের সঙ্গে বললুম, যাক শুনে সুখী হলুম যে, তুমি আমাকে দেখতে এসেছ। কিন্তু তুমি যাকে স্বামী বলছ, তুমি তো নিজেই তার সঙ্গে তোমার সে বন্ধন কেটে ফেলেছ।

কেন? তুমি আমার স্বামী।

শান্তির কথা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। বলে কি! এত কাণ্ডের পর এখন আমাকে স্বামী ব'লে সম্ভাষণ করতে লজ্জা করছে না? নারীচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

আমি বললুম, হ্যাঁ, আইনগত এখনও আমি তোমার স্বামী, কিন্তু ধর্মত বোধ হয়—

বোধ হয়? কেন, তুমি কি আবার বিয়ে করেছ?

বিয়ে! সর্বনাশ, আবার বিয়ে! না শান্তি, বিয়ে সেই একবারই করেছিলুম। জীবনে একজনকেই ভালবেসেছিলুম—তুমি। তুমি কি এখনও নির্মলকেই ভালবাস? না, প্রণয়ী বদল করেছ?

আমার কথা শুনে শান্তি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। তার মাথার কাপড় খ'সে এল, খোঁপা পিঠে ঝুলে পড়েছিল। আমি মানুষকে ওরকম ভাবে কাঁপতে এর আগে কখনও দেখি নি। তার প্রত্যেক চুলটি পর্যন্ত কাঁপছিল।

আমার মনে হ'ল, যেন তার শরীরের ওপর দিয়ে একটা প্রবল বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে চলে গেল। কাঁপুনিটা থেমে যাবার পর সে অতি করুণ সুরে বললে, ওগো, ওরকম ক'রে ব'লো না। তুমি জান না, তুমি বুঝতে পারবে না।

জানি না! বুঝতে পারি না! হ্যাঁ শান্তি, একদিন ছিল বটে, যখন কিছুই বুঝতে পারতুম না। আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, আমি নিজের ভালবাসায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমাকে হৃদয়ে বসিয়ে যখন আমি মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করছি, সেই সময় তুমি আমার বন্ধুর প্রেমে মশগুল হয়ে আমার কাছ থেকে পালাবার বন্দোবস্ত করছিলে—আমি স্বীকার করছি যে, তখন সেটা বুঝতে পারি নি। তোমার অবহেলাকে সত্য অবহেলা ব'লে কখনও মনে করতে পারি নি, তাই বুঝতে পারি নি।

তবে তুমি কি সত্যিই মনে কর যে, নির্মল—

হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি। তুমি কি সে কথা অস্বীকার করতে চাও?

শান্তি স্থির হয়ে অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই করি। জীবনে আমি একজনকে ভালবেসেছি, সে আমার স্বামী, সে তুমি। কিন্তু আমি যাকে ভালবেসেছি, তাকে কখনও অবিশ্বাস করি নি, সে কথা কখন কল্পনাও করতে পারি নি। তোমার অসুখের পর তুমি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলে, তাতে আমি প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু নির্মল-ঠাকুরপো আমায় বুঝিয়েছিল যে, তোমার মাথার গোল হয়ে গিয়েছে, তাই তুমি অমন করছ। কি করলে তুমি ভাল হবে কি ক'রে তোমায় সুস্থ করতে পারব, সেজন্যে আমি দিবারাত্রি তার সঙ্গে পরামর্শ করতুম। কিন্তু তুমি তখন আমাদের সেই পরামর্শকে কি চোখে দেখতে, তা মনে ক'রে দেখ। তারপর একদিন তোমার দপ্তর পরিষ্কার করতে করতে একখানা বিশ্রী চিঠি আমার চোখে পড়েছিল, সেই চিঠি পড়ামাত্র তোমার সমস্ত ব্যবহারের কারণ আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। বুঝলুম যে, তুমি আমায় সন্দেহ কর। আমি সেই দিনই নির্মলকে সেই চিঠিখানা দেখিয়ে তাকে ব'লে দিলুম, তুমি এখান থেকে চ'লে যাও, আমার সামনে আর কখনও এসো না। সেদিন সে আমার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে গিয়েছে।

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বললুম, নির্মল কোথায় আছে এখন?

তা জানি না, তবে যাবার সময় সে ব'লে গিয়েছিল যে, মৃত্যুর পর যদি এ জীবনের শেষ না হয়, তা হ'লে সেই রাজ্যে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন আমায় এমন ক'রে তাড়িয়ে দিও না বউদি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

তারপর শান্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, দেখ, প্রেম সব অত্যাচার সহ্য করতে পারে, কিন্তু প্রেম অবিশ্বাস সহ্য করে না। নির্মল চ'লে যাবার পর আমি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আনবার কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি আমায় বারবার তাচ্ছিল্য ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছ। শেষে আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, এরকম ক'রে তোমার প্রেমে বঞ্চিত হয়ে তোমার কাছে থাকার চেয়ে

দূরে স'রে যাওয়াই মঙ্গল। তাই তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি তোমার কাছ থেকে চ'লে গিয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে যদি আমার প্রেমের সম্পর্কই চুকে গেল, তখন কেবল তুমি আমায় বিয়ে করেছ—এই দাবিতে তোমার সুখ ও শান্তির অন্তরায় হয়ে এখানে বাস করতে আমার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আমি স্থির করলুম, যেমন ক'রেই পারি, আমি নিজের ভরণপোষণ চালিয়ে নোব—যে কোন কাজই হোক না কেন। জীবনে তোমার প্রেমই ছিল আমার প্রধান সম্পদ, সেই সৌভাগ্য থেকে যখন চ্যুত হয়েছি, তখন আর আমার মানই বা কি? কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলুম। তোমার ওপর অভিমান ক'রে চ'লে গিয়েছিলুম বটে; কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা, তা যে অটুট ছিল, সেটা অনুভব করলুম তোমাকে ছেড়ে গিয়ে। এখান থেকে চ'লে গিয়ে দশটি দিন মাত্র আমি আমার এক বাল্যসখীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলুম। তুমি তাকে চেন, সে আমাদেরই গাঁয়ের মেয়ে। দশ দিন পরে ফিরে এসে দেখলুম, তুমি নেই।

ফিরে এসে যখন দেখলুম যে, তুমি নেই, তখন আমার মনে যে কি ক'রে উঠেছিল, তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে কথা পুরুষ বুঝতে পারে না। তারপর প্রতি পল, প্রতি মুহূর্তে প্রতি দিন ধ'রে এখানে ব'সে আমার আহ্বান আমি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি—এস প্রিয়তম, ওগো মধুরপ্রিয়, ওগো প্রিয়মধুর, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস। তুমি কার ওপর অবিশ্বাস ক'রে চ'লে গিয়েছ? ফিরে এস। আমার আহ্বান কি তুমি শুনতে পাও নি? কিন্তু আমি জানতুম যে, একদিন না একদিন তুমি ফিরে আসবেই, তোমাকে আসতেই হবে। সেই অপেক্ষায় আজও আমি এখানে ব'সে আছি।

শান্তি চুপ করলে।

আমার মনে হতে লাগল, যেন আমি আস্তে আস্তে মাটির মধ্যে নেবে যাচ্ছি। অসহায়ের মতন হাত দুখানা শান্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, শান্তি, এত দুঃখ আমি তোমায় দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর শান্তি। নিজের দোষে আমিও কম দুঃখ ভোগ করি নি।

শান্তির চোখ দিয়ে তখন টপটপ ক'রে জল পড়ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, সেইটেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ প্রিয়তম। তুমি বল, আমার ওপর আর তোমার অবিশ্বাস নেই।

ভুল, শান্তি, ভুল করেছি। আজ পনরো বছর এই ভুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে গিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

জামার পকেটে আমার প্রবন্ধটা ছিল সেটা টেনে বের ক'রে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। শান্তি একবার অবহেলাভরে সেদিকে চেয়ে দেখলে মাত্র, আমাকে কোনও প্রশ্ন করলে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, শান্তি, এতদিন তুমি একলা কোন্ ঘরে থাকতে? চল, আমাকে কেউ দেখতে পাবার আগে আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ি।

আমার কথা শেষ হতে না হতে শান্তি ফিরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমাদের পুরোনো বাড়ির একখানা বড় ঘর ছিল, ঘরখানা বাড়ি থেকে একটু দূরে আলাদা জায়গায় তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে যত বাজে জিনিসপত্র গুদামজাত করা থাকত। শান্তি আস্তে আস্তে এই ঘরখানায় এসে ঢুকল।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে বললুম, এত ঘর থাকতে শেষে তুমি এই গুদাম ঘরে বাস করছ ?

শান্তি কোনও কথা না ব'লে ঘরের মধ্যে স্তূপাকার জিনিসপত্রের ফাঁক দিয়ে রাস্তা ক'রে এগিয়ে চলতে লাগল। তারপর সে ঘরের এক কোণে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমি তার পেছনে পেছনে অগ্রসর হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, সেখানে একটা মানুষের কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে! ওপরের দিকে একটা ঝুল-মাখানো দাঁড় ঝুলছে।

কিছুই বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এসব কি ব্যাপার শান্তি ? এ যে আমি কিছুই বুঝতে—

কিন্তু শান্তি! কোথায় সে ? মুহূর্তের মধ্যে সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পলক ফেলতে না ফেলতে সমস্ত রহস্য আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল ক'রে ফুটে উঠল। দুঃসহ বেদনায় ছুটে গিয়ে দাঁড়িগাছা ধ'রে আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম শান্তি!

জীর্ণ দড়ি পট করে ছিঁড়ে গেল। আমি সেই কঙ্কালের ওপর ঘুরে প'ড়ে গেলুম। চোখের সামনে দিয়ে সেই উড়ো চিঠির অক্ষরগুলো বিদ্যুৎবর্ণে একবার চিকচিক ক'রে আমার চোখ ঝলসে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

মায়ের অনুগ্রহ

চীনে হোটেলের ছোট্ট একটা খোপের মধ্য উপেন আর মন্মথ মুখোমুখি ব'সে জিন খাচ্ছিল।

তাদের সামনে একটা ক'রে শূন্যে পাত্র। মাঝখানে বড় একখানা তস্তুরিতে একরাশ কড়া আলুভাজা। উপেন একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ ক'রে তাতে আস্তে আস্তে টান দিচ্ছিল, আর মন্মথ তস্তুরি থেকে মধ্যে মধ্যে আলুভাজা তুলে নিয়ে দাঁতে কাটছিল।

আশপাশের ছোট বড় খোপ থেকে নানা দেশের নরনারীর বুকনির এক-আধটা টুকরো ছিটকে তাদের কানে লাগছিল।

শনিবারের সন্ধ্যেটা খুব জ'মে উঠেছিল।

মন্মথ খানিকক্ষণ উপেনের দিকে চেয়ে থেকে ব'লে উঠল, মাইরি, মায়ের নিগ্রহ হয়ে তোর চেহারাটা একদম মাটি ক'রে দিয়েছে।

উপেন সিগারেটে একটা জোর দম লাগিয়ে বললে, চেহারা be damned, মায়ের নিগ্রহ যদি আর এক দিন পরে আমায় আক্রমণ করত, তা হলে প্রাণ দিতেও আমার আপত্তি ছিল না। আমার জীবনে সেইটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মন্মথ বললে, সে আবার কি রকম ?

আরে, তা জান না বুঝি ? বলি নি তোমায় ?

কই, না।

বল কি হে ? তবে শোন, বলি।

মন্মথ বললে, তবে আর একটা ক'রে জিন দিয়ে যেতে বলি ?

উপেন বললে, জিন তোমার ঘোড়ার পিঠে চাপিও, আমায় এক পেগ হুইস্কি দিতে বল। বাবা, বিলেত থেকে ঘুরে এলে, অথচ হুইস্কি খেতে শিখলে না ? আরে ছিঃ !

মন্মথ বললে, আমার লিভারে হুইস্কি সহ্য হয় না, ওইটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

মন্মথ হাঁকলে, আ চুং !

হাস্যমুখে একটি চীনে যুবক তাদের ঘরে প্রবেশ করতেই সে বললে, এক পেগ হুইস্কি আর এক পেগ জিন।

হুইস্কির গেলাসে একটি চুমুক মেরে উপেন বলতে লাগল, তোরা তখনও বিলেত থেকে ফিরিস নি, সে বছর মাঘ মাস কাবার হতে না হতে শহরের চারিদিকে ভয়ানক বসন্ত শুরু হ'ল। হঠাৎ এই রকম বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার অভিভাবকেরা তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে গবেষণা

করতে ব'সে গেলেন। অনেক তদন্ত ক'রে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক পাঁচ বছরে শহরে বসন্ত রোগের এই রকম বাড়াবাড়ি হয়। অতএব এই একটা বছর কোন রকমে চোখ-কান বুজে ওষুধ গেলার মত যদি বেঁচে যেতে পার, তা হ'লে পরের চারটে বছর বসন্ত-রোগে মরবার ভয় অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা শহরের চারিদিকে বসন্ত-রুগীর বড় বড় প্ল্যাকার্ড মেরে দিয়ে টিকের বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। বসন্ত যে সামান্য রোগ নয়, তা বোঝাবার জন্যে বেচারারা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে শহরে একটা হুলস্থুল কাণ্ড লেগে গেল। আজ যার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি, কাল তার বাড়িতে গিয়ে শুনি যে, তার গায়ে গুটি বেরিয়েছে, দিন দশেক যেতে না যেতেই সে ব্যক্তি স'রে পড়েছে।

ঠনঠনের শীতলা-তলায় পুজোর আর বিরাম নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই সেই মান্ধাতার আমলের ছাতা-ফুটো ভাঙা মন্দির মেরামত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কে একজন মাড়োয়ারী মন্দিরের চাতাল, সিঁড়ি, সব মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে।

আমাদের মেস ছিল তখন একটা সরু গলির ভেতর ভদ্রপল্লীর মধ্যে। বাসার চারিদিকে গৃহস্থের বাড়ি। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে একটু জিরোতে না জিরোতেই পুরাতন ভৃত্য রামদাস এসে খবর দিতে লাগল, বাবু, আজ ও-বাড়িতে মায়ের আগমন হয়েছে।

যাদের বাড়িতে বসন্ত হয়, তারা দিন দুয়েক ধ'রে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে পুজোর নাম ক'রে রোগ তাড়াতে চেষ্টা করে, তারপরে দিন কয়েক ধ'রে রুগীর কাতরানি, তারপরে একদিন কান্নার রোলে পাড়া কেঁপে ওঠে।

পাড়ার সবার মুখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব, কখন কাকে ধ'রে! সকলেই ধীরে ধীরে কথা কয়, কথায় কথায় ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখায়, অতি সন্তর্পণে বলতে থাকে—মায়ের অনুগ্রহ।

তোমায় বলব কি, মাস-খানেকের মধ্যে সমস্ত জাতটাই ধার্মিক হয়ে উঠল।

দেবতাকে ঘুষ দেবার ঠেলায় বাজারে সন্দেশের দর আক্রা হয়ে গেল।

আমাদের বাসার কাছাকাছি তিন বাড়িতে বসন্ত হয়েছিল। দিনের বেলা তো আপিসেই কাটত। রাত্রি এগারোটা বারোটা অবধি আড্ডা দিয়ে বাড়িতে ফিরে একটু গা গড়াবার উপক্রম করছি, আর রুগীর কাতরানি—বাবা গো, আর পারি না গো—

একদিন আপিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরেছি; বাসায় তখনও কেউ ফেরে নি, ছাতের ওপর ব'সে একটু আরাম করছি, এমন সময় রামদাস এসে খবর দিলে—ঘোষেদের বাড়িতে মা এসেছেন। সেই মেয়েটির—

ঘোষেদের বাড়িটা একেবারে আমাদের লাগা বললেই হয়, মাঝে একটা

সর্ন্ন গলির ব্যবধান মাত্র। তাদের জানলা খুললে আমার ঘর থেকে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত দেখা যেত। কদিন থেকে দেখছিলুম, ওদের বাড়ির একটি মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এসেছে। বাপের বাড়িতে এসে সমস্ত বাড়িখানাকে সে আনন্দে মাথায় ক'রে রেখেছিল। আহা! মেয়েটির জন্যে বড় কষ্ট হতে লাগল।

মায়ের অনুগ্রহটা যতক্ষণ দূরে দূরে ঘুরছিল, ততক্ষণ আমাদের বাড়িতে কোন সাড়াই পড়ে নি। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ একেবারে আমাদের গর্দান পর্যন্ত নেমে আসতেই বাড়ি ছেড়ে যে যার লম্বা দিলে। আমরা তিনজন, বসন্তে মরার চেয়ে অনাহারে মরবার ভয় যাদের বেশী, তারাই শুধু র'য়ে গেলুম।

আমার ঘরে একা আমি ছাড়া আর কেউ নেই। রাত্রে রুগীর কাতরানি শুনে আঁতকে উঠি; বাড়িতে আরও যে দুজন ছিল, তারা মাঝে মাঝে অন্যত্র রাত কাটায়; প্রভুভক্ত রামদাস আর আমি মায়ের অনুগ্রহের প্লাবনের ওপর আমাদের জীর্ণ জীবন-তরী নিয়ে টাল মাটাল খেতে লাগলুম।

কিছুদিন এই ভাবে কাটবার পর আমার পুরাতন অনিদ্রা রোগ আবার চেপে ধরল। রাতে ঘুম হয় না, আপিসে গিয়ে ঘুমোলে বড়বাবু এমন বেসুরো চীৎকার করতে থাকে যে, স্বয়ং নিদ্রাদেবীর পক্ষেও তা সহ্য করা শক্ত। অনেক দেখে-শুনে শেষকালে এক মতলব আবিষ্কার করা গেল। এগারোটার পর সিধে বাড়ি না ফিরে দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধ'রে শহরময় ঘুরে শরীরটাকে অবসন্ন ক'রে নিয়ে আসতে লাগলুম যে, বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুম আসত।

সেদিন ছিল শনিবার। রাত্রি প্রায় দেড়টা অবধি হনহন ক'রে শহরটা টহল মেরে বাড়িতে ঢোকবার আগে গলির মোড়ে সদর-রাস্তার ওপর একটা রকে ব'সে সিগারেট টানছি, রাস্তায় একটা লোক নেই, কিছুক্ষণ আগে রাস্তা মাতিয়ে একদল লোক মড়া নিয়ে গেছে, দূর থেকে তাদের চীৎকার বাতাসে উড়ে এসে আমার কানে লাগছিল। মৃদু বাতাস আমার অবসন্ন শরীরটাকে রাস্তাতেই ঘুম পাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে; উঠব মনে করছি, এমন সময় আমার পাশ দিয়ে দুটি রমণীমূর্তি চ'লে গেল।

সেই রাত্রে জনপ্রাণীহীন রাস্তায় নারীমূর্তি দেখে আমার জড়তা তখনই ছুটে গেল। পেছন থেকে তাদের পা দেখে যতটা বুঝতে পারা গেল, তাতে মনে হ'ল যে, তাদের মধ্যে একজন তরুণী, অপর জন বৃদ্ধা। তরুণীর বর্ণ গৌর।

ব্যাপার কি! জামাটা খুলে কাঁধে ফেলে রেখেছিলুম, তখনই সেটা পরতে পরতে এগিয়ে এসে একটা গ্যাসের কাছে দাঁড়ালুম। তারা আমার পাশ দিয়ে চ'লে গেল। গ্যাসের আলোতে তরুণীকে দেখলুম, বেশ দেখতে সে। সে আমার রকম দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন একটু হেসে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

বুকের মধ্যে কে যেন হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, বাস্, হেসেছে যখন—

আমি তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম।

চলেছি তো চলেইছি। চলার যেন আর অন্ত নেই। বাঙালীর মেয়ে যে এত জোরে চলতে পারে, রাত বেড়ানোর ইতিহাসে সে অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে আমার আর হয় নি। চলতে চলতে মাঝে মাঝে একবার তরুণীর পাশে গিয়ে পড়ি, সে বিলোল কটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে হাসে, তখনই আবার সন্ত্রস্ত হয়ে বৃদ্ধার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার রকম দেখে কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। সে কি ভদ্রলোকের মেয়ে? চেহারা দেখে তো ভদ্র ব'লেই মনে হয়। কিন্তু ভদ্রোলোকের মেয়ের পক্ষে আর একজন পুরুষকে এই রকম কটাক্ষ করা—তাই বা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? মনের মধ্যে চিন্তার রাশি তালগোল পাকাতে লাগল বটে, কিন্তু পা দুখানা আমার সমান চালে কাজ করছিল।

বৃদ্ধা তরুণীর সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছিল না। কখনও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, কখনও সঙ্গে চলে, আবার কখনও বা দশ হাত পিছিয়ে পড়ে।

এমনই ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর বৃদ্ধা যেই একটু এগিয়েছে সেই সুযোগে আমি তরুণীকে ব'লে ফেললুম, আর কতদূর ভাই? সারারাত্রি কি আজ পথে পথেই ঘুরবে?

তরুণী দ্বিধাহীনভাবে আমার কথার উত্তর দিলে, এই যে, আর বেশী নেই, এই মোড়টা—

ঠিক সেই সময়ে বৃদ্ধা পেছন ফিরে দেখতে পেলে যে, তরুণী আমার সঙ্গে কথা বলছে। তার সেই বিশ্রী তোবড়ানো মুখের কুঞ্চনগুলো বিস্ময়ে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করল। বৃদ্ধা দু পা পেছন এসে তরুণীর পাশে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সিগারেট ধরাবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলুম।

বৃদ্ধা একটু উচ্চকণ্ঠে তরুণীকে কি বললে, শুনতে পেলুম না; তরুণী কিছু বললে কি না, তাও বুঝতে পারা গেল না।

আবার চলা শুরু হ'ল। চলার আর বিরাম নেই। জনশূন্য রাস্তা মধ্যে মধ্যে গ্যাসের থামগুলো পাহারার মতন চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে হেঁটে হেঁটে আমার হাঁটু দুটো ভেঙে পড়বার যোগাড়। এক জায়গায় এসে আবার একটা সুবিধে উপস্থিত হওয়ায় তাকে বললুম, আমি তা হ'লে চললুম, আর চলতে পারছি না।

তরুণী বললে, আর একটু চল না, এই তো এসে পড়েছি। দেখ, ওই লোকটা অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পেছু নিয়েছে, ওকে তাড়াতে পার?

হঠাৎ বৃদ্ধার কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠলুম। সে বললে, বউমা, ও কি হচ্ছে? ওইজন্যেই তোমায় নিয়ে রাস্তায় বের হতে চাই নি।

বৃদ্ধার কথায় কান না দিয়ে অগ্রসর হলুম। দু-এক পা চ'লেই দেখি, অন্য ফুটপাথ দিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁসে একটা লোক এগিয়ে চলেছে। লোকটাকে এতক্ষণ একেবারে দেখতে পাই নি। আমি অন্য ফুটপাথে গিয়ে কোন রকমের

ভণিতা না ক'রে একেবারে তার হাত চেপে ধরে বললুম, রাস্কেল, ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পিছু নেওয়া! যাও, নিজের কাজে চ'লে যাও।

লোকটা বোধ হয় আমার কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সে অবসর না দিয়ে আবার বললুম, এখান থেকে এক পা এগিয়েছ কি ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দেব। খলিল গুণ্ডার নাম শুনেছ? বাঁচতে চাও, স'রে পড়।

লোকটা অবাক হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল; আমি ছুটে রাস্তা পার হয়ে আবার তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম। একবার ফিরে দেখলুম, লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

আরও অনেকক্ষণ চলার পর তারা একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকল। দু পা গিয়েই বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে চারপাশের বাড়িগুলো দেখতে লাগল। তার রকম দেখে মনে হ'ল, যেন তারা ভুল ক'রে এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ঠিক সেই সময় বড় রাস্তায় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। গাড়ির ভেতর থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বলছিল, এই গলি, এই গলি।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে না দেখতে গাড়িটা গলির মধ্যে ঢুকে একেবারে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার উপক্রম করল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি গাড়ির একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি আর তরুণী অন্য পাশে রইলুম।

গাড়ির মধ্যে দেখি, সেই লোকটা। সে আর পায়ে না হেঁটে একখানা গাড়ি ভাড়া করেছে। সে একদৃষ্টে তরুণীর দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

তরুণী এবার আগে আমায় বললে, বড় কষ্ট হয়েছে তোমার, না?

কষ্ট যে হচ্ছিল, তা আর প্রকাশ করবার নয়—যেমন দেহে, তেমনই মনে। তবু বলতে হ'ল, না, কষ্ট কিসের? আর কতদূর?

তরুণী হেসে বললে, এই যে এবার ঠিক এসে পড়েছি।

ঠিক সেই সময় রাত্রির অন্ধকার তোলপাড় ক'রে চীৎকার উঠল, ব্যায়লা হ্যায়রি হ্যায়রি বোওওল।

শ্মশান-যাত্রীদের সেই বীভৎস চীৎকারে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁত ক'রে উঠল। নিজেকে সামলে নেবার আগেই তরুণী "বাবা গো" ব'লে একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে দুহাত দিয়ে একেবারে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে বোধ হয় এক মিনিটের বেশী সময় লাগে নি।

গাড়ির ভেতর থেকে সেই লোকটা গলা বাড়িয়ে আমাদের দুজনকে সেই অবস্থায় দেখে হতাশভাবে ধপাস ক'রে ব'সে পড়ল।

গাড়িখানা গড়গড় ক'রে এগিয়ে গেল। তরুণীর একখানি শিথিল হাত তখনও আমার কাঁধের ওপর প'ড়ে ছিল। গাড়িখানা স'রে যেতেই বৃদ্ধা আমাদের সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমায় একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে বললে, চল, তোমায় দেখছি।

তার কথা শুনে ক্রোধে আমার শরীর জ্বলতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল, তার গলাটা টিপে সেখানেই শেষ ক'রে ফেলি। আমার প্রতি বক্তব্য শেষ ক'রে সে তরুণীকে বললে, রাস্তার মাঝে খুব চালানটাই চলালে যা হোক! চল, এ গলি নয়।

তারা গলি থেকে বেরিয়ে আবার বড় রাস্তায় প'ড়ে চলতে লাগল। সেই যে লোকটা গাড়ি নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, গলিটা সরু ব'লে কোচোয়ান আর গাড়ি ঘোরাতে পারলে না। গাড়ি সিধে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা একবার উজবুকের মত জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে শেষ দেখা দেখে নিল।

বড় রাস্তায় প'ড়ে আবার চলা শুরু হ'ল। কারও মুখে কোন কথা নেই। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এই ধারার প্রথম পুরুষ, প্রথম-নারী দর্শন-মুগ্ধ আমার মন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে যার পেছনে—কে সে নারী? কোথায় সে যাবে? কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছি, কিছুই জানি না। যুক্তি-তর্ক কিছুই নেই। নারীর পশ্চাতে পুরুষ এই ভাবেই ছুটতে থাকবে—নারী ও পুরুষের সৃষ্টিকর্তার এই বিধান। নারী ও পুরুষের মাঝে বিশাল সংসার বার বার বাধার দেওয়াল তুলে দেবার চেষ্টা করছে, ওই বিশ্রী বুড়োটা যেন তারই চিহ্ন।

চিন্তা করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল; কত গলি পার হয়ে গেলুম, কিছুই দেখি নি। হঠাৎ তরুণী এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। বুড়ো বললে, আবার কি হ'ল? দাঁড়ালে কেন?

আমি তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে আমায় চুপিচুপি বললে, কাল রাত্রি এগারোটার পর আমাদের বাড়ীর নীচে এসে দাঁড়িও, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। বল, আসবে?

আমি বললুম, নিশ্চয় আসব।

তরুণী বললে, তোমার জন্যে ওপরে একটা জানলায় আমি অপেক্ষা করব।

বুড়ো বোধ হয় আর সহ্য করতে পারলে না। সে চেঁচিয়ে উঠল, ধন্যি মেয়ে যা হোক!

তরুণী আর কিছু না ব'লে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে তারা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ঢোকবার সময় সে আমাকে ইশারা ক'রে চ'লে যেতে বললে।

তারা ভেতরে চ'লে গেলে আমি তাদের বাড়িখানা ভাল ক'রে দেখতে লাগলুম দোতলায় সারি সারি তিন-চারটে জানলা। ঊর্ধ্বমুণ্ড হয়ে জানলাগুলো দেখছি, এমন সময় বুড়োর কণ্ঠস্বর কানে গেল—এই যে, এখনও দাঁড়িয়ে আছে!

ওপরের একটা জানলায় সাদা মতন কি একটা দেখা গেল। কিন্তু সেদিকে

দেখবার আর অবসর ছিল না। নীচে চোখ নামিয়ে দেখি, তাদের রকের ওপর দুটো ; ষণ্ডা লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে।

লোক দুটোকে দেখেই আমার শ্রান্ত লকবগে পা দুটোতে কে যেন স্প্রিঙের দম লাগিয়ে দিলে। এক মুহূর্ত আর সেখানে অপেক্ষা না ক'রে দৌড় দিলুম।

দূর থেকে 'মারো মারো, পাহারওয়ালা, খুন করব' ইত্যাদি নানা প্রকার শ্রবণের পীড়াদায়ক কথা উড়ে আমার কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! আড়াই ঘণ্টা ধ'রে যে পথটা তাদের পেছন পেছনে গিয়েছিলুম, ঠিক পনরো মিনিটে সেই রাস্তা পার হয়ে ফিরে এলুম। বাড়িতে এসে বিছানায় পড়তে না পড়তে ঘুম। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে চিন্তা করবারও অবসর হ'ল না।

রবিবার সকালে রামদাস যখন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল, তখন বোধ হয় বেলা দশটা। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, মাথাটা এত ভারী যে, তুলতে কষ্ট হ'ত লাগল। বিছানায় উঠে ব'সেই মনে হ'ল, যা থাকে কপালে, আজ দেখা করতে যেতেই হবে। খাট থেকে নেমে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখি, সর্বনাশ! বসন্তে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে গিয়েছে।

তারপর প্রায় দু মাস ধ'রে যমে-মানুষে টানাটানি। সে ইতিহাস আর শুনে কি হবে!

নিজের গায়ের বিকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তুম। স্বপ্ন দেখতুম যে, সেই তরুণী তার অঞ্চল ভ'রে সৌরভ এনে আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

একদিন—রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, রোগের যন্ত্রনা আর সহ্য করতে না পেরে আমি পরনের কাপড়খানা কড়িকাঠে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছি, ঘরের মধ্যে কেউ নেই, দরজাটা খোলা রয়েছে, গলায় ফাঁস পরাচ্ছি, এমন সময় স্পষ্ট দেখলুম, সেই তরুণী ছুটে এসে আমার হাতখানা ধ'রে দাঁড়াল।

সে বললে, এ কি করছ?

রোগের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় আমি তাকে এতবার দেখেছি যে, তার এই আসাটা আমার কাছে যেন খুবই স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল।

আমি বললুম, আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, দু দিন বাদে তো ম'রেই যাব, কেন এত কষ্ট সহ্য করি?

সে বললে, তবে! তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে। আমার কথা না শুনেই মরবে?

মনে হ'ল তাই তো সুন্দরী, তোমার কথা না শুনে কি ক'রে মরি?

আমি বললুম, কবে তুমি তোমার কথা বলবে?

সে হেসে বললে তুমি সেরে ওঠ, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

আত্মহত্যা করা হ'ল না, আবার বিছানায় প'ড়ে ছটফট করতে লাগলুম।

রোগ সেরে যাবার পর প্রথমেই আমি সেই সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু দেখলুম যে, সে বাড়ি ভেঙে ট্রামের আস্তাবল বাড়ানো হচ্ছে। সেখানে কত খোঁজ করলুম, কিন্তু কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। তারপর কয়েকটা বছর ধ'রে তার দেখা পাবার আশায় সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু দেখা পাই নি।

জীবনে তারপর অনেক সুন্দরীর অনেক কথা শুনেছি, হয়তো আরও অনেকের অনেক কথা শুনতে হবে। কিন্তু সেদিন রাতের সেই অপরিচিত সুন্দরী আমায় যে কি বলতে চেয়েছিল, সে কথা চিরকাল রহস্যের আবরণেই ঢাকা রইল।

উপেন চুপ করতে মন্মথ বললে, তোমার পলাতকা সুন্দরীর উদ্দেশ্যে এক পেগ হুইস্কি খাওয়া যাক। এই বো ই, দোঠো বড়া পেগ হুইস্কি।

কবির মেয়ে

বৎসর দুই-একের মধ্যে আমাদের দলের তিন-চারিজন আড্ডাধারী যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেল, তখন আমরা দস্তুরমত শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। গেরুয়া না পরিলেও ত্যাগে আমরা গেরুয়াধারী অপেক্ষা কম ছিলাম না। আর এই পার্থিব জগতে আড্ডা দেওয়া হইতে যে অপার্থিব সুখ আর নাই, এ কথার ব্যবহারিক পরিচয় দিয়া অনেক গৃহবিমুখ সন্ন্যাসীকেও আমরা আড্ডামুখী করিয়া তুলিয়াছি। এ হেন আড্ডা ছাড়িয়া লোক কি সুখে সন্ন্যাসী হইতে চাহে, এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মন-মরা হইয়া দিন কাটাইতেছিলাম, এমন সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরও একটি বড় স্তম্ভ খসিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ কিনা আমাদের দীনবন্ধু হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।

ভাঙা আড্ডা কোনরূপে চলিতে লাগিল। বছর দুই-তিন আশায় আশায় থাকিয়া পলাতক আড্ডাধারীদের ঘরে ফেরা সম্বন্ধে যখন আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় একদিন দীনবন্ধু হৈ-হৈ করিয়া আড্ডায় উপস্থিত।

সংবাদ কি?

কোথায় ছিলি এতদিন?

গেরুয়া গেল কোথায়?

ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছিল বুঝি?

চারিদিক হইতে তাহার উপরে সহস্র প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিল, সন্ন্যাসী হয়েছিলুম ভাই।

সুরেশ বলিল, সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু সন্ন্যাসীই যদি হলি, তবে ফিরলি কেন?

দীনবন্ধু বলল, ওরে বাবা! সংসারীর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ফ্যাসাদ বেশি।

মহেন্দ্র দাদা বলিল, সেইজন্যেই তো পৃথিবীতে সংসারী লোক বেশি, আর সন্ন্যাসী কম। এই কথাটা বোঝাবার জন্যে অত কষ্ট করলে কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো এর উত্তর পেতে।

দীনবন্ধু বলিল মহেনদা, উত্তরের ভার হলে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু তখন আমার যা প্রয়োজন হয়েছিল, তা উত্তরের একেবারে বিপরীত। আর সে জিনিস অন্তত তোমার কাছে পাওয়া যেত না।

মহেন্দ্র বলিল কি হয়েছিল, বল তো?

দীনবন্ধু বলিল, পৈতৃক বাড়িখানা বাধা পড়েছিল, জান তো? পাওনা-দাররা নালিশ করে বাড়িখানা বিক্রি করে নিলে। এর পরে আর সংসারে টান থাকে? তুমিই বল?

মহেন্দ্রদা বলিল, সংসার সাগরে গৃহই হল সব থেকে বড় নোঙর, তারই শেকল যখন ছিঁড়ে গেল, তখন কিসে আর ধরে রাখবে, বল? কিন্তু আবার ফিরে এলে কিসের টানে, বল দেখি? ছোট ছোট নোঙর কোথাও ফেলবার চেষ্টায় আছ নাকি?

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল, না দাদা, আর নোঙরে কাজ নেই। এইরকম ভেসে ভেসেই বেড়াব।

সুরেশ বলিল, আচ্ছা, বেরিয়েই বা গেলে কেন, আর ফিরেই বা এলে কেন?

দীনবন্ধু বলিল, বেরিয়ে যাবার কারণ তো বলেছি। অবশ্য ফিরে আসবারও কারণ একটা আছে।

দীনবন্ধুকে সবলে চাপিয়া ধরিলাম, কারণ বলিতেই হইবে। তাহারও বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে আরম্ভ করিল—

তোমাদের তো আগেই বলেছি, পৈতৃক আর স্বোপার্জিত পাওনাদাররা মিলে ভিটেখানা বিক্রি করালে। তখন আমার হাতে আছে মোট তিপান্ন টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে ভাবলুম, কি করা যায়! যেমন বাজার, তাতে চাকরি-বাকরির সুবিধে কোথাও হবে না। ওদিকে তিপান্ন টাকা ফুরোবার সাথে যে উদরযন্ত্রের দাবিও ফুরিয়ে যাবে, এমন কোনও আশা নেই। এই সব নানা দিক ভেবে ঠিক করে ফেললুম, সন্ন্যাসীই হওয়া যাক। যাহাতক মনে হওয়া, অমনই আনা-দুয়েকের লাল মাটি কিনে এনে দুখানা ধুতি গেরুয়া রঙে ছেপে ফেললুম। তার পরদিন দুপুরবেলায় হরিদ্বারের গাড়িতে সন্ন্যাস যাত্রা।

হরিদ্বারে গিয়ে তো পৌঁছলুম, কিন্তু গুরু আর খুঁজে পাই না। অনেক

পরামর্শ দিলে যে, হিমালয়ে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসী আছেন, সেখানে গিয়ে কারুর কাছ থেকে দীক্ষা নাও।

হিমালয়ের দিকেই যাত্রা করা গেল। সমস্ত দিন চলি আর রাত্রে কোন চটিতে আশ্রয় নিই। পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, ভাল সন্ন্যাসী কোথায় আছে? তাদের নির্দেশমত কোনও মঠে গিয়ে উঠি। কোথাও বা যাওয়ামাত্র তাড়িয়ে দেয়, কোথাও বা দু দিন বাদে ব'লে দেয়, তোমাকে দীক্ষা দোব না। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করি।

এই রকম প্রায় মাস-খানেক পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে একদিন এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। এঁর নাম জীবানন্দ। হরিদ্বারে থাকতেই খুব উচ্চ-রের সাধক ব'লে এঁর নাম শুনেছিলুম। ছোট্ট একটি উপত্যকার মধ্যে এঁর মঠ। তিন-চারখানি ঘর, তাতে গুটি কয়েক শিষ্যকে নিয়ে তখন বাস করছিলেন।

সন্ন্যাসীকে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললুম, বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি, তাই আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

সন্ন্যাসী স্মিত হাস্যে বললেন, বেশ করেছ, এখানে থাক। শান্তিময় এই স্থান, শান্তি পাবে।

সেখানে দু-তিন দিন থাকার পর একদিন বিকেলবেলা তাঁকে একলা পেয়ে আমি ব'লে ফেললুম, বাবা, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন।

আমার কথা শুনে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো হঠাৎ লাল টকটকে হয়ে উঠল। আমি তাঁর পদসেবা করছিলুম, তিনি পা গুটিয়ে নিয়ে উঠে ব'সে জিজ্ঞেস করলেন, কি বললে?

স্বামীজীকে হঠাৎ অমন উত্তেজিত হতে দেখে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কি বললে?

এবার আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেললুম, আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। আমি সংসার ত্যাগ—

স্বামীজী সেই সুরেই বললেন, কে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে বলেছে? আমার কাছে আসতেই বা কে বলেছে?

কোনও জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বললেন, আমি মনে করেছিলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ, কিছুদিন থেকে মনটা ভাল হ'লে ফিরে যাবে। এই ভেবেই তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম।

জানই তো, এরকম ধরনের কথা কোন দিনই সহ্য করা আমার অভ্যেস নেই। তবুও, সন্ন্যাসী লোক, তাকে কিছু বলব না মনে ক'রে এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিলুম। কিন্তু সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। বলে ফেললুম, আশ্রয়ের আমার এমন অভাব হয় নি যে, সে জন্য এই পাহাড়-পর্বত ভেঙে আপনার কাছে আসতে হবে।

আরও একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু স্বামীজী তার আগেই

একটি প্রকাণ্ড ধমক ছেড়ে বললেন, তবে ওঠ্। এই মুহূর্তেই এখান থেকে দূর হয়ে যা।

চীৎকার শুনে শিষ্য দুজন ছুটে এল। স্বামীজী তাদের বললেন, এখুনি একে মঠের চৌহদ্দি পার ক'রে দিয়ে এস।

আমি তখনই উঠে পড়লুম। শিষ্য দুজন আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা দেখিয়ে বললে, এই পথ ধ'রে যাও, কেদারে পৌঁছবে। রাস্তা দুর্গম, একটু সাবধানে যেও। পথে যাত্রী দেখলে তাদের সঙ্গ নিও, অসুবিধে হবে না।

শিষ্যরা চ'লে গেলে আমি সেই পথ ধ'রে হাঁটতেআরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ চলবার পর বিপরীত দিক থেকে একজন লোক আসছে দেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, চটি কত দূরে?

সে বললে, এখানে চটি কোথায়? দশ মাইল দূরে একটা চটি আছে বোধ হয়।

লোকটার কথা শুনে আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। একে তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অন্ধকারে পথও চিনতে পারি না; মঠে যাবার পথ চিনি বটে, কিন্তু সেখানে ফেরবার পথ নিজেই নষ্ট ক'রে এসেছি। এই রাত্রিতে দশ মাইল পাহাড়ে-পথ অতিক্রম ক'রে চটিতে পৌঁছবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। বাইরের অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। অন্তরের আশার শিখাও স্তিমিত। একমাত্র ভরসা আমার দুর্জয় সাহস। সেই সাহসে ভর ক'রে আমি অগ্রসর হতে লাগলুম।

রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর আকাশে একটু চাঁদের আলো দেখা দিলে। ক মাইল পথ চ'লে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলুম না, তবে যতদূর মনে পড়ে, একটা ছোট আর একটা বড় উপত্যকা পার হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। স্থির করলুম যে, এক জায়গায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করব।

একটা গাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করছিলুম, কখন যে সুষুপ্তির কোলে চ'লে পড়েছি, তা জানতেই পারি নি, হঠাৎ খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস আমায় ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে।

জেগে দেখি, চাঁদের আলোতে চারিদিক ভেসে গেছে। আমার চারিদিকে ছোট থেকে বড়—একটার পর একটা পাহাড় থাকে থাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দূরে, সবার পেছনে একটা পাহাড় আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে। বাতাস অতি মৃদুভাবে তার গায়ে মেঘের চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। কি স্থির আর কি শান্তভাবে তারা কাল-সমুদ্রের বুকে অনন্তের নোঙর পেতে প'ড়ে আছে!

আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়গুলো যেন এই শব্দহীন, অন্তহীন নীল চাঁদোয়ার নীচে ব'সে মহাপ্রলয়ের দিন কে কি কাজের ভার নেবে, তারই পরামর্শ করছে। সেই বিরাট মহান প্রকৃতির সামনে মাথা আপনি নুয়ে পড়ল।

মাথা তুলতে না তুলতে শুনতে পেলুম, চল্, এত রাতে আর এখানে ব'সে থাকে না।

পেছনে ফিরে দেখি, স্বামীজী তাঁর দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ফিরতেই তিনি বললেন, তুই তো ভারি অভিমানী ছেলে! চলে যেতে বললুম ব'লেই কি চ'লে যেতে হয়?

স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে বললুম, প্রভু, আপনি তাড়িয়ে না দিলে এ দৃশ্য আমি দেখতে পেতুম না। চ'লে যেতে ব'লে ভাল ই করেছিলেন।

স্বামীজী আমার একখানি হাত ধ'রে বললেন, চল্, ফিরে চল্। রাগ করিস নি।

সেই রাত্রিতে আবার মঠে ফিরে এলুম। বোধ হয় চার দিন পরে স্বামীজী আমার দীক্ষা দিলেন। আমার সংসারী নাম ঘুচে গিয়ে নাম হল—অরূপ-চৈতন্য।

মঠে বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। সকালে স্বামীজী আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। দূরে দু-তিনখানা গ্রাম ছিল, তারই বাসিন্দারা আমাদের আহার্য যোগাত, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর ধনী শিষ্যরা ভেট পাঠাত। শক্ত কাজের মধ্যে ছিল ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসা। জ্যোৎস্না রাত্রি হ'লেই আমি পাহাড়ে বেরিয়ে পড়তুম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মঠে এসে শুয়ে পড়তুম।

বাইরের যে পৃথিবীটার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চ'লে এসেছিলুম, মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে তার আহ্বান আমার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ে আমাকে আকুল ক'রে তুলত। কিন্তু নির্জনতার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। তার নেশা ধরতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু সে মৌতাত একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর ছাড়া মুশকিল। আস্তে আস্তে এই একলা থাকার মৌতাতে আমি মশগুল হয়ে উঠছিলুম, এমন সময় কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীজীকে বোম্বাইয়ের দিকে চ'লে যেতে হ'ল।

মঠে তখন আমরা তিনজনমাত্র শিষ্য ছিলুম। স্বামীজী একজনকে সঙ্গে নিলেন, একজনকে পাঠিয়ে দিলেন প্রয়াগ-অঞ্চলে, আর আমায় বললেন, তুই নিজের দেশে যা। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর একবার দেশে যেতে হয়।

মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আর আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গুরুর আগ্রহে আমায় বেরুতে হ'ল। তিনি আমাদের দুজনকে ব'লে দিলেন, দু বছর পরে আমি এইখানে ফিরব।

বেরিয়ে পড়তে হ'ল। বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, তখন হাতে আর কিছু না থাক্, রেলভাড়াটা ছিল, এখন একেবারে রিক্ত। বিনা টিকিটেই রেলে উঠে পড়া গেল। টিকিট নেই শুনে কেউ বা সন্ন্যাসী দেখে ছেড়ে দেয় আর কেউ বা ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেয়। তখনকার মত নেমে পড়ি, পরদিন আবার ট্রেনে উঠে চলতে থাকি।

এই রকম ক'রে অগ্রসর হতে হতে একদিন মধুপুর রেল-স্টেশনে একজন

কর্মচারী আমার টিকিট নেই দেখে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে। আমি মনে করেছিলুম, আমাকে নামিয়ে দিলেই সে নিশ্চিন্ত হবে, আমিও আবার অন্য গাড়িতে চড়ব। কিন্তু না হ'ল না স্টেশন থেকে গাড়িখানা চ'লে যাবার পর সে ব্যক্তি আমাকে একেবারে রেল পুলিসের জিম্মায় সমর্পণ করলে। এরকম ফ্যাসাদে এর আগে আর কখনও পড়ি নি। প্রায় আট-দশ দিন টানা-প'ড়েন থানা পুলিস হতে হতে ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। আমি আন্দাজ করেছিলুম, এই সুযোগে জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা বোধ হয় হয়ে যাবে। কিন্তু সুবোধ হাকিম কোম্পানির সমস্ত কথা শুনে আমায় বললে, যাও, এমন কাজ আর ক'রো না।

সন্ন্যাসীর নামে মামলা হওয়ায় সেখানে হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। আমি মুক্তি পেতেই শহরের এক জন ধনী লোক আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাব শুনে তারা রেলের টিকিট কিনে দিতে চাইলে। কিন্তু রেলে উঠতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। আমি সেখান থেকে হেঁটেই রওনা হলুম।

মধ্যপ্রদেশ থেকে কলকাতা অবধি বেশ ভাল হাঁটা পথ আছে সেই রাস্তা ধ'রে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছি। তখন বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে কষ্ট দেয়, আর পাহাড় নদীগুলো ভরে ওঠায় কোন কোন জায়গায় পারের জন্যে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। তা না হলে সন্ন্যাসীর পক্ষে পথ চলায় কোনও কষ্ট নেই।

মাসখানেক পরে চ'লে বাংলায় এসে পৌঁছলুম। বৃষ্টি তখনও থামে নি বরং আরও বেড়েছে। মাঠ ঘাট সব জলে ভর্তি রাস্তাও আর তেমন শুকনো যে নয়, মধ্যে মধ্যে ভারি কাদা।

একদিন—সেদিন আর কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকি নি। রাস্তা বেয়ে তাড়াতাড়ি চলেছি, কোনও রকমে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। কতবার বৃষ্টি এল আর কতবার যে ভিজে কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল, তার ঠিকানা নেই। সমস্ত দিন চ'লে চ'লে সন্ধ্যার সময় একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলুম। পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তার ওপরে জলে ভিজে ভিজে কদিন থেকেই শরীরটা জ্বর জ্বর করছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরেই আবার বৃষ্টি শুরু হ'ল। মনে করেছিলুম, রাত্রিটা এখানে কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে আবার চলা শুরু করব। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

আমি যে গাছের নীচে আস্তানা করেছিলুম, তার একটু দূরেই একটা রাস্তা গ্রামের দিকে চ'লে গিয়েছে। এই দুর্যোগে কোনও রকমে কোনও গৃহস্থের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারলে নিশ্চয় রাত্রির মত একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে—এই ভরসায় গাছের তলা থেকে দৌড় দিলুম।

দৌড়—দৌড়—দৌড়। কিছুক্ষণ দৌড়ুই, আবার কিছুক্ষন হাঁটি। এই

রকম ক'রে চলতে চলতে দূরে একটা আলো দেখতে পেলুম। ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা একটা মুদীর দোকান; ছোট একটি চালাঘর। মুদী সেখানে আশ্রয় দিলে না, তবে সে দয়া ক'রে গ্রামের রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে বললে, গাঁয়ের ভেতরে যাও, সেখানে আশ্রয় পেতে পার।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার ওপরে কালো মেঘের ছায়া ধরণীর যা কিছু সব যেন নিকিয়ে নিয়েছে। চোখে কিছুই দেখতে পাই না। অন্ধকার, কাঁটা আর কাদায় মিলে সে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে চলতে লাগলুম।

গ্রাম একেবারে নিষুতি। একে এই দুর্যোগ, তার ওপরে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর গ্রামবাসীরা যে যার শুয়ে পড়েছে। মানুষ তো ছার, একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে না। এরই ভেতর দিয়ে আমি পিছলে পিছলে টলতে টলতে চলেছি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, তবুও চলেছি এমন সময় অনেক দূরে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা সেই আলো লক্ষ্য ক'রে গিয়ে আমি একটা একতলা জীর্ণ বাড়ির সামনে উপস্থিত হলুম। একটা খোলা জানলা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিল। একটু ঘুরে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল বটে, কিন্তু কেউ নেই সেখানে। আমি ডাক দিলুম, বাড়িতে কে আছেন? বাড়ির ভেতরে রমণীকণ্ঠ শোনা গেল, ওরে, দেখ, বোধ হয় ডাক্তারবাবু এলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কিশোরী প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সে লণ্ঠনটা তুলে 'কে?' ব'লে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে লণ্ঠনটা ঠক ক'রে নামিয়ে রেখে সে ভেতরে চ'লে গেল।

একটু পরেই একজন বিধবা রমণী 'কে?'? ব'লে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে গুটি দুই তিন ছেলেমেয়ে।

আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম, আমি অতিথি। এই দুর্যোগে বড় বিপদে পড়েছি; রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।

রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?

বললুম, সন্ন্যাসীর আবার বাড়ি কোথায় মা।

ও, তুমি সন্ন্যাসী। তা গেরুয়া দেখেই মনে হয়েছিল। এস বাবা, ভেতরে এস। ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড়খানা নিংড়ে পরলুম। শরীর একেবারে ভেঙে আসছিল; শোবার জন্যে জায়গা খুঁজছি, এমন সময়ে সেই বিধবা আমায় বললেন, বাবা, আমাদের বড় বিপদ। তাই দেখেই বোধ হয়

ভগবান এত রাত্রে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘুমটুম সব ছুটে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বিপদ বলুন? আমার যদি সাধ্য থাকে—

তিনি বললেন, আমার বড় মেয়েটি আজ ছ মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। আজ সন্ধেবেলায় কাসতে কাসতে কি রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছে, এখনও ভাল ক'রে জ্ঞান হয় নি। এ গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই; ভিন গাঁয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে। তা এই দুর্যোগে সে বোধ হয় আর এল না।

চলুন, তাকে দেখে আসি।

এই ব'লে উঠলুম। বিধবা আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের এক দেওয়ালের গায়ে লাগা এক খাটে রোগিণী শুয়ে আছে। এই ঘরেরই খোলা জানলা দিয়ে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই লক্ষ্য ক'রে আমি এসেছি রোগিণীর বয়স বোধ হয় কুড়ির কাছাকাছি। দেখতে হয়তো সুন্দরীই ছিল, কিন্তু নির্মম রোগ তার সমস্ত সৌন্দর্যই গ্রাস করেছে।

অনেকক্ষণ বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ দেখলুম। চোখ বুজে সে প'ড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, এর নাম কি?

ললিতা।

রোগিণীর তপ্ত ললাটে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলুম, ললিতা!

ডাকামাত্র তার নিমীলিত চোখ দুটো খুলে গেল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুলে।

রোগিণীর মা বললেন, সন্ধ্যের আগে একবার বমি ক'রে সেই যে চোখ বুজে ছিল, আর এই খুলল। তোমাকে কি বলব বাবা—

আমি বললুম, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আর কোন ভয় নেই। কাল ডাক্তার এলে যা হয় ব্যবস্থা হবে।

রোগিণীর ঘরের বাইরে একটা চওড়া দাওয়া। তারই এক কোণে আমার শোবার ব্যবস্থা হ'ল।

পাশের একটা ঘরে ছেলেমেয়েদের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, ললিতার মা আমাকে শুইয়ে সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

তখনও বৃষ্টি থামে নি। বৃষ্টির সেই অখণ্ড ঘুম পাড়ানিয়া গানে গ্রামের সমস্ত প্রাণীই নিদ্রিত। আমার চোখ থেকে কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই পাশের ঘরের সেই রুগ্না মেয়েটির জীর্ণ মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার কথা ভাবতে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমাকে তার দিকে টানতে লাগল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, বাতিটা তখনও মিটমিট করছে। কোণে এক বৃদ্ধা ঝি প'ড়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে। খাটের দিকে চেয়ে দেখলুম, ললিতা আবার চিত হয়ে শুয়েছে। সেই স্তিমিত আলোতে তার মুখ ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না. আমি খাটের ধারে গিয়ে ঝুঁকে তার মুখখানা দেখতে লাগলুম।

একদৃষ্টে তাকে দেখছি। নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে, তা পড়ছে কিনা, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার একখানা হাত তুলে নাড়ী দেখতে লাগলুম। জীবন প্রবাহ অতি ক্ষীণ, যে কোনও মুহূর্তে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ রুগ্নার চোখ দুটো খুলে গেল। আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠল কে! কে তুমি?

আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে রেখে বললুম, কোনও ভয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী! ও, তুমিই বুঝি রোজ ওই জানলার ধারে ব'সে থাক? আজ এত কাছে এসেছ যে?

আমি বললুম, তুমি ঘুমোও। বেশি কথা বললে অসুখ বাড়বে।

কিন্তু তুমি এত কাছে এসেছ কেন? আমাকে বুঝি নিয়ে যাবে? না না, আমি যাব না, তুমি যাও।

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, বিকারের ঘোরে সে ভুল বকছে। আমি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি চোখ বোজ, ঘুমোও।

মেয়েটি আর একবার দৃষ্টিহীন চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে চোখ বুজল।

একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার সেই শীর্ণ মুখ আর অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি করুণায় আমার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতে লাগল। আমি ব'সে ব'সে ললিতাকে পাখার বাতাস করতে লাগলুম। গুরুদেবের শিক্ষা একেবারে বিফলে যায় নি। তোমাদের সত্যি বলছি, সেখানে ব'সে ব'সে আমার মনে হতে লাগল যে, এর মধ্যে ভগবানের নিশ্চয় কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তা না হ'লে কোথাকার লোক আমি, আর আজ এই শেষরাতে কোথায় ব'সে কাকে বাতাস করছি! আশ্চর্য দৈবের খেলা!

সূর্যের রথখানা তখনও উদয়াচলের শিখরে এসে পৌঁছয় নি। অন্ধকার একটু ফ্যাকাশে হয়েছে মাত্র, এমন সময় ললিতার মা ঘরে ঢুকে আমাকে ওই অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বললেন, সারারাত্রি এইখানে ব'সে আছ বাবা? তুমি আর-জন্মে নিশ্চয়ই আমাদের কেউ ছিলে। তা না হ'লে—

তাঁকে বাধা দিয়ে বললুম, আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। সেবাই আমাদের ধর্ম।

আমাদের কথা শুনে ললিতার ঘুম ভেঙে গেল। রে চোখ চেয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে লাগল। তার মা কাল রাত্রির সমস্ত কথা ব'লে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে শুয়েই হাতজোড় ক'রে আমাকে নমস্কার করলে।

সকালবেলা ক্রমে ক্রমে ললিতাদের বাড়ির অবস্থা জানতে পারলুম। ললিতার বাবা ছিলেন একজন কবি, কাজেই দরিদ্র। চাকরি-বাকরির চেষ্টা চার-পাঁচ বার করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি কোথাও বনিবনা হয় নি। অতি সামান্য আয় আছে, তাতে কষ্টে দুবেলা খাওয়া চলে। জাতে তাঁরা ব্রাহ্মণ। বছর-খানেক আগে ললিতার বাবা তিন দিনের জ্বরে মারা গেছেন। ললিতা ছাড়া

আরও একটি মেয়ে আছে, তার নাম অমিতা। দুটি ছেলে, তারা মেয়েদের চেয়ে ছোট। মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি। ললিতার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, এমন সময় তার বাবা মারা গেলেন। তারপরে আজ ছ মাস সে জ্বরে জ্বরেই সারা হচ্ছে। কাল বিকেলে সে রক্তবমি ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভিন গাঁয়ে ডাক্তার থাকে, রাতে লোক পাঠানো হয়েছিল, লোকও ফেরে নি, ডাক্তারও আসেনি।

ললিতার মার বয়সও বেশি নয়, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। সংসারের কাহিনী বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, ললিতা বাঁচবে তো? কর্তার বড় আদরের মেয়ে ও।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, বললুম, না বাঁচবার তো কোন কারণ দেখছি না, ও সেরে উঠবে।

তিনি বললেন, তুমি কটা দিন এখানে থাক বাবা, তোমায় দেখে আমার ভরসা হচ্ছে।

মাসখানেক ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমিও ক্লান্ত হয়েছিলুম, বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাঁর কথা শুনে বললুম, বেশ, আমি আছি।

ললিতার মা সংসারের কাজে ব্যাপৃত হলেন, আমি আবার ললিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। তার মনটা একটু প্রফুল্ল করবার জন্যে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে?

সে উৎসাহিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, বলুন, শুনব।

একটা গল্প বললুম। সে শুনে বললে, এ গল্প আমি জানি। আর একটা বললুম, সে বললে, এও আমি জানি।

সকালবেলা গল্প ক'রে কাটল। দুপুরবেলা ডাক্তার এলেন। হাতুড়ে ডাক্তার, কলকাতার কোন্ এক স্বদেশী ডাক্তারী কলেজে বছর ছয়েক প'ড়ে পাঁচটি অক্ষর উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু ললিতার যে রোগ, তা ধরবার জন্যে দিগ্‌গজ ডাক্তার না এলেও চলে। ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে দুটি টাকা নিয়ে আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, রাজযক্ষ্মা হয়েছে, দুটো ফুসফুসেই আর কিছু নেই, যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারে।

বিকেলবেলায় ললিতার খাটের পাশে ব'সে আছি। অস্তোন্মুখ রবির এক টুকরো ম্লান রশ্মি খোলা জানালা দিয়ে বিছানার ধারে এসে পড়েছিল। ললিতা অনেকক্ষণ সেই আলোটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, সন্ন্যাসী, ডাক্তার কি ব'লে গেল, আমি আর বাঁচব না?

আমি বললুম, সে কি! কে বললে তোমাকে? ডাক্তার বললে, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। ওসব কথা ভাবে না লক্ষ্মীটি।

আমার কথা শুনে ললিতার শীর্ণ মুখ খুশিতে ভ'রে উঠল। সে বললে, না না সন্ন্যাসী, আমি তো সে কথা ভাবি না। আমি দিনরাত বাঁচবার কথাই ভাবি। শুধু ভাবি, কবে ভাল হয়ে উঠব। এখন আমি মরতে চাই না।

আমার এই উনিশ বছর বয়েস, এই বয়েসে কি মরতে ইচ্ছে হয় ? আমার অনেক আশা আছে, অনেক—অ—নে—ক—

এই অবধি ব'লে সে ভয়ানক হাঁপাতে লাগল। পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভয়ে তাকে বললুম, ললিতা, গল্প শুনবে ?

ললিতা একটু হেসে বললে, না, গল্প নয়। ওই তাকের ওপর কবিতার বই আছে, নিয়ে এসে আমায় শোনাও না।

তাকের ওপরে সারি সারি ইংরেজী বাংলা কবিতার বই সাজানো ছিল। একখানা বাংলা বই নিয়ে এসে বললুম, কোনটা পড়ব ?

ললিতা বললে, যেটা ইচ্ছে পড়।

আমি পড়তে লাগলুম, আর ললিতা চোখ বুজে রইল। একটার পর একটা প'ড়ে যাই, তার আর ক্লান্তি নেই। ঝি এসে আলো দিয়ে গেল, মা এসে কাছে বসলেন, অনিতা এসে খাইয়ে গেল, মা অন্য কাজে গেলেন, পড়ার আর বিরাম নেই। একবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে আমি পড়া বন্ধ করলুম, কিন্তু তখনই সে চোখ চেয়ে বললে, কই, পড়ছ না ?

আবার পড়তে শুরু করা গেল। একবার ললিতার দিকে চেয়ে দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

তার সেই অবস্থায় মনের ওপর কোন চাপ পড়া উচিত নয় ভেবে পড়া বন্ধ করলুম। ললিতা তখনই চোখ চেয়ে বললে, থামলে যে ?

আমি বললুম, আজ এই অবধি থাক্, আবার কাল হবে। কি বল ? ললিতা বললে, আচ্ছা।

তাকে বইখানা রেখে এসে তার কাছে বসামাত্র সে বললে, সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল। বড় সুন্দর পড়তে পার তুমি। আমার বাবাও খুব সুন্দর পড়তে পারতেন। আমাতে আর বাবাতে বই হাতে ক'রে কখনও চ'লে যেতুম সেই নদীর ধারে, কখনও বা ওই বড় মাঠটা পেরিয়ে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে, সমস্ত দিন আমরা সেখানে ব'সে ব'সে কবিতা পড়তুম। এই ভাদ্র মাসে আমরা ভাই-বোনে মিলে মাঠে-ঘাটে কত খেলাই করেছি ! আজ প্রায় ছ মাস হ'ল বাড়ি থেকে বেরুই নি। প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠছে। কতদিনে আমি ভাল হয়ে উঠব, বলতে পার, সন্ন্যাসী ?

ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, তুমি শিগগির সেরে উঠবে। সেরে উঠলে আবার আমরা তেমনই ক'রে খেলতে যাব। তোমার শরীরটা একটু ভাল হোক।

আমার কথা শুনে সে সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, তুমি ঘুমোও, লক্ষ্মীটি, তা না হ'লে আবার অসুখ বাড়বে।

ললিতা আর কিছু না ব'লে চোখ বুজে ফেললে।

সে রাত্রিতে ললিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে উঠল। রাত্রি বারোটা কি একটার সময় সে কাসতে আরম্ভ করলে। কিছু পরেই তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত

উঠতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাকে খবর দিলুম। ললিতার মা আর তার বোন অমিতা এসে আর্তের পাশে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল। বাতাস করতে করতে একটু যদি যন্ত্রণা কমে তো অমনই কাসি শুরু হয়, তারপরেই দু ঝলক লাল টকটকে রক্ত। একটুখানি নিশ্বাস নেবার জন্যে সে কি চেষ্টা! শতচ্ছিদ্র ফুসফুসের সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, তা যক্ষ্মা-রুগীকে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। আমার মনে হতে লাগল, আজ রাত্রিতে বোধ হয় শেষ। কিন্তু মানুষের প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে না দিয়ে তো মুক্তি পায় না। সারারাত্রি সেই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে শেষ রাত্রির দিকে ললিতা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। আমরা তিনজনে সারারাত তার বিছানার পাশে ব'সে ব'সে কাটালুম।

ললিতাদের গ্রামের ধার দিয়েই গঙ্গা ব'য়ে গিয়েছে। আমি রোজ নদীতে গিয়ে স্নান করতুম। সকালবেলা একটুখানি ঘুমিয়ে স্নান সেরে এসে দেখি, ললিতা জেগেছে আর বেশ প্রফুল্লভাবেই তার ছোট ভাই-বোনেদের সঙ্গে গল্প করছে। একটি ভাই আদর ক'রে তার দিদির পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ললিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলে, সন্ন্যাসী, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ।

এখন গঙ্গার দুকূল ভ'রে উঠেছে, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা সন্ন্যাসী, গঙ্গার ধারে সেই যে বড় বটগাছটা, সেটা দেখেছ?

হ্যাঁ।

তারই একটি মোটা শেকড় মাটি থেকে ধনুকের মত হয়ে উঠে আবার মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, সেটা দেখেছ?

কই, তা তো দেখি নি!

তা হ'লে সেটা জলে ডুবে গিয়েছে। আর কতদিনে যে গঙ্গার সে রূপ আবার দেখতে পাব!

ললিতা তার ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করলে। কিছুক্ষণ পরে ললিতার মা, অমিতা ও তার ছোট ভাই দুটিকে খাবার জন্যে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ভাই-বোনেরা চ'লে যাবার পর ললিতা চোখ মেলে আমায় বললে, সন্ন্যাসী এই সময় মাঠে খুব কাশফুল হয়। আমার জন্যে কাল এক গোছা তুলে আনবে?

আমি বললুম, কাল কেন, আজই বিকেলে তোমার জন্যে কাশ নিয়ে আসব। মাঠে অনেক কাশ দেখেছি।

ললিতা এতক্ষণ বেশ হাসিখুশিই করছিল, হঠাৎ তার চক্ষু দুটি সজল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মাঠ-ভরা কাশের সেই শোভা, বর্ষার গঙ্গার

সেই আপন-ভোলা উদ্দাম স্রোত, শরতের সকালে এই মিষ্টি রোদ—এই শেষ সব শেষ। আর দেখতে পাব না।

ললিতার কণ্ঠে এমন একটা অসহায় ও উদাস সুর বাজতে লাগল যে, চোখের জল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তখনও সন্ন্যাসীর অভিমান আমার যায় নি। নিজের মনকে ধমক দিতে লাগলুম, ছি, এত কোমল তুমি।

ললিতাকে বললুম, ললিতা, ওসব কথা ভেবে নিজের অসুখ বাড়িয়ে কেন আমাদের দুঃখ দিচ্ছ? তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

ললিতা আবার আমার মুখের দিকে তাকালে। সেই সজল দৃষ্টি। এবার সে বললে, সন্ন্যাসী, আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়? আমি যদি ম'রে যাই, আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে? আমি ম'রে গেলে তুমিও তো এখান থেকে চ'লে যাবে। তারপর তুমি কত দেশে দেশে ঘুরবে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, তারই মধ্যে সজনে কি নির্জনে পাড়াগাঁয়ের এই ললিতার কথা, যার সঙ্গে দুদিনের জন্যে তোমার ভাব হয়েছিল, তার কথা কি মনে থাকবে?

আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল। কোনও রকমে গলাটি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললুম, থাকবে ললিতা। তোমাকে কখনও ভুলব না।

ললিতা যেন একটা আশ্বাসের নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আ সন্ন্যাসী, তুমি বড় ভাল।

ললিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তার মাকে নির্জনে ডেকে বললুম, ললিতার অবস্থা ভাল নয়, বোধ হয় দু একদিনের বেশি বাঁচবে না।

কথাটা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার সংবাদে মায়ের সে চমকানি, তার বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। তিনি কোন কথা না ব'লে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। সদ্যোবিধবা সেই নারীকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা আমার যোগাল না। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম, মৃত্যু এ সংসারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু ধরণীর এই অতি পুরাতন অতিথি প্রতি গৃহে প্রতি বারেই দেখা দেয়। সকলেই জানে, এর কোন প্রতিকার নেই, তবুও তারা শোকে কাতর হয়। সকলেই জানে, সান্ত্বনার কোন মূল্য নেই, তবুও সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে মরে। ললিতার মার অশ্রু দেখে আমিও দু-চারটে সান্ত্বনার বাঁধা গৎ আওড়াতে লাগলুম। কিন্তু ছেলেরা সেখানে এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে গেলুম।

বিকেলবেলা অমিতা ও তার ভাই দুটিকে নিয়ে মাঠ থেকে কয়েক গোছা কাশফুল তুলে নিয়ে এলুম। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা কি রকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। ফুলগুলো দেখে তার মুখে আবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে একটি গোছা ফুল নিয়ে নিজের মুখের ওপর বুলোতে আরম্ভ করলে।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল একেবারে রাত্রি বারোটা কি একটায়। এর মধ্যে তাকে একবার জাগিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। আমি তার পাশে ব'সে ছিলুম, সে আমার একখানা হাত ধ'রে

বললে, সন্ন্যাসী, ঠিক ক'রে বল তো আমি বাঁচব কি না? দেখো, আমার কাছে গোপন ক'রো না। যদি আমি আর না বাঁচি, তা হ'লে তোমায় একটা কথা ব'লে যাব। সে কথা তোমাকে বলবার আগে আমি ম'রে গেলে আমার ক্ষোভের আর সীমা থাকবে না। সে দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। বল বল, আমি কি আর বাঁচব না?

ললিতার সে অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। ব'লে ফেললুম, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে।

আমার কথা শুনে সে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে বললে, বড় উপকার করলে তুমি আমার। এ কথাটা তোমায় না বললে ম'রেও আমি শান্তি পেতুম না। শুনবে সে কথা?

বল, শুনি।

আমি তোমায় ভালবাসি।

আঁ! আমার সন্দেহ হ'ল যে, বিকারের ঝোঁকে সে বুঝি ভুল বকছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, ললিতা, ঘুমোও তুমি। বেশি কথা কইলে—

ললিতা আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে ব'লে যেতে লাগল, দেখ সন্ন্যাসী, জীবনে আমার সব সাধই মিটেছে, কিন্তু আমি কখনও কারুকে ভালবাসি নি। আমার বুকে ভালবাসার যে সম্পুটখানি আছে, ধনী যেমন যত্ন ক'রে নিজের বুকের মধ্যে মহামূল্য রত্নকে আগলে রাখে, আমিও তেমনই আমার কুমারী-ধর্ম দিয়ে আমার সেই ভালবাসাটিকে আগলে রেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাতে অক্ষুণ্ন সেই পাত্রটিকে তুলে দেবার জন্যে। আজ আর সময় নেই, আমি তোমার হাতে আজ সেই রত্ন তুলে দিচ্ছি। সন্ন্যাসী, শোন, আমি তোমায় ভালবাসি।

আমার মনের অবস্থাটা একবার তোমরা কল্পনা ক'রে দেখ। বাক্‌পটুতার জন্যে তোমাদের কাছে কত প্রশংসাই না পেয়েছি! কিন্তু সেই মুমূর্ষু দু দিনের পরিচিতার প্রেম গ্রহণ করবার মত ভাষা আমি খুঁজে পেলুম না। স্তম্ভিত হয়ে তার পাশে ব'সে রইলুম।

ললিতা আবার বলতে আরম্ভ করলে, সন্ন্যাসী, এদিকে ফেরো, আমার দিকে চাও।

আমি তার দিকে চাইলুম। সে বললে, তুমি? তুমি আমায় ভালবাস?

আমি কি বলব! তাকে ভালবাসার কোনও কল্পনা তখনও পর্যন্ত স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয় নি। কিন্তু তার জীবন মরণের মাঝে সেই ক্ষীণ ব্যবধানটুকু প্রত্যাখ্যানের লজ্জা আর দুঃখে ভরিয়ে দেবার মত সত্যনিষ্ঠা আমার নেই। ব'লে ফেললুম, বাসি ললিতা, বাসি। তুমি কি বুঝতে পার না?

ব'লেই মনে হ'ল, মিথ্যা কথা বলতে শেখা আমার সার্থক হয়েছে। মিথ্যার অতখানি সদ্ব্যবহার করবার অবসর বোধ হয় জীবনে আর পাব না।

ললিতা আমার কথা শুনে বললে, বুঝতে পারি। সেই জন্যই তো তোমাকে ভালবেসেছি।

আমি বললুম, ললিতা, গতজন্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয় আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেবার বোধ হয়, আমি তোমাকে এমনই ক'রে ফাঁকি দিয়েছিলুম, এ জন্মে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে।

ললিতা একটু হেসে বললে, শোধবোধ হয়ে গেল। এবার যখন মিলব, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। যাবার আগে—

ললিতা আর বলতে পারলে না। আমি নীচু হয়ে তার জ্বরতপ্ত অধরে তার কুমারী-জীবনের প্রথম প্রেমের চুম্বন এঁকে দিলুম।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি সন্ন্যাসী?

আশ্চর্য! এতদিন সে আমার নাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নি। আমাকে 'সন্ন্যাসী' ব'লেই ডাকত। আমি বললুম, আমার নাম দীনবন্ধু।

সে বললে, না না, ও নাম ভাল নয়। ও আবার কি নাম!

বললুম, তা হ'লে তুমি আমার একটা নাম দাও।

ললিতা আবার সেই ম্লান হাসি হেসে বললে, সেই বেশ। তোমার নাম তরুণ। কেমন?

আমার হাসি পেল। বললুম, তোমার যে নাম ইচ্ছে, সেই নাম ধ'রেই আমায় ডেকো।

সে বললে, দূর তোমার নাম বুঝি আমায় ধরতে আছে?

একটু চুপ ক'রে সে আবার বললে, ওগো, তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় একটু দাও না।

আমি তাই দিলুম। একটু হাঁপিয়ে গিয়ে সে বললে, আর একবার, ওগো, আর একবার।

আবার তার তৃষিত অধর চুম্বনে ভরিয়ে দিতে হ'ল। চুমুতে তার যেন সাধ আর মিটছিল না। সে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে রইল। সেই অবস্থাতেই আমাদের প্রথম প্রেমের বাসর-রাত্রি অবসান হ'ল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ললিতা ইহলোক থেকে বিদায় নিলে।

দীনবন্ধুর কাহিনী শুনিয়া আমরা নীরব রহিলাম। মহেন্দ্র দাদা জিজ্ঞাসা করিল, গেরুয়া ছাড়লে কোথায়?

দীনবন্ধু বলিল, শ্মশানঘাটে স্নান ক'রে নতুন কাপড় পরবার সময় গঙ্গার জলে গেরুয়া ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি।

হিন্দু-মুসলমান ফ্যাক্ট

মারো মারো—

আবার কি হ'ল ?

দেখ দেখ, লোকটাকে মেরে ফেললে বুঝি !

একটা মোছলমান শহীদ হ'ল বোধ হয়।

গোলমাল শুনে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে জানতে পারলুম, আমাদের কয়লা-ওয়ালাটাকে দ'া-দের দারোয়ানেরা মেরে ফেললে। লোকটা নাকি আজ পনরো বছর ধ'রে মুসলমানত্ব গোপন ক'রে এ পাড়ায় কয়লা ফিরি ক'রে বেড়াচ্ছিল। আজ সকালে হঠাৎ কি ক'রে তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার ও সাজা হয়ে গেল।

সকালবেলা উঠেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। হাঙ্গামার আতঙ্কে সারারাত্রি ঘুম হয় না। রাত্রি তিনটে অবধি বাঁটুল-হাতে ছাতে ঘুরে বাড়ি পাহারা দিই, দূরে গোলমাল শুনতে পেলে সেই দিক লক্ষ্য ক'রে কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে গুলতি ছাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বন্দী, দিনের বেলাতেও বেরবার জো নেই। কি জানি, কোন্ গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোরা নিয়ে মুসলমান লুকিয়ে আছে। জানতে পারবার আগেই হয়তো রপ্তানি হয়ে যাব।

খবরের কাগজ ওলটাতে লাগলুম। তিনজন হিন্দুস্থানী পাঁ্যাড়াতলার পথ দিয়ে জাহান্নমে চ'লে গিয়েছে, সাতজন মুসলমান শহীদ হয়েছে, দুজন মাড়োয়ারীর ঘৃতপুষ্ট ভুঁড়ির দফা কাবার, পা পিছলে প'ড়ে গিয়ে একজন বাঙালী বিশেষ আহত হয়েছে, তার অবস্থা সংকটাপন্ন, ইত্যাদি পড়তে পড়তে মগজের মধ্যে যুদ্ধের বাজনা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় মেয়ে আমার নাচতে নাচতে এসে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ বাবা, ধনাঢ্য মানে নাকি মাড়োয়ারী ?

জিজ্ঞাসা করলুম, এ সন্ধানটি তোমায় দিলে কে ?

মেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, কাকা।

দিন তিনেক আগে ভায়া আমাকে কেন যে 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিল, এবার তার কারণ বুঝতে পারলুম। মেয়েকে বললুম, যা, তোর বই নিয়ে আয়, দেখি, কেমন পড়াশুনো হচ্ছে।

যাক, তবু একটা কাজ পাওয়া গেল মনে ক'রে মহা উৎসাহে মেয়েকে পড়াতে শুরু করলুম বটে, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলুম, কাজটি মোটেই সুখকর নয়। কি ক'রে নিজের রচিত এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করছি, এমন সময় ছোট ভাই মণি মুখ শুকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, মেজদা, একটা মোছলমান তোমায় ডাকছে।

অ্যাঁ, মোছলমান!

হ্যাঁ।

কি রকম দেখতে, ষণ্ডা মতন, লুঙ্গি-পরা?

না, ইজের-আচকান-পরা।

ছোরা-টোরা হাতে আছে দেখলি?

না, তা দেখি নি, তবে আচকানের ভেতর কোমরের কাছে কি যেন একটা উঁচু হয়ে আছে ব'লে মনে হ'ল।

মেয়ে আমার এই অবসরে উঠে পালিয়েছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে ব'লে দিলুম, ব'লে দে, বাড়ি নেই।

ভায়া একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললে, আমি যে তাকে বলেছি, তুমি বাড়িতে আছ। সে বৈঠকখানায় বসেছে।

বেশ করেছ! এখন কি করা যায়!

আমায় চিন্তিত দেখে ভায়া প্রস্তাব করলে, গজেনদার বাড়ি থেকে রিভল্‌ভারটা চেয়ে আনব?

ততক্ষণে আমি একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিয়েছিলুম। ভায়াকে আশ্বস্ত ক'রে নীচে নেমে পড়লুম।

আমাদের পাড়াটাকে হিন্দু-কেল্লা বলা চলে। এখানে গাজী হবার আশায় কোন মুসলমান এসে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। ভরসা ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—আরে, সখায়ৎ মিয়া যে! কি খবর?

সখায়ৎ বললে, মানিকতলার বাজারে মুসলমানদের ঢুকতে দিচ্ছে না, তাই তোমাদের পাড়ায় গোস্ত কিনতে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলুম, ফুফা মিয়া তোমায় সেলাম জানিয়েছেন।

সখায়তের ফুফা মিয়া ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত বাজিয়ে। তাঁরা পশ্চিমে-মুসলমান, আমরা তাঁর শিষ্য, তিনি আমাদের ওস্তাদ। এই দুর্দিনে ওস্তাদ কেন স্মরণ করেছেন বুঝতে পারলুম না। সখায়তকে বললুম, ওস্তাদকে আমার সেলাম জানিও, সুবিধে করতে পারলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

দিন দুয়েক পরে সন্ধ্যের ঝোঁকে একদিন ওস্তাদজীকে গিয়ে সেলাম দেওয়া গেল! তাঁকে ঘিরে জনকয়েক সাকরেদ ব'সে আছে, তারা সকলেই হিন্দু, নানা রকম আলোচনা চলছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ওস্তাদ কেমন আছেন?

খাঁ সাহেব ববলেন, শরীর ভারি খারাপ। তোমায় ডেকেছিলুম একটা কাজের জন্যে এই যে, হিন্দুরা এমন ক'রে মুসলমানদের মারছে, মসজিদ ভেঙে দিচ্ছে, খবরের কাগজে একটা চিটি লিখে হিন্দুদের এই অত্যাচার থামিয়ে দিতে পার না?

কয়েকজন অপরিচিত লোকও সেখানে ব'সে ছিল, তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারা হয়তো মনে করলে যে, আমার একটু কলমের খোঁচার ওপর এতবড় হাংগামাটা থামা না-থামা সব নির্ভর করছে।

গম্ভীরভাবে আসন নিয়ে বললুম, এখন চিঠি লিখলে কি আর হিন্দুরা মার থামাবে, মুসলমানেরা যে আগে মার শুরু করেছে, মন্দির ভেঙেছে আর এখনও মারছে।

খাঁ সাহেব তামাক টানতে টানতে বললেন, আরে, সে কথা ছেড়ে দাও। হিন্দুরা যে এই অন্যায় করছে—

এই অবধি ব'লেই খাঁ সাহেব কাসতে আরম্ভ করলেন। কাসি থামলে একটু দম নিয়ে বললেন, কদিন খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচারে শরীরটা একদম গিয়েছে।

একজন শিষ্য বললেন, খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার কেন করেন? এখন একটু বুঝে চলতে হয়—

খাঁ সাহেব একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, তোমরা বুঝে চলতে দিচ্ছ কোথায় বাপু? এই যে চার দিন বাজারে একেবারে গোস্ত পাওয়া গেল না—

আমি বললুম, ওস্তাদ, বাজারে মাছ তো পাওয়া যাচেছ—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খাঁ সাহেব বললেন, মাছ! মছলি? লাহুলাল্লা! এই মাছ খেয়েই তো আমার এই অবস্থা হয়েছে। মাছ কি একটা খাবার জিনিস?

মাছের মতন এমন নিরীহ জীবের ওপর অতখানি খাপ্পা হবার কি কারণ থাকতে পারে, আমরা তা অনুমান করতে পারলুম না। ইত্যবসরে ওস্তাদ গড়-গড়ায় দুটি দম লাগিয়ে বলতে লাগলেন, তাজ্জব এই যে, হিন্দুরা এত লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়; কিন্তু আল্লার ইশারা তারা মোটেই বুঝতে পারে না। আরে, এটা বুঝতে পারিস না যে, খোদা জমির ওপর এত জায়গা থাকতে মাছের বাসস্থান নির্দেশ করলেন কিনা জলের মধ্যে! মাছ অতি গরম জিনিস, এত গরম যে মানুষের অখাদ্য। দেখ না, দিনরাত তারা জলের মধ্যে বাস করে, কিন্তু মাছের সর্দি হতে কেউ কখনও দেখেছ? হিন্দুরা সেই সাংঘাতিক জিনিসকে জল থেকে তুলে এনে তাতে রাজ্যের গরম মসলা দিয়ে রোজ খাবে। শুধু তাই নয়, এই মাছ নিয়ে হিন্দুরা একটা শাস্তর পর্যন্ত লিখেছে। এই সবের জন্যেই তো বেহেস্তে হিন্দুর স্থান নেই।

ওস্তাদকে ঘিরে আমরা যে কজন মাছ-খোর হিন্দু ব'সে ছিলুম, তাদের পক্ষে এটা বিশেষ গুরুপাক ব'লে বোধ হ'ল না, কিন্তু হিন্দুস্থানী সীতারাম কথাটা হজম করতে পারলে না। সে বললে, খাঁ সাহেব মাছের চেয়ে মাংস তো আরও বেশি গরম—

খাঁ সাহেব এবার নলচে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে বললে? এমন কথা কে বলে? আরে, সামান্য বুদ্ধি দিয়েই দেখ না, বকরি, সে জমিনের ওপর চ'রে বেড়ায় খাদ্য তার ঘাস। তার মাংস কখনও গরম হতে পারে? এইজন্যেই তো মাংস রাঁধতে এত গরম মসলার প্রয়োজন। একদিন মাংস শুধু সিদ্ধ ক'বে খাও দিকি। দেখবে, সর্দিতে ফুসফুস ভ'রে ওঠবে।

এমন অকাট্য যুক্তির কাছে সীতারামও হার মানলে। খাঁ সাহেব

পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানতে টানতে ক্ষিতীশকে বললেন, এই ক্ষিতীশ, বাজাও।

ক্ষিতীগ কোণ থেকে সেতারটি নামিয়ে সুর বাঁধতে লাগল। ঠিক সেই সময় বাইরে আবার গোল শুরু হ'ল, মারো মারো—

আসরের সবাই উঠে দাঁড়াল। কেউ কেউ ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেউ বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলাটা যতদূর সম্ভব লম্বা ক'রে দেখতে লাগল। খাঁ সাহেব 'কেয়া আফৎ' ব'লে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে ব'সে রইলেন। একটু পরে শ্যাম এসে খবর দিলে, একজনকে ছুরি মেরেছে।

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন—হিঁদু না, মোছলমান ?

হিন্দু

অ্যাঁ, হিন্দুকে মারলে পাড়ার ভেতরে!

খাঁ সাহেব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে, যানে দাও, জাহান্নমমে গিয়া।

কথাগুলো গুরুপাক হ'লেও, যারা মাছ খায় তারা কোন রকমে হজম ক'রে ফেললে, কিন্তু নিরামিষাশী সীতারামের তা সহ্য হ'ল না। সে একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে, হিন্দু মরলেই জাহান্নম, আর মুসলমান মরলেই বেহেস্ত, কি বলেন ওস্তাদ ?

ওস্তাদ বললেন, বেশখ্খ্। অর্থাৎ নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে ?

সীতারাম বললে, বা রে বেশ মজার কথা তো!

খাঁ সাহেব বললেন, সীতারাম, তুমি ছেলেমানানুষ, এসব কথা নিয়ে তর্ক ক'রো না। এর পরীক্ষা হয়ে গেছে, প্রমাণ হয়ে গেছে। এ নিয়ে কোন প্রশ্নই এখন আর উঠতে পারে না।

সীতারাম এটোয়ার ব্রাহ্মণ। তার শাস্ত্রে লেখে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ বেহেস্তে যেতে পারে না। খাঁ সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে এক ঘণ্টা ধ'রে সে স্নান করে, সে অত সহজে ছাড়বে কেন ? সে ব'লে ফেললে, এসব আপানার গাঁ-জুরী কথা। এ আমি মানতে রাজি নই। খাঁ সাহেব একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, শুনবে তবে ?

আমরা সবাই বললুম, ওস্তাদ, বলুন, শোনা যাক।

হরিহর এতক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আফিঙের মৌজে বেহেস্তের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, খাস বেহেস্তের কথা উঠতে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে এগিয়ে এসে বসল। খাঁ সাহেব একবার উঠে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন, আশে-পাশে বেহেস্তের কোন দালাল লুকিয়ে আছে কি না! তারপর নিশ্চিত হয়ে শুরু করলেন।—

বেশি দিনের কথা নয়। কলকাতায় আসবার পাঁচ কি ছ বছর আগে হবে, তখন আমরা লক্ষ্ণৌয়ে থাকি। গোমতীর ধারে আমাদের বাড়ি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনে বাড়ি একেবারে জমজম। বাবার অনেক সাধু সন্ন্যাসী

ফকির বন্ধু ছিলেন। তাঁরা রোজ আসতেন, জলসা হ'ত। বেশ চলছিল, এমন সময় একদিন হিন্দু-মুসলমানে লাগল ফাটাফাটি। একদিন, ঠিক এই রকম আর কি, চারিদিকে দাঙ্গা চলেছে, আমাদের বৈঠকখানায় আমি আছি, বাবা আছেন, আর আছেন এক ফকির আর এক সাধু। ফকির সাহেব আর স্বামীজী দুজনেই সাধক, এক কথায় তাঁরা দুজনেই ছিলেন উঁচুদরের বজরুগ। আজ যেমন আমাদের তর্ক বেধেছে, সেদিনও এমনই ধারা বেহেস্তের কথা হতে হতে স্বামীজী আর ফকির সাহেবে লেগে গেল তর্ক। ফকির সাহেব স্বামীজীকে বললেন, তুমি সাধক লোক তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু বেহেস্তে তোমার স্থান নেই।

দুজনে এই নিয়ে তুমুল তর্ক। শেষকালে আমার বাবা বললেন আপনারা ক্ষান্ত হোন, এ নিয়ে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই, কারণ এ কথায় প্রমাণ এখানে হতে পারে না।

ফকির সাহেব বললেন, এখুনি এর পরীক্ষা হয়ে যেতে পারে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ক'রে ?

ফকির সাহেব বললেন, আমরা দুজনে এখুনি এই দেহ ছেড়ে চ'লে যাব। যে বেহেস্ত থেকে সেখানকার প্রধান ফল আনার নিয়ে আসতে পারবে, বুঝতে হবে সে-ই সেখানে গিয়েছিল।

ফকির সাহেবের প্রস্তাব শুনে আমি তো স্তম্ভিত। কিন্তু বাবা দেখলুম কিছুমাত্র ভড়কালেন না। তিনি এসব ব্যাপার এর আগে ঢের দেখেছেন কিনা। তিনি বললেন, খয়েরু, এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

ফকির সাহেব আর স্বামীজী দুজনে প্রস্তুত হলেন। সাধু আসন-পিঁড়ি হয়ে ধ্যানস্থ হলেন আর ফকির সাহেব একটি ছোট্ট মাদুর পেতে সেখানে নেমাজী-বৈঠক শুরু ক'রে দিলেন। তারপরে 'ইয়া বিসমিল্লা'—এই ব'লে ওস্তাদজী বাঁ হাতের তাবিজটাকে ডান হাতের দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধ'রে বিড়বিড় ক'রে কি মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

আমরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর কি হ'ল ওস্তাদ ?

খাঁ সাহেব চক্ষু মেলে চারিদিকে চেয়ে অতি মৃদুভাবে বলতে লাগলেন, তারপরে দেখতে দেখতে ফকির আর সাধু দুজনের দেহ হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। যেখানে সাধু ব'সে ছিলেন সেখানে শুধু তার লেংটি, আর ফকিরের মাদুরে তাঁর আলখাল্লাটি প'ড়ে রইল।

ব্যাপার দেখে আমরা বাপ-বেটায় জড়াজড়ি ক'রে কোণঠাসা হয়ে ব'সে রইলুম। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা চ'লে গেল, ফকির কিংবা সাধু কারুরই দেখা নাই। শেষকালে রাত যখন কাবার হয় হয়, সেই সময় দেখা গেল, সাধুর ন্যাঙট আর ফকিরের আলখাল্লা ভ'রে উঠছে। দেখতে দেখতে দুজনেই এসে হাজির হলেন, দুজনের হাতে দুই আনার। সে আনারের যেমন রঙ, তেমনই তার আকৃতি আর তেমনই তার খোশবু। আমাদের সমস্ত মহল্লাটা আনারের

খোশবুতে ভরপুর হয়ে উঠল। সাধু তাঁর আনারটি বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খেয়ে দেখ খাঁ সাহেব।

বাবা সে আনার ভেঙে একটি ক'রে দানা সবার হাতে দিলেন। আহা-হা-হা, শোভনাল্লা! কি তার আস্বাদন! জীবনে এমন আনার কখনও খাই নি। বাবা স্বামীজীর তারিফ ক'রে বললেন, মাশাল্লা সাধুজী, আল্লা তোমার তনু দুরুস্ত রাখুন, আজ তুমি যা খাওয়ালে জীবনে ভুবল না।

তারপরে ফকির সাহেব তাঁর আনারটি বাবার হাতে তুলে দিলেন। এ আনারটি সাধুর আনারের চাইতে কিছু বড় হবে। তা হোক, গাছের সব ফল আকারে সমান হয় না, তার জন্যে কিছু আসে যায় না। বাবা আস্তে আস্তে আনারটি ভাঙলেন। তোমাদের কি বলব, তোমরা সাকরেদ ছেলের মতন—কি বলব, হাজার মৃগনাভির ছাল একসঙ্গে ছাড়িয়ে ফেললে যেমন গন্ধ বেরোয়, সেই রকম গন্ধে বোধ হয় দশ মাইল জায়গা আমোদিত হয়ে গেল। তারপরে একটি দানা মুখে দেওয়া গেল। সাধুর আনার সু তার বটে, কিন্তু এ আনারের তুলনা নেই। সাধুকে পর্যন্ত সে কথা স্বীকার করতে হ'ল।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, সাধুজী, এর অর্থ কি?

সাধুজী ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে ছিলেন, তিনি মুখ তুলে বললেন, আপনাদের কি বলব, আমার এতকালের সাধনা সবই বৃথা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন বেহেস্তের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, তারা আমায় ভেতরে ঢুকতে দিলে না। তারা বললে, তুমি সাধু লোক, তুমি এখানে ঢুকলে আমাদের সাজা হবে। আমি অনেক অনুনয় করলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মনের দুঃখে সেখান থেকে ফিরে আসছি, এমন সময় পথে যেন কে আমার নাম ধ'রে ডাকলে। ফিরে দেখি, আমার ছেলেবেলাকার এক বন্ধু ইহলোকে তার নাম ছিল আব্বাস। জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে আব্বাস, কবে এলি এখানে, কি করছিস, কেমন আছিস?

আব্বাস বললে, এসেছি তো প্রায় বিশ বছর। আমি বেশ আছি, বেহেস্তের দাঁড়াতলার সর্দার হয়েছি। তারপর তুমি যে এখানে?

আব্বাসকে সব কথা খুলে বললুম। সে বললে, আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি, আমি যদি কিছু করতে পারি।

আমাকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আব্বাস চ'লে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদেই এই আনারটা সে আমায় এনে দিলে।

এই ব'লে সাধু কাঁদতে লাগলেন। ফকির বললেন, এ আনারও বেহেস্তেরই বটে, কিন্তু সেখানে এই আনারগাছ দিয়ে বাগানের বেড়া দেওয়া হয়। বেড়ার আনারের চেয়ে খাস বাগানের আনার ভাল তো হবেই।

সাধুজী তখুনি হিন্দুয়ানিতে তোবা ক'রে ফকির সাহেবের কাছে কলমা প'ড়ে মুসলমান হয়ে পড়লেন।

এই অবধি ব'লে খাঁ সাহেব তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন।

হরিহর একটু এগিয়ে এসে বললে, খাঁ সাহেব, এর পরের ঘটনাটুকু আরও আশ্চর্য আপনি জানেন না।

হরিহর ছিল সংসারত্যাগী। তার ওপরে সে হিপ্‌নটিজ্‌ম্ জানত। খাঁ সাহেব দু-একবার তার ক্রিয়া-কলাপ দেখে তার ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে তাকেও একজন উঁচুদরের ওস্তাদ ব'লে মনে করতেন। হরিহরের কথা শুনে তিনি বললেন, না, তারপরে কি হ'ল তুমি জান নাকি?

হরিহর বললে, জানি, শুনুন তবে—

আপনাদের ওখানে যে মুসলমান হয়েছিল, সে আমার গুরুভাই, আমরা এক ওস্তাদের সাকরেদ। আমি তখন লক্ষ্ণৌ থেকে একটু দূরে নদীর ধারে এক নির্জন জায়গায় ডেরা গেড়ে বসেছি। একদিন এক মুসলমান ফকির আমার আস্তানায় এসে দেখা দিলে। আমি তখন ধুনির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে ছিলুম। ধ্যান ভাঙবার পর তার দিকে ভাল ক'রে দেখি—আরে, তুই! তুই এমন আলখাল্লা পরেছিস কেন?

সে বললে, মুসলমান হয়েছি ভাই, ও তোর হিঁদুয়ানিতে কিছু নেই।

আমি বললুম, কেন? হিন্দুর শাস্ত্রেও তো মুরগী খাবার বিধান আছে।

আমার গুরুভাই কাঁদতে কাঁদতে বললে, মুরগী নয় রে দাদা, আনার, আনার—

কোন রকমে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার কি বল্ দিকিন?

সে আমায় সমস্ত কথা খুলে বললে। তার কথা শুনে আমি বললুম, হতভাগা, গুরুর শিক্ষা একেবারে ভুলে গেছিস? বেহেস্তে তোকে ঢুকতে দেবে কেন? সে যে আমাদের নরক রে। সেখানে কি সাধু সন্ন্যাসী যায়?

গুরুভাইয়ের এতক্ষণে দিব্যচক্ষু খুলল। সে বললে, তবে উপায়?

আমি বললুম, চল্ তোর সেই মুসলমান ফকিরের কাছে।

গুরুভাই আমায় সঙ্গে নিয়ে সেই ফকির সাহেবের কাছে গেল। ফকির সাহেব বড় ভাল লোক, তিনি আমাদের খাতির ক'রে বসালেন। আমি বললুম ফকির সাহেব, আমার বন্ধুকে সিধে লোক পেয়ে খুব দম লাগিয়েছ তো?

ফকির সাহেব বললেন, কেন?

আমি বললুম, বেহেস্ত যে আমাদের নরক, সেখানে তো সাধুকে ঢুকতে দেবে না। আমাদের সাধুরা স্বর্গে যায়, নরকে তো যায় না। আর আনারের কথা কি বলছ সাহেব? আনার তো স্বর্গবাসীরা খায় না, অত বিচি যে ফলের সে ফল কি স্বর্গের লোকেরা খেতে পাবে?

আনারের যুক্তিটা ফকির সাহেবের মনে লাগল। বোঝদার লোক কিনা। তিনি বললেন, তবে বেহেস্তের আনার কি হয়?

আমি বললুম, হিন্দুদের বাড়িতে যেসব গরু কসাইরাও কেনে না, একাদশী করতে করতে ম'রে যায় তারা সব স্বর্গে যায় কিনা, এই তাদের খাবারের জন্যে যেমন ধাপার মাঠে তরকারির চাষ হয়।

ফকির সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তবে স্বর্গের ফল কি?

অমৃতে, আম। সেখানে এক রকম আঁটিহীন আম হয়, স্বর্গবাসীরা সেই আম খায়। আনার! আরে ছোঃ!

ফকির বললেন, খাওয়াতে পার আমায় স্বর্গের অমৃত?

আমি বললুম, স্বর্গের আম তোমায় খাওয়াতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমায় একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ফকির জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রতিজ্ঞা?

স্বর্গের আম যদি বেহেস্তের অনারের চাইতে খেতে ভাল লাগে, তা হ'লে তোমায় হিন্দু হতে হবে।

ফকির সাহেব বললেন, রাজি, কিন্তু এখুনি প্রমাণ করতে হবে।

বেশ।—ব'লে বন্ধুকে আবার আসনে বসিয়ে দেওয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে থাকার পর সে উঠে পড়ল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, কি হ'ল?

সে বললে, স্বর্গের দূতেরা বললে, আলখাল্লা প'রে ধ্যান করলে স্বর্গে ঢুকতে দেবে না।

বন্ধু আলখাল্লা খুলে লেংটি প'রে আবার ধ্যানস্থ হ'ল। এবার কিন্তু দেখতে দেখতে তার দেহ হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক পরে বন্ধু আমার একটি আম হাতে নিয়ে ফিরে এল। আহা-হা-হা! কি তার রূপ! খাঁ সাহেব, এ তোমার তোবড়া-মুখো আনার নয়, এ একেবারে যৌবনের জোয়ারে পরিপূর্ণ, নিটোল। সে আমের রূপ দেখেই তো ফকিরের দশা লেগে গেল। গুণী লোক কিনা, মাল দেখেই চিনে ফেলেছিল। তারপরে তাঁর চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে একটি চাকলা কেটে মুখে ফেলে দিলুম। ফকির তো খেয়ে একেবারে পাগল। বেহেস্তের আনার যে স্বর্গের গরুতে খায়, এ সম্বন্ধে তাঁর আর তিল মাত্র সন্দেহ রইল না। সেই দিনই আমরা তাঁকে শুদ্ধি করিয়ে হিন্দু ক'রে নিলুম। ফকির সাহেব প্রথমে আলখাল্লা ছেড়ে ন্যাঙট পরতে রাজি হন নি। অনেক বোঝানোর পর আলখাল্লা ছাড়লেন বটে, কিন্তু মুরগী হালাল করবার ছোরাটা আর কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হন না শেষকালে তাঁকে হিন্দু-চিমটের দুটো চারটে নিরুপদ্রব প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে তিনি ছোরা ছেড়ে চিমটেরই অনুরাগী হয়েছেন।

এই অবধি ব'লে হরিহর চুপ করলে। হিন্দুর অধিকার নিয়ে এই ঝগড়ার বাজারে হরিহর যে একজন মুসলমানকে শুদ্ধি করেছে, সেজন্যে তার প্রশংসায় আমাদের সবারই বুক ফুলে উঠছিল, কিন্তু অসৌজন্যের ভয়ে আমরা সকালেই সবাই চুপ ক'রে রইলুম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেদ ক'রে খাঁ সাহেবের গড়গড়াটা একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালে, ঝুটর়র়র়র়—বাৎ!

মর্-মরীচিকা

মালকোশ রাগ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। খাঁ সাহেব বললেন, এই রাগের ওপরে জিনের আসক্তি আছে।

শিষ্যবৃন্দ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সেটা কি রকম ?

খাঁ সাহেব বলতে লাগলেন, মর্ত্যের দরবারের জন্যে মিয়া যেমন দরবারী রাগের সৃষ্টি করেছেন, তেমনই স্বর্গের দরবারের জন্য সুরস্বতীজী মালকোশের সৃষ্টি করেন। এই রাগ বাজালে স্বর্গবাসী আত্মাদের মর্ত্যের কথা মনে প'ড়ে যায়। নারদজী এই রাগ ধরাধামে প্রচার করেন।

তবলার ওপরে ডুগিটা উল্টে রেখে দর্শন সিং বললে, খাঁ সাহেব, ওই যে বললেন, মালকোশের ওপরে জিনের আসক্তি, এটা একেবারে নির্যাস সত্যি কথা।

উৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের আবার প্রশ্ন—সেটা আবার কি রকম ?

তা হ'লে বলি শোন। সে এক কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে গয়া শহরে এই কাণ্ড। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, শহর একেবারে নিষুতি ঢোঁড়িজীর বাড়িতে জলসা হচ্ছে, তিনি নিজে এসরার ধরেছেন। মালকোশ আলাপ চলেছে, আসর খুব জ'মে উঠেছে, এমন সময় দেখলুম যে, আসরের এক পাশে আমাদের কিষণদাস লণ্ঠন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবধি ব'লে ঠাকুর চোখ দুটো বুজে স্থির হয়ে রইল। সিদ্ধির ঝোঁকে মধ্যে মধ্যে কথার খেই হারিয়ে সে ওই রকম স্থির হয়ে ব'সে থাকত। তার অবস্থা দেখে আমরা ব'লে উঠলুম, হ্যাঁ ঠাকুর, কিষণদাস—

দর্শন সিং তার ভাঙা গলায় গর্জে উঠল, হ্যাঁ খাঁ সাহেব, কিষণদাস, আরে রাম রাম, কিষণদাস দু বছর আগে মারা গিয়েছে, সেই কিষণদাস এসে, ঠিক আগে যে রকম আসত, সেই ভাবে লণ্ঠনটি নিবিয়ে দিয়ে তার নির্দিষ্ট পেরেকটিতে ঝুলিয়ে একেবারে আমার গা-টি ঘেঁষে চেপে বসল। খাঁ সাহেব, আমার তো হাত-পা ঠকঠক ক'রে কাঁপতে শুরু করল। কি বলব, ঢোঁড়িজী আলাপ করছিলেন, গৎ তোড়া বাজালে আমাকে সেদিন ডাহা বেইজ্জৎ হতে হ'ত।

আবার মিনিটখানেক দম নিয়ে ঠাকুর শুরু করলে, ঢোঁড়িজীর আলাপ শেষ হয়ে গেলে পাশ ফিরে দেখি, কিষণদাস গায়েব। মুখ তুলে পেরেকের দিকে চেয়ে দেখি, লণ্ঠনও গায়েব।

হয়তো মনের ভুল কি দেখতে কি দেখেছি মনে ক'রে কথাটা আর কারুকে বললুম না। জলসা ভেঙে যাবার পর বাড়ি চললুম। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, দলে

দলে তাঁরা দু পাশের বাড়ির ছাতে ব'সে আছেন। পাগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছেন, একেবারে রাস্তায় এসে ঠেকেছে।

ঠাকুরের গল্প শুনে শিষ্যবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা আশা করছিল, এর পর খাঁ সাহেব যা বলবেন, সেটা একটা শোনবার মতন জিনিস হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকার পরেও খাঁ সাহেবের দিক থেকে কোন জবাবই এল না। সেদিন তাঁর মেজাজটা ভাল নেই স্থির ক'রে আমরা যে যার বাড়ি চ'লে গেলুম।

এর কয়েক বছর পরের কথা। পুষ্কর তীর্থ থেকে ফেরবার পথে আজমীঢ়ে উরুস্ পর্ব দেখতে গিয়েছিলুম। বিখ্যাত মুসলমান সাধু মৈনুদ্দিন চিস্তির যে সমাধি সেখানে আছে, সেইখানে তাঁর মৃত্যুদিনে সাত দিন দিন-রাত্রি শ্রাদ্ধোৎসব হয়। উরুস্ পর্ব এখন কিক'রে সম্পন্ন হয় বলতে পারি না, যখনকার কথা বলছি, তখন মুসলমানদের সঙ্গীতাতঙ্ক-রোগটা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়ায়নি সাধুর শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে অনাচে-কানাচে ব'সে অনেক পণ্ডিত মিলে তখন গান-বাজনারও শ্রাদ্ধ করতেন। এইখানে, মসজিদের ভেতরে রোগী সুস্থ, রাজা ফকির, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা রকমের মানুষ-খিচুড়ির মধ্যে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আরে, তুমি এখানে ?

বললুম, পুষ্করে গিয়েছিলুম, মনে করলুম, উরুস্‌টাও দেখে যাই। এ জন্মে হিন্দুমতে যত পাপ সঞ্চয় করা গেছে, তাতে স্বর্গবাস আমার কেউ মারতে পারবে না। এই সঙ্গে বেহেস্তে যাবারও যদি একখানা পাস যোগাড় করতে পারি তো মন্দ কি ?

খাঁ সাহেব তাঁর শিষ্যকে ভাল ক'রেই চিনতেন। আমার পিঠে হাত চাপড়ে বললেন, বেশ করেছ বেটা। দেখ, এখানে হিন্দু মুসলমান সমানে পুজো দিচ্ছে। এ দৃশ্য না দেখলে একটা ক্ষোভ থাকত।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখানে ?

খাঁ সাহেব বললেন যে, এখানে এক মেবারী সর্দারের ছেলে তাঁর কাছে বাজনা শিখছে। তাঁকে উদয়পুরেই থাকতে হয়। সম্প্রতি তারা এখানে তাদের বাগানবাড়িতে এসে বাস করছে। এই শহর থেকে মাইল পনরো দূরে তাদের বাড়ি।

কিছুক্ষণ সদালাপের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বিকেলবেলা বাক্সপত্র গুছোচ্ছি, এমন সময় আমাদের হোটেলের সামনে প্রকাণ্ড এক জুড়ি-গাড়ি এসে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি যে খাঁ সাহেবের ভাতিজা গাড়ির মধ্যে এমন জাঁকিয়ে ব'সে আছে যে দেখলেই মনে হয়, গাড়ি-ঘোড়ার মালিক সে নয়।

আমি ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ? চলেছ কোথায় ?

আমাকে দেখেই সে গাড়ি থেকে নেমে একেবারে আমার ঘরে এসে বললে,

তোকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। সর্দারজী আর খাঁ সাহেব তোকে নেমন্তন্ন করেছেন, আজ ওখানে ভারী জলসা আছে।

আমি বললুম, সে কি! আজ রাত্রি দুটোর গাড়িতে আমি যে আবু যাব, টিকিট কেনা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে।

সে বললে, তার আগে তোমায় এখানে পেঁছে দিয়ে যাব। তোমায় না নিয়ে গেলে দুজনেই আমার ওপরে নারাজ হবেন।

অগত্যা বেরুতে হ'ল। দু ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা ছুটে অশ্বিনীতনয়-যুগল আমাদের ঠিকানায় পেঁছে দিলে।

সর্দারের বাড়িতে যখন পেঁছিলুম, তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। আসরে বাজনা শুরু হয়েছে। সেখানে যেতেই খাঁ সাহেব সর্দারজীর সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। উভয় পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ আপ্যায়ন চলবার পর আসরে আসন নেওয়া গেল।

কয়েকজন স্থানীয় ওস্তাদের বাজনা হয়ে যাবার পর খাঁ সাহেব সরোদ নিয়ে বসলেন। সারোদের তারে একবার মৃদু আঘাত দিতেই কোন থেকে একজন ফরমাশ করলেন, খাঁ সাবেহ, মালকোশ।

খাঁ সাহেব তার বেঁধে মালকোশ আলাপ শুরু করলেন।

আলাপ চলেছে। আসরে সকলেই সমঝদার, বাজে লোক নেই। একটু কাসির শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে। একমনে শুনতে শুনতে আমার মনও সুরের স্রোতে ভেসে চলেছে, হঠাৎ কে যেন কানে কানে বললে, এই রাগের ওপরে জিনের আসক্তি আছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলুম। বহুদিনবিস্মৃত আর একজনের কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে পড়ল, দর্শন সিং ও তার অভিজ্ঞতারকথা, আর তারই সংগে মনে পড়ল যে, দর্শন সিং আজ আর ইহজগতে নেই।

শরীর ও মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। খাঁ সাহেব ততক্ষণে বিলম্বিত লয় শেষ ক'রে মধ্যে লয়ে বাজাতে শুরু করেছেন। মালকোশ রাগের গম্ভীর করুণ সুর চোখের সামনে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। সুরের সুরায় মাতাল মন আমার একেবারে স্বর্গের দরবারে গিয়ে হাজির। দেখতে লাগলুম, যেন দেবী সরস্বতী মাঝখানে বসেছেন, তাঁর বীণা মোহন অংগুলির আঘাতে শাপভ্রষ্ট বিরহী যক্ষের মত মালকোশের সুরে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে। সুরপ্রিয় এক ধারে চক্ষু মুদে ব'সে আছেন, সুরায় তাঁর রুচি নেই. ভৃংগার আসরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পরলোক-প্রবাসী আত্মার দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মালকোশ যেন ইহলোকের সন্দেশহর, তাকে দেখে এই ধরণীর সুখ-দুঃখ আশা-উৎসাহ বিরহ-মিলন যা কিছু তাদের কাছ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তারই মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে তারা উতলা হয়ে উঠেছে।

মুখ তুলে একবার চারিদিকে চাইলুম। দেখলুম, অধিকাংশ লোকই চোখ বুজে, বাকি যারা তাদের চক্ষুও অর্ধ-নিমীলিত। দূরে দেওয়ালে

একটা বড় লণ্ঠন ঝুলছিল, সেটাও যেন নেশায় ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

মনকে একবার জোর ক'রে নাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে বসতে না বসতে আবার শুনতে পেলুম, কেয়া বুঢ়া বাবু, মেজাজ শরীফ?

পাশ ফিরে দেখি, আরে! ছ ফুট তিন ইঞ্চি দর্শন সিং দাঁড়িয়ে।

পোড়া অদৃষ্টকেও বলিহারি! কোথায় উর্বশী মেনকা এসে আসরে নৃত্য শুরু করবে, তা নয় আমার বরাতে এল কিনা—আরে ছ্যাঃ!

চুপ ক'রে আছি দেখে ঠাকুর বললে, ভয় নেই, আমি বেশিক্ষণ থাকব না।

এই ব'লে সে আমার পাশে ব'সে পড়ল। আসরের আর কেউ ঠাকুরকে দেখেছে কি না জানবার জন্যে চারদিকে দেখতে লাগলুম। খাঁ সাহেব তখন মাথা গোঁজ ক'রে দ্রুত লয়ে বাজিয়ে চলেছেন। যারা এতক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে শুনছিল, এবার তারা বিস্ফারিত নয়নে তাঁর আঙুল চালাবার কায়দা দেখছে। সবার চোখ তাঁর দিকে, এদিকে আমার যে কি অবস্থা তা দেখবার অবসর কারুরই নেই।

মালকোশ শেষ হতে প্রায় দশটা বাজল। পাশ ফিরে দেখি, দর্শন সিং উধাও। আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সুবিধের নয় এই ভেবে খাঁ সাহেবকে বললুম, এবার আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন। আজ রাতেই আমাকে রওনা হতে হবে।

খাঁ সাহেব সর্দারজীকে বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে গাড়ি আনতে হুকুম দিলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে লোক এসে সংবাদ দিলে যে, দুটি গাড়িই ঠাকুরাণীদের নিয়ে শহরে গিয়েছে। অন্য সব ঘোড়াই বেদম। একমাত্র গুলবুলন্দ ছাড়া আর কেউ সোয়ারি দিতে পারবে না।

লোকটির কথা শেষ হতে না হতে খাঁ সাহেব ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোড়া হ'লেই চলবে। ভাল ক'রে জিন চড়িয়ে দাও।

ঘোড়ায় চড়বার কথা শুনে তো একেবারে দ'মে গেলুম। এর চেয়ে যে সারারাত্রি জিনের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে থাকতে রাজি আছি। আমার মতন লোকের এই পনরো মাইল রাস্তা ঘোড়ার পিঠে যেতে হ'লে ঘোড়া কিংবা সওয়ার কারুরই যে উদ্দেশ মিলবে না, সে কথাটা এখন এদের বোঝাই কি ক'রে! একবার ভাবলুম এখানে থেকেই যাই, টিকিটের দামটা না হয় যাবে। পাঁচটা টাকার জন্যে কি বেঘোরে প্রাণটা দোব।

মনের অশান্তি বোধ হয় মুখে ফুটে উঠেছিল। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সর্দারজী খাঁ সাহেবকে কি বললেন। তার কথা শুনে খাঁ সাহেব ব'লে উঠলেন, আরে না না, সেজন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না। ও বিশ-পঁচিশ মাইল ঘোড়ার পিঠে যাওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।

মিথ্যে কথা বলা অন্যায়—এই ব্যবস্থা সমাজকে যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা সত্যিই পণ্ডিত লোক। মনে পড়ল, কলকাতায় থাকতে খাঁ সাহেবের আড্ডায়

ব'সে বড় বড় ঘোড়া সওয়ারের অনেক কীর্তি-কাহিনী একটু অদল-বদল ক'রে বেমালুম নিজের ব'লে চালিয়েছি, এখন উপায় কি করি ?

তবুও একবার খাঁ সাহেবকে বলা গেল, ওস্তাদ, আমি তো আজ রাতেই চ'লে যাব, ঘোড়ার কি হবে, কোথায় থাকবে ?

খাঁ সাহেব বললেন, ঘোড়া হোটেলের আস্তাবলে থাকবে। শহরে আমাদের লোক রোজই যাচ্ছে, কাল গিয়ে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ঘোড়া এসে হাজির হ'ল। সাদা কাঠিয়াবাড়ী ঘোড়া, তার ওপরে দিশী জিন চড়ানো, ঠিক যেন একখানি রাজপুত চিত্র।

সর্দারজী ব'লে দিলেন, ঘোড়াটার মুখ কড়া আছে।

ভাবলুম, আর কড়া আছে! আলগা থাকলেই বা কি সুবিধা হবে আমার!

বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ না ক'রে গুল্‌কন্দের পিঠে সওয়ার হওয়া গেল। ডান পায়ের রেকাব লাগাতে না লাগাতে আরবী ঘোড়ার বংশধর চার পা তুলে ছুট দিলে। সর্দারজীকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দেবার অবসর পেলুম না।

ছুটতে ছুটতে একটা তেমাথার কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে ফেললুম। কোন্ রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল কিছুতেই তা ঠিক করতে পারলুম না। রাস্তায় আলো নেই, লোকজনও নেই যে পথ জিজ্ঞাসা ক'রে অগ্রসর হব। অনেক গবেষণা ক'রে শেষে ডান দিকের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলুম।

গল্‌কন্দ আবার ছুট দিলে। একে অনভ্যেস তার ওপরে সেই গাদিওয়ালা দিশী জিন। কখনও ডাইনে কখনও বা বাঁয়ে হেলে কোন রকমে ব'সে আছি। একটু যে আস্তে চ'লে জিরিয়ে নোব, তারও উপায় নেই। রাজপুতানার ঘোড়া আবার দুলকি চাল জানে না। যেতে বললেই চার পা তুলে ছোটে, আর রাশ টানলেই দাঁড়িয়ে যায়। পথ যে চিনে চলব, তারও উপায় নেই, কারণ ঘোড়ায় চড়ার দিকেই সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয়েছে।

ওদিকে আনাড়ী সওয়ার পিঠে নিয়ে গুল্‌কন্দেরও দম প্রায় বেরিয়ে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার ও তার দুজনেরই প্রায় সমান অবস্থা।

ঠিক পথে চলেছি কি না, তা জানাবার জন্যে একজায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারে পথ কিছুতেই চিনতে পারলুম না। মনে হতে লাগল, যেন ভুল পথেই এগিয়ে চলেছি। ঘড়িতে দেখলুম, একটা বেজে গিয়েছে। ভেবে দেখা গেল, যে পথেই আসি না কেন, আজ রাত্রে আড্ডা ত্যাগ করা অসম্ভব। আমি ঘোড়ার মুখ ধ'রে পথের ধারে এক গাছতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে, গাছের সংগে ঘোড়া বেঁধে, তার পিঠ থেকে গদি নামিয়ে তাই মাথায় দিয়ে বালির ওপরে শুয়ে পড়লুম।

মালকোশের প্রভাব তখনও কাটে নি। জলের মধ্যে ছুঁচোবাজি যেমন ঘুরে বেড়ায়, খাঁ সাহেবের হাতের এক-একটা গমক আমার মগজের মধ্যে এমনই চোঁ-চোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শান্তিতে হাত পা এলিয়ে এসেছিল, তার ওপরে নৈশ শীতল বায়ু লেগে ক্লোরোফর্মের নেশার প্রথম অবস্থার মতন বেশ একটা আরামদায়ক অবসাদ শরীরকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানতে পারি নি। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে লাগায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ চেয়েই দেখি, কতকগুলো লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, আর একটা ষণ্ডা মতন লোক অতি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বাংলা থিয়েটারের ভীমের মতন তার গালপাট্টা আর গোঁফ, দেহটি কিন্তু ভীমের চেহারার চারগুণ।

শুনলুম, ভীমমুখো অন্য একজনকে বললে, নিশ্চয় সেই, এতে আর কোন ভুল নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তি গম্ভীরভাবে ব'লে উঠল, তবে আর কেন, লাগাও।

ধড়মড় ক'রে উঠে একবার ভাল ক'রে চারিদিক চেয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি একটা লণ্ঠন আমার মুখের কাছে ধরেছে আর তিন-চারজন লোক আমার দিকে চেয়ে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হ'ল না। দু হাতে বেশ ক'রে চোখ রগড়ে আবার দেখলুম, যথাপূর্বং।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললে, এই, ওঠ।

ব্যাপার কি? কারা এরা? এত ক্রোধেরই বা কারণ কি? কিছুই বুঝতে পারলুম না। একবার মনে হ'ল, মালকোশের ঝোঁক কি এখনও কাটে নি? এরা কি জিন, না ডাকাত?

রাজপুতানায় ঘুরে ঘুরে যে কটি ঝাড়সাই বুলি শেখা গিয়েছিল, তাই এক রকম জোড়াতাড়া দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে বললুম, কে তোমরা? কি চাও?

ভীমরূপী লোকটা এক বিরাট হুংকার ছেড়ে বললে, চোপ রও।

ভীমের পাশেই একটা রোগা মতন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এই ব্যক্তি এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। ভীমের হুংকারের সঙ্গে সঙ্গেই সে কোমর থেকে সাঁই ক'রে একখানা ছোরা টেনে নিয়ে তার বেদানার মতন তোবড়ানো মুখ আরও বিকৃত ক'রে বললে, বিনা বাক্যব্যয়ে এখান থেকে আমাদের সঙ্গে চল। আর একটি কথা বলেছ কি এই ছুরি বুকে বসিয়ে দোব।

বিনা বাক্যব্যয়েই উঠে দাঁড়ালুম। উঃ, মালকোশে কি এতদূর পর্যন্ত হয়! কি করতে চায় এরা আমাকে নিয়ে? কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

কি একটা কথা তাদের জিজ্ঞাসা করব ব'লে ভাবছিলুম, এমন সময় একটা লোক আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বললে, আবার দাঁড়ালি যে?

চল, কিন্তু আমার ঘোড়া—

ভীম একজনকে হুকুম দিলে, এই, ঘোড়াটাকে নিয়ে এস।

চার-পাঁচজন প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে চলতে লাগলুম। কি যে হচ্ছে, কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। বিপদে পড়লুম, না এটা সৌভাগ্যেরই সূচনা হ'ল, তাও ধরতে পারছিলুম না। ওদিকে আমার প্রহরীদের মুখে গালাগালির তুবড়ি ছুটেছে। মাঝে মাঝে পেছন থেকে আচমকা এক-আধটা গুঁতো, গোঁজা, ধাক্কা, এ তো চলেইছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে চলবার পর তারা আমায় একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। ভীম বললে, একেবারে ভেতরে নিয়ে চল, এখানে নয়।

তার কথা শুনে অন্য লোকগুলো আমায় ঠেলতে ঠেলতে দোতলায় একখানা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেললে। ঘর ও সেখানকার আসবাবপত্র দেখলে মনে হয় যে, বাড়ি যাদের, তারা ধনী ও শৌখিন লোক। ঘরখানা ভাল ক'রে দেখছি, এমন সময় ভীম একটা চাবুক হাতে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

চাবুকটা একবার সট ক'রে আওয়াজ ক'রে ভীম বললে, আজ তোমার শেষ দিন।

ভয়ে আমার কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করল। উঃ, মালকোশের কি ভীষণ পরিণাম! এখন কি করি? কি করে এই সব দৈত্যদানাদের হাত থেকে উদ্ধার পাই? মনের মধ্যে একটা আশা হচ্ছিল যে, কোন রকমে রাতটা কাটাতে পারলে হয়। খাঁ সাহেবের মুখে শুনেছিলুম যে, দিনের আলোতে জিনের দেহ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। নানা রকম ভাবনায় মগজের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকতে শুরু হ'ল। ভীমের কথার কি উত্তর দোব তাই ভাবছি, এমন সময় সেই বেদনামুখো লোকটা বললে, তোমার এ রকম ব্যবহারের কারণ কি?

এটা যে আমারই প্রশ্ন, সে কথা এদের এখন বোঝাই কি ক'রে? চুপ ক'রে রইলুম।

এক ব্যক্তি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জোরে আমায় একটা লাথি মেরে বললে, আবার কথা কওয়া হচ্ছে না, মৌনী হয়েছেন!

আমি বললুম, কি কথা বলব? তোমাদের কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

ধাঁ ক'রে গালে একটা চড় এসে পড়ল। চড়টা এত অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে এসে পড়ল যে, কে যে সেটা মারলে, তা বুঝতেই পারলুম না।

ভীম বলতে লাগল, অকৃতজ্ঞ! খেতে পেতিস না, আমার বাবা তোকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলে, তার মেয়েকে বিয়ে ক'রে শেষকালে এই ব্যবহার!

বলতে বলতে ভীম উত্তেজিত হয়ে চাবুকের বাঁট দিয়ে পায়ের গাঁটে ঠকাং ক'রে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

আমি বললুম, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে, তোমরা নিশ্চয় ভুল করছ, আমি সে ব্যক্তি নই।

বদমাইস, মাথার চুল অন্য রকম ক'রে ছেঁটেছ ব'লে মনে করেছ আমাদের

চোখে ধুলো দেবে। তা পারবে না, আজ তোমাকে খুন ক'রে এইখানে পুঁতে রাখব।

আবার একটি চড়।

পাজি, স্ত্রীকে এখানে ফেলে তুমি চারিদিকে মজা ক'রে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে চোখের জলে তার দিন কাটছে। কোথায় ছিলি এতদিন, বল্‌ শিগগির?

আবার একটি বিষম গোঁজা।

উঃ! মনে হ'ল, এই অনাহূত কিল-চড়গুলো বাদ দিলে মোটের ওপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে মন্দ নয়। জিনদের রসিকতার মধ্যে দেখছি বেশ মৌলিকতা আছে।

ওদিকে তুমি মজা ক'রে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে তোমাকে ধরবার জন্যে আমরা এই তিন-চার বছরে প্রায় লাখ টাকা খরচ করেছি।

হায় হায়! বলে কি এরা! আমার জন্যে এক জায়গায় লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, আর আমি কিনা খাতা বগলে নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দিলুম! দুরদৃষ্ট আর কাকে বলে?

চাবুকের বাঁট দিয়ে ভীম আর একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এখন তোমার মতলব কি? মনে রেখো, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

মনটা তখনও মুগ্ধ ভ্রমরের মতন ওই খরচ হয়ে যাওয়া লাখ টাকার চারপাশে ঘুরছিল। ভীম আর একটা খোঁজা দিয়ে আমায় সজাগ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, চুপ ক'রে থাকলে একেবারে জন্মের মত চুপ করিয়ে দোব বলছি। মতলবখানা কি, খুলে বল।

বললুম, মতলব আর কি? আমার জন্যে যদি আরও কিছু খরচ করবার ইচ্ছে তোমাদের থাকে তো সেটা আমাকে নগদ ধ'রে দাও।

কাচের ওপরে পাথর ঘষলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম ক্যাঁকক্যাঁকে সুরে কানের পাশে একজন ধমকে উঠল, আবার রসিকতা হচ্ছে?

বললুম, সম্পর্কটা তো সেই রকমই সাব্যস্ত করবার চেষ্টা চলেছে বাপু।

চোপ রও।—ব'লে সেই ক্যাঁকক্যাঁকে লোকটা আমার বাঁ গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। এক চড়ে সর্বাঙ্গ চিড়বিড়িয়ে উঠল। বুঝতে পারা গেল যে, আগেকার সেই চড়টি এই ব্যক্তির কাছ থেকেই এসেছিল। আর তো সহ্য হয় না। আর এ তো ঠিক জিনের ব্যাপার ব'লেও মনে হচ্ছে না। একজন বলে, চুপ ক'রে থাকলে একেবারে চুপ করিয়ে দোব। আর একজন কথা কইলে বড় চড় হাঁকড়ায়। কথা বলা আর চুপ ক'রে থাকার মাঝামাঝি কি হতে পারে, তাড়াতাড়িতে তাও ঠিক ক'রে উঠতে পারলুম না। এদিকে মার খেতে খেতে যে বেদম হয়ে পড়লুম! ঠিক করলুম, এবার যে মারবে, তাকেই মারব। ব'সে ব'সে কাঁহাতক গালাগালি আর চোরের মার হজম করা যায়?

চুপ ক'রে আছি দেখে ভীম আবার জিজ্ঞাসা করলে, এখন আবার মতলব কি? এখানে ভদ্রভাবে থাকবে, না যমের বাড়ি পাঠিয়ে দোব?

আমি বললুম, তা হ'লে আমায় দিনকতক সময় দাও। ঘরে ব্রাহ্মণী আছেন, তাঁর সঙ্গে পাকা রকমের একটা কাটান-ছিটেন ক'রে আসি। কথাটা তারা বোধ হয় বুঝতে পারলে না। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, কি, কি বললে ?

আবার বললুম, দেশে স্ত্রী রয়েছে, তার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা ক'রে আসতে হবে তো ?

ভীম বলতে লাগল, আবার যে বিয়ে করেছ, সে কথা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। এর মধ্যে নিশ্চয় অন্য স্ত্রীলোক আছে, নইলে হঠাৎ তুমি তোমার ধর্মপত্নীকে ফেলে পালাবেই বা কেন ? পাষণ্ড !

ক্যাঁককেঁ্যাকে লোকটা বললে, তবে আর ওর ওপরে মায়া কিসের ? লাগাও।

ও বাবা ! এতক্ষণ এঁরা তা হ'লে আমার প্রতি মায়া করছিলেন ! মায়ার অবতারেরা এবারে সাংঘাতিক একটা কিছু করবেন, এই আঁচ পেয়ে একটা কিছু অস্ত্রের জন্যে চারিদিকে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু আমি প্রস্তুত হতে না হতে আবার সেই রকম একটা চড় পড়ল।

যা থাকে কপালে, আর নয়, এই স্থির ক'রে ক্যাঁককেঁ্যাকের গালে ঠেসে একটি চড় কষিয়ে দিলুম। চড় খেয়েই সে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল। একবার উঠতে চেষ্টা করলে, কিন্তু আবার ঘুরে পড়ল। তার অবস্থা দেখে অন্য লোকগুলো চেঁচিয়ে আমাকে মারতে এল। আমি উঠে দেওয়ালে গা দিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলুম। তারপরে রীতিমত যুদ্ধ। তারা দূর থেকে জুতো লাঠি গাড়ু গামছা হাতের কাছে যে যা পেলে, তাই ছুঁড়ে আমাকে মারতে লাগল।

গোলমাল শুনে ঘরের মধ্যে আরও তিন-চারজন লোক এসে পড়ল। তারা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, ঘরে ঢুকেই যুদ্ধে লেগে গেল।

সেই সাত-আটজন লোক এক দিকে, আর আমি একা এক দিকে, এই ভাবে কতকক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব ? শেষকালে একখানা বড় শতরঞ্চি চাপা দিয়ে তারা আমায় ধ'রে ফেললে।

তারপরে সেই আট-দশজনে মিলে আমার ওপরে কিল, গুঁতো, গাঁট্টা, গোঁজা, লাথি, চড়, ঠুসো, ঠাসা যার যা খুশি স্বাধীনভাবে চালাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শুধু-হাতে মারতে বোধ হয় তাদের অঙ্গে ব্যথা লাগছিল, তাই শেষকালে তারা সশস্ত্র হয়ে আসতে লাগল। কেউ ছুরি, কেউ তলোয়ার, কেউ বা লাঠি, কেউ বা সড়কি। কিছুক্ষণ আগেও যদি তারা অস্ত্র নিয়ে আসত, তা হ'লে একজনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষা করতে পারতুম। কিন্তু তখন আমার প্রায় হয়ে এসেছিল। একজন দূর থেকে পায়ে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিতেই প'ড়ে গেলুম ও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলুম জানি না। চৈতন্য ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতে লাগলুম। বুঝতে পারলুম যে, হাত

পা দৃঢ়ভাবে বাঁধা। যে ঘরে আমায় প্রথমে নিয়ে আসা হয়েছিল, এটা সে ঘর নয়। ঘরের মধ্যে বাতি নেই, অন্ধকার ঘুটঘুট করছে।

আমার সেই অদ্ভুত অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

এবার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন শরীরের গ্লানি অনেকখানি কেটে গিয়েছে। ঘরখানার এক দিকের দেওয়ালের একটা ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে খানিকটা রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। আমার মনে হতে লাগল, বন্ধ ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে আমার জীবনবন্ধু অরুণ যেন মুক্তির খোশ খবর-ভরা একখানা খাম সম্মুখে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। একবার দাঁত দিয়ে হাতের বন্ধন খুলে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মানুষের দাঁত আহার্যের আস্বাদন পেতেই ব্যগ্র, মুক্তির আস্বাদন সে জানতেই চাইলে না। কিছুক্ষণ টানাটানি ক'রে সে কার্যে ক্ষান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘুমের জন্যে বেশি চেষ্টা করতে হ'ল না। সে যেন মাথার শিয়রেই ব'সে ছিল, ডাক দিতেই চোখের ওপরে সে তার সুপ্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে।

সেবারে বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। দরজা খোলার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ক্লান্তির অবসাদে দেহ তখনও অবশ, চোখ চাইতে আর ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ নারীকণ্ঠের শব্দ কানে এল। শুনলুম সে বলছে—আচ্ছা, তোমরা যাও, আমি একবার গিয়ে দেখি।

নারী যে শক্তির অংশ—এ বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নেই। মুমূর্ষুর মত নির্জীব হয়ে প'ড়ে ছিলুম, নারীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই শরীরের মধ্যে বেশ একটা উৎসাহের আবেগ সঞ্চারিত হতে লাগল।

তখুনি একজন পুরুষ বললে দেখবে আবার কি? ওকে আমরা খুন ক'রে ফেলব।

নারীকণ্ঠ শুনে দেহে যতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, পুরুষের কণ্ঠে খুন হবার কথা শুনে উৎসাহের সে গতি দ্বিগুণ বেগে উৎস-মুখে ফিরে গেল।

নারীকণ্ঠে আবার উচ্চারিত হ'ল, তবুও আমি একবার দেখে নিই।

ভীম বললে, আচ্ছা, দেখ। আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি ওর কাছ থেকে কোনও পাকা কথা না পাওয়া যায়, তা হ'লে রাতেই ওকে শেষ করব।

চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম। মনকে প্রবোধ দিতে লাগলাম যে, খুনই হই আর মুক্তিই পাই, যা হয় একটা কিছু আজই সন্ধ্যের মধ্যে হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ আগে দরজা খোলার শব্দ হয়েছিল, এবারে মনে হ'ল, দরজাটা যেন বন্ধ হ'ল। বুঝতে পারলুম, ঘরের মধ্যে কেউ এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। যে এল, সে ধীরে ধীরে আমার সামনে এসে বসল।

অত্যন্ত বিপদের পাশেও শিকার থাকলে কূর্ম যেমন সাবধানে খোলের ভেতর থেকে মুখ বের করে, ঠিক সেই রকম সন্তর্পণে আমার চোখ দুটো একবার দেখে নিলে যে, আমার সম্মুখে যে ব'সে আছে সে নারী।

ধীরে ধীরে সে আমার হাত ও পায়ের বন্ধন খুলে দিলে। শরীরের বেদনা

তখনও যায় নি। নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও কোন রকমে উঠে বসলুম।

মুখ তুলে দেখলুম, আমার সামনে ব'সে আছে এক নারী। মুখের পাতলা ওড়না তার ঘাড়ের ওপরে ঢ'লে পড়েছে। মেঘাবৃত পূর্ণ শশীর মত বিষণ্ণ তার মুখ; নয়নকোণে অশ্রুর জোয়ার সবেমাত্র তার রেখা ফেলে রেখে পালিয়েছে।

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি?

আমিও বললুম, কি?

আবার কিছুক্ষণ নীরব। যুবতীর দুই গাল বেয়ে টপটপ ক'রে অশ্রুজল ঝ'রে পড়তে লাগল।

এ আবার এক নতুন বিপদ হ'ল দেখছি! ভাবতে লাগলুম, খুন হবার জন্যে বোধ হয় সন্ধ্যে অবধি আর অপেক্ষা করতে হ'ল না। সামনে ব'সে অপরিচিতা সুন্দরী যদি এই ভাবে কাঁদতে থাকে, তা হ'লে তো সন্ধ্যের আগেই আত্মহত্যা ক'রে ফেলতে হবে। কি ব'লে তাকে সান্ত্বনা দোব তাই ভাবছি, এমন সময় সে বললে, কেন তুমি আমায় ফেলে এমন ক'রে চ'লে গিয়েছিলে?

আমি তাকে বললুম, সুন্দরী, তোমারা যাকে মনে করেছ, সে ব্যক্তি আমি নই। আমি মুসাফের, পথ হারিয়ে এই দিকে এসে পড়েছিলুম। তোমার বাড়ির লোকেরা ভুল ক'রে আমায় ধ'রে এনেছে। তুমি আমায় ভাল ক'রে দেখ তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

যুবতী সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, তুমি সেই, তুমি সেই। পোশাক বদলে আর মাথার চুল অন্য রকম ক'রে ছেঁটে কি আমায় ভোলাতে পারবে?

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, তোমায় আমি আর ছাড়ব না। এইখানে বন্ধ ক'রে রেখে দোব, আর পালাতে পারবে না।

একবার মনে হ'ল, যা থাকে কপালে থেকেই যাই; তারপর না হয় সময় বুঝে একদিন লম্বা দোব। বললুম, সুন্দরী আমি তো বিদেশী, তোমাদের ভাষা কিছুই জানি না বললেই হয়। এই কিড়িরমিড়ির ভাষায় প্রেমের বুলি শিখতে যে অনেকদিন লেগে যাবে! ততদিনে আমার কথা তো ছেড়েই দাও, তোমার যৌবনই কি থাকবে?

কথাটা শুনে সুন্দরী চ'টে গেল। মুখটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন ক'রে আমার দিকে রেগে চেয়ে রইল। এদের ধাতে দেখছি ঠাট্টা জিনিসটা একেবারে সহ্য হয় না। সে কিছু বলবার আগেই আমি ব'লে ফেললুম, দেখ, আমায় ছেড়ে দাও। তোমরা যাকে মনে ক'রে আমায় ধরেছ, আমি সে লোক নই।

এবার সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, তোমায় ছাড়ব না। কেমন যাবে যাও দিকিনি?

না, থেকেই যেতে হ'ল দেখছি। সুন্দরীর এই অনুনয় ঠেলে যে পাষণ্ড চ'লে যেতে পারে, সে যাক। আমার সে চরিত্রবল নেই।

মনে মনে ভাবতে লাগলুম যে, ব'লে ফেলি—আচ্ছা সুন্দরী, তোমার কথাই

থাক্, আমি র'য়ে গেলুম। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল যে, এই নারী প্রতিদিন অন্য লোক মনে ক'রে আমাকে তার প্রেম-নিবেদন করবে। ওই মৃণাল-কোমল বাহুলতা অন্য লোক ভ্রমে আমায় আলিঙ্গন করবে। তারপরে, তারপরে—যাক, আর চিন্তায় যোগাল না। জোর ক'রে ব'লে ফেললুম, না সুন্দরী আমি তোমার স্বামী নই। আমাকে ছাড়তেই হবে।

হ্যাঁ, তুমিই আমার স্বামী।

ব্যাপরটা যে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল দেখছি! আমি বললুম, আচ্ছা, তোমার স্বামীর অঙ্গে কোনও দাগ ছিল?

হ্যাঁ, ছিল। ছিল কি, আছে।

কোথায়?

আচ্ছা, তোমার জামাটা খোল।

না, আগে তুমি বল।

বলব?

হ্যাঁ, বল।

তোমার ডান দিকের পাঁজরায় একটা দাগ আছে।

তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে ফেললুম। সর্বনাশ! ছেলেবেলা ফুটবল খেলতে খেলতে প'ড়ে গিয়ে পাঁজরার কাছে কেটে গিয়েছিল। সেই দাগটা দেখিয়ে দিয়ে রমণী ব'লে উঠল, এই দেখ। আমার সঙ্গে চালাকি?

আর কথা বলা অসম্ভব হ'ল। এই একটা তুচ্ছ দাগ, যাকে এতদিন অতি সামান্য ব'লেই বিবেচনা ক'রে এসেছি, সেইটেই শেষে আমার জীবনে চিরজীবনে দাগা হয়ে রইল।

জয়ের আনন্দে সুন্দরীর মুখ খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল। এবার সে হাসতে হাসতে বললে, কেমন, আমার সঙ্গে আর চালাকি করবে? দেখি, আর কত চালাকি জান তুমি! তোমাকে যে আমি তোমার চেয়ে বেশি চিনি, এই চার বছরেই সে কথা কি ভুলে গিয়েছ?

সত্যি কথা বলতে কি, আমারই তখন নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছিল। মনে হতে লাগল, এতদিন কি তবে স্বপ্নে ছিলুম? না, এটাই স্বপ্ন? স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক সহজে যা এসেছে সহজেই তাকে গ্রহণ করা। মানুষের জীবনে এমন অবসর কখনও আসে না। অধরের সম্মুখে এই যে পিয়ালা, কেন তা নিঃশেষে পান ক'রে ফেলি না? কদিনের এ জীবন? হয়তো কালের ফুৎকারে কালই বুদ্বুদের মত এ মিলিয়ে যাবে।

স্বপ্নের দোলায় চ'ড়ে কল্পলোকের কুঞ্জবনে দোল খাচ্ছি, এমন সময় সুন্দরীর কণ্ঠস্বর কানে গেল।

শুনেছি, তুমি আবার বিয়ে করেছ?

যাঃ নেশা ছুটে গেল।

সুন্দরী আবার বলতে আরম্ভ করলে, এখানে তাকে নিয়ে এস। আমরা

দুজনে মিলেমিশে থাকব। আমায় যে দিব্যি করতে বল করছি, তার সঙ্গে আমি কখনও ঝগড়া কবর না। শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে আবার টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখও জলে ভ'রে উঠল। এই প্রেমপাত্র অবহেলায় ঠেলে ফেলে যে হতভাগ্য চ'লে গিয়েছে, তার প্রতি আক্রোশে আমার দেহ-মন ভ'রে উঠতে লাগল।

সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে আবার বললে, কি গো, কথা কইছ না যে ?

আমি বললুম, সুন্দরী, কি কথা বলব ? তোমরা যে বিষম ভুল করেছ, সে কথা কি ক'রে তোমাকে বোঝাব ? কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে যে, আমি তোমার স্বামী নই ?

আমার কথা শুনে এবার সে কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইল। অনেকক্ষণ সেই ভাবে ব'সে থেকে সে মুখ তুলে বললে, বেশ, তুমি যদি চ'লে যেতে চাও তো আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হতে চাই না। যাও তুমি. কিন্তু মনে রেখো. আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

আমি বললুম, যদি দয়া ক'রে ছেড়ে দেবে তো এখুনি দাও। না হ'লে সন্ধ্যেবেলা তোমার ভাইয়েরা এসে আমায় মেরে ফেলবে।

যুবতী বললে, না, তারা কেউ বাড়ি নেই, তাদের ফিরতে দেরি, হবে। আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

আমার ঘোড়া আছে তোমাদের আস্তাবলে—সাদা ঘোড়া, সেটাকে দাও।

একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, এখনও সেই রকম ঘোড়ার শখ আছে ?

কথাটা শুনে অতি দুঃখেও হাসি এল। কিন্তু মুক্তির আশ্বাস পেয়ে মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে বললুম, দেখ. সাহিসকে ঘোড়া আনতে ব'লো না। আমায় আস্তাবলটা দেখিয়ে দাও. আমি নিজেই জিন চড়িয়ে নোব। পালাচ্ছি—সে কথা তুমি ছাড়া আর যেন কেউ না জানতে পারে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললে, 'কেন আমি কি জিন চড়াতে জানি না ?

আধ ঘণ্টা পরে সে ঘরের মধ্যে এসে বললে, এস, এখন কেউ নেই, এই বেলা পালাও।

তারপর সে আমাকে কতকগুলো সরু দেওয়াল-ঘেরা-পথ দিয়ে একেবারে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানে আমার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, ওগো, তুমি কি এত নিষ্ঠুর হয়েছ ? একবারে ছেলেটাকে দেখে যাবে না ?

ছেলে ! হ্যাঁ, কই, ছেলেকে নিয়ে এস, দেখি।

সুন্দরী ছুটে গিয়ে ছোট্ট একটি ছেলেকে নিয়ে এল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, তাকে দেখলে অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণও স্নেহে গ'লে যায়। তার

কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে দু গালে চুমু খেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, সুন্দরী, তোমার উপকার জীবনে কখনও ভুলব না। তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করাই আজ থেকে আমার প্রধান ব্রত হয়ে রইল। তোমার স্বামীর নাম কি ?

সুন্দরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অশ্রুজলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। ছেলেটাকে এক হাতে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে একটুখানি ম্লান হেসে আমার মুখের ওপরে দরজাটা সে বন্ধ ক'রে দিলে।

প্রস্নের পেত

সাহিত্য চর্চা ছেড়ে দিয়েছি ব'লে বন্ধুরা প্রায়ই অনুযোগ করেন, তাঁদের কথার যে কি জবাব দোব, তা বুঝতে পারি না। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি, প্রকাশ করি না। মধ্যে মধ্যে মনকে ফাঁকি দিয়ে চোখ দিয়ে দু-এক ফোঁটা জলও বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু আমার ও পথ মাড়াবার আর জো নেই। সরস্বতীর নিকুঞ্জে পেঁছিবার রাস্তার দুধারে যতগুলি দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা আড়ালে-আবডালে ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে আছে, বরাতের গুণে তারা একে একে সবাই আমাকে আক্রমণ করেছিল, গাঁটে যা ছিল তা তো কেড়ে নিয়েছে, উপরন্তু ব'লে দিয়েছে যে, এ পথ মাড়ালে এবার প্রাণটি পর্যন্ত যাবে। তাদের অত্যাচারে সাহিত্য-রোগ আমার সেরে গিয়েছে, কিন্তু রোগের ভয়টা এখনও যায় নি।

ছেলেবেলায় কবি হবার সাধ মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। রোজ গাদা গাদা কবিতাও লিখতুম, বাড়ির সবার মুখে আমার কবিতার প্রশংসা আর ধরত না, তাঁরা শেলী না কীট্স এই রকম কি একটা খেতাবও আমায় দিয়েছিলেন। কিন্তু কবি হওয়া আমার বরাতে নেই। আমার কবিতা লেখার অভ্যাস যদি স্থায়ী হ'ত, তাহ'লে কবিতার বাজারে আজকাল যাঁরা আসর জমিয়ে বসেছেন, তাঁদের অনেককেই অন্য আসরে আশ্রয় নিতে হ'ত। কিন্তু পরের উপকার করার দিকে ঝোঁকটা ছেলেবেলা থেকেই কিছু বেশি পরিমাণে থাকায় কবিতা লেখা ছেড়ে দিলুম। অবশ্য আমার কবিতা লেখা ত্যাগ করার মূলে মাসিক-পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের যে কোন হাত ছিল না, সে কথা হলফ করে বলতে পারি না, তবে সে কথাগুলো আর প্রকাশ করব না, রসিক যাঁরা সেটা তাঁরা বুঝে নেবেন।

ওই একই কারণে গল্প ও উপন্যাস লেখাও ত্যাগ করতে হয়েছিল। এবারের মতন সাহিত্য-চর্চা এখানেই শেষ হ'ল মনে ক'রে মনটা ভার দ'মে গেল, ঠিক এই সময়ে দু-একজন বন্ধু আমায় গল্প-কবিতা ছেড়ে সমালোচনায় মন দিতে

পরামর্শ দিলেন। শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রে নয়' সাহিত্যের বাইরে যে বাস্তব ব'লে আর একটা বড় ক্ষেত্র আছে, সেখানেও এমন বন্ধু ও এমন অমোঘ উপদেশ আমি কখনও পাই নি।

আমি সমালোচক হলুম। ছোটগল্পকে চুটকি-গল্প নাম দিয়ে বর্তমানের গল্পলেখক সম্প্রদায়কে গালাগালি দিয়ে কোন এক মাসিকপত্রে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয়, এবার আর সাত দিন যেতে না যেতেই লেখা ফিরে এল না। প্রবন্ধ তো বেরোলই, উল্টে অন্য কাগজ থেকে লেখার জন্যে তাগাদা আসতে লাগল। যেসব সম্পাদক আমার কবিতার ওপর একটু আধটু টিপ্পনী কেটে ফেরত দিতেন, তাঁরাও সমালোচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সাহিত্যের বাজারে সমালোচক ব'লে আমার একটা সুনাম র'টে গেল। ভাবলুম যে, গল্প আর কবিতা লিখে জীবনটাকে নষ্ট ক'রে ফেলেছিলুম আর কি!

তখনও আমি কলেজে পড়ি। কলেজ থেকে বাইরে বেরোবার আগেই একজন উঁচুদরের সমালোচক ব'লে আমার নাম র'টে গিয়েছিল।

লেখাপড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার চেয়ে একটা বড় রাস্তা আমার চোখের সামনে খুলে যাওয়ায়, সে রাস্তা ছেড়ে সাহিত্যের আর একটা রাজপথে প্রবেশ করেছিলুম। এই রাস্তায় যদি না যেতুম, তা হ'লে সাহিত্য-চর্চা আমায় ছাড়তে হ'ত না।

কলেজ ছেড়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটা বড় শহরে এক কলেজের অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল। শহরে অনেক বাঙালীর বাস, এইখানে এসে আমার প্রত্নতাত্ত্বিক হবার শখ চেপেছিল। এই নতুন শখের কারণ যে একেবারে ছিল না তা নয়। আমি দেখতুম যে, শহরের চারিদিকে যেখানেই যাই সেখানেই একটা না একটা অদ্ভুত পাথরের মূর্তি প'ড়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে এই পাথরের মূর্তিগুলো কতদিন ধ'রে এই ভাবে অবহেলায় প'ড়ে রয়েছে, তার ঠিকানা নেই। এক-একটা মূর্তির পেছনে কত বড় ইতিহাস, কত আশ্চর্য কাহিনী, হয়তো কত প্রণয়ীর অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস জড়িত রয়েছে, তা কে বলতে পারে! কোন কোন জায়গায় পল্লীর গরিব লোকেরা তাদের পাড়ায় একটা মূর্তির অদ্ভুত নাম দিয়ে মূর্তিটাকে সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করে। আমার বাড়ি থেকে কলেজ ছিল প্রায় চার মাইল দূরে। কলেজে যাওয়া-আসার সময় একাগাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে আমার মগজে এই সব মূর্তির ইতিহাস গজিয়ে উঠতে থাকত। আমি রবিবারে ও অন্য ছুটির দিন মূর্তিগুলিকে গিয়ে ভাল ক'রে দেখে আসতে আরম্ভ করলুম।

মাস কয়েক চাকরি ক'রে ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে শ-পাঁচেক টাকা জমেছিল সে টাকা কটা তুলে এনে একটা ক্যামেরা কিনে ফেললুম। তারপর কয়েকটা মূর্তির ফোটো তুলে একখানা বিখ্যাত বাংলা মাসিক-পত্রে এক প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া গেল।

সমালোচকের চাইতে প্রত্নতাত্ত্বিকের খাতির তখন বাজারে খুব বেশি।

প্রবন্ধ বেরুতে না বেরুতে চারিদিকে তার প্রতিবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একজন মস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ব'লে আমার খ্যাতি র'টে গেল। প্রতি মাসেই ফোটোসমেত আমার প্রবন্ধ মাসিক-পত্রে শোভা পেতে লাগল। চারিদিকে জয় জমাট নাম আর খাতির, সাহিত্য-সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রণ—এই সব ব্যাপারে মেজাজ আমার সরগরম হয়ে উঠল।

এই রকম একটা সময়, তখন বোধ হয় ঈস্টারের ছুটি। ছুটিতে যে একবার বাড়ি ঘুরে আসব, তারও জো নেই, মাত্র চার দিনের ছুটি, বাড়িতে যেতে আসতেই চারদিন কেটে যাবে। সকালবেলা চা খেয়ে বাইরের ঘরে ব'সে একটা মূর্তির ছবি নিয়ে সেটার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার কথা ভাবছি, এমন সময় আমার দুটি ছাত্র সন্তর্পণে এসে আমায় নমস্কার করলে।

কি ব্যাপার! সকালবেলা কি মনে ক'রে হে?

বিশ্বনাথ ও সুরেশ বললে যে, তারা প্রত্নতত্ত্ব শিখতে চায়।

আমি তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে বললুম, তোমাদের মতন যদি কয়েকটি উৎসাহী ছেলে পাই, তা হ'লে দেশের যে কত কাজ করতে পারি!

আমার কথা শুনে তারা বললে, সার্, আপনি যা বলবেন, তাই করব।

বিশ্বনাথ ও সুরেশ সেদিন থেকে সকাল-বিকেল আমার কাছে আসতে লাগল। আমার অর্ধেক কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিতুম। তাদের উৎসাহ দেখে আমার ইতিহাস-চর্চার ঝোঁক আরও বেড়ে গেল।

সেদিন রবিবার! বিশ্বনাথ কোথায় বাইরে গিয়েছে, সুরেশ সকালবেলা একলাই এসেছিল। নিমক-মণ্ডির চৌপায়া-মায়ীর মূর্তি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা চলছিল। এই মূর্তিটি অদ্ভুত—তাঁর চারটি পা, পাঁচটি হাত, কিন্তু মুণ্ডুটা নেই, হয়তো ভেঙে গিয়েছে। রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে হেলানো ভাবে প'ড়ে আছে। মূর্তির কতক অংশ মাটির নীচে পোঁতা। সেই লোকেরা মূর্তিটাকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করে। আমরা কিছুদিন আগে মূর্তিটার একটা ফোটো নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু পল্লীর লোকেরা ভয়ানক আপত্তি করায় সেদিন আর ছবি তোলা হয় নি। মূর্তিটার সঙ্গে যে একটা বড় ও অত্যন্ত আশ্চর্য রকমের ইতিহাস জড়িত আছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

সুরেশ বললে, সার্, মূর্তিটাকে ওখান থেকে তুলে আনলে কেমন হয়।

সুরেশের প্রস্তাবটা নেহাত মন্দ লাগল না। কিছুদিন থেকে বাড়িতে একটা মিউজিয়াম করবার আমার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু মূর্তিগুলো যে ভারী, কেই বা সেগুলো নিয়ে আসবে? আর এদেশের কোন লোকের কাছে সে প্রস্তাব করলে সে খুনিই করে ফেলবে। এই সব নানান কথা ভেবে ও-বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করতে পারি নি। সুরেশের কথা শুনে আমি বললুম, চৌপায়া মূর্তির ওজন প্রায় চার মণ হবে, কে নিয়ে আসবে?

সুরেশ বললে, সার্, বিশ্বনাথদের বাড়িতে একটা উড়ে ঠাকুর আছে,

সে লোটা আকাট ষণ্ডা, তাকে কিছু কবলালে হয়তো সে এ কাজে রাজি হতে পারে। পশ্চিমের দেবতাদের উপর উড়েদের কোন ভক্তি নেই।

ঠিক হ'ল যে, বিশ্বনাথদের ঠাকুরটা যদি রাজি হয়, তা হ'লে তাকে নিয়ে গিয়ে একদিন রাত্রি বেলা মূর্তিটা তুলে আনতে হবে।

কথাবার্তা ঠিক ক'রে উঠে যাবার সময় সুরেশ বললে, সার্, একটা কথা বলব ?

আকস্মিক তার এই রকম বিনয়--প্রকাশের ঘটা দেখে অবাক হয়ে বললুম, বল না কি বলবে ?

সে বললে, সার্, সেকালের বরাহ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছি, দেখে দিতে হবে।

তার কথা শুনে আমি তো অবাক। প্রবন্ধ লেখবার কি আর বিষয় পেলে না বাবা ! সেকালের বরাহ তো দূরের কথা, একালের বরাহ সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান উইলসনের হোটেলের চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, বৈষ্ণবের ছেলের বরাহের ওপর অহেতুক এমন প্রেম উথলে উঠল কেন হে ?

সে বললে যে, লালবাগ যাবার রাস্তায় জোয়ার-ক্ষেতের পাশে একটা পাথরের বরাহ-মূর্তি প'ড়ে আছে, সেটাকে দেখে প্রথমে বরাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার অনুপ্রেরণা আসে। তারপরে অনেক গবেষণা ক'রে সে এই প্রবন্ধটি লিখেছে। সুরেশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, সেদিন বিকেলে তার সঙ্গে গিয়ে মূর্তিটা দেখে আসব।

বিকেলবেলা সুরেশচন্দ্র একা নিয়ে হাজির। দুজনে মিলে সেকালের বরাহের সন্ধানে যাত্রা করা গেল। একায় উঠেই সুরেশ বললে, সার্, একটা শাবল নিয়ে এসেছি।

শাবল ! শাবল কি হবে ?

যদি সুবিধে হয় তো আজকেই ওটাকে তুলে নিয়ে আসা যাবে।

আধ ঘণ্টা একার ঝাঁকুনি সহ্য ক'রে আমরা বরাহ অবতারের মূর্তির কাছে এসে পৌঁছলুম। একাওয়ালাকে একটু দূরে দাঁড়াতে ব'লে আমরা মূর্তিটার কাছে হাজির হলুম। দিব্যি ছোটখাটো একটি জানোয়ারের মূর্তি, অনেকটা বরাহেরই মতন ; তবে মাথার ওপর দুটো শিং আছে। ওজনে দশ-পনরো সেরের বেশি হবে না। কিন্তু সেদিন লালবাগে কি একটা মেলার জন্যে পথে লোক চলার আর অন্ত ছিল না। ঠিক হ'ল, আসছে শনিবার সন্ধ্যের পর সুরেশ এসে বরাহটি এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

সে বললে, আপনার আর আসবার দরকার হবে না সার্।

শনিবার রাত্রি প্রায় নটার সময় গলদঘর্ম কলেবরে সুরেশচন্দ্র বরাহমূর্তি নিয়ে এসে হাজির।

সে বললে, লোকজনের চলাচল কিছুতে কমে না। শেষকালে রাস্তা একটু নিরিবিলি হতে সে মূর্তিটা তুলে ফেললুম। কিন্তু সেটিকে তুলে কিছুদূরে এগিয়ে এসে আবার এক মুশকিল। একাওয়ালা সে মূর্তি তার গাড়িতে তুলতে কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে আর কোন উপায় নেই দেখে এই চার মাইল রাস্তা সেই আধ-মণে বরাহ ঘাড়ে ক'রে আসতে হয়েছে।

সুরেশের উৎসাহ দেখে আমি তো স্তম্ভিত। তার সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভ'রে গেছে। আমার বাড়িতে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে যখন সে বাড়ি গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। যাবার সময়ে সে বললে, শাবলটা মাঝ-পথে ফেলে এসেছি, কাল সকালেই আবার সেটাকে আনতে যেতে হবে।

যখন সমালোচক ছিলুম, তখন সাধারণে আমাকে চিনত বটে, কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদকদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি। প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়ার কিছুদিন পরেই তিন-চারটি প্রধান প্রধান মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা, কারও কারও সঙ্গে আত্মীয়তাও জ'মে গিয়েছিল। আমি সুপারিশ ক'রে যখন সুরেশের "সেকালের বরাহ" প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, তখন আর কথা আছে!—পরের মাসেই একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রে সুরেশের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল।

ছাপার অক্ষরে নাম দেখে সুরেশের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল। সে একদিন কলেজের ছুটির পর আমাকে জানালে, সার, আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি ঠিক হয়ে থাকবেন, আমি আর বিশে আপনার ওখানে যাব, তারপর চৌপায়া-মায়ীকে তুলে আমার বন্দোবস্ত করতে হবে।

চৌপায়া-মায়ী সম্বন্ধে প্রবন্ধ আমার লেখা হয়ে প'ড়ে ছিল, কেবল ছবির জন্যে সেটা কাগজে দেওয়া হচ্ছিল না। তার কথা শুনে আমার ভরসা হ'ল যে এতদিনে আর একটা বড় রকম প্রবন্ধ বেরোবার সুবিধে বুঝি লাগে!

রাত্রি দশটার সময় আমার দুই সাকরেদ এসে উপস্থিত। দুজনের হাতে দুটো বড় শাবল। বিশ্বনাথের বাড়িতে শাবল ছিল না, প্রত্নতত্ত্ব শিখতে হ'লে প্রত্যহ যে শাবলের প্রয়োজন হয়, এ কথা সুরেশ আমার সামনেই দু-তিন দিন তাকে বলেছিল। নতুন উৎসাহে সে তিন হাত লম্বা একটা শাবল কিনে ফেলেছে।

রাত্রি প্রায় দেড়টা অবধি তিনজনে মিলে চৌপায়া-মায়ীর চারিদিকে পগারের মত চওড়া এক গর্ত ক'রে ফেললুম, তবুও তাকে একটু নড়াতে পারলুম না। অনেক কষ্টে প্রায় দু-হাত গর্ত খোঁড়ার পর চৌপায়া-মায়ীকে একটু নড়ানো গেল। কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে যে মূর্তি সেখান থেকে তুলে আনি! ঠিক হ'ল, কাল রাতে বিশ্বনাথদের ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে চারজনে মিলে মূর্তিটা বাড়িতে আনা হবে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে হাতের তেল সিঁদুর তুলতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যের একটু পরে নিমক-মণ্ডির ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি যে, চৌপায়া মায়ীর চারিদিকে বিস্তর লোকের সমাগম হয়েছে। চারিদিকে আলো, মূর্তির ওপর একটা লাল রঙের চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। সে

মহল্লার যত মেয়ে পুরুষ মিলে সেখানে গান গাইছে, মহা ধুমধাম ক'রে পুজোর যোগাড় হচ্ছে। ব্যাপার কি ? একটু সন্ধান নিয়ে জানলুম যে, মায়ী কি জন্যে নারাজ হয়ে কাল রাত্রে এখান থেকে উঠে চার পায়ে দৌড় দিয়েছিলেন, এমন সময় সদাশিব পাঁড়ে তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর একখানি পা জড়িয়ে ধরে ! মা আর কিছুতেই ফিরবেন না, শেষকালে তিনি সদাশিবকে বললেন যে, তুই যদি আমার রোজ সেবা করিস, তবেই আমি থাকব, নইলে—

সদাশিবের কথায় তিনি ফিরে এসেছেন। আজ রাত্রি বারোটার সময় মহাধুম ক'রে তাঁর ক্রোধ শান্তির জন্যে পুজো হবে। মুন্সী নন্দাপ্রসাদ সদাশিবকে একটা মন্দির করবার টাকা দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি হয়েছে। বুঝলুম যে, চৌপায়া মূর্তির প্রবন্ধটা আরও কিছুদিন বাক্সে চাপা রইল।

এদিকে সুরেশের প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে আমার শিষ্যদ্বয়ের উৎসাহ দিন দিন বাড়াতে শুরু করল। বিশ্বনাথ "বৈদিক যুগের বার্লিপুজো' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এল। সেটা ছাপাও হয়েছিল। রোজ তারা শহর ঢুঁড়ে যত সব মূর্তি তুলে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে পুরতে লাগল। বাড়িটা একটি ভাঙা মূর্তির আস্তাবল হয়ে উঠল। আমার বসবার ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর, এমন কি শোবার ঘরের খাটখানি ছাড়া আর সমস্ত জায়গায় মূর্তি—ভাঙা মূর্তি। সুরেশ আর বিশ্বনাথ নিত্য নতুন প্রবন্ধ লিখে আনে, তাদের প্রবন্ধ লেখার ঠেলায় আমার পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে উঠল।

সেদিন শরীরটা ভাল ছিল না ব'লে সন্ধ্যের সময় কোথাও যাই নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় শোবার যোগাড় করছি, এমন সময় বিশ্বনাথ ও সুরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

সুরেশ বললে, গুরু, কাজ হাসিল, চৌপায়া মায়ীকে নিয়ে এসেছি।

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, কোথায়—কোথায় ?

বাইরে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

গরুর গাড়ির নাম শুনে আমি একটু দ'মে গেলুম।

সুরেশ আবার বললে, কিছু ভয় নেই স্যর। মুসলমানের গাড়ি, তাও দেহাতি। কি কাজে শহরে এসেছিল, আজ রাতেই ফিরে যাবে।

তাদের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল, তারপর চারজনে মিলে চৌপায়া মায়ীকে কোন রকমে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে রাখা হ'ল।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথ এসে বললে যে, কাল সারা রাত জেগে সে চৌপায়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছে, কোন কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে।

আমি বিশ্বনাথকে ব'লে দিলুম দেখ, সামনে পরীক্ষা। এখন কয়েক মাস প্রবন্ধ লেখা টেখা ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনায় মন দাও গে।

বিশ্বনাথ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চ'লে গেল।

সেদিন নিমক মণ্ডিতে গিয়ে যে দৃশ্য দেখেছিলুম, তা কখনও ভুলব না। মূর্তিটা যেখানে ছিল, সেখানে একটা বিরাট গর্ত হাঁ ক'রে রয়েছে আর তারই

চারিদিকে পল্লীর যত লোক ঘিরে ব'সে বুক চাপড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, হা মায়ী —হা মায়ী—

সকলের মুখে একটা এস্ত ভাব, একটা কি যেন এ ভয়ানক সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

ফোটোগ্রাফগুলো তখনও ডেভেলপ করা হয় নি ব'লে সেখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা হ'ল না।

চৌপায়ার প্রবন্ধ বেরিয়ে গেল। হাতে আপাতত কোন কাজ নেই। মনে করছি, এবার কিছুদিন বিশ্রাম নোব; এই রকম একটা সময়ে কোথা থেকে অনাসৃষ্টির অনিদ্রা-রোগ এসে আমায় বড় কাতর ক'রে ফেললে। সারারাত বিছানায় প'ড়ে এপাশ ওপাশ করতে হয়। শেষ-রাত্রে ঘুম আসে, একেবারে বেলা নটার আগে সে ঘুম ভাঙে না।

একদিন, রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা, কিছুতেই ঘুম আসছে না। নানা রকমের বিদকুটে চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। শুয়ে থাকা অসম্ভব মনে হওয়ায় বিছানা ছেড়ে উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে ফেললুম। তারপর মাথায় একটু হিমসাগর তেল মালিশ করব মনে ক'রে খাট থেকে যেমন নামতে গিয়েছি, আর দেখি সর্বনাশ!

বেশ স্পষ্ট দেখলুম যে, আমার প্রধান সাকরেদ সুরেশচন্দ্রের সেকালের বরাহ কুলুঙ্গি থেকে নেমে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখের সামনে দিয়ে যেন একসঙ্গে দশ-বারোটা তারাবাজি খেলে গেল। চোখ দুটো বেশ ক'রে রগড়ে আবার চেয়ে দেখলুম। বরাহ অবতার আমার দিকে একবার আড়নয়নে চেয়ে একটু মুচকি হেসে ঘাড়টা অন্য দিকে ফিরিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

শুয়োরের মুখে মানুষের হাসি যে কি রকম মানায়, তা যে না দেখেছে তাকে সে কথা বোঝানো যাবে না। ভয়ে আমি খাটের এক কোণে স'রে গেলুম। কিন্তু একটু পরেই দেখি, বরাহ-অবতার খাড়া হয়ে আমার খাটের ওপরে দুটি পা তুলে দিলেন।

ব্যাপার ক্রমেই সঙিন হয়ে উঠছে দেখে আমি একটু সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে বললুম, বাবা বরাহ-অবতার, দীনের ওপর আজ এ কি অনুগ্রহ আপনার?

আমার কথা শেষ হতে না হতে বরাহ মহাশয় তর্জন ক'রে উঠলেন, চোপ রও ইউ শুয়োর, আমায় বরাহ বলা! বরাহ তুই, তোর···

ওঃ বাবা! এ আবার কথা কয় যে! কুমোরের চরকির মতন মাথা ঘুরতে লাগল। ঢোঁক গিলতে গিয়ে দেখি, গলার মধ্যে যেন করাতের গুঁড়ো ঠাসা। নেমে গিয়ে যে এক ঢোঁক জল খাব, তারও উপায় নেই, বরাহ মহাশয় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, তবে আপনি কে?

বরাহ বললেন, সেইটে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই এত কষ্ট ক'রে ওই কুলুঙ্গি

থেকে নেমে এসেছি। তুমি কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে তার নীচে বরাহ লিখেছ কেন? জান, আমি কে?

আমি হাতজোড় ক'রে বললুম, আজ্ঞে, আপনি ভুল করছেন, সে প্রবন্ধ আমি লিখি নি। কলেজের একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া লিখেছে, তার নাম সুরেশ চক্রবর্তী। তার বাড়িটা দেখিয়ে দোব?

তোমার ভরসা না পেলে সুরেশের সাধ্যি কি যে আমায় অপমান করে! দেখবে, আমি কে?

এই কথা ব'লে সে তড়াক ক'রে লাফ মেরে হাত পাঁচেক দূরে ছটকে গেল। আর একটু হ'লেই তার পায়ের চাঁট লেগে আমার দেড়শো টাকার আয়নাখানাই চুর হয়ে যেত।

আমি বললুম, আজ্ঞে, আপনার চেহারা দেখে তো বরাহ ব'লেই মনে হয়েছিল, কিন্তু হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ষাঁড়—

ষাঁড় নয়, বৃষ। শুনবে আমার আওয়াজ?

এই ব'লে সে মিনিটখানেক ধ'রে একটি ছোট্ট হাঁক ছাড়লে।

আমার মনে হ'ল, যেন ঘরের মধ্যে দুটো মানোয়ারী জাহাজ খানিকক্ষণ পাল্লা দিয়ে গলা সেধে নিলে। গলার আওয়াজের ধমক সামলে উঠতে না উঠতে বৃষ-অবতার বললেন, দেখবে আমার গুঁতোর জোর?

এই ব'লেই সে ছুটে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে একটা ঢুঁ মারলে। তার ঢুঁ'র জোরে সমস্ত বাড়িখানা কেঁপে উঠল।

ঘরের মধ্যে আরও শতখানেক মূর্তি সাজানো ছিল, ঘরখানা কেঁপে উঠতেই মূর্তিগুলো খিলখিল ক'রে হেসে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা-বলাবলি করতে লাগল।

তারা একটু চুপ করলে বৃষ মহাশয় বললেন, আমার কি ইচ্ছে করছে জান?

আজ্ঞে না।

আমার ইচ্ছে করছে যে, তোমার নাকে এমনই জোরে একটা ঢুঁ লাগাই। অনেকদিন গুঁতোগুঁতি করা হয় নি।

বৃষের প্রস্তাব শুনে আমি কেঁদে ফেলে বললুম, দোহাই আপনার। ওই ইচ্ছেটি সম্বরণ করুণ। আপনাকে খুশি করবার জন্যে যা করতে বলবেন, তাই করব।

আমার চোখের জল দেখে বোধ হয় ষাঁড়ের প্রাণটা একটু নরম হ'ল। সে বললে, আচ্ছা, আজ ঘুমোও। আমি একটু চিন্তা ক'রে দেখে যা ব্যবস্থা হয় তাই করব।

এই ব'লে সে এক লাফে কুলুঙ্গিতে চ'ড়ে বসল।

আমি বললুম, একটা বালিশ দোব কি?

সে কোন কথা না ব'লে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ল।

তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বাইরে একটু ঠাণ্ডা বাতাসে এসে দাঁড়ালুম। গা দিয়ে তখনও কালঘাম ছুটছে।

সকাল হতে না হতে স্নান ক'রে একেবারে সুরেশের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাকে বললুম, ওহে, আমার দেশ থেকে কয়েকজন লোক আসবেন, মূর্তিগুলো দিন কতক তোমার এখানে রাখবার সুবিধে হবে ?

সুরেশ বললে, তার ওখানে রাখবার সুবিধে হবে না। তবে সে আশ্বাস দিয়ে বললে যে, বিশ্বনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিশ্চয় এ বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে।

দুপুরবেলা সেদিন আর কলেজে যাওয়া হ'ল না, পেটে চারটি ভাত পড়তে না পড়তেই চোখ ঝিমিয়ে এল। কিন্তু ঘুমিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার জো আছে! ঘুমোতে না ঘুমোতে স্বপ্ন দেখি, বৃষ মহাশয় আমার নাকটি তাক ক'রে ছুটে আসছে, আর অমনই ধড়মড় ক'রে উঠে বসি।

দুপুরটা তো এই ক'রে কাটল। সন্ধ্যার সময়ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারলুম না, যদি সুরেশ ও বিশ্বনাথ এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যায়! কিন্তু কোথায় বা বিশ্বনাথ, আরে কোথায়ই বা সুরেশ! অনেক রাত অবধি তাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে খেয়ে-দেয়ে যখন গিয়ে শুলুম, মাথার কাছের ঘড়িটাতে তখন এগারোটা বাজল। সেদিন আর বাতি নেবানো হবে না ঠিক ক'রে বাতিটা জেবলেই চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিসের একটা আওয়াজ শুনে চটকা ভেঙে গেল। দেখি, বিশ্বনাথের বৈদিক যুগের কালী তাক থেকে নেমে ঘড়িটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন।

কালীকে নামতে দেখে তো আমার আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হবার উদ্যোগ করলে। তিনি খানিকক্ষণ ঘড়ির দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কি হে ?

আজ্ঞে, ওটা ঘড়ি।

দেখলুম, বৈদিক যুগের কালীর মেজাজটা বৃষের মতন অত কড়া নয়। তিনি আর কোন কথা না ব'লে ঘরের মধ্যে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কোন উৎপাত হয় নি বটে, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে সারারাত্রি জেগে থাকতে হয়েছিল।

পরদিন কলেজে সাত দিনের ছুটি চেয়ে এক দরখাস্ত দিলুম। কলেজের ছুটি মঞ্জুর হ'ল। দু-তিন দিন কেটে গেল, অথচ মূর্তিগুলোকে সরাবার কোন বন্দোবস্ত করতে পারলুম না। এদিকে রোজ রাতে তারা তাক থেকে নেমে এসে ঘরময় নৃত্য করে। মধ্যে মধ্যে বৃষ মহাপ্রভু আমার নাকের ওপর চুঁ লাগিয়ে গুতোগুতির শখ মেটাতে চায়। রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে বা যদি একটু ঘুম হয়, তা স্বপ্ন দেখতে থাকি যে, মূর্তিগুলো সব আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে ; আর মধ্যে মধ্যে গোঁত খেয়ে আমার মাথার ওপর পড়বার উপক্রম করছে। এর ওপরে সুরেশ ও বিশ্বনাথ এমন ডুব মারলে যে, বাড়িতে গিয়েও তাদের পাত্তা পাওয়া মুশকিল হ'ল। বিপদের কথা কাউকে বলবারও জো নেই। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায়ন্তর নেই, এমন অবস্থা দাঁড়াল।

বিপদ যখন আসে, তখন সে তার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকেও ডেকে নিয়ে আসে। একে আমার এই বিপদ, তার ওপরে আমার বাড়িওয়ালা জোয়ালাপ্রসাদ এসে একদিন বললে, তার বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, দেহাত থেকে তার কজন জাতভাই এসে সেখানে থাকবে।

মূর্তিগুলো যখন বাড়িতে এনে পুরেছিলুম, তখন বাড়ি ছাড়ার কথা একবারও মনে হয় নি। এখন এগুলো বার করি কি ক'রে ?

যা থাকে কপালে মনে ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলুম। ওদিকে বাড়িওয়ালা রোজ এসে কড়া তাগাদা দিয়ে যায়, শেষকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করা পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দিলুম।

সেদিন বোধ হয় শনিবার, কলেজ বন্ধ। সারারাত্রি বৃষ মহাপ্রভুর খোশামোদ ক'রে রাত কাটিয়ে সকালবেলা উঠে দুটি কাপ চা খেয়ে সবে বসেছি, এমন সময় সুরেশ ও বিশ্বনাথ এসে হাজির। তাদের দেখে তো আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠল। আমি টেবিল চাপড়ে চীৎকার ক'রে বললুম, রাস্কেল, এই তোমাদের গুরুভাণ্ড !

তারা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, দিন কতকের জন্যে কজন বন্ধু মিলে বিন্ধ্যাচল বেড়াতে গিয়েছিল। আজ সকালে ফিরেছে। এখানে এসেই তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আমি তাদের সমস্ত ব্যাপার খুলে বললুম, বাবা, তোমাদের গুরুকে যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তা হ'লে শিগগির একটা উপায় কর, নইলে—

ঠিক এই সময় তিন চারজন লোক আমার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন বললে, শিশিরবাবু কার নাম ?

আমার, কি চাই আপনার ?

আপনার বাড়িওয়ালা আপনার নামে নালিশ করেছিল। আমরা কোর্টের পেয়াদা, আমরা আপনার জিনিসপত্র রাস্তায় নামিয়ে দোব। তারপর আপনার যেখানে ইচ্ছে সেখানে সেসব নিয়ে যেতে পারেন। এই আদালতের হুকুম।

কাছারির লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। তারা তখুনি কাজে লেগে গেল। দশ বারোটা মুটে মিলে আমার জিনিসপত্র রাস্তায় নামাতে লাগল। পাথরের মূর্তিতে গলি ভ'রে উঠল।

পেয়াদা দেখে সুরেশ "একটু আসি" ব'লে স'রে পড়েছিল, বিশ্বনাথ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। এমন সময় ছুটতে ছুটতে সুরেশ এসে বললে, স্যর্, সর্বনাশ হয়েছে, পালিয়ে আসুন।

ব্যাপার কি ?

ব্যাপার পরে শুনবেন।—ব'লে সে আমার হাত ধ'রে একেবারে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা পর্দা ঢাকা এক্কায় তুলে বললে, জোরসে চালাও।

সুরেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সে বললে, সর্বনাশ হয়েছে, রাস্তায় চৌপায়া-মায়ীর মূর্তি দেখে কে গিয়ে নিমক মণ্ডিতে খবর দিয়েছে, সেখানকার লোকেরা লাঠি নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে, আমি দেখে এলুম।

অ্যাঁ, বল কি ?

আমার মাথার ভেতর কেমন করতে লাগল, বসে থাকতে পারলুম না ; সেইখানেই শুয়ে পড়লুম।

ওদিকে নিমক-মণ্ডির লোকেরা মার-মার ক'রে এসে চৌপায়া মূর্তি তুলে নিয়ে চ'লে গেল। শহরের গুণ্ডারা সেই সুবিধেয় আমার সমস্ত জিনিসপত্র লুঠে নিলে। তারা যেখানে সেখানে বাঙালীদের দেখ-মার করে বেড়াতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ আর সুরেশ খবর আনতে লাগল। এক-একটি সংবাদ যেন এক একটা কামানের গোলা। তারা এসে বললে, স্যর্, বদমাইওগুলো আপনাকে খুন করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে পুলিসের সঙ্গে এক জায়গায় বদমাইসদের একটা বড় রকমের দাঙ্গাও হয়ে গেল। সন্ধ্যে নাগাদ শহরে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল অনেক বাঙালী শহর ছেড়ে নৌকা ক'রে লম্বা দিলেন।

সন্ধ্যে অবধি সুরেশদের বাড়িতে থেকে, হিন্দুস্থানীর পোশাক পরে আমি সেই রাত্রেই কলকাতা পালিয়ে এলুম।

কলকাতায় এসেও নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। সেখান থেকে ওয়ারেণ্ট এসে আমায় ধ'রে নিয়ে গেল। মূর্তি চুরি করার অপরাধে আমার বিরুদ্ধে মস্ত মামলা রুজু হ'ল। বিচারের ফালাফলটা আর শুনে কাজ নেই, তবে এইটুকু শুনলেই হবে, চাকরি ক'রে যা কিছু পুঁজি করেছিলুম, মকদ্দমার খরচ চালাতে তা বেরিয়ে গেল, উপরন্তু চাকরিটিও গেল।

চাকরি আবার পেয়েছি। দু-পয়সা পুঁজিও হয়েছে, তবে সাহিত্যচর্চা আর করছিনা। সুরেশ আর বিশ্বনাথের নাম এখন দেশের সবাই জানে। তারা দুজনেই "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" উপাধি পেয়েছে।

পথে-বিপথে

পথের ধারে গাছতলায় প'ড়ে ছিলুম, রোগের ঘোরে। আমার পাশ দিয়ে যাত্রী চলেছিল দলে দলে, বিরামহীন। সবাই চলেছে একই উদ্দেশ্যে, নাসিকে কুম্ভ-স্নান করতে। শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা বিরাট মানুষ-নদীর পাড়ে প'ড়ে প'ড়ে জীবন মৃত্যুর লহরী গুনছি। এই বিশাল জীবনস্রোত আবার কোন্ মহাজীবনে গিয়ে বিলীন হবে—নানা চিন্তায় সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

বোধ হয় দু দিন এমনই ভাবে প'ড়ে ছিলুম; হঠাৎ কানের কাছে আওয়াজ এল, এই, ওঠ্।

মাথাটা তুলে দেখলুম, একটা লোক, মাথার ঝাঁকড়া চুল মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে, তার ভেতর দুটো চোখ জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে, যেন ঝোপের ভেতর বাঘের চোখ। আমার ঘটিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে আপনা-আপনি বললে, এই যে চোখ চেয়েছে! না, আয়ু আছে দেখছি।

তারপর একটু এগিয়ে এসে আমায় বললে, নে, এই দুধটুকু মেরে দে। যা, খুব বেঁচে গেছিস।

অনেকদিন পরে মাতৃভাষা কানে যেন অমৃতবর্ষণ করলে। আমি কোন রকমে উঠে ব'সে তাকে বললুম, কে তুমি?

সে একটু হেসে বললে, এই তোমারই মতন একজন। ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলুম। মড়া পোড়াবার শখটা এখনও যায় নি কিনা! দুধটুকু খেয়ে ফেল, জোর পাবে।

দুধটা বোধ হয় সে নিজে খাবার জন্যে যোগাড় করেছিল। কিন্তু তখন আর আমার বিচার করবার অবসর ছিল না, তার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে এক চুমুকে দুধটুকু শেষ ক'রে ফেললুম। সে আমার হাত থেকে ঘটিটা আবার নিয়ে নিলে।

দুদিন নিরম্বু উপবাসের পর পেটে দুধ পড়তে শরীরটা যেন একটু সুস্থ বোধ হতে লাগল। একটু পরেই সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, এই, ওঠ্, একটু চ'লে বেড়া, সব সেরে যাবে।

তার স্পর্শে কি ছিল জানি না। আমার মনে হ'ল যেন আমার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে আমি পাশ ফিরতে পারছিলুম না, সেই আমি উঠে বেড়াতে লাগলুম। লোকটা ঘটি হাতে নিয়ে আমার চলাফেরা লক্ষ্য করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে আবার গাছতলায় আমার কম্বলে এসে বসলুম। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সে একবার আমার দিকে আর একবার তার হাতের শূন্য ঘটিটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল।

হয়তো দুধের দামটা লজ্জায় চাইতে পারছে না মনে ক'রে আমি তাকে ডেকে বললুম, তোমার উপকার চিরকাল মনে থাকবে বন্ধু, দুধটুকু না পেলে হয়তো এইখানেই আমায় মরতে হ'ত। আমার কাছে এই কম্বলটা আছে, এইটে নাও।

আমার কথা শুনে সে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, রেখে দাও তোমার কম্বল। দেড় পয়সার এক কম্বল বেচতে গিয়ে শেষকালে পুলিশের খপ্পরে পড়ি আর কি!

এই ব'লে আমার পাশে কম্বলে সে ধপ ক'রে ব'সে ঘটিটা মাটিতে নামিয়ে রাখলে।

আমাদের সামনে দিয়ে জলস্রোতের মত লোকের স্রোত ব'য়ে চলেছে। একদল যাত্রী চলেছিল কোলাহল করতে করতে, তাদের পেছনে একটা উলঙ্গ ছেলে, হাতে একটা বড় কলা। আমি তাদের দেখছি, এমন সময় লোকটা টপ ক'রে আমার পাশ থেকে উঠে গিয়ে ছেলেটার হাত থেকে কলাটা কেড়ে নিয়ে আর এক দিকে চ'লে গেল।

ছেলেটা হতভম্বের মতন কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে কেঁদে উঠল।' তার মা তার চীৎকার শুনে পেছন ফিরে টপ ক'রে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলে।

লোকটার কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক! একটু পরে সে মুখ চোকাতে চোকাতে ফিরে এসে বললে, জলযোগ করা গেল।

আমি তাকে বললুম, এটা কি রকম হ'ল? ঐটুকু ছেলের হাত থেকে—

আমার কথা শেষ না হতেই সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললে, চুপ কর, ছেলেমানুষের একটা কলা গেছে, এখুনি তার বাপ মা তাকে দশটা কলা দিয়ে শান্ত করবে। আমায় কে দেবে?

সেদিন আর আমার যাওয়া হ'ল না। লোকটাও সারারাত আমার পাশে প'ড়ে ঘুমোতে লাগল। সকাল হতে সে আমায় বললে, কোথায় যাবি?

নাসিকে, কুম্ভমেলায়।

চ, তোর সঙ্গে যাই।

আবার চলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। একদিন অবিশ্রান্ত চলার পর আমরা দুজনে ঠানায় এসে পেঁছিলুম। ঠানা ছোট্ট শহর, যাত্রীরা এখানকার ধর্মশালায় একদিন বিশ্রাম ক'রে আবার চলবে। যাত্রীর ভিড়ে ধর্মশালা আগেই ভ'রে গিয়েছিল, আমাদের সেখানে স্থান হ'ল না। আমরা রাস্তার ধারে কম্বল বিছিয়ে এক জায়গায় আস্তানা করলুম।

ঠানায় দু-তিনটে সদাব্রত খোলা হয়েছিল, আমার এক জায়গায় খেয়ে এসে শুয়ে পড়লুম। শরীর ক্লান্ত ছিল, পড়তে না পড়তে ঘুম। ঘুমের ঘোরে

স্বপ্ন দেখছিলুম, সশরীরে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। স্বর্গের রাস্তার দু দিকে বড় বড় স্ফটিকের প্রাসাদ, তার ভেতর থেকে নাচ-গান শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোন গোলমাল নেই। রাস্তা পরিষ্কার ঝকঝক করছে। রাস্তায় কিন্তু একটি লোকের মুখ দেখতে পেলুম না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। একটি ছোট ছেলে হাসতে হাসতে পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডাকলুম, সে কাছে এসে বললে, কি?

তোমার নাম কি?

আমার নাম সন্তোষ।

আচ্ছা, উর্বশীর বাড়িটা কোথায় বলতে পার?

মাসী! মাসী তো এখানে আসে নি।

মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেলুম। বিশ্বের প্রেয়সীর যে আবার একটি বোনপো আছে, তা তো আমার জানা ছিল না। তাকে কি বলব ভাবছি, এমন সময় সে বললে, তোমার দাড়ি কোথায় গেল?

দাড়ি! দাড়ি আমি রাখি না।

বালকের মুখে বিস্ময়ের একটা ছায়া এসে পড়ল; দেখতে দেখতে তার এমন সুন্দর হাসিমাখা সরল মুখখানা গোমড়ামুখো বিজ্ঞ বৃদ্ধের মত হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে চেয়ে যে দিক থেকে আসছিল, সেই দিকেই ছুট দিলে।

আমি তো অবাক! হঠাৎ যে তার কি হ'ল, তা ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। ব'সে ব'সে তারই কথা ভাবছি, এমন সময় ছেলেটি একটা লোক নিয়ে এসে আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলে। লোকটার মুখে যেমন দাড়ি, তেমনই গোঁফ। সে আমায় প্রশ্ন করলে, আপনার দাড়ি নেই কেন?

কামাই ব'লে।

প্রশ্ন হ'ল—কবে এখানে আসা হয়েছে?

আজ।

ওঃ, আপনি এখানকার নিয়ম-কানুন জানেন না বুঝি? স্বর্গে দাড়ি কামাবার হুকুম নেই। দেবরাজ ইন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই এখানে দাড়ি রাখতে বাধ্য।

আমি বললুম, আজ্ঞে, ভবিষ্যতে আর কামাব না, আপনি উর্বশীর বাড়িটা চেনেন কি?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা কটমট ক'রে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বললে, এই করতে এখানে আসা হয়েছে বুঝি?

লোকটার মুরুব্বিয়ানা আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগছিল না। কি করব, নতুন জায়গা ব'লে সবই সহ্য করতে হচ্ছিল; কিন্তু আর পারা গেল না, আমি বললুম, তবে কি স্বর্গে এসেছি তোমার ঐ দাড়িওয়ালা মুখ দেখতে?

তারপরে উভয়ে হাতাহাতি। হঠাৎ সে এমন এক প্যাঁচ আমায় মারলে যে, আর সামলাতে পারলুম না। সেখান থেকে একেবারে মর্ত্যে এসে দড়াম ক'রে

প'ড়ে গেলুম। ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি, আমার সঙ্গী আমায় ঠেলছে। চোখ চাইতেই সে আমার একখানা হাত ধ'রে একেবারে টেনে তুলে বললে, চ'লে আয় দিকিন।

তারপর সে আমাকে টানতে টানতে ছুট দিলে।

আমি বললুম, ব্যাপার কি?

সে চেঁচিয়ে এক ধমক দিয়ে বললে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিস নি।

টানতে টানতে সে আমায় এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। গিয়ে দেখি, সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সে ভিড় ঠেলে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেখানে একটা মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে, মড়াটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে, আর তার সর্বাঙ্গে মাছি ভনভন করছে। ব্যাপারটা যে কি, তা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই সে মড়ারমাথার দিকটা তুলে ধ'রে আমাকে বললে, নে, তোল্ ওদিকটা।

তার এই আদেশের মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যে, আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারলুম না। আস্তে আস্তে মড়ার পা দুটি তুলে ফেললুম। মড়াটাকে তুলতেই চারদিকের লোকেরা নাকে কাপড় দিয়ে স'রে গেল। আমার সঙ্গী গটগট ক'রে এগিয়ে চলল, আর আমি মড়ার দুই পা মাথায় নিয়ে তার পেছনে যেতে লাগলুম।

শহর ছাড়িয়ে ক্রমে আমরা একটা জঙ্গলময় জায়গায় এসে পড়লুম। এই লোকটার কাণ্ড দেখে প্রথমে আমার ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ চলার পর সে ভাবটা কেটে গেলে আমার অত্যন্ত বিরক্তি ধরতে লাগল। একে শরীর অবসন্ন, তার ওপর কোথাকার এই পচা মড়া; ইচ্ছে হচ্ছিল, মড়াটা ফেলে দিয়ে লোকটাকে বেশ ক'রে ঘা দুই চার দিয়ে চ'লে যাই।

চলতে চলতে হঠাৎ সে ব'লে উঠল, মানুষ মড়ার চেয়ে জ্যান্ত মানুষকেই বেশি ডরায়।

আমি বললুম, কেন?

শুনলুম, এই লোকটার ওলাউঠো হয়েছিল। দুদিন ধ'রে সে পথের ধারে প'ড়ে ছটফট করেছে, কেউ তার মুখে এক গণ্ডুষ জলও দেয় নি। আর যাই সে মরেছে, মাছির মত পালে পালে লোক এসে মড়া ঘিরে দাঁড়িয়েছে! কি মজা বল্ দেখিন!

এর মধ্যে মজাটা কোথায়, তাই ভাবতে লাগলুম। মনে হ'ল, দু-দিন আগে আমিও পথের ধারে মরতে বসেছিলুম।

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা একটা স্বল্পতোয়া নদীর ধারে মড়া নামালুম। আমার সঙ্গী বললে, তুই এখানে মড়াটা আগলে ব'স্, আমি গাঁয়ে গিয়ে একটা কুড়ুল যোগাড় ক'রে আনি।

আমার সঙ্গী আমাকে রেখে গাঁয়ের দিকে চ'লে গেল। আমি মড়া আগলে ব'সে ভাবতে লাগলুম আমার সঙ্গীর কথা। নদীর ওদিকে দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের পিঠের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সূর্য ওপারে নেমে যেতে

লাগল। নদীর এক দিকে নিবিড় বন, সন্ধ্যারাণীর আঁচলের পরশ লেগে সেই বিশাল বন জেগে উঠেছে। তারই আওয়াজ বাতাসে ভেসে এসে আমার কানে লাগতে লাগল—ঝম ঝম ঝম। আমার মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গী সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বোধ হয় এমন একটা কিছু কাণ্ড বাধিয়েছে, যাতে সমস্ত জঙ্গলটা চীৎকার ক'রে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হঠাৎ মড়াটার মুখের ওপর আমার চোখ পড়ল—ইস!

এতক্ষণ তার মুখ দেখি নি। কি বীভৎস সে দৃশ্য! মৃত্যুর মধ্যে জীবনের যে পরিপূর্ণতা, যে সৌন্দর্য ও শান্তি আছে, এ মুখে তার চিহ্নমাত্রও নেই। অতৃপ্ত তৃষ্ণার যন্ত্রণা সেই পচা ধসা মুখ থেকে তখনও মিলিয়ে যায় নি। আমি আর সেখানে বসতে পারলুম না, উঠে একটু দূরে গিয়ে বসলুম।

ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। এত অন্ধকার যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। আমার সঙ্গীর দেখা নেই, ব'সে ব'সে ভাবছি, কখন সে আসবে! মনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন বললে, সে কি আর ফিরবে?

তাই তো! সে যে রকম লোক, তার পক্ষে তো কিছু বিচিত্র নয়! তারপর? এই অন্ধকার রাতে এই পচা মড়া নিয়ে আমি কি করব?

ভেতর থেকে কে যেন এক ঠেলা দিয়ে আমায় তুলে দিয়ে বললে, পালা পালা, তুই পাগল হয়েছিস?

আমি তড়াক ক'রে উঠে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকার। কি ভীষণ অন্ধকার! এত অন্ধকার আমি কখনও দেখিনি। সেই অন্ধকার ঠেলে আমি শহরের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। আমার মনে হতে লাগল, সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ অশরীরী আত্মা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে. বিষাক্ত সাপের গর্জনের মত ফোঁস ফোঁস ক'রে আমার চারিদিকে তারা যেন কি বলাবলি করছে! তারা আমাকে সেই মড়াটার দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। আমার শরীরে শক্তি নেই, অবসন্ন শরীরটাকে তারা সেইখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে। আমি অসহায়ের মত মড়ার মাথাটার কাছে ব'সে পড়লুম।

অন্ধকারে আমি চুপচাপ ব'সে আছি, মাঝে মাঝে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মড়াটার দিকে চাইতে হচ্ছে। তার সমস্ত দেহের মধ্যে সাদা দাঁতগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ঘড়ঘড়ে ধরা গলায় সে যেন ব'লে উঠল, জল, একটুখানি জল!

আমি ছুটে গিয়ে নদী থেকে গণ্ডুষ ক'রে জল এনে তার মুখে দিতে লাগলুম।

মড়ার মুখে কত গণ্ডুষ জল দিয়েছি, তা মনে নেই। একবার নদী থেকে ফিরে এসে দেখি, আমার সঙ্গী ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে দুজন লোক, তাদের মাথায় এক এক বোঝা কাঠ চাপানো. আমার সঙ্গীর হাতে একটা লণ্ঠন। আমাকে দেখে সে বললে, মরা মানুষ কি আর জল খায় রে পাগলা!

আমার সর্বাঙ্গ তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল, আমি তার কথার কোন জবাব দিতে পারলুম না, ব'সে পড়লুম।

তারা তিনজনে মিলে চিতা সাজিয়ে মৃতদেহ তুলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমার সঙ্গী তার সঙ্গের লোক দুটোকে বললে, তোরা যা, কাল সকালে তোদের লণ্ঠন পেঁৗছে দোব।

তারা চ'লে গেলে সে বললে, ওরা কি আসতে চায়!

আমি আর থাকতে পারলুম না। বললুম, তোমার মতন শখ আর কার আছে বল? রাস্তার মড়া তুলে এনে রাত-দুপুরে এই ফ্যাসাদ না বাধালে আর চলছিল না, না?

লোকটা আমার কথা শুনে ফ্যাঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ করলে। সেটা হাসি, না কান্না—কিসের শব্দ, অন্ধকারে তা বুঝতে পারলুম না।

দুজনে চুপচাপ ব'সে আছি। আমাদের সামনে ধূধূ ক'রে চিতা জ্বলছে। হঠাৎ সে আমায় একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, এই, চিতার ওপর লাফিয়ে পড়তে পারিস?

না বাবা, অত শখ আমার নেই।

আর যদি তোকে জোর ক'রে ওই চিতায় ফেলে দিই?

আমার আর সহ্য হ'ল না। আমি বললুম, দেখ, এক ঘটি দুধ খাইয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। আর যদি বেশি ঘাঁটাও, তা হ'লে ঠ্যাং দুটো ধ'রে একটি আছাড়ে সাবাড় ক'রে ওই চিতায় ফেলে দোব।

সত্যি?—ব'লে লোকটা লাফিয়ে উঠল। তারপরে নির্বিকারভাবে বললে, দে ভাই, দে, দেখি তুই কত বড় পালোয়ান!

খামকা একটা লোককে মেরে পোড়াব কি? আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেল! চুপ ক'রে ব'সে রইলুম, আর সে আমার চারদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল, দে, ঠ্যাং ধ'রে আছাড় দে।

একবার মনে হ'ল, দোব নাকি শেষ ক'রে? খানিকক্ষণ সেই ভাবে চেঁচামেচি ক'রে সে বললে, দূর, কাপুরুষ কোথাকার!

তারপর গজর গজর করতে করতে সে আমার কাছ থেকে দূরে স'রে গিয়ে বসল। কিন্তু তার শ্লেষ আমার সর্বাঙ্গে যেন বিষের দাহন ছিটিয়ে দিলে। আমি তার কাছে গিয়ে বললুম, কই, আমায় চিতায় ফেলে দাও তো, দেখি তুমি কত বড় বীরপুরুষ!

আমার কথা শেষ হতে না হতে সে টপ ক'রে আমায় কোল-পাঁজা ক'রে তুলে চিতার দিকে ছুটল। আর একটু হ'লেই আমায় চিতায় ফেলে দিয়েছিল আর কি! আমি দু হাতে তার গলা চেপে ধ'রে জোড়া পায়ে বুকে চাড়া দিয়ে তার কবল থেকে কোনও রকমে ছটকে বাইরে প'ড়ে গেলুম।

এর পরে আর সেখানে থাকা চলে না। আমি বললুম, বাস্, এই পর্যন্ত। আমি চললুম।

সে চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চিতার আলো তার মুখের ওপর প'ড়ে তার মুখখানা ঠিক সেই মড়াটার মতন দেখাচ্ছিল। আমি সেদিকে আর চাইতে পারলুম না। কোনও কথা না ব'লে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে

শহরের দিকে এগিয়ে চললুম। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই সে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আমি মনে করলুম, বুঝি জ্যান্ত মানুষকে পোড়াবার শখটা না মিটিয়ে সে আমায় ছাড়বে না।

কিন্তু এবার সে বললে, রাগ করলি ভাই? আয়।

যাওয়া হ'ল না। ফিরে এসে আবার চিতার কাছে গিয়ে বসতে হ'ল। মড়াটার আধখানা তখন পুড়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গী চিতার ওপরে গোটা-দুয়েক মোটা মোটা কাঁচা কাঠ চাপিয়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে বললে, তোর নাম কি রে?

রামদয়াল বাঁড়ুজ্জে। তোমার নাম?

হরিহর দত্ত। তোর বাড়ি কোথায়?

কলকাতা।

অ্যাঁ! সে চমকে উঠে বললে, কি বললি? কলকাতা? বাগবাজার জানিস—বাগবাজার?

কলকাতার ছেলে আর বাগবাজার জানি না!

তুই কতদিন বাড়িছাড়া?

আমি অনেকদিন বাড়ি ছেড়েছি, প্রায় পনরো বছর হবে।

আমার সঙ্গী বললে, আমার বাড়িও কলকাতা। ভারি ডানপিটে ছেলে ছিলুম আমরা বুঝলি? বাগবাজারের ছেলে, জানিস তো কি রকম?

তা আর জানি না! হাতে হাতেই তার প্রমাণ পাচ্ছি।

সে বললে, দেখ্, জ্যান্ত মানুষকে আমি ডরি না। এই মরা মানুষেই আমাকে দেশছাড়া করেছে।

কি রকম?

শুনবি তবে? আচ্ছা, তা হ'লে আর দুখানা কাঠ চিতেয় চাপিয়ে দিয়ে আয়।

দুখানা কাঠ চিতার ওপরে চাপিয়ে তার পাশে এসে বসলুম। সে বলতে লাগল, ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে ছিলুম, ভারি ডানপিটে। আমার বাবা কিন্তু আমার চেয়েও বেশি ডানপিটে ছিলেন। তিনি আমার মত ডানপিটে ছেলের পিঠে রোজ নিয়ম ক'রে দুটো তিনটে ডাণ্ডা ভাঙতেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে, অত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? তাই অকালে তাঁকে মারা যেতে হ'ল। আমি বাবাকে বলতুম, বাবা, আমার জন্যে তুমি অত পরিশ্রম ক'রো না। আহা! বাপের মন কিনা, তাতে বোঝ মানবে কেন? তিনি ভাবতেন, ছেলে আমার কিছু বোঝে না। একদিন বাবাকে বুঝিয়ে বললুম, দেখ বাবা, তোমার মার কাছে শুনেছিলুম যে, তোমার ঠাকুরদাদা গাঁজা আর মদ খেতেন, আর তোমার বাবা খেতেন গাঁজা। তুমি কিছু খাও না, আমিও যদি একটান বিড়িও না খাই, তা হ'লে তো বংশের নাম ডুববে। বাস্, আর যাবে কোথা! সেদিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে আমাকে পিটিয়ে তাঁর হাত পা এলিয়ে পড়ল। সেই ন্যালবেলে হাত-পা আর সোজা হ'ল না। দিন দশেক এই

ভাবে কাটবার পর তিনি মারা গেলেন। মরবার সময় আমায় কাছে ডেকে বললেন, হরে, এমন কাজ আর করিস না বাবা।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বললুম, বাবা তুমি স্বর্গে থেকে দেখো, এবার থেকে তোমার সব কথা শুনে চলব। কিন্তু তুমি একটি দিনের জন্যেও আমার কথা শুনলে না, দুঃখটা আমার চিরদিনের জন্যে র'য়ে গেল।

বাবার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁর প্রাণটা বোধ হয় জিবের ডগায় এসে ওত পেতে ব'সে ছিল, সেই হাসির ফাঁকে টপ ক'রে সেটা লাফিয়ে বেরিয়ে গেল, আর বাবার মুখে সেই হাসিটুকু লেগে রইল।

মা অনেকদিন আগেই পালিয়েছিলেন। বাড়িতে বাবার এক খুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমাদের বাড়ির বাইরের দিকটায় খানকয়েক দোকানঘর ছিল, তারই ভাড়াতে আমাদের দুজনের কোন রকমে দিন কাটতে লাগল। তা দিদিমণিকে বেশিদিন বাঁচতে হয় নি। বাবা মারা যাবার বছরখানেকের মধ্যেই তিনিও স'রে গেলেন।

বেড়ে দিনগুলো কাটছিল, এমন সময় শহরে পেলেগ এল। পুলিস ঢেঁড়া দিতে লাগল, বোম্বাইসে আদমী এলেই থানায় খবর দিতে হবে। গোয়ালে আগুন লাগলে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম ভাবে শহর থেকে লোক পালাতে লাগল। এই সময় আমাদের পাড়ায় দীনে গয়লা পেলেগে মারা গেল। দীনু ঘোষের লোকজন সবাই পালিয়েছিল, যারা কলকাতায় ছিল, তারাও সে সময় এমন ডুব মারলে যে, তাদের পাত্তাই পাওয়া গেল না। মরা বাড়িতে পচে আর কি! শেষকালে আমি, অবিনাশ, জগবন্ধু আর বিশ্বনাথ —এই চারজন মিলে সেই মড়া পুড়িয়ে এলুম। সেই থেকে পাড়ায় কেউ মরলেই আমাদের চারজনের ডাক পড়ত। শেষে শহরসুদ্ধ লোক আমাদের চিনে গেল। কায়েতের ছেলে আমি, লোকে আমায় 'মড়িপোড়া-বামুন' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে আমি ভাবলুম, ভালই হ'ল। বামুন হতে গিয়ে বিশ্বামিত্রের মতন তপস্বীকেও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল, আর আমি কি রকম ফাঁকতালে বামুন হয়ে গেলুম!

দিনগুলো বেশ কাটছে। নিজে হাতে রাঁধি বাড়ি খাই, সপ্তাহে একটা দুটো মড়া পোড়াই, আর তারই জেরে দুটো একটা নেমন্তন্ন লেগেই আছে। জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মড়ার সঙ্গেই আমাদের মেলামেশা বেশি চলতে লাগল। কবিরা নাকি বলে, তেমন ভাবে ভালবাসলে সে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যাবেই যাবে। আরে, কবির কথা বেদ-বাক্য। এই দেখ না, জ্যান্ত মানুষকে ভালবাসতুম না, বাসতুম মড়াকে। শেষকালে সেই মড়াই আমাকে বুঝিয়ে দিলে, জ্যান্ততে আর মড়াতে কোন তফাত নেই।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমরা চারটিতে পড়ার এক রকে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় একটি বুড়ো লোক এসে আমাদের বললে, বাবা, আমার মেয়েটি কলেরায় মারা গেছে। বিধবা অবস্থায় ছেলেবেলায় তার একটি সন্তান হয়েছিল

ব'লে পাড়ার কোন লোক তাকে ফেলতে চাইছে না। তোমাদের নাম শুনে এসেছি, ভদ্রলোকের মেয়েকে কি শেষে মুন্দোফরাশ ছোঁবে?

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল পড়তে লাগল। অবিনাশ ছিল আমাদের দলের সর্দার। সে বৃদ্ধকে আশ্বস্ত ক'রে বললে, সে কি কথা! আমরা রয়েছি যখন—চল হে, সে কি কথা!

আমরা উঠলুম। বৃদ্ধ এ গলি সে গলি অনেক ঘুরিয়ে আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িটা অতি পুরাতন। বোধ হয় শহরের পত্তন হবার আগে সেখানে তাঁতীদের আড্ডা ছিল। বাড়িটা যেন রাস্তাটাকে দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। বাড়ির ভেতরের অবস্থাও সেই রকম। অন্ধকার। উঠনে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলেছে। বৃদ্ধ আমাদের একটা এঁদো ঘরে বসিয়ে ভেতরে চ'লে গেল। বাড়ির ভেতরে কান্না বা কোন রকমের শব্দ নেই, সব চুপচাপ, মাঝে মাঝে দুটো একটা লোক ঢুকছে, কি বেরুচ্ছে মাত্র। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ব'সে থাকবার পর সেই বৃদ্ধ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, আসুন।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলুম যে, উঠনে মড়া নামানো হয়েছে। আর বাক্যব্যয় না ক'রে খাট কাঁধে তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। খানিকটা পথ এগিয়েছি, এমন সময় বৃদ্ধ বললে, আপনারা এগিয়ে যান, আমরা পান-সিগারেট কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

আমরা চলেছি হনহন ক'রে নিমতলার দিকে। বৃদ্ধ আমাদের অনেক পেছিয়ে পড়েছে, তাকে আর দেখতেই পাচ্ছিনা। একবারে শ্মশানে গিয়ে দেখা হবে মনে ক'রে আমরা আর তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই চলেছি। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে, পথে লোকজন গাড়িঘোড়া বিরল হয়ে এসেছে। এমন সময় ফুটপাথের ওপর থেকে একটা পাহারাওয়ালা আমাদের বললে, এই বাবু, খাড়া রহো।

আমরা দাঁড়ালুম, কেয়া হ্যায়?

পাহারাওয়ালা খটখট ক'রে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

সে বললে মুর্দাসে খুন নিকালতা কাহে?

আমরা তো অবাক! খুন কি রে বাবা!

দেখি, সত্যিই খাট চুঁইয়ে টপটপ করে রাস্তায় রক্ত পড়ছে।

অবিনাশ পাহারাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিলে, লোকটার দেহে আজ সকালে বড় রকমের একটা অস্ত্র করা হয়েছিল, তাই থেকে রক্ত ঝরছে।

পাহারাওয়ালা তার কথা শুনে আমাদের ছেড়ে দিলে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আমি বললুম, কি হে, ব্যাপার কি?

বিশ্বনাথ বললে, ব্যাপার কি বুঝতে পারছ না? চুপচাপ চ'লে এস, এখন চেঁচামেচি করলে ফ্যাসাদ বাড়বে বই কমবে না।

চারজনে ফুর্তি ক'রে শহর কাঁপিয়ে চলেছিলুম, সব ফুর্তি যে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ভয়ে আমাদের তালু

শুকিয়ে উঠতে লাগল, প্রতি পদেই পায়ে পা আটকে যায়, না পারি চলতে, না পারি চেঁচাতে। ঘাটের কাছে এসে শ্মশানে না ঢুকে গঙ্গার ধার দিয়ে সোজা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা নির্জন স্থানে আমরা মড়া নামালুম। তারপরে আস্তে আস্তে ওপরকার চাদরখানা তুলে দেখি, মড়াটাকে একেবারে মাদুর দিয়ে মুড়ে সেলাই ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমরা কোন রকমে একদিককার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে দেখি, একটি স্ত্রীলোক, তার মুণ্ডুটা দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। তার রক্ত তখনও গরম; বোধ হয়, আমাদের ডেকে এনে নীচে বসিয়ে রেখে তারপর খুন করা হয়েছে। আমরা তখনই চাদর ঢেকে দিয়ে পরামর্শ করতে লাগলুম, কি করা যায়?

অবিনাশ বললে, আমাদের যদি এখনই পুলিসে ধরে, তা হ'লে নিশ্চয় ফাঁসি হবে।

জগবন্ধু বেচারা তো কেঁদেই অস্থির, অ্যাঁ, ফাঁসি! অবিনাশ বললে, এটাকে এখানে ফেলে রেখে আমরা চারজনে চারদিকে সটকে পড়ি। হাঙ্গামা মিটলে তারপরে দেশে ফেরা যাবে। নয়তো এই পর্যন্ত।

বিশ্বনাথের ট্যাঁকে সাতটা টাকা, গোটা দশেক বিড়ি আর একটা ছুরি ছিল। ছুরিখানা সে রাখলে, আর সেই টাকা আর বিড়ি চারজনে ভাগ ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে চার দিকে স'রে পড়লুম। সেই যে সরেছি, বাস্, আর ফিরি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাদের কি হ'ল?

কে জানে? তবে অবিনাশ কাবুলের মন্ত্রী হয়েছে, আমির তাকে খুব খাতির করে। সুবিধে হ'লে একবার কাবুলে যেতে হবে।

আমি বললুম, অন্য বন্ধুরা বোধ হয় এতদিনে বাড়িতে ফিরেছে?

সে বললে, কারও খোঁজ পাই নি। একটি কাবুলী একবার আমায় বলেছিল যে, তাদের দেশে একজন বাঙালী বাবু আছে, সে সেখানকার মন্ত্রী। আমি তখনই বুঝে নিলুম, ঠিক এ আমাদের অবিনাশ। ছেলেবেলা থেকে কাবুলের মন্ত্রী হবার দিকে তার ভারি ঝোঁক ছিল কিনা। রাস্তায় কাবুলী দেখলেই তাকে ধ'রে তার সঙ্গে সে পাঞ্জা লড়ত।

তা তুমি আর ফিরলে না কেন?

ফিরি কি ক'রে? এরা কি আর বাড়ি ফিরতে দিলে? যেদিন থেকে বাড়ি ছেড়েছি, সেদিন থেকে আর হাঁফ ছাড়বার ফুরসুৎই পাই নি।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলুম না। ভাবতে লাগলুম এই লোকটার কথা, তার কাজের কথা আর আমার বিপুল অবসরের কথা—

নিজের চিন্তার স্রোতে অনেকদূরে ভেসে গিয়েছিলুম, চমক ভাঙতেই দেখি, আমার সঙ্গী নিবন্ত চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি উঠে তার কাছে যেতে সে আমায় বললে, ঘটটা তো সেই রাস্তায় ফেলে আসা হয়েছে, চলু, হাতে ক'রে জল এনে চিতা নিবিয়ে চ'লে যাই।

আমরা গণ্ডূষ ক'রে জল এনে এনে যতদূর সম্ভব চিতা ঠাণ্ডা ক'রে গ্রামে

গিয়ে লণ্ঠন ফিরিয়ে দিয়ে যখন শহরের দিকে অগ্রসর হলুম, তখন উদয়গিরি-চূড়ার শিখর রাঙা হয়ে উঠেছে!

পথের মাঝে আমার সংগী বললে, তুই নাসিকে কি করতে যাবি ?

কুম্ভ-স্নান করতে।

আমি যাব গোদাবরীর ধারে পঞ্চবটী বনে। কবিগুরু বাল্মীকির মানসকন্যা সীতার পায়ের ধুলোয় সেখানকার মাটি পবিত্র হয়ে আছে। সেই পবিত্র মাটিতে এই অপবিত্র পায়ের চাট্টি ধুলো ঝেড়ে দিয়ে আসব—বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে বললে, বড় কষ্ট হ'ল তোর, কিছু মনে করিস নি ভাই।

আমি তার কথার কোন জবাব দিলুম না। দুজনে নির্বাক হয়ে চলতে লাগলুম। আমরা যেখানটায় ডেরা করেছিলুম, সেখানে গিয়ে দেখি, ঘটি ও কম্বল অদৃশ্য হয়েছে। সেদিন স্নান ক'রে খেয়ে রাস্তার ধারে প'ড়ে দুজনে সমস্ত দিনরাত ঘুমানো গেল। পরদিন সকালে উঠে নাসিকের দিকে যাত্রা করলুম।

আমাদের সঙ্গে বিরাট জনস্রোত চলেছে, লোক-চলার আর বিরাম নেই। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা, শিশু—সমস্ত ভারতবর্ষটাই যেন গড়িয়ে চলেছে তীর্থ করতে। চলতে চলতে আমরা মনমদে এসে পেঁছিলুম। আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল, সংগীকে বললুম, দাদা, একটা বেলা এখানে থেকে গেলে হ'ত না ?

সে বললে, বেশ, আমার তো আর ট্রেন ধরার মত পুণ্যি করা নয় যে, অমুক তারিখে পাঁচটা সতরো মিনিটে নদীতে ডুব মারতে না পারলে আর স্বর্গে যাওয়া হবে না!

ঠিক হ'ল, একটা বেলা সেখানে কাটিয়ে যাব।

মনমদে সদাব্রত কিংবা ধর্মশালা কিছুই নেই, এখানে যাত্রীরা বড় একটা কেউ দাঁড়ায় না। আমরা খুঁজে খুঁজে এক মারাঠী যুবকের বাড়িতে আশ্রয় নিলুম। আমাদের আশ্রয়দাতা তরুণ, সে তার তরুণী ভার্যাকে নিয়ে সেখানে বাস করে। দুটি চালাঘর—একটিতে রান্না হয়, অন্যটিতে থাকা। ঘরে জিনিস পত্র খুবই কম, দেখলেই মনে হয় যে, তারা বড় গরিব।

আমাদের স্নান শেষ হ'লে আমাদের প্রিয়দর্শন আশ্রয়দাতা এসে বললে, স্টেশনে ব্রাহ্মণের দোকান আছে, রুটি ভাত যা চাইবেন পাবেন।

বলে কি! অনেকদিন পরে গৃহস্থদের বাড়িতে খাব—এই চিন্তায় মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যুবকের কথায় আমরা দুজনে একেবারে ব'সে পড়লুম। স্টেশনে যে খাবার দোকান আছে, সে কি আমরা জানি না! যুবকের কথা শুনে আমার সঙ্গী অম্লানবদনে বললে, আবার স্টেশনে কে যাবে ? তোমার স্ত্রীকে চাট্টি চাল চড়িয়ে দিতে বল।

তার কথা শুনে যুবকের হাসি এক নিমিষে মিলিয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ বিমর্ষ মুখে থেকে বললে, দেখ, আমাদের এখানে খেলে তোমাদের জাত যাবে, আমার ও আমার স্ত্রীর বাপ-মায়ে বিয়ে হয় নি। তাদের হাতে তোমরা খাবে ?

আমার সঙ্গী বললে, শিগগির ভাত চড়িয়ে দাও, আমরা এখুনি ঘুরে আসছি।

আমার সঙ্গী ঘর থেকে আমায় টেনে রাস্তায় বার করলে, তারপর লক্ষ্যহীনের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চলতে চলতে একবার সে বললে, আহা, বেচারীরা বড় গরিব।

আমি বললুম, গরিব, কিন্তু লোক ভাল।

কিন্তু তোদের সমাজ এদের বাইরে ঠেলে রেখে দিয়েছে। কারা ঠকেছে বলু দিকিন? ঘরোয়া মামলার মত দুই তরফই মারা যাচ্ছে।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে আমায় দাঁড় করালে। সামনে খানিকটা পরিষ্কার জমির চারদিকে তারের বেড়া, মাঝখানে ছোট একটা একতলা বাড়ি, বোধ হয় সেখানে রেল-কোম্পানির কোন কর্মচারী থাকে। ফাঁকা জমিতে দুটো খোঁটায় দুটো গরু বাঁধা, তারা ঘাস খাচ্ছে। আমার সঙ্গী কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে টপ ক'রে তার ডিঙিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল, তারপর গরু দুটোকে খোঁটা থেকে খুলে দরজা দিয়ে রাস্তায় বার ক'রে নিয়ে এল। আবার এক নতুন ফ্যাসাদের উপক্রম দেখে আমি গুটিগুটি সেখান থেকে সরে এগিয়ে পড়ছিলুম, কিন্তু সে গরু দুটোর গলার দড়ি দু হাতে ধ'রে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে বললে, একটাকে ধর্।

আমি বললুম, এ আবার কি হবে?

রাস্তায় আসতে আসতে যে ফাঁড়ি দেখেছি, সেখানে এ দুটো জমা দিতে হবে কিনা—

বা রে! পরের গরু বাড়িতে বাঁধা রয়েছে, আর তুমি—

হ্যাঁ, খাঁটি দুধ খেতে হ'লে মাঝে মাঝে এ রকম খরচ করতে হয়।

কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সে তর্ক করতে গেলে হয়তো আবার অন্য বিপদ হতে পারে ভেবে আর বাক্যব্যয় না ক'রে একটা গরুকে ধ'রে নিয়ে চললুম। ফাঁড়ির কাছে এসে আমার হাত থেকে গরুর দড়িটা নিয়ে সে দু হাতে দুটো গরু টানতে টানতে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, এ রকমের লোকের সঙ্গে আর কদিন কাটালে নির্ঘাত জেলে যেতে হবে। ইতিমধ্যে সে বেরিয়ে এসে বললে, যাক, আট আনা পাওয়া গেছে, চল্।

আমাদের আশ্রয়দাতার বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখি, ভাত হয়ে গেছে। অনেকদিন পরে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় আমার সঙ্গী সেই যুবকটির হাতে আধুলিটা দিতে গেল, কিন্তু সে কিছুতেই তা নেবে না, শেষকালে সে তার স্ত্রীকে ডেকে বললে, মা, তোমার ছেলে তোমায় প্রণাম করছে, নাও তো লক্ষ্মী।

মেয়েটি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একখানা হাত বাড়াতেই সে টপ ক'রে আধুলিটা তার হাতে ফেলে দিয়েই আমাকে বললে, চল্।

সমস্ত দিনরাত অবিশ্রান্ত চলার পরদিন সন্ধ্যের সময় আমরা নাসিকে এসে

পেঁছিলুম। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক, যে যেখানে আছে, স্নান করতে এসেছে, কোন সম্প্রদায় আর বাকি নেই—গৃহী, সন্ন্যাসী, উদাসী, চোর, জোচ্চোর, ডাকাতে পথ পরিপূর্ণ। কুম্ভমেলা যে না দেখেছে, সে হিন্দুকে দেখে নি। স্বর্গলাভের জন্যে হিন্দু কি রকম অকাতরে সৎ অসৎ সমস্ত কাজই করতে পারে, প্রয়োজন হ'লে কেমন অকাতরে পরের প্রাণ পর্যন্ত নিতে পারে, এখানে প্রতি পদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যেদিন নাসিকে গিয়ে পেঁছিলুম, তার পরের দিন সকালে স্নান। লক্ষ লক্ষ যাত্রী গোদাবরীর তীরে আড্ডা করেছে, পুলিস ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে কোন দিক সামলাতে পারছে না। নদীতে সামান্যই জল, যেখানে খুব গভীর সেখানেও এক কোমরের বেশি নয়। নদীর বুকে বড় বড় কালো পাথর জল ছাড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক নরনারী সেই পাথরের ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বড় বড় নামজাদা সন্ন্যাসী শিষ্য-পরিবৃত হয়ে ব'সে আছেন, কেউ বা সদাব্রত খুলেছেন, কোথাও ধর্ম উপদেশ হচ্ছে, কোথাও বা তুরীয়ানন্দের ধোঁয়ায় মর্ত্যে মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। কোন কোন সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে জলস্রোতের মত অবিশ্রান্ত অশ্লীল গালাগালির স্রোত বেরিয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের মনে যুগপৎ ভীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করছে। যে সন্ন্যাসী যত বেশি গালাগালি দিচ্ছে, সেখানেই ভিড় তত বেশি, সে একটা দেখবার জিনিস।

আমরা অনেক মারামারি ক'রে নদীর বুকের ওপর একখানা প্রকাণ্ড পাথরের এক কোণে একটু আশ্রয় পেলুম। সারারাত ঘুমোবার উপায় নেই, ঘুমোলেই অন্য ব্যক্তি এসে আমাদের ঠেলে জলে ফেলে দিয়ে সেই স্থানটুকু অধিকার ক'রে বসবে। কোন রকমে শুয়ে ব'সে রাত কাটাতে হ'ল।

সকালবেলা উঠে যাত্রীরা কোমর-জলে নেমে দাঁড়াল, সময় এলেই ডুব দিতে হবে। পুলিসের লোক জলে স্থলে বড় বড় ডাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্নান আরম্ভ হ'লে কেউ যেন বেশিক্ষণ জলে না থাকে। আমি ও আমার সঙ্গী দুজনে তাদের সঙ্গে জলে নেমে অপেক্ষা করতে লাগলুম। হঠাৎ সেই বিশাল জনসঙ্ঘ চেঁচিয়ে উঠল, জয় জয় মায়ী—

তারপরে টপাটপ ডুবের পালা। আমি ডুব দিতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার সঙ্গী টপ ক'রে ধ'রে ফেললে।

আমি বললুম, কি ?

সে বললে, দাঁড়িয়ে মজা দেখ্ না, এত লোকের সঙ্গে স্বর্গে গেলে সেখানে টেঁকতে পারবি ?

আমি তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলুম। সে আবার বললে, এদের সঙ্গে তুইও কি পাগল হ'লি ?

আর সময় ছিল না, পুলিসের লোক তখুনি আমাদের জল থেকে তুলে দিয়ে অন্য লোকদের স্নানের জায়গা ক'রে দিলে। কোমর-জল থেকেই আমাদের উঠতে হ'ল।

জল থেকে উঠে আমি অনেক দূরে অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন জায়গায় গিয়ে

চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। দুঃখে ক্ষোভে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। আমার সংগী সমস্ত দিন চুপচাপ আমার পাশে ব'সে রইল। সন্ধ্যের পর সে আমাকে তুলে নদীর ধারে নিয়ে গেল। স্নান ক'রে এক জায়গায় খেয়ে আমরা এক সন্ন্যাসীর আস্তানায় গিয়ে বসলুম। সন্ন্যাসীর চারিদিকে বিস্তর লোক গোল হয়ে ব'সে গিয়েছে। আর তার মুখ দিয়ে অনর্গল গালাগালির স্রোত বেরুচ্ছে। সবাই বললে, ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ।

আমরা তার কাছে গিয়ে বসতেই সে আমাদের অশ্লীল ভাষায় একটা গালাগালি দিয়ে তার কাছে যেতে বললে। আমি ব'সে রইলুম, আমার সঙ্গী হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে কোন দ্বিধা না ক'রে সন্ন্যাসীর গালে বিরাট একটা চপেটাঘাত কষিয়ে দিলে। সেই চড়ের শব্দে কি মেশানো ছিল বলতে পারি না, সেখানে যত লোক ব'সে ছিল সবাই আবিষ্টের মত অনড় হয়ে ব'সে রইল। সন্ন্যাসী চড় খেয়ে মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গীর মাথা লক্ষ্য ক'রে তার দেড় হাত লম্বা চিমটেখানা মারলে ; আমার সঙ্গী বাঁ হাতে চিমটেটা ধ'রে তার নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে, সন্ন্যাসী একেবারে ঘুরে মাটিতে দড়াম ক'রে প'ড়ে গেল।

সন্ন্যাসী ভূতলশায়ী হওয়ামাত্র চারিদিক থেকে "মার্ মার্" শব্দে সকলে তাকে তেড়ে চলল। তারপর জুতো, লাঠি, ঘুষি আর চিমটে—আমার মনে হ'ল, তার একখানি হাড়ও আর আস্ত নেই। সন্ন্যাসীর শিষ্যেরা তাদের গুরুকে তুলে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। ভিড়ের লোকেরাও তাদের পেছন পেছন যেতেই সুযোগ বুঝে আমি মৃতপ্রায় সঙ্গীকে তুলে নিয়ে এক দিকে দৌড় দিলুম ; অনেকদূরে ছুটে এসে তাকে মাটিতে নামিয়ে রাখলুম। তার মাথা থেকে পা—সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছিল। নদী থেকে জল এনে তার মাথায় দিতে লাগলুম। বোধ হয় দু ঘণ্টা পরে সে চাইলে। আমি সারারাত ব'সে তার সেবা করলুম।

সকালবেলা সে ধড়ফড় ক'রে উঠে আমার একখানা হাত চেপে ধ'রে অনুনয়ের সঙ্গে বললে, চল্, এখান থেকে চ'লে যাই।

আবার চলা শুরু হ'ল। দিন দুয়েক গ্রামের পথে চ'লে আমার সঙ্গী জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ ধরলে। আমার ইচ্ছে ছিল, অজন্তার দিকে যাব। সে বললে, চল্, সাতারায় যাই, সেখান থেকে ফিরে অজন্তায় যাব।

চলতে হ'ল, তারই সঙ্গে চললুম। তার কথার মধ্যে এমন একটা কি ছিল, যা আমি কিছুতেই অমান্য করতে পারছিলুম না।

চলেছি তো চলেইছি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ভেতর দিয়ে সরু পথ। আমাদের চারিদিকে নীচে ওপরে বিশাল অরণ্য, তারই মধ্যে আমরা দুজন যাত্রী অনির্দিষ্ট যাত্রায় এগিয়ে চলেছি। সমস্ত দিন রোদের মুখ দেখতে পাই না, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ের মাথাগুলো দিনরাত মেঘে ঢেকে আছে। রাত্রে গাছের ওপর ব'সে অজানা জানোয়ারের বিকট ডাক শুনে আঁতকে উঠি, সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলে, শেয়াল ডাকছে। সকাল হ'লে আবার চলি।

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সমস্ত বনটা মুখরিত। আমার মনের মধ্যেও নানা চিন্তার ঢেউ উঠছিল। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি? কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এই লোকটা এসে আমার এই নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটাকে এমনভাবে আলোড়িত করলে? আমার জীবনের সঙ্গে কেমন ক'রে এর জীবনের ধারা এসে মিশল? আর কতদিন সে আমায় এমন ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে? কেন আমি তার সঙ্গে এমন ক'রে ঘুরে মরছি? আমার সমস্ত অন্তরটা বিদ্রোহের সুরে বলতে লাগল, কেন? কেন? কেন?

আমি তাকে বললুম, সাতারায় গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাধাবে তো?

আমার কথা শুনে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু হাতে আমার দু কাঁধ ধ'রে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যের আবছায়ার ভেতর দিয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে সে বললে, আচ্ছা, তুই যা, আমি চললুম।

এই ব'লে সে হনহন ক'রে পাহাড়ের ওপর উঠে যেতে লাগল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। ক্রমে তার দেহখানা আমার চোখে ছোট্ট হয়ে আসতে লাগল। তারপর যে অদ্ভুত যাদুকর ধরণীর বুকে সেই বিশাল পাহাড়, বন, নির্ঝরিণী ফুটিয়ে তুলেছে, মাথার ওপরে যে চিররহস্যময় নীল চাঁদোয়া উড়িয়ে দিয়েছে, সে তার অদ্ভুত তুলির আর একটা আঁচড়ে সেই অদ্ভুত মানুষটাকে পাহাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে। পশ্চিমঘাটের বিরাট অরণ্যের মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলুম।

তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

অন্ধকারের অন্তরালে

আজ তিন দিন হ'ল লীলা জ্বরে শয্যাগত হয়ে আছে ; মুখে তার জল দেবার লোক নেই।

কলকাতার একটা বিশ্রী পল্লীর তেতলার একখানা ঘরে তার বাসা। বাড়িতে আরও দশ-বারোটা হতভাগিনী বাস করে। এদের সঙ্গে লীলার চোখের পরিচয় আছে মাত্র, মুখের আলাপ নেই।

কয়েক বছর আগে বর্ষার এক ঘনঘটাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় লীলা তার প্রতিবাসী রমেশের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। সেই থেকে আজ অবধি এইখানেই তার দিন কেটেছে। লীলার মনে দম্ভ ছিল যে, তার চারপাশের এই সব অভাগিনীদের চেয়ে সে ঢের উঁচু। তারা কত বার কত ছলে তার সঙ্গে ভাব করতে এসেছে, কিন্তু বারে বারেই ঘৃণায় সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রতি রাত্রে তাদের বীভৎস প্রমত্ত লীলা তার দেহ-মনকে কণ্টকিত ক'রে তুলেছে ; তার জন্মগত সংস্কার প্রতিদিনই এদের অভিসম্পাত হেনেছে, মৃত্যু কামনা করেছে।

চারিদিকের এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে লীলা অভেদ্য প্রেমের দুর্গ তৈরি ক'রে বাস করছিল, কিন্তু কয়েক মাস আগে তার প্রেম ও শ্রদ্ধাকে পদাঘাত ক'রে তার প্রণয়ী অন্তর্ধান করেছে।

শৈশবেই লীলার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু প্রেমের আস্বাদন পাবার অনেক আগেই তাকে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বাপ মা ও অভিভাবকেরা একে একে তার চোখের সামনে একাদশী, থান-ধুতি ও নিরাভরণতার যবনিকা টেনে দিয়ে সংসারের নানা অশুচিতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় একদিন পাহাড়ে-নদীতে বান ডাকার মত তার মনের দুকূল ছাপিয়ে উঠল। লীলার চিত্ত-বন অভূতপূর্ব গীত গন্ধ কম্পন ও মর্মর-ধ্বনিতে ভ'রে উঠল। তার হৃদয়ের এই নূতন অনুভূতির কথা একজন কাউকে জানাতে পারে, এমন একজন বন্ধু যদি তার কেউ থাকত! এতদিনে লীলার মনে হ'ল, পৃথিবীতে তার সবই আছে, কিন্তু কেউ নেই। এই চিন্তা লীলার জীবনে যেন একটা বিষম ভারের মত চেপে বসল। তার অভিভাবকেরা দেখলেন যে, সে রীতিমত থান-কাপড় পরছে, দু বেলা নিয়মিত রামায়ণ পড়ছে, সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়তে পড়তে তার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠছে। কিন্তু তার অন্তরের ফল্গুধারার স্রোতে সে যে কোন্ সত্যবানকে নিয়ে জীবনতরী ভাসিয়েছে, সে কথা কেউ জানতে পারলে না।

এই সময়ে একদিন সদ্যস্নাতা সিক্তবসনা লীলাকে ঘাটের পথে রমেশ প্রেম-নিবেদন করলে। লীলা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে এল, কিন্তু কাউকে কিছু বললে না। তারপরে প্রতিদিন রমেশের অনুনয় আর প্রেমের অভিনয় চলতে লাগল।

প্রেমে বিচারশক্তির উপদ্রব থাকে না। লীলাও নির্বিচারে রমেশকে ভালবেসে ফেললে। তারপরে একদিন ভাদ্র মাসে খুব ভোরবেলা লীলা রমেশের সঙ্গে নৌকোয় চ'ড়ে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে পড়ল।

লীলার বাড়ির লোকেরা প্রথমে মনে করেছিল যে, স্নান করতে গিয়ে সে স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তার মা ভাই-বোনেরা সকলে তার জন্যে কাঁদতে আরম্ভ করলে। লীলার বাবা পার্বতীচরণ জেলে ডেকে সমস্ত দিন জাল ফেলে তার দেহ খুঁজে বেড়ালেন। সন্ধ্যের পর হতাশ হয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরলেন তখন পরিজনদের কান্না থেমে গিয়েছে। পার্বতীচরণ মনে করলেন, হয়তো লীলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটু পরেই তাঁর স্ত্রী অভয়াকালী তাঁকে সংবাদ দিলেন, লীলা যে সমুদ্রে ডুবেছে, সমাজের কোন জাল দিয়েই তাকে আর তোলা যাবে না।

পার্বতী তাঁর তিন ছেলে, ছোট মেয়ে সুরবালা ও স্ত্রীকে ব'লে দিলেন, লীলার নাম এ বাড়িতে যেন আর কেউ মুখে না আনে।

দিন যায়। ভাই বোনেরা একে একে সকলেই তাদের দিদিকে ভুলতে লাগল। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে নিশীথরাত্রে বিপথগামিনী তনয়ার কুশল কামনায়, জননী অভয়াকালীর চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু নীরবে গড়িয়ে পড়ত।

রমেশ যে লীলাকে ভালবাসত না, তা নয়। সেও লীলার সঙ্গে বাড়িঘর ছেড়ে এসে এইখানে তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করছিল। লীলার মত সেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে। লীলাকে নিয়ে প্রথমে কিছুকাল বেশ সুখেই তার দিন কেটেছিল, কিন্তু তার অর্থ ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট আরম্ভ হ'ল। দারিদ্র্য জীবনের সমস্ত মাধুর্য নষ্ট করে। তাদের দুজনের সম্বন্ধকে লালসা, প্রেম অথবা যে কোন আখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, এতদিন সে সম্বন্ধে কোন আঘাতই লাগে নি, সুখেই তারা দিন কাটাচ্ছিল; কিন্তু দারিদ্র্য এসে তাদের জীবন থেকে মাধুর্যের সেই আবরণটুকু তুলে নিলে। তখন প্রতি কথায় তাদের মধ্যে ঝগড়া, রাগ, অভিমান ও কথাবন্ধ শুরু হ'ল।

এই রকম ক'রে দিন কাটছিল। এমন সময় একদিন রমেশ লীলার হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা এনে দিয়ে বললে, এই টাকাগুলো রাখ। আমি দিন সাতেকের জন্যে রাণীগঞ্জে যাচ্ছি চাকরির চেষ্টায়। চাকরিটা পেলেই তোমায় নিয়ে যাব।

অন্য সময় হ'লে লীলা রমেশকে কোথাও যেতে দিত না। কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে তখন সে জর্জরিত; চাকরি না করলেই নয়, তাই সে আগ্রহের সঙ্গে রমেশকে পাঠিয়ে দিলে।

মাস দুয়েক আর রমেশের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। লীলা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপরে একদিন রমেশের কাছ থেকে চিঠি এল। রমেশ লিখেছে, রাণীগঞ্জে সে চাকরি পায় নি। সেখানে তার একজন আত্মীয় তাকে ধ'রে একেবারে দেশে নিয়ে চ'লে এসেছে। কলকাতায় সে যে আর কখনও যেতে পারবে, এমন ভরসা নেই।

রমেশের এই চিঠি প'ড়ে লীলা চোখে অন্ধকার দেখলে। পুরুষের এই হীনতার কথা সে ইতিপূর্বে অনেকের মুখে শুনেছে, উপন্যাসেও পড়েছে ; কিন্তু তার নিজের জীবনে এমন ক'রে তা উপলব্ধি করতে হবে, তা যে সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

লীলা ভাবতে আরম্ভ করলে, কি করবে সে ? কেমন ক'রে সে জীবিকা অর্জন করবে ? তাদের বাড়ির অন্যান্য অধিবাসিনীদের মতন হীন বৃত্তি অবলম্বন করতে সে তো কিছুতেই পারবে না। তবে সে কি করবে ?

এমনই ক'রে ভয়ে ভাবনায় অনাহারে অর্ধাহারে তার দিন কাটতে লাগল। পঞ্চাশটি টাকা কয়েক মাস বাড়িভাড়া আর ঝিয়ের মাইনে দিতেই খরচ হয়ে গেল। শেষকালে না খেয়ে খেয়ে সে শয্যা নিলে।

আজ তিন দিন জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। ক্ষিদের জ্বালায় দু দিন সে পচা ভাত গিলেছে, কিন্তু কাল থেকে তার পেটে কিছুই পড়ে নি। বাড়ির অন্য মেয়েরা তার ঘরে ঢুকত না। প্রথমে যখন লীলা এ বাড়িতে আসে, তখন তাদের মধ্যে দু-চারজন তার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, কিন্তু তার হাবভাব দেখে তারা সেই যে চ'লে গিয়েছিল, আর তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

জ্বরে লীলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। একবার একটু জ্ঞান হওয়ায় তার মনে হ'ল, কে যেন তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেই তার মনে হ'ল, তবে কি সে ফিরে এল ? এ নিশ্চয় সেই, তা না হ'লে এত আদর ক'রে কে তার কপালে হাত বুলিয়ে দেবে ?

প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে একবার সে চোখ খুলে ওপরের দিকে চেয়ে দেখলে, তার পাশের ঘরের নলিনী মাথার কাছে ব'সে রয়েছে। তাকে চোখ চাইতে দেখে নলিনী বললে, লীলা, একটু হাঁ কর তো ভাই।

লীলার তখন আর চিন্তা করবার শক্তি ছিল না। সে হাঁ করতেই নলিনী তার গলায় একটা ছোট্ট গেলাসে ক'রে খানিকটা ওষুধ ঢেলে দিলে। ওষুধটুকু গিলে ফেলে লীলা আবার আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়ল। নলিনী তার মাথার জলপটি দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

লীলার যে এই অবস্থা হয়েছে, তা সেই বাড়ির কেউ জানত না। একেই সে কারুর সঙ্গে মিশত না, তারপরে রমেশের সেই চিঠি পাওয়া অবধি সে ঘর থেকে বার হওয়াই এক রকম বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

নলিনী কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিল যে, রমেশ আর লীলার ঘরে আসছে না। লীলা যে রমেশের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, এ কথা তারা

সকলেই জানত। রমেশ আসছে না দেখে সে ব্যাপার অনেকটা বুঝে নিয়েছিল। এরকম সে অনেকবার দেখেছে। তার নিজের জীবনেও এমনই একটা ঘটনা চিরদিনের দাগার মত আঁকা আছে। লীলার প্রতি সহানুভূতিতে তখুনি তার মনটা কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল, কিন্তু তবুও সে সাহস ক'রে তার কাছে যেতে পারে নি। একদিন নলিনীর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে লীলা তাকে অপমান ক'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর সে আর তার ঘরে ঢোকে নি।

লীলাদের বাড়ির একজন ঝি সকালবেলা সকলের বাজার ক'রে দিয়ে যেত। তারই মুখে নলিনী লীলার অসুখের কথা শুনে তার কাছে এসে দেখে যে, সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। নলিনী তখন থেকেই তার শুশ্রূষা আরম্ভ ক'রে দিলে। তার কাছে তখন যে লোকটা আসত, সে ডাক্তার। নলিনী তখুনি তাকে ডেকে এনে লীলার চিকিৎসা আরম্ভ ক'রে দিলে।

প্রায় পনরো দিন অক্লান্ত চেষ্টা ক'রে নলিনী লীলাকে সারিয়ে তুললে। এবার কিন্তু লীলা আর নলিনীকে তার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না। তার সহস্র রূঢ় ব্যবহারের প্রতিদানে নলিনী যা দিয়েছে, সেজন্যে তার প্রতি শ্রদ্ধায় লীলার মনটা নুয়ে পড়ল। সে তার জীবনের সমস্ত কথা নলিনীর কাছে খুলে ব'লে ভবিষ্যতের পথে চলবার জন্যে হাতখানি তার হাতে তুলে দিলে।

সমাজের সমস্ত রাস্তাই তখন লীলার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তার চোখের সামনে সে যে পথ দেখতে পেলে, সেই পথেই ঢুকে পড়ল। এতদিন যে সৌধশিখরে ব'সে অবজ্ঞায় এদের দিকে সে দৃকপাতও করত না, অকস্মাৎ আকাশের প্রাসাদের মতন তার সেই সৌধ মনেই মিলিয়ে গেল। লীলা মনে প্রাণে অনুভব করলে, যাদের সে এতদিন ঘৃণা করেছে, সে তাদেরই একজন।

লীলার নূতন জীবন আরম্ভ হ'ল। নিত্য সন্ধ্যায় হাসি, গান, ফুর্তি ও আমোদের লহরী ছুটল। প্রতিদিন নূতন প্রণয়ীর আগমন। চেনা নেই, শোনা নেই যার সঙ্গে কখনও চোখের দেখা পর্যন্ত নেই, তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয়। যে আসে, তারই মুখে সেই একই কথা—তোমায় ভালবাসি। প্রতিদানস্বরূপ তাকেও বলতে হয়—তোমায় ভালবাসি। না বললে ব্যবসা চলে না। এই অভিনয়ের জন্যেই সে পয়সা নিয়েছে। সমস্ত রাত্রি মদ আর মাতালের হুল্লোড়, তারপর সকালবেলা মস্তিষ্কের অবসাদ আর আত্মার অনুতাপ।

লীলার মাঝে মাঝে মনে হ'ত, এ জীবন থেকে কোনও রকমে যদি মুক্তি পেতুম! মাঝে মাঝে সে স্বপ্ন দেখত, এই ঘৃণিত জীবনযাত্রা পরিত্যাগ ক'রে আবার সে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। আর সে কখনও বাড়ি ছেড়ে বেরুবে না। শত সহস্র রমেশ পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেও সেদিকে সে ফিরেও চাইবে না। সুখের আতিশয্যে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখত, তার পঙ্কিল বিছানায় প'ড়ে আছে। তার মনে হ'ত, হায় রে দুরাশা! সমস্ত জীবনের বিনিময়ে দু দিন—দুটি দিনের জন্যে যদি সে তার বাবা-মা ভাই-বোনদের স্নেহনীড়ে ফিরে যেতে পারত!

বছর তিন-চার এমনই ক'রে কাটল। অত্যাচারে লীলার অনভ্যস্ত শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগল। নানা রকমের রোগ এসে তার দেহকে আশ্রয় করলে। শেষকালে একদিন সে শয্যা নিলে।

এক মাস দু মাস তিন মাস কেটে গেল, লীলার রোগ আর সারে না। দু দিন ভাল থাকে তো চার দিন অসুখে পড়ে। অসুখের জন্যে তার ঘরে লোক আসাও ক'মে যেতে লাগল। একদিন শরীরটা একটু ভাল থাকলে সে তার রোগজীর্ণ দেহটাকে কোন রকমে চকচকে ক'রে নিয়ে নূতন গ্রাহকের প্রতীক্ষায় বারান্দায় গিয়ে বসত। তার সেই গলিত দেহখানারও জন্যে খদ্দেরের অভাব কোন দিনই হ'ত না। ভগ্নদেহ নিয়ে সারারাত্রি তাদের সঙ্গে হুল্লোড় ক'রে আবার সে শয্যা নিত।

অনেক কাল রোজগার বন্ধ থাকায় লীলার হাতে যা কিছু অর্থ ছিল, তা সবই ফুরিয়ে গেল। নলিনী তাকে দিন কতক সাহায্য করলে। কিন্তু সে বা আর কতদিন তার খরচ যোগাবে! সে তার বাবুকে ব'লে লীলাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে।

লীলা হাসপাতালে গেল। সেখানে হরেক রকমের রুগী আসে, তাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারা সাত আট দশ দিন থাকে, রোগ সেরে গেলে আবার চ'লে যায়। কিন্তু লীলার অসুখ আর সারে না। ক্রমেই সে নিজের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। সেখানে একলাটি শুয়ে শুয়ে তার কত কথাই মনে হ'ত! সে ভাবত, আর যদি না বাঁচি তো বেশ হয়। সংসারের ভারস্বরূপ হয়ে এই রোগজীর্ণ দেহ বহন ক'রে আর তো চলতে পারি না। বেঁচে থাকলে হয়তো আরও কত রকমের দুর্দশায় পড়তে হবে। তার চেয়ে এইখানেই যদি জীবনের বোঝা নামিয়ে দিতে পারি। কখনও বা আশা-কুহকিনী তার কানে ভবিষ্যতের আর একটু সুখময় জীবনের গান শুনিয়ে যায়, সে সর্বান্তঃকরণে বেঁচে ওঠবার জন্যে প্রার্থনা করে।

হাসপাতালে প্রায় তিন মাস কেটে গেল, কিন্তু লীলার অসুখ কিছুতেই সারল না। একদিন তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, তার যক্ষ্মা হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া করলে অসুখ সারতে পারে। হাসপাতালে থেকে আর কোনও লাভ নেই।

সকালবেলা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে লীলা বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরের লোকজন গাড়িঘোড়া ও কোলাহল কানে যেতেই তার মনে হ'ল, এতদিন সে যেন খাঁচায় বন্ধ ছিল। মুক্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হাসপাতালের দেওয়াল ধ'রে রাস্তার লোক-চলাচল দেখতে লাগল।

কয়েক মিনিটের জন্যে লীলা তার নিজের অস্তিত্বের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, হাসপাতাল থেকে তার ছুটি হয়ে গেছে, এখান থেকে চ'লে যেতে হবে।

কোথায় যাবে সে? কোথায় তার আশ্রয় আছে? পৃথিবীতে এমন কোন স্থান আছে, যেখানে জীবনের এই গোনাগুনতি দিন কটা সে শান্তিতে কাটাতে

পারে? একবার তার বাড়ির কথা মনে হ'ল। সেখানে কি তার আশ্রয় মিলবে না? দুর্বল মস্তিষ্কে সে আর ভাবতে পারছিল না। ধীরে ধীরে সে তার কলকাতার বাসার দিকে পা চালিয়ে দিলে।

নলিনী মধ্যে মধ্যে কখনওবা নিজে গিয়ে কখনওবা তার বাবুকে দিয়ে লীলার সংবাদ নিত। লীলা যে আর বেশি দিন বাঁচবে না, সে সংবাদ সে পেয়েছিল। সেদিন সকালবেলা একেবারে লীলাকে সামনে দেখে সে চমকে উঠল। এতখানি পথ হেঁটে তার ওপরে তেতলা অবধি সিঁড়ি ভেঙে লীলা হাঁপাচ্ছিল, নলিনী তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে বসিয়ে বললে, আগে একটু খবর দিতে হয়, আমি নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতুম। লীলা বললে, কাল রাতে তারা বললে, আমায় চ'লে যেতে হবে, আর আজ সকালে বিদায় করলে। খবর দিই কি ক'রে?

নলিনীর ঘরে সেদিন নানা রকমের খাবারের আয়োজন হচ্ছিল। লীলা জিজ্ঞাসু নয়নে তার দিকে চাইতেই নলিনী বললে, আজ যে বিজয়া, বন্ধুবান্ধব আসবে, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে তো ছাড়তে পারি না।

একটু থেমে নলিনী আবার বললে, আজকের দিনে এসে বড় ভাল করেছিস।

লীলা বললে, কিন্তু ভাই, আমার তো খাওয়া হবে না। আমি যে এখুনি চ'লে যাব।

নলিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবি? বাড়িতে?

নলিনী অবাক হয়ে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে আর কোন প্রশ্ন বেরুল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর লীলা বললে, নলিনী, ভাই, তুই আমার অনেক উপকার করেছিস। আর-জন্মে নিশ্চয় তুই আমার মায়ের পেটের বোন ছিলি। আমায় দুটো টাকা ভিক্ষে দে। জানিস তো আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।

লীলার কথা শুনে নলিনীর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল। সে কথা না ব'লে কিছুক্ষণ লীলার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থেকে, উঠে গিয়ে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিয়ে বললে, এই নে।

লীলা বললে, এত টাকা কেন দিচ্ছিস ভাই?

নলিনী বললে, আসবার ভাড়াটাও রেখে দে। কি জানি, যদি দরকার হয়!

বেলা এগারোটার সময় নলিনীর চাকর এসে লীলাকে রেলগাড়ির একটা কামরায় বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

লীলা যখন তাদের স্টেশনে এসে নামল, তখন শরতের বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে। স্টেশন থেকে তাদের বাড়ি প্রায় দু মাইল দূরে। বাড়ি পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠবে, পথ চলতে কষ্ট হবে, মনের মধ্যে এই সব চিন্তা হওয়া সত্ত্বেও সে স্টেশনের বাইরে বেরুতে পারছিল না। তার ভয় হচ্ছিল, যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে!

অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সে সেই জনবিরল স্টেশনের একটি কোণে বসে রইল। তারপর সেখান থেকে উঠে মুখখানা বেশ ক'রে কাপড়ে ঢেকে বাড়ির

দিকে পা চালিয়ে দিলে। একে পথ অন্ধকার, তার ওপরে বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল অনেকদিন গ্রামপথে চলা অভ্যেস না থাকায় পদে পদে তার পা পিছলে যেতে লাগল। সন্ধ্যের সময় রোজ রোজ তার জ্বর আসত, জ্বরে তার মাথা টিপটিপ করছিল, পদে পদে পা আটকে যেতে লাগল, তবুও মনের জোরে সে অগ্রসর হতে লাগল। পথের মাঝে একদল ছেলে সিঁথি খেয়ে জটলা করছিল। লীলা তাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতেই একজন ঠাট্টা ক'রে তাকে কি বললে। সেই অন্ধকারেও লীলা মুখ দেখে তাকে চিনতে পারলে। তাদেরই পাড়ার ছেলে সে। লীলা যখন বাড়ি থেকে চ'লে যায় সে তখন শিশু ছিল।

লীলার এসব কথা ভাববার অবসর ছিল না। তার মাথার মধ্যে তখন অন্য রকম ভাবনার ঝড় বইছিল। হঠাৎ চৌধুরী বাড়ির ঠাকুর বিসর্জনের বাজনা তার কানে এসে লাগল। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সে এগিয়ে চলল।

আর একটু গেলেই লীলাদের বাড়ি, এ মোড়টা ঘুরলেই হয়। লীলার বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ধড়ফড়ানি শুরু হ'ল। সদর দরজা দিয়ে তার ঢোকা হবে না। সে বেড়া গ'লে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপরে পা টিপে টিপে খিড়কির পুকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তার চারিদিকটা ভাল ক'রে দেখে কম্পিতচরণে তার মার শোবার ঘরের জানলার নীচে এসে হাঁপাতে লাগল।

বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কেউ নেই। সকলেই প্রতিমা বিসর্জন দেখতে গিয়েছে। লীলা দেখতে পেলে, তাদের ঠাকুরঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে, ভেতরে আলো জ্বলছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে লীলা ভাবছিল, এমন সময় কার গলার আওয়াজ পেয়ে ছুটে সে ঠাকুরঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না, শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছিল। লীলা গলবস্ত্র হয়ে তাদের গৃহদেবতাকে প্রণাম ক'রে সেইখানে ব'সে রইল।

কতক্ষণ সেই ভাবে ব'সে আছে, তার কোন জ্ঞানই লীলার ছিল না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনে তার চমক ভাঙল। বিগ্রহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখলে, তার মা একখানা রেকাবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রেকাবিখানা মাটিতে রেখে বিস্ময়াবিষ্ট অভয়াকালী জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

লীলার মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। একবার দুবার ঢোক গিলে সে শুধু বললে, মা!

অভয়াকালী এগিয়ে এসে একবার ভাল ক'রে তার মুখখানা দেখে নিয়ে বললেন, কে লীলা?

লীলা বললে, হ্যাঁ মা, আমি এসেছি তোমার কাছে থাকব ব'লে। আমায় তাড়িয়ে দিও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা।

দেখতে দেখতে মায়ের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এতদিন কোথায় ছিলি?

কলকাতায়।

তবে যা শুনেছি, সব সত্যি ?

লীলা এ কথার কোন জবাব দিলে না। সে শুধু কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমায় তাড়িয়ে দিও না মা।

অভয়কালী বললেন, সে কি ক'রে হবে ? তোমার জন্যে আমরা কোথাও মুখ দেখাতে পারি না। সুরবালার তেরো বছর বয়স হ'ল, এখনও তার বিয়ে হচ্ছে না। আমি যদি তোমায় রাখি, তা হ'লে তোমার বাবা আমাকে আর তোমাকে দুজনকেই খুন ক'রে ফেলবে।

লীলা বললে, কিন্তু মা, আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না। ডাক্তার ব'লে দিয়েছে, বড় জোর আর ছমাস বাঁচব। এই কটা দিন তোমার কাছে থাকি মা।

এই ব'লে লীলা দুহাত দিয়ে তার মার পা জড়িয়ে ধরলে। অভয়াকালী এতক্ষণ স্থির ছিলেন, কিন্তু আর তাঁর চোখের জল শাসন মানলে না। এতদিন তিনি কতবার মেয়ের মৃত্যুকামনা করেছেন ; আজ ভগবান তাঁর সেই কামনা সফল করতে উদ্যত দেখে বেদনায় তাঁর বুক উথলে উঠল। তাঁর ইচ্ছে করছিল, ডাক ছেড়ে চীৎকার ক'রে হৃদয়ের বোঝা কতকটা লাঘব করেন, কিন্তু চীৎকার করবার জো নেই।

তিনি স্নেহে লীলার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

বাইরে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, কই গো, তোমরা কোথায় গেলে সব ?

অভয়াকালী তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এসে ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলেন। একটু পরে বললেন, তোর বাবা।

লীলা ভয়ে তার মার কোলের কাছটিতে ঘেঁষে বসল।

অভয়কালী তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, তোর গাটা যে বড় গরম মা !

লীলা বললে, রোজ জ্বর হয়, জ্বর আর ছাড়ে না মা।

অভয়াকালীর চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে অশ্রু লীলার সর্বাঙ্গে ঝ'রে পড়তে লাগল। তিনি ফিসফিস ক'রে মেয়েকে বললেন, তুই যা মা। যেখানে ছিলি সেখানে থেকে আমায় চিঠি লিখিস, আমি তোকে টাকা পাঠিয়ে দোব।

লীলা আবার বললে, কিন্তু মরবার সময়ে যে তোমাকে দেখতে পাব না মা !

অভয়াকালী আর সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর বুকের মধ্যে এতক্ষণ ধ'রে পুঞ্জে পুঞ্জে যে আবেগ জমা হয়ে উঠছিল, কোন দিক দিয়ে তাকে মুক্তি দিতে না পারায় তাঁর শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। একবার তিনি লীলাকে জড়িয়ে ধ'রে তার মাথায় চুমু খেলেন। লীলা মনে করলে, এবার বোধ হয় মার মনে দয়া হয়েছে। কিন্তু তখনই তিনি কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছিত হয়ে মেঝের ওপরে প'ড়ে গেলেন।

লীলা অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে থেকে একবার ডাকলে, মা !

মূর্ছিতা মাতার কানে মেয়ের সে আকুল আহ্বান পৌঁছল না। লীলা তাঁকে নাড়া দিয়ে আবার ডাকলে, মা !

এবারও কোন সাড়া নেই।

বাইরে পার্বতীচরণ হাঁক দিলেন, গিন্নী কোথায় গেলে গো, এদের যে মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

লীলা তার মার দেহখানা আঁকড়ে ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ সেই ভাবে ব'সে থেকে লীলা আবার ডাক দিলে, মা!

এবারেও কোন সাড়া নেই।

লীলা মূর্ছিতা মায়ের পায়ে মাথাটা একবার লুটিয়ে দিয়ে উঠে হাতড়ে হাতড়ে এসে দরজাটা খুলে ফেললে। তারপর ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাত্রির অন্ধকারের অন্তরালে মিলিয়ে গেল।

মতিলাল

পাঠক! একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করুন। কল্পনানেত্রে দেখুন আজিকার এই প্রাসাদ-কণ্টকিত কলকাতা শহরের বুকে প্রায় সদররাস্তার ওপরেই একখানা খোলা মাঠ। মাঠখানা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। চারপাশে গোটাকয়েক বড় বড় বাড়ি তাকে যেন ধনীদের শ্যেনচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছে। রাস্তা থেকে বোঝাই যায় না যে, এখানে এত বড় একটা মাঠ একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে। মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে চাইলে মনে হবে, বড় বড় বাড়ির মাঠমুখো জানলাগুলো যেন অবাক হয়ে এই খোলা জায়গাটুকুর শ্যামল সৌভাগ্যের দিকে চেয়ে আছে।

এই ময়দানটি ছিল আমাদের ছেলেবেলার লীলাভূমি। আমরা প্রায় গুটি-কুড়ক ছেলে প্রতিদিন এখানে খেলতে আসতুম—শহরের নানা দিক থেকে।

মাঠের এক দিকে প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতন একখানা বাড়ি। এই বাড়ির একটি ছেলে ছিল আমাদের বন্ধু। তাদেরই ছিল এই মাঠ। একদিন বিকেলে, আমরা তখন খেলায় উন্মত্ত, এমন সময় বাড়ির মধ্যে কান্নার রোল উঠল। আমরা খেলা ফেলে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম। বন্ধু বললে, দেনার দায়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি আটকা পড়েছে। তার পরে প্রতিদিন পাওনাদারেরা এসে ঝাড়, লণ্ঠন, খাট, পালং বের ক'রে নিয়ে যেতে লাগল। সবার শেষে একদিন তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেল পশ্চিমের কোন এক শহরে। কিন্তু যাক, সে আর এক কথা।

হাইকোর্টে মামলা চলতে লাগল বছরের পর বছর ধ'রে, আর আমরা একদল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে সেই বিরাট প্রাসাদ ও তারই সংলগ্ন এই মাঠখানা নিরুপদ্রবে ভোগ কত্তে লাগলুম।

বিকেলে স্কুলের ছুটির পর মাঠে ফুটবল খেলা শুরু হ'ত। আমাদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একদল ছিল খেলোয়াড়, আর একদল ছিল গাইয়ে-বাজিয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ের দল খেলার সময় এক দিককার গোল-পোস্টের কাছে ব'সে থাকত। খেলা শেষ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে একজন বলটিকে কোলে নিয়ে বাজাতে বসত আর গান শুরু হ'ত। খেলোয়াড়ের দল তখন গাইয়ে বাজিয়েদের ঘিরে গোল হয়ে বসত। দু দলই ছিল দু দলের গুণের কদরদান আর দু দলের মধ্যে যোগসূত্র ছিল পাঁচ নম্বরের একটি ফুটবল, যেটি ছিঁড়ে গেলে কিংবা যার ভেতরকার হাওয়া ক'মে গেলে দু দলেরই ফুর্তি হ'ত একদম মাটি।

মতিলাল ছিল শেষের দলের অর্থাৎ গাইয়ে-বাজিয়ে দলের লোক। কিন্তু মাঠের সভার রীতিমত সভ্য হয়েও আমাদের ধরন-ধারণের সঙ্গে তার চাল-চলনের ঠিক মিল ছিল না। তার কথাবার্তা, হালচাল সব কিছুর মধ্যেই পাকা সংসারীর একটা ছাপ ফুটে উঠত। সে ছিল, যাকে সোজা কথায় বলে, কাজের লোক। আমরা ছিলুম লেখাপড়ায় একেবারে সেরা ছেলে। প্রত্যেক পরীক্ষায় কে কত নীচে থাকতে পারে, আমাদের মধ্যে প্রতি বৎসর তারই প্রতিযোগিতা চলত। ছুটি জিনিসটাকে বরাবর আমরা ছুটি ব'লেই মান্য করতুম। কিন্তু মতিলাল ছিল ঠিক তার উল্টো। লেখাপড়ায় সে ভাল ছেলে না হ'লেও ভাল হবার চেষ্টা সে করত। একমাত্র সরস্বতীপুজোর দিন ছাড়া বছরের প্রতিদিন নিয়ম ক'রে রুটিন-মত সে পড়াশোনা করত। ইংরেজী শেখবার প্রতি তার ছিল অসাধারণ ঝোঁক। তার বাবা ও ঠাকুরদাদা দুজনেই ছিলেন ডেপুটি। সে বলত যে, তার জন্যেও হাকিমের চেয়ার খালি প'ড়ে রয়েছে, বি. এ. পাস ক'রে এখন গুটিগুটি সেখানে গিয়ে বসতে পারলে হয়।

মতিলাল মাঠে আসত একেবারে সন্ধ্যে ঘেঁষে। স্কুলের ছুটির পর প্রত্যহ সে গড়ের মাঠের দিকে যেত। প্রতিদিন নিয়ম ক'রে এই বায়ুসেবন করতে যাবার স্পৃহা যে বায়ুরোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ, এ কথা উল্লেখ করলে মতিলাল বলত, গড়ের মাঠের দিকে কি হাওয়া খেতে যাই রে! ওদিকে মেম-সাহেবদের পেছুপেছু ঘুরলে অনেক ভাল ভাল Idioms and Phrases শিখতে পারা যায়।

সাহেব-মেমরা যে কি অযাচিতভাবে মুক্তকণ্ঠে Idioms ও Phrases ছড়াতে ছড়াতে পথে বিচরণ করে, মধ্যে মধ্যে মতিলালের মুখে তারই দু-একটা উদাহরণ শুনে আমাদের মনে হ'ত, ইংরেজী ভাষাটা আমাদের আর শেখা হ'ল না। কারণ তা শিখতে যা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তা একমাত্র মতিলালেরই আছে এবং তার জন্যে অনুপ্রেরণা আসছে ভবিষ্যতের সেই হাকিমী-পদ থেকে, যে অনুপ্রেরণা আমাদের মধ্যে কারুরই ছিল না।

মতিলালের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পিতা ও পিতামহের সঙ্গে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জেলায় জেলায় ছেলেবেলা থেকে ঘুরে তার পূর্বত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে খ'সে গিয়েছিল। কথাবার্তা বলত সে পরিষ্কার, আর তার কণ্ঠটি ছিল মন মাতানো। তা ছাড়া গানের সংগ্রহও ছিল তার বিস্তর। সেসব গান তখনও কারুর মুখে শুনতে পেতুম না, এখনও পাই না।

পাঠক, দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করুন। মাঠের আর এক কোণে কতকগুলো ভাঙা ঘর। এক সময়ে বোধ হয় সেখানে গোয়াল ছিল। এখানটায় রীতিমত জঙ্গল। মানুষ-ভর উঁচু উঁচু বুনো কচুগাছ হঠাৎ-বড়লোকের মত অত্যন্ত কদর্যভাবে নিজেদের সমারোহ জাহির করতে ব্যস্ত। এদের মাঝে পাঁচ ছটা উঁচু নারকোলগাছ মাথার ওপরে চিরশ্যাম ডালি নিয়ে দিনরাত তাদের ঝর্ঝর রাগিণীতে বোধ হয় সেই বাড়িরই পুরনো গাথা গেয়ে যেত।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পরে এই জঙ্গলটার ঠিক পেছন দিকে চাঁদ উঁকি দিত। জঙ্গলের পরেই ছিল একখানা বাড়ি। এই বাড়ির একটা আলসে-বিহীন খোলা ছাত মাঠের দিকে বার করা ছিল। যেন দেওয়ালের কঠোর আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বাড়িরই খানিকটা মাঠের দিকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

নারকোলগাছগুলোর পেছন থেকে চাঁদ উঁকি দেওয়ার কিছু পরেই সেই খোলা ছাতে এসে দাঁড়াত একখানি চাঁদমুখ। এরা ছিল যেন দুই সখী। চাঁদের সাড়া পেলে চাঁদমুখ আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারত না।

সে ছিল তরুণী। উজ্জ্বল গৌর ছিল তার দেহের বর্ণ। কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে সে আকুলভাবে মাঠের দিকে চাইত। মাঠের মধ্যে কি যে ছিল তার ধ্যানের বস্তু, কে যে তার কামনার ধন, তা আমরা কেউ জানতুম না। জানবার চেষ্টাও কোন দিন করি নি। অনেকক্ষণ সেই ভাবে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে আবার সে ঘরে ফিরে যেত।

যেদিন এই ব্যাপার হ'ত, সেদিন আর আমাদের গান মোটেই জমত না। তরুণী ছাতের ধারে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের হাতে ফুটবলের ওপর তবলার বোল তার অজ্ঞাতেই থেমে যেত। মতিলালের কণ্ঠ ধীরে ধীরে কখন যে বাতাসে মিলিয়ে যেত, তা আমরা বুঝতেই পারতুম না। আমরা অনিমেষ নয়নে সেই তরুণীর দিকে চেয়ে থাকতুম। তারপরে ধীরে ধীরে যখন তার মূর্তি ছাতের এক কোণে মিলিয়ে যেত, তখন আমাদের মনের পটে ফুটে উঠত এক-একটি ভাবমূর্তি, আর উঠত ছোট্ট সেই সভাতলে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। এর পরে কথা কি গান কিছুই জমবে না বুঝেই আমরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা হতুম।

কৈশোরের কল্পনা-সাগরে আমাদের জীবন তরণী যখন এই ভাবে টলমল করছে, তখন চাঁদ এসে ধরলে তার হাল, আর লক্ষ্য হ'ল চাঁদমুখ। চাঁদের সঙ্গে তার সঙ্গিনীর দলও এল। চিত্রা আসতে লাগল তার বিচিত্র রূপ ধ'রে, শ্রবণা এল নৃত্যের তালে দ্যুলোকে ভূলোকে মাদল বাজিয়ে, ভদ্রা তার বিরহের গাথা অশ্রুধারে ঢেলে দিতে লাগল। স্বাতী ও অনুরাধা খেলতে লাগল লুকোচুরি, আর সবার শেষে ফল্গু যেত হৃদয়-দোলায় দোল দিয়ে। এদের পাল্লায় প'ড়ে কোথায় গেল পড়াশোনা আর কোথায় গেল কি! বাইরের সংসারটা হয়ে পড়ল একটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও অবাস্তব জিনিস। নিজের মনের মধ্যে একটা বিরাট কল্পনার রাজ্য তৈরী ক'রে তারই সিংহাসনে মশগুল হয়ে ব'সে রইলুম। আমাদের হালচাল দেখে প্রতিবেশীদের রসনা হয়ে উঠল সংবাদপত্রের চাইতেও

তীক্ষ্ণ, আর অভিভাবকদের নির্যাতন করবার শক্তি দেখে জেলের কর্তৃপক্ষও হ'ত লজ্জিত। কিন্তু আমাদের সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমরাও বলতুম, হে ভগবান, এরা যে কি করছে, তা এরা বুঝতে পারছে না, তুমি এদের মার্জনা ক'রো।

একদিন—সেদিন এই চাঁদ আর ছাতের কোণের সেই চাঁদমুখ অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঝড় তুলে সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। এমন সময় নির্মল বললে যে, একটি মেয়েকে সে ভালবাসে। মেয়েটির বাড়ি তার মামার বাড়ির পাশেই। মামাদের সঙ্গে তাদের খুব ভাব। সেইখানেই সেই কিশোরীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু পরিচয় এখন দু পক্ষ থেকেই গভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ মেয়েটির নাকি কোন্ এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নির্মলের এই কাহিনীটি যে ডাহা মিথ্যে কথা, তা বুঝতে আমাদের কারুরই বাকি রইল না, কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই তার একটি প্রতিবাদ বেরুল না কারণ ঘটনাটি মিথ্যা হ'লেও সেই ইতিহাসের মধ্যে এমন একটা শাশ্বত সত্য ছিল, যা সমস্ত অসত্যকে ছাপিয়ে একটি অখণ্ড সত্যের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'ল।

নির্মলের কাহিনী শেষ হতে না হতে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসগুলো পড়বার আগেই সত্যকুমার তার নিজের জীবনের একটা প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করলে। সত্যর পর বিমল, এমনই ক'রে আবহাওয়াটা এমনই সংক্রামক হয়ে উঠল যে, আমিও কল্পনা থেকে নিজের জীবনের অমনই একটা কাহিনী তৈরি ক'রে ব'লে দিলুম।

সকলেই নিজের নিজের কাহিনী বললে বটে, কিন্তু মতিলাল কেবল দীর্ঘনিশ্বাসই ফেললে, বললে না কিছুই। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আমাদের মনে হ'ল যে, তারও নিশ্চয়ই একটা প্রেম-কাহিনী আছে। শুধু আছে নয়, তার মূলে কিছু সত্য আছে ব'লেই সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না। আমরা তাকে চেপে ধরলুম, বলতেই হবে।

মতিলালও কিছুতেই বলবে না। আপত্তি তার যতই দৃঢ় হতে থাকে, আমাদের সন্দেহও ততই ঘনীভূত হয়। শেষকালে অনেক বলা-কওয়ার পর অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে প্রকাশ করলে যে, তাদের বাড়ির দোতলার ছাতের গায়েই আর একজনদের ছাত একেবারে লাগানো। এই বাড়িরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে। তাকে সে ভালবেসেছে, প্রতিদানও পেয়েছে। তাকে সে বিয়ে করবেই, এতে যা হয় হবে।

মতিলালের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু আমরা সকলেই মনে মনে স্বীকার করলুম যে, এর মধ্যে মিথ্যের আমেজ একটুকুও নেই। চাঁদ ও চাঁদমুখ মতিলালের মত ছেলের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে জেনে মনে হতে লাগল, যেন সে আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। মনে আছে, তার পরদিন থেকে সে পড়ের

মাঠে Idioms ও Phrases শিখতে যাওয়া বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি মাঠে আসতে আরম্ভ করলে। আর চাঁদমুখো চর্চা করবার জন্যে গানের পরে আরও আধ ঘণ্টা আড্ডার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

এই রকম কিছুদিন যায়। দিন কয়েক মতিলালের দেখা নেই। তার বাড়ি কেউ চেনে না, কাজেই খোঁজ পাবারও উপায় নেই। ইতিমধ্যে একদিন সে আমাদের কাছে খুব গোপনে প্রকাশ করেছিল যে, তাদের মিলনের পথে দু-একজন লোক বাধা দেবার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে রেখেছিল যে, তাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

মতিলালের অদর্শনে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তার সাংঘাতিক অসুখ, বুঝি এ যাত্রা আর বাঁচে না।

মতিলালের অসুখের খবরটা যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে এসে পেঁছিল, তা মনে নেই। খোঁজ পড়ল, তার বাড়ি কোথায়। কিন্তু কেউই তার বাড়ি চেনে না। ঠিক হ'ল, তার স্কুলে গিয়ে বাড়ির ঠিকানাটা জেনে আসা হবে। সে আবার পড়ত এক অদ্ভুত স্কুলে। স্কুলটির নাম ছিল—সর্বমঙ্গলা ইনস্টিটিউশন। তার বাবার একজন চেনালোক সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সেই সুবাদে মতিলালকে সেখানে ভর্তি হতে হয়েছিল। ইস্কুলটি ছিল নির্মলের বাড়ির কাছেই। নির্মল বললে যে, কাল সেখানে গিয়ে সে মতিলালের ঠিকানা জেনে আসবে।

পরদিন নির্মল মতিলালের ঠিকানা জেনে নিয়ে এল। আমরা জন চার-পাঁচ খেলা ফেলে মতিলালের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

গলির গলি তস্য গলি ঘুরে ঘুরে প্রায় সন্ধ্যের সময় আমরা তার বাড়ি আবিষ্কার করলুম।

হরি! হরি! এই বাড়িতে মতিলাল থাকে! সে একটা খোলার বাড়ি। পঞ্চাশ রকমের লোক হরদম বাড়ির মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। যাকেই মতিলালের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে, জানি না। নির্মল নিশ্চয় ভুল ঠিকানা এনেছে সাব্যস্ত ক'রে আমরা ফিরব ফিরব মনে করছি, এমন সময় একটি লোককে ওষুধের শিশি হাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করা গেল, হ্যাঁ মশায়, মতিলাল থাকে এই বাড়িতে?

সন্ধান পাওয়া গেল। এই বাসাতেই মতিলাল থাকে বটে। লোকটি আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কতকগুলো এঁদোপচা নর্দমা আঁস্তাকুড় পেরিয়ে একটা নীচু ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলাম। ঘরের এক কোণে খাটে একটা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় মতিলাল প'ড়ে আছে। খাটের কাছে দু-তিনজন লোক মাটিতে ব'সে গল্প করছে। এক কোণে পিলসুজের ওপরে প্রদীপ জ্বলছে। আমরা গিয়ে খাটের ওপরে বসতেই মতিলাল অদ্ভুত এক রকম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম, মতিলাল, কেমন আছিস ভাই?

মতিলাল চীৎকার ক'রে উঠল, হামারা সর্বাঙ্গমে বেশ করকে গঙ্গামৃত্তিকা আর তুলসীপাতা বাটকে লেপকে লেপকে দেও, জ্বল জাতা হ্যায়।

মতিলালের মুখে এই রকম হিন্দী কথা শুনে তো আমরা কজনেই হেসে ফেললুম। কিন্তু সে আবার তখুনি চেঁচিয়ে উঠল, কেয়া! হামারা দুর্দশা দেখতে তোম্‌লোক হাসতা হায়? নির্দয় কাঁহাকা—

হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখ অশ্রুতে ভ'রে উঠল। মতিলালের দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখে তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি নেই, চাহনি বেশ স্বাভাবিক। অতি ক্ষীণ স্বরে একবার সে ব'লে উঠল, Oh, how helpless!

কথাগুলো ব'লেই সে চোখ বুজে ফেললে।

রোগ কিংবা রোগী সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তবুও মনে হ'ল যে, মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সেখানে যে লোকগুলি ব'সে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, মতিলালের বাড়িতে অসুখের খবর দেওয়া হয়েছে কি?

তারা বললে, না, এখনও জানানো হয় নি, বিকারটা তো আজ দুপুর থেকে শুরু হ'ল কিনা।

তাদের কাছ থেকে মতিলালের বাপের ঠিকানা জেনে নিয়ে তখুনি তাঁকে 'তার' ক'রে দিলুম—'তার' পাওয়া মাত্র চ'লে আসবেন, মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম যে, মতিলালের এক দূরসম্পর্কের কাকা কলকাতায় থাকেন এবং মতিলাল তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে।

যা হোক, সেদিন 'তার' ক'রে রাত্রে বাড়ি ফেরা হ'ল। পরদিন বিকেলবেলা গিয়ে দেখি, মতিলালের বাবা এসে পড়েছেন, খুব ধুম ক'রে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের দেখে ভারি খুশি হলেন। আমাদের খেলার মাঠের কাছেই একখানা বাড়ি খালি ছিল। সেই বাড়িটা ঠিক ক'রে মতিলালকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তার মা ও অন্য ভাইবোনেরা দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়লেন। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় গিয়ে তাকে দেখে আসতে লাগলুম।

মতিলালের সে যাত্রা পরমায়ু ছিল। দেড় মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রে সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হ'তে লাগল। তার বাবা ফিরে গেলেন বিহারের সেই শহরে, কর্ম্মস্থলে। মা ও অন্য ভাইবোনেরা কলকাতাতেই র'য়ে গেলেন। ঠিক হ'ল যে, এবার থেকে তাঁরা কলকাতাতেই থাকবেন। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির সময় মতিলালেরা যাবে বাবার কাছে, আর পুজো ও বড়দিনের ছুটির সময় বাবা আসবেন তাদের কাছে।

মতিলাল সেরে উঠে আবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে। কিছুদিনের মধ্যেই আড্ডায় নিয়মিত হাজিরাও পড়তে লাগল। কিন্তু ছাতের কোণে সেই চাঁদমুখের উদয় হ'লেই সে আর বসত না, কোনও রকম ছুতো ক'রে পালিয়ে যেত। চাঁদমুখ দেখে স'রে পড়বার কারণটা আমাদের কাছে যতই সে ঘুরিয়ে বলুক না কেন, আমরা ঠিক বুঝতে পারতুম, চন্দ্রবদনের প্রতি তার আকস্মিক এই যে বিতৃষ্ণা, এর মূলে আছে দোতলার ছাতের সেই প্রেম-কাহিনী। আমরা

সভায় নিজেদের যে প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করেছিলুম, তার মধ্যে অন্তত বাড়ি-ঘরগুলো ছিল সত্যি, কিন্তু মতিলাল অতখানি গৌরচন্দ্রিকার পর এমন একটি গল্প ছাড়লে যে, তার মধ্যে সত্যের রেশটুকু পর্যন্ত নেই। খোলার বাড়ির দোতলার ছাতের কথা নিয়ে তার অসাক্ষাতে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে খুব হাসির ধুম প'ড়ে যেত। হয়তো মতিলালের কানে কোন সূত্রে কিছু পৌঁছেছিল। তাই সে ইদানীং চাঁদের সঙ্গে চাঁদমুখের উদয় দেখলেই পালিয়ে যেত।

কিন্তু একদিন সত্যিই বাঘ এল। মতিলালের বাবা বিহারের যে শহরে তখন হাকিমি করছিলেন, সেই শহরের একজন উকিল ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। উকিল বন্ধুটির দু-তিন পুরুষ ধ'রে এখানে বাস। তাঁর বাবা ও ঠাকুরদাদা সে অঞ্চলে বেশ বিষয়-আশয়ও ক'রে গিয়েছেন। তাঁদেরই একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মতিলালেরা সেখানে থাকত। বাড়ির পাশে বাড়ি হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল খুব। জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী কিছুদিন থেকে নানা রকম অসুখে ভুগছিলেন। সেখানকার ডাক্তার-কবিরাজেরা কিছু করতে না পারায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা চলছিল। জগবন্ধু মতিলালকে লিখলেন, একটা বাড়ি ভাড়া করবার কথা। বাড়ির জন্যে বেশি কষ্ট পেতে হ'ল না। তাদের বাড়ির পাশেই একখানা বাড়ি খালি ছিল। সেই বাড়িখানা জগবন্ধু-বাবুদের জন্যে ঠিক করা হ'ল।

জগবন্ধুবাবুর পরিবার খুব বড় নয়। তাঁর বৃদ্ধা মা পুত্রবধূর সঙ্গে এলেন, আর এল মুমূর্ষু মায়ের সেবার জন্যে কৃষ্ণা একাদশীর অস্তমান চন্দ্রের পাশে শুক্লা চতুর্দশীর পূর্ণশশীর মতন তাঁর একমাত্র বিধবা মেয়ে হিমানী।

জগবন্ধুবাবুর স্ত্রীকে মতিলাল মাসীমা ব'লে ডাকত। যেদিন তাঁরা এসে পৌঁছলেন, সেদিন থেকে মতিলালের আর বিশ্রাম নেই। এই ডাক্তারের বাড়ি ছোটা, এই ডাক্তারখানায় যাওয়া, ঝি-চাকরের ব্যবস্থা করা, বাজার করা, রোগীর সেবা করা, একাই সে একশো হয়ে উঠল।

আমরা তাদের বাড়িতে গেলে মতিলালের মা হিমানীর মার উদ্দেশ্যে বলতেন, গেল জন্মে মতিলাল বোধ হয় ওরই ছেলে ছিল। ছেলেটা এই সেদিন ব্যারাম থেকে উঠেছে, আবার না পড়লে বাঁচি।

মতিলালের সঙ্গে সঙ্গে হিমানীদের বাড়িতে আমাদের গতিও অবারিত হয়ে উঠল। হিমানীর বাবার অগাধ কাজ। তাই তিনি সব সময়ে রুগ্না স্ত্রীর কাছে থাকতে পারতেন না। দশ-পনরো দিন অন্তর শনিবার দেখে তিনি কলকাতায় আসতেন আর রবিবার সন্ধ্যের সময় ফিরে যেতেন।

মাস কয়েক ধ'রে ডাক্তার, কবিরাজ, অবধূত ক'রে কিছুতেই হিমানীর মার অসুখ সারল না। এতদিন তবুও তিনি উঠতে হাঁটতে পারছিলেন, কোথাকার এক দিগ্‌গজ কবিরাজ এসে দুটি তিনটি গুলির আঘাতে ভদ্রমহিলাকে একেবারে বিছানায় পেড়ে ফেললে।

আবার ডাক্তারি শুরু হ'ল। পঞ্চাশ রকমের ওষুধ, মালিশ—ঘণ্টায়

দু-তিন বার ক'রে। তার ওপরে পনরো মিনিট অন্তর জ্বরের তাপ দেখা ; খাতায় চৌকো ঘর কেটে তাতে জ্বরের নক্শা করা, ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ বেড়ে গেল চারগুণ। আমি আর নির্মল এসে হিমানী ও মতিলালকে সাহায্য করতে লাগলুম।

কিন্তু আমাদের সেবা ও ডাক্তারদের চিকিৎসা সমস্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হিমানীর মা স্থির মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। সকাল থেকেই রোগিণীর অবস্থা খারাপ। ঠিক হ'ল যে, আমি আর নির্মল রাত্রি একটা অবধি জাগব, তারপরে হিমানী ও মতিলাল বাকি রাতটুকু জাগবে। হিমানীর ঠাকুরমা রাত্রির পর রাত্রি পুত্রবধূর শিয়রে জেগে ব'সে থাকতেন, এতে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। তবে তিনি ওষুধপত্র কিছু খাওয়াতে পারতেন না। পাছে ভুল ক'রে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেন, এইজন্যে আমাদের কারুকে থাকতেই হ'ত।

সে রাত্রি আমি আর নির্মল একটা অবধি জেগে মতিলালকে তুলে দিতে গিয়ে দেখি, বিছানায় সে নেই। আমি আর নির্মল শুতুম ছাতের ওপরে একটা ছোট্ট ঘরে। হাওয়া পাবার জন্যে হয়তো সে আমাদের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে মনে ক'রে ছাতে গিয়ে দেখি যে, এক কোণে মতিলাল ও হিমানী দাঁড়িয়ে আছে।

হিমানী কাঁদছিল। তার মা যে আর বেশি দিন নেই, এই কথা বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল। দেখলুম, সে ঘাড় হেঁট ক'রে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে আর মতিলাল গুনগুন ক'রে কি ব'লে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি, তা তাদের দুজনের একজনও টের পায় নি। কিছুক্ষণ এই ভাবে হাঁটু গেড়ে মতিলালকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল, আর মতিলাল হিমানীর মুখখানা তুলে ধ'রে তার অধরোষ্ঠে গভীর চুম্বনের দাগ এঁকে দিলে।

চাঁদের আলোতে মতিলালের মুখখানা ঝকঝক করছিল। তারই দেহের ছায়া হিমানীর মুখের ওপর পড়ায় তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবর্ণনীয় সেই আলো ও আবছায়ার খেলা। দক্ষালয়ে যাবার আগে সতী যখন মহাদেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়েছিলেন, অভিমান-অপগত প্রিয়তমার প্রসন্ন মুখ দেখে ভোলানাথ বোধ হয় এমনই বিহ্বল হয়েছিলেন। মৃত্যু যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সংহারের দেবতা মহেশ্বর সেদিন নিজেই তা দেখতে পান নি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মতিলাল আমাদের দেখতে পেয়ে হিমানীকে কি বললে। তারপরে আমাদের সঙ্গে কোন কথা না ব'লেই তারা দুড়দুড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালবেলায় হিমানীর মা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর জ্ঞান ফিরে এল না। সন্ধ্যেবেলা আমি ও নির্মল একবার বাড়ি ঘুরে

এসে তাদের বাড়িতেই শুয়ে রইলুম। সেদিন আর কারুর ব্যস্ততা বা রাত জাগবার পালা নেই। রোগিণী সকলকে অবসর দিয়েছেন। সকলেই শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রোগীর ঘরের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরের এক কোণে একটি বাতি জ্বলছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ, নিঝুম। সেই নিঃঠুর নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগীণীর অন্তিম নিশ্বাস, জীবনগাথার শেষ রাগিণী তালে তালে ধ্বনিয়ে উঠছে।

জানলায় মুখ দিয়ে ভেতরে দেখলুম, মুমূর্ষুর শিয়রে ব'সে আছেন হিমানীর বৃদ্ধা পিতামহী, আর তাঁর দু পায়ের দু ধারে ব'সে হিমানী ও মতিলাল।

সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল, যেন রোগিণীর মাথার কাছে রুদ্রভৈরব তার গৈরিক নিশান নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর পায়ের কাছে মন্মথ তার মকরকেতন ওড়াচ্ছে। সংহার ও সৃষ্টির দুই দেবতায় মিলে উৎসব ক'রে সেই পুণ্যবতীকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আস্তে আস্তে সেখান থেকে স'রে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে হিমানীর মা মারা গেলেন। দিন দুয়েক পরে তার বাবা এসে তাদের নিয়ে চ'লে গেলেন।

সেবার ছিল আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা। দিন কয়েক বই নিয়ে বসা গেল। পরীক্ষার পর মতিলালেরা কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে তার বাবার কর্মস্থলে চ'লে গেল।

মাস কয়েক মতিলালের আর কোন খবর পাই নি। পরীক্ষায় পাস ক'রে আমরা কলেজে ঢুকলুম। মতিলালও পাস করলে, কিন্তু সে আর কলকাতায় ফিরে এল না। সেবার পুজোর ছুটির মধ্যে একদিন মতিলালের ছোট ভাই যতিলাল আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। যতিলাল বললে, মা তোমায় একবার ডেকেছেন, আজই যাবে।

খবর নিয়ে জানলুম যে, তারা কলকাতায় মাসখানেকের জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে আছে। এখানে এসেই আমাকে খবর দিয়েছে।

মাঠের আড্ডা তখনও পুরোদমে চলেছে। সেদিন আর মাঠে না গিয়ে মতিলালদের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হওয়া গেল। মতিলালের মা তো আমায় দেখেই কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁর চোখে জল দেখে আমি চমকে উঠলুম, তবে কি মতিলাল নেই! তবুও জিজ্ঞাসা করলুম, মতিলাল কোথায়?

মা বললেন, আজ দু মাস হ'ল সে কোথায় চ'লে গিয়েছে, সেই থেকে তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

কথাটা শুনে একেবারে দ'মে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছিল নাকি?

তিনি বললেন, ঝগড়া হয় নি। সেই হিমানী ছুঁড়ীকে তোমার মনে আছে? তাকে নিয়ে সে পালিয়েছে। তারা নিশ্চয় কলকাতাতেই কোনও জায়গায় আছে। তোমরা তাকে খুঁজে বের কর বাবা। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হ'লে আমি বাঁচব না।

মতিলালের মার কাছ থেকে যতখানি সংবাদ সংগ্রহ করা গেল, তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হিমানীর মার মৃত্যুর বোধ হয় মাস দুয়েক পরেই তার বাবা আর একটি তরুণীর পাণিপীড়ন করেছেন। ইতিমধ্যে হিমানীর সঙ্গে কলকাতায় মতিলালের পত্র-ব্যবহার চলছিল। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে যাবার কিছুদিন পরেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, মতিলাল ও হিমানী দুজনেই অন্তর্ধান করেছে।

তখুনি মাঠে গিয়ে সংবাদটা প্রচার করা গেল। তখন ফুটবল খেলা শেষ হয়ে গানের আসর বসেছে। মতিলালের কথা শুনে মাঠসুদ্ধ ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, জয় মতিলালের জয়।

ঠিক হ'ল, পরদিন থেকে তার খোঁজ শুরু হবে।

দিন দশেক পাতিপাতি ক'রে খুঁজে মতিলালকে ঠিক ধ'রে ফেলা গেল। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা খোলার ঘর নিয়ে সে আর হিমানী বাস করছিল। হিমানীকে আমরা মতিলালের মতন নাম ধ'রেই ডাকতুম, কিন্তু এবার দেখার পরেই আমরা তাকে বউদি ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলুম। আমার মুখে বউদি ডাক শুনে প্রথমে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে সঙ্কোচ কাটিয়ে হিমানী এমন ব্যবহার করতে লাগল, যেন এই ডাকেই সে চিরদিন অভ্যস্ত।

পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। অবিশ্যি আমাদের এই পরামর্শ-সভায় হিমানীও এসে বসল। প্রথমেই উঠল গ্রাসাচ্ছাদনের কথা। হিমানী ও মতিলালের কাছে যা ছিল, তা রেল ও গাড়িভাড়া, তার ওপরে নতুন সংসার পাতা, দু মাসের দু টাকা ক'রে ঘরভাড়া আর খাওয়ায় প্রায় সব নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। হিমানী হিসেব ক'রে বললে, মাসে দশটা টাকা হ'লে তাদের খাওয়া ও বাড়িভাড়া চ'লে যেতে পারে। আমি আর নির্মল দুজনে এই দশ টাকার ভার নিলুম। কারণ মতিলাল বললে যে বাড়িতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। হিমানীকে ফেলে সে কি ক'রে বাড়ি যাবে?

মনে হ'ল, সত্যিই তো! হিমানীকে ফেলে মতিলাল কি ক'রে বাড়ি যেতে পারে?

কয়েকদিন পরে মতিলালের মার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। ছেলেকে দেখবার আশায় তিনি দিন গুনছিলেন। তাঁকে বললুম, আজ কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার সময় পথে মতিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মতিলালের মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি বললেন, তাকে ধ'রে নিয়ে আসতে পারলি নি?

বললুম, সে চেষ্টা অনেক করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই সে এল না

কি বললে সে ?

সে বললে, হিমানীকে ফেলে কি ক'রে আমি বাড়ি যাব ? আমার সঙ্গে যদি তাকেও তাঁরা স্থান দেন, তা হ'লে যেতে পারি।

আমার কথা শুনে তাঁর চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, তা কি ক'রে হবে বাবা ? তোমরা তো লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে। গেরস্তর সংসারে হিমানীকে কি ক'রে ঠাঁই দিই।

মতিলালের মার পরে আরও অনেকের মার মুখেই এ রকম কথা শুনেছি বটে, কিন্তু কেন যে গেরস্তর সংসারে তাদের স্থান হতে পারে না, তা তখনও বুঝতে পারি নি, আজও বুঝতে পারি না।

তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হতভাগা কোথায় আছে ?

বললুম, অনেক চেষ্টা ক'রেও তার ঠিকানাটা বার করতে পারলুম না। সে বললে, কলেজে গিয়ে এক সময় তোর সঙ্গে দেখা করব।

সেই ছুঁড়ীটা সঙ্গে আছে তো ?

কথাটা শুনে ভারি হাসি পেল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ, আছে।

একবার তাকে কোন রকমে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস ?

চেষ্টা ক'রে দেখব।—ব'লে সেদিন তাঁর কাছে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে আবার আমাদের পরামর্শ সভা বসল। হিমানীকে ফেলে মতিলালের একলা বাড়িতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। অনিশ্চিত অদৃষ্ট-সাগরে তারই মুখ চেয়ে যে ভেলা ভাসিয়েছে, তাকে ফেলে কেমন ক'রে সে ঘরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরে যাবে ?

একদিন মতিলালের মাকে ব'লে ফেলা গেল, আচ্ছা, হিমানীকে স্থান দিতে আপনাদের আপত্তি কি ?

কথাটা শুনে তিনি অদ্ভুত এক রকমের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টির অর্থ, ও, তোমরাও বুঝি ওই দলের ?

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, হিমানী কি সম্পর্কে আমাদের এখানে থাকবে ? সে যদি মতিলালের সঙ্গে না গিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে যেত, তা হ'লেও নয় কথা ছিল। আমার এখনও একটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় নি—

আবার কিছুক্ষণ পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, হিমানীর নিজের বাড়িতেই কি তার আর স্থান হবে ? তোমরা তো তার শুভার্থী, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা এই কথা শুনে হিমানী বললে, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিলেও আমি যাব না।

মতিলাল বললে, তোরা আর মার কাছে যাস নি

আমরা মতিলালের মার সংগে দেখা করা বন্ধ ক'রে দিলুম। পুজোর পরে কলেজ খুললে একদিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম যে তাঁরা কলকাতা থেকে চ'লে গিয়েছেন।

মতিলাল দিব্যি সংসার করতে লাগল। সে সমস্ত দিন চাকরির সন্ধানে ঘোরে। সন্ধ্যের সময় মাঠে এসে জোটে। সন্ধ্যের পর আমি আর নির্মল তার সংগে বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে গিয়ে ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব ক'রে ফিরে আসি।

এমনই কিছুদিন যায়। মতিলাল ইতিমধ্যে একটি ছেলে-পড়ানোর কাজ জুটিয়েছিল। মাস দুয়েক পরে সে কাজটা আবার চ'লে গেল। পাঁচ টাকা ক'রে দু মাসের মাইনেতে তাদের জোড়া দুয়েক কাপড় হ'ল, তা ছাড়া আমাকে ও নির্মলকে একদিন হিমানী নেমন্তন্ন ক'রে মাংস রেঁধে খাওয়ালে।

বছরখানেক এই ভাবে কাটবার পর একদিন বিকেলে মতিলাল বললে, ওহে, বেড়ে একটা মতলব ঠাওরানো গিয়েছে।

মতিলালেরা যে জায়গাটায় থাকত, তার চারিদিকে ছিল ব্যবসাদার-আড়তদারদের বাস। এদের কারও কারও সংগে তার খাতিরও জন্মেছিল। মধ্যে মধ্যে দু-একজনের খাতা লিখে, ইংরেজীতে চিঠি লিখে সে টাকাটা সিকিটা উপায়ও করত। মতলব ঠাওরানোর কথা শুনে আমরা মনে করলুম, তার মাথায় বুঝি কোন ব্যবসা-বুদ্ধি চেপেছে। সে বললে, দেখ, আমার অভাবে মা-বাবা ভাই বোন সবাই কষ্ট পাচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু একটি কাজ করলে তাঁরা হিমানীকে শুধু বাড়িতে স্থান দিতে কোন আপত্তি করবেন না। হিমানীরা আমাদের স্বজাত। আমি মতলব করেছি, তাকে বিয়ে ক'রে একদিন দুম ক'রে দুজনে বাড়িতে গিয়ে হাজির হব। ছেলের বউকে তো আর বাপ-মা ফেলে দিতে পারবে না।

ঠিক মনে হ'ল, চাঁদমুখের প্রভাব মতিলালের সাংসারিক বুদ্ধিকে এখনও ম্লান করতে পারে নি। আমরা তাকে উৎসাহ দিলুম, লাগিয়ে দাও বিয়ে, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।

আমাদের উৎসাহে হিমানী মতিলাল দুজনেরই উৎসাহ গেল বেড়ে। অনেকদিন পরে আবার একটা নতুন উত্তেজনা পেয়ে আমরা মেতে উঠলুম। মতিলাল কোথা থেকে পুরোহিত যোগাড় ক'রে আনলে। বরকর্তা ও কন্যাকর্তার শূন্য আসন শাস্ত্রের মন্ত্রে পূর্ণ হয়ে উঠল। টাকাকড়িরও বিশেষ অভাব হ'ল না। নির্মলের ছিল সোনার হাতঘড়ি, আর আমার ছিল সোনার বোতাম ও আংটি। তা ছাড়া দু-চারখানা বই ও হুকারের দোকানে চ'লে গেল।

শুভদিনক্ষণে হিমানীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হয়ে গেল। মতিলাল তার বাবাকে চিঠি লিখলে, হিমানী এখন আমার স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ। তাকে গৃহে স্থান দিতে, আশা করি, আপনাদের কোন আপত্তি হবে না। আমরা শিগগিরই বাড়ি যাব।

দিন পনরো চ'লে গেল, কিন্তু মতিলালের চিঠির কোন জবাব এল না।

চিঠির জবাব না আসতে মতিলাল ও হিমানী দুজনেই মুষড়ে পড়তে লাগল। সেই কঠোর দারিদ্র্য বোধ হয় আর তাদের সহ্য হচ্ছিল না।

আরও দিন পনরো কেটে যাবার পরও যখন তার বাবার কাছ থেকে কোন উত্তর এল না, তখনই একদিন মতিলাল বললে, না-ই আসুক জবাব, চল, বেরিয়ে তো পড়া যাক, তারপরে যা হবার তাই হবে।

আমরাও রাজি। বেনারস কলেজের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ আছে ব'লে বাড়ি থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে একদিন রাত্রি সাড়ে নটার গাড়িতে মতিলাল ও হিমানীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়া গেল।

যখন ট্রেন থেকে স্টেশনে নামলুম, তখন রাত্রি শেষ হতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক দেরি। ভোর হওয়ার পর একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে মতিলালদের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। শহর স্টেশন থেকে মাইল চার-পাঁচ দূরে। চিকোতে চিকোতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ি গিয়ে তাদের বাড়ির কাছে পৌঁছল। বাড়ির দরজায় মতিলালের একটি বোন দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে ছুটে বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল।

হিমানীকে নিয়েই ভেতরে যাওয়া হবে কি না তারই পরামর্শ চলছে, এমন সময় বাড়ির মধ্যে মতিলালের বাবার চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। আমরা স্থির করলুম, আপাতত হিমানী গাড়িতেই ব'সে থাক্। ঝড়ের প্রথম ঝাপটাটা কেটে যাবার পর তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। আগে নির্মল, তারপরে আমি, তারপরে মতিলাল। কিন্তু বেশি দূরে অগ্রসর হতে হ'ল না। মতিলালের বাবা হনহন ক'রে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর পেছনে তার ভাইবোনের দল উৎসাহের আবেগে চঞ্চল হয়ে ছুটে আসছে, এই অবস্থায় দুই শোভাযাত্রায় সংঘর্ষ বাধল। মতিলালের বাবা বললেন, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, অমন ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না।

ভদ্রলোককে আমরা বোঝাতে লাগলুম, কিন্তু তিনি সেসব কথা কানে না তুলে আমাদের গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এক কথা। হিমানীকে ছেড়ে চ'লে এস, আমি মেয়ে ঠিক করেছি, তাকে বিয়ে কর, তবেই এ বাড়িতে স্থান হবে।

মতিলাল এক ধারে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল। পিতার সহস্র কর্কশ কথার একটি জবাবও সে দিলে না। ভাইবোনেরা একে একে তাদের বাবার পেছন থেকে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। সব-ছোটটি মতিলালের একটা আঙুল ধ'রে নাড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে অবিশ্রান্ত গালাগালি শোনার পর মতিলাল ধরা গলায় আমাদের বললে, চল, যাই।

আমরা ফিরলুম। তার বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন, দাঁড়াও, ওকে না ত্যাগ করলে আমার বিষয়ের একটি পয়সাও তোমাকে দোব না, মনে থাকে যেন।

কথাটা শুনে মতিলালের ম্লান মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। অপূর্ব সে হাসি। তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে আমাদের বললে, চল, যাই, হিমানী অনেকক্ষণ একলা ব'সে আছে।

আমরা ধীরে ধীরে বাইরে এসে একে একে গাড়িতে উঠে বসলুম। মতিলালের ভাইবোনেরা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল, তাদের সবার চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত। কারও মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে দড়াম ক'রে ওপরকার একটা জানলা খুলে গেল। জানলায় বোধ হয় মতিলালের মা এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু আমরা কেউ আর গাড়ি থেকে মুখ বাড়ালুম না।

কয়েক মুহূর্ত বাদে হিমানী ব'লে উঠল, ঠাকুরপো. ওই যে দেখছ বাড়িটা —যেটার দরজায় তালা লাগানো, ওইটে আমাদের বাড়ি।

তারপরেই মতিলালের দিকে ফিরে সে হাসতে হাসতে বললে, তাড়িয়ে দিলেন তো? তুমিও যেমন! কোন বাপ-মা কখনও এ রকম ছেলেকে ঘরে নিতে পারে? কি বল ভাই খুশি-টাকুরপো?

নির্মল খুব হাসত ব'লে হিমানী তাকে খুশি-ঠাকুরপো ব'লে ডাকত।

নির্মল বললে, আমি যদি বাপ হতুম, তা হ'লে নিশ্চয় পারতুম।

হিমানী আবার মতিলালের দিকে ফিরে বললে, দেখ, তুমি ও রকম মুখ ক'রে থাকলে আমার ভারি খারাপ লাগে। আমি কিন্তু এক্ষুনি কেঁদে ফেলব, তখন তোমরা তিনজনে মিলে আমাকে থামাতে পারবে না।

হিমানীর দুই চোখ অশ্রুতে ভ'রে উঠল। মতিলাল গাড়ি থেকে এবার মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে বললে, এই, স্টেশনে চল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই মতিলাল হিমানীকে বললে, আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে ব'লে আমাদের কোন দুঃখ হয় নি। আমরা সমস্ত দুঃখকে তো বরণ ক'রেই নিয়েছি হিমানী।

হিমানীর চোখের জল এক নিমিষে অপসৃত হয়ে গেল। সে তার চোখ দুটোকে বড় বড় ক'রে বললে, তবে তুমি অমন মুখ ক'রে রয়েছ কেন?

মতিলাল বললে, আমার দুঃখ এই যে, আমাদের জন্যে বন্ধুরা মিছিমিছি বাবার কাছে কতকগুলো গালাগালি খেলে।

মতিলালের বাবার গালাগালিতে আমাদের মনের মধ্যে যতটুকু গ্লানি জমা হয়ে উঠেছিল, হিমানীর হাসির আঘাতে স্টেশনে পৌঁছবার আগেই তা উঠে গেল। যেমন হাসতে হাসতে আমরা বেরিয়ে ছিলুম, পরদিন সকালে আবার তেমনই হাসতে হাসতে আমরা তাদের বেলেঘাটার সেই খোলার বাড়ির দরজায় গাড়ি থেকে নামলুম।

এই ব্যাপারের দিন দশ-বারো পরে একদিন বিকেলে মতিলালের বাড়িতে গিয়ে দেখি, নির্মল মুখখানি চুন ক'রে একখানা জলচৌকির ওপরে ব'সে আছে। এক কোণে হিমানী দাঁড়িয়ে. তার মুখে হাসির রেখা তখনও মিলিয়ে যায় নি, আর মতিলাল গম্ভীর হয়ে খাটের ওপরে ব'সে।

ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলুম, একটা কিছু হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি ?

নির্মল হিমানীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, জিজ্ঞাসা কর ও'দের।

হিমানীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে বউদি ?

হিমানী বললে, কি আবার হবে !

নির্মল ঝেড়ে ফুঁড়ে ঠিক হয়ে বসতে বসতে বললে, আমরা এখানে আসি, ও'দের সেটা ইচ্ছে নয়।

হিমানী ব'লে উঠল, দেখ খুশি-ঠাকুরপো, যা-তা ব'লো না বলছি, তা হ'লে এই পাখা-পেটা খাবে। আমি তাই বলেছি ?

নির্মল গম্ভীরভাবে বললে, তা না তো কি ? যা বলেছ, তার সরল অর্থ ওই।

হিমানী এবার আমার দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমিই বল—

আমি বললুম, ব্যাপারটা কি হয়েছে, খুলেই বল না ছাই ?

মতিলাল এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার সে বললে, আচ্ছা, আমিই বলছি।

মতিলালের কথা শুনে নির্মল মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। কিন্তু তার চোখ দুটো অশ্রুভারে তখুনি নুয়ে পড়ল। সে অন্য দিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

মতিলাল বললে, আমি আর হিমানী স্থির করেছি যে, তোমাদের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য নোব না।

এই অবধি ব'লে মতিলাল চুপ করলে। আমাদের কারুর মুখ দিয়েই আর কোন কথা বেরুল না, মতিলালও চুপ ক'রে রইল। হেমন্তের সন্ধ্যা তার অন্ধকারের সঙ্গে রাশি রাশি ধোঁয়া নিয়ে ছোট্ট সেই খোলার ঘরখানার ভেতরে এসে জমা হতে লাগল। তারই মধ্যে ব'সে ব'সে আমার মনে হতে লাগল, একদিন প্রখর দিবালোকে আমরা যে এই চারিটি বন্ধু পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছিলুম, এই অন্ধকারের মধ্যে বুঝি সেই বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে যাবার পর নির্মল ব'লে উঠল, বাতিটা জ্বাল বউদি।

হিমানী বললে, এই যে জ্বালি।

হিমানীর কণ্ঠস্বর ভারী। বেশ বুঝতে পারা গেল, অন্ধকারে সে কাঁদছিল।

বাতিটা জ্বালবার পর মতিলাল বললে, এর জন্যে তোমরা দুঃখ ক'রো না বন্ধু। আমি হিমানীর জন্যে ও হিমানী আমার জন্যে কতখানি ত্যাগ করেছে, আর একে অন্যের জন্যে কতখানি সহ্য করতে পারে, তা অভাবে না পড়লে তো বুঝতে পারব না। হিমানীকে পাওয়ার সুখ আমি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে কিছুতেই পারছি না, যতক্ষণ না তাকে পাবার দুঃখটাও ভোগ করছি।

এতে তোমরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। তা হ'লে আমরা দুজনেই মর্মান্তিক দুঃখ পাব।

সেদিন এ সম্বন্ধে আর আমাদের কোন কথা হ'ল না। বাড়ি ফেরবার সময় সমস্ত পথটা মতিলালকে গালাগালি দিতে দিতে ফেরা গেল।

তখন মাসের শেষ, বাড়িভাড়া দেবার সময়। আমি আর নির্মল স্থির করলুম যে, চুপিচুপি তাদের ওখানে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে ঘরভাড়াটা দিয়ে দেখা না ক'রেই পালিয়ে আসব। ঠিক করা হ'ল যে, দুপুরবেলায় গিয়ে কাজটি সেরে আসতে হবে, কারণ সে সময় মতিলাল বাড়িতে থাকে না।

দুই বন্ধু দুপুরবেলা মতিলালের বাড়িতে গিয়ে সোজা একেবারে বাড়িওয়ালার ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। বাড়িওয়ালা আমাদের প্রস্তাব শুনে হেসে বললে, তাঁরা তো কাল বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চ'লে গেছেন।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় গেল তারা? কেন গেল তারা?

বাড়িওয়ালা তার আন্দাজমত দু-একটা জায়গার নাম করলে। তখনি দুজনে ছুটলুম সেখানে। বস্তির পর বস্তি প্যাতিপাতি ক'রে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু মতিলাল ও হিমানীর কোন সন্ধানই পেলুম না।

মতিলাল কেন আমাদের ছেড়ে গেল? না হয় সে আমাদের সাহায্য না-ই নিত। এই নির্বান্ধব শহরে আমাদের চেয়ে বন্ধু সে কোথায় পাবে?

পরদিন থেকে আমি আর নির্মল মাঠে যাওয়া বন্ধ রেখে কলকাতা শহরে বস্তিতে সেই পলাতক বন্ধু আর বান্ধবীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। এক মাস অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক'রেও তাদের কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে আবার একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাঠে ফিরে এলুম।

মাঠের সেদিনকার অবস্থা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেখানে গিয়েই বুঝতে পারলুম, একটা বিষাদের ছায়া সেখানকার অনাবিল আনন্দকে ম্লান ক'রে ফেলেছে। ফুটবল খেলা বন্ধ, গানও বন্ধ, বন্ধুরা এক কোণে ম্লান মুখে বসে রয়েছে। মাঠের ঠিক মাঝখানেই দেখি, একটা বড়গোছের হোগলার ঘর উঠেছে। এখানে সেখানে চারিদিকে লম্বা লম্বা গর্ত।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, যারা জমিটা কিনেছে, তারা বাড়ি তুলছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সেখানে বাড়ি তৈরি হবে।

চোখের সামনে প্রতিদিন একখানার পর একখানা ইঁট গেঁথে মিস্ত্রীরা সেখানে দালান তুলতে লাগল। বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে আসা বন্ধ করতে লাগল, দেখতে দেখতে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির পথে বিরাট প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার পর কিছুদিন আমরা এখানে সেখানে জমায়েৎ হতে লাগলুম, কিন্তু আড্ডা আর তেমন জমল না। বছর খানেকের মধ্যেই আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম। তারপরে জীবনে কত বার চাঁদ উঠল, কত চাঁদমুখ দেখলুম, তার ঠিকানা নেই। অভিজ্ঞ সংসার দেখিয়ে

দিলে, চাঁদে রয়েছে কলঙ্ক, আর চাঁদমুখ—যাক, সে কথা আর তুলে কাজ নেই।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার বোধ হয় পনরো-বিশ-বছর পরে নানা ঘাটের জল খেয়ে তখন এক মাসিক-পত্রের সম্পাদকীয় বৈঠকে বেশ কায়েমী হয়ে বসা গিয়েছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা সম্পাদক-মশায় একটি নতুন লোককে আড্ডায় নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তোমরা এঁর শশিশেখরের এত প্রশংসা কর, ইনিই সেই কবি শশিশেখর।

ভদ্রলোক সভাস্থ সবাইকে নমস্কার ক'রে অতি সঙ্কুচিতভাবে ফরাশের একটি কোণে গিয়ে ব'সে পড়লেন। কবির চেহারাটি, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, অর্থাৎ মোটেই কবিজনোচিত নয়। মাথার চুল কদমছাঁটা পরনে একখানা ময়লা ধুতি, অঙ্গে একটা আধ-ময়লা জামা, সেটা না পাঞ্জাবি, না শার্ট, না কোট। পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া, শততালি হ'লেও জুতোর মালিক যে শৌখিন তা জুতোর আকৃতি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দুর্দশায় পেকে গিয়েছে। মুখের চেহারাও তার অঙ্গের জামা-কাপড়ের সামিল। দাড়ি-গোঁফ বোধ হয় মাসখানেক আগে কামানো হয়েছিল।

লোকটা খাটে ব'সে আসরের চারদিকে চেয়ে আমার দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার চোখের ওপর চোখ পড়তেই আমার মনে হ'ল, যেন মুখখানা কোথায় দেখেছি। যতই তার মুখের দিকে চাই ততই মনে হয়, যেন এ মুখ পরিচিত। গৃহপ্রত্যাগত প্রবাসী ঘরে ফিরে তার বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেমন ক'রে তার হারানো রতন খুঁজে বেড়ায়, আমিও তেমনই স্মৃতির ধ্বংসস্তূপে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধুদের মুখগুলো খুঁজতে লাগলুম, কে—কে এই কবি শশিশেখর ?

আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে নবাগত কবি সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে। তারপরে গুটিগুটি আমার কাছে এসে বললে, আমায় চিনতে পারলে না তো ?

চীৎকার ক'রে উঠলুম, মতিলাল !

মতিলাল বললে' হ্যাঁ, চিনেছি।

মতিলালকে ধ'রে বসালুম। কিন্তু সেদিন তার বড্ড তাড়া ছিল ব'লে আর বসতে পারলে না। পরের দিন আসবে ব'লে সে চ'লে গেল।

পরের দিন তার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে ব'সে রইলুম কিন্তু সে এল না। তার পরের দিন আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে মতিলাল এসে হাজির।

মতিলালকে কাছে বসালুম। সে ছদ্মনামে কবিতা লেখে। সকালে দৈনিক একখানা বাংলা কাগজে চাকরি করে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তিন মাস অন্তর এক মাসের মাইনে পায়। সন্ধ্যেবেলায় দু জায়গায় ছেলে পড়ায়, সেখান থেকে ত্রিশ টাকা পায়।

আড্ডা ভেঙে যাবার পর রাস্তায় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কোন্ দিকে যাবে ?

মতিলাল উত্তর দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই দিকে।

বললুম, চল, আমিও ওই দিকে যাব।

দুজনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ ধ'রে নীরবে চলবার পর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, বউদি কোথায় ?

মতিলাল একটু হেসে বললে, তাকে মনে পড়ে ?

আর সামলাতে পারলুম না। ব'লে ফেললুম, রাস্কেল, ছোটলোক, বর্বর, অকৃতজ্ঞ! মনে পড়ে! আমাদে বন্ধুত্বের যা প্রতিদান তুমি দিয়েছ, তাতে তোমাদের কথা আর মনে না রাখাই উচিত।

রাগের ঝোঁকে তাকে আরও অনেক কথা ব'লে ফেললুম, কিন্তু সে একটি কথারও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে সমস্ত শুনে গেল। আমার বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর ধরা গলায় মতিলাল জিজ্ঞাসা করলে, নির্মল কোথায় ? কেমন আছে সে ?

নির্মল! নির্মল চ'লে গিয়েছে, সে আজ পাঁচ-ছ বছরের কথা।

মতিলাল আর কোন প্রশ্ন করলে না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বউদি কোথায় ?

মতিলাল বললে, এখানেই আছে, দেখবে তাকে ?

নিশ্চয়, কোথায়—কত দূরে তোমার বাড়ি ?

মতিলাল বললে, বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে, সেই বাগবাজারের গঙ্গার ধারে। আজ রাত্রি হয়ে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যেবেলায় এসে তোমায় নিয়ে যাব।

সেদিনকার মতন বিদায় নেওয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যের সময় মতিলাল এসে বললে, চল।

শহরের এক কোণে, বাগবাজারের গঙ্গার ধারে একখানা একতলা বাড়ি। পথটা অত্যন্ত সরু। দূরে দূরে গ্যাস জ্বলছে। হেমন্তের শীতল আবহাওয়ায় উনুনের ধোঁওয়াগুলো আটকা প'ড়ে পথের মধ্যে ভিড় ক'রে আছে। বিশ বছর আগে এমনই আর এক সন্ধ্যায় বেলেঘাটার সেই খোলার ঘরে হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কিছুই নেই বললেই হয়। এক কোণে একটি ছোট বিছানা পাতা। সেখানে গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকে মতিলাল বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, ওগো, চেয়ে দেখ কে এসেছে।

বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেখানে হিমানী শুয়ে রয়েছে। তপ্তকাঞ্চনের মত রঙ তার একেবারে কালিবর্ণ, পরিপূর্ণ নিটোল অঙ্গ একেবারে কঙ্কালে পরিণত।

তার সেই মূর্তি দেখে আমি একেবারে শিউরে উঠলুম। একবার সন্দেহও হ'ল, নিশ্চয় এ অন্য আর কেউ।

হিমানী চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চাইলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, ঠাকুরপো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।

সেদিন অনেক রাত্রে মতিলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। হিমানীর যক্ষ্মা হয়েছে। সে আর বাঁচবে না। মতিলাল বললে যে, তারও মুখ দিয়ে বার কয়েক রক্ত উঠেছিল: হিমানী যে তার আগেই যাচ্ছে, এইটেই তার মস্ত সান্ত্বনা।

পরদিন থেকে নিয়ম ক'রে তাদের ওখানে যেতে লাগলুম। সকালবেলা আমি যাবার পর মতিলাল বেরোয় খবরের কাগজে চাকরি করতে। বেলা বারোটার সময় সে কাজ সেরে ফিরলে পর আমি বাড়িতে ফিরি। বিকেলে আমি গেলে সে ছেলে পড়াতে যায়, সন্ধ্যের পর ফেরে। রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি সেখানে থেকে আমি বাড়ি ফিরি।

হিমানীকে চিকিৎসা করছিল এক কবিরাজ। ডাক্তার দেখাতে বিস্তর পয়সা খরচ। খবরের কাগজের আপিস থেকে মাসে মাসে মাইনে পাওয়া যায় না। ছেলে পড়িয়ে যা ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়, তাই তখন তাদের সম্বল। এই দুঃসময়ে মতিলাল আমার কাছে সাহায্য চাইলে, কিন্তু আমারও তখন দেবার কিছুই নেই। একদিন মতিলালকে আমরা সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, সে তা নেয় নি। আজ সে সাহায্য চায়, কিন্তু তাকে দেবার কিছুই নেই। নির্মল ইহলোকে নেই, আমি আছি, কিন্তু সোনার বোতাম ও আংটি আর নেই।

মাসখানেক এই ভাবে কেটে গেল। হিমানী বেশ জানত, সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মতিলাল তখনও বাড়ি ফেরে নি। সমস্ত দিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ায় শীতটা বেশ জোরে পড়েছে। হিমানী ইদানীং আর নিজে নড়তে চড়তে পারত না, তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। একখানি শতজালি দেওয়া লেপ তার অঙ্গে ঢাকা দিয়ে ধারগুলো মুড়ে দিচ্ছিলুম, এমন সময় ধীরে ধীরে সে বললে, ঠাকুরপো, তোমার হাতে এই সেবাটুকু পাব ব'লেই বোধ হয় এতদিন বেঁচে ছিলুম। আমার ওপরে আর রাগ নেই তো ভাই?

আমি বললুম, রাগ তোমার ওপরে কোনও দিনই ছিল না বউদি।

আর কোন কথা বলতে পারলুম না। হিমানী আরও কিছু শোনবার জন্যে উৎসুখ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললুম, তোমার চিকিৎসা না হ'লেও, তবু তো তুমি আমাদের সেবা পেলে, একবার আমাদের কথা ভেবে দেখ।

হিমানী বললে, মরতে আমার বড্ড ভয় করছে ভাই। তোমরা যদি আগে যেতে, তা হ'লে আমার কোন ভয় ছিল না। আমায় সেখানে একলা থাকতে হবে। মা গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাবা যখন ক্ষমা করেন নি, তখন মা কি ক্ষমা করবেন?

কিছুক্ষণ পরে সে উৎসাহভরে ব'লে উঠল, কিন্তু খুশি-ঠাকুরপো আছে না

সেখানে ? ও, তবে কোন ভাবনা নেই। সে ভারি অভিমানী, তা হোক, কই, তুমি তো অভিমান ক'রে থাকতে পার নি !

পৌষের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা হিমানী বললে, ঠাকুরপো, আজ ভাই বিদায়ের দিন। আজ আমার জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু নেই। মনে হচ্ছে, আজই দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে—

হিমানী হাসিমুখে কথাটা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শেষ করবার আগেই তার দুই চোখ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার হাত দুখানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে দেখলুম, বরফের মতন ঠাণ্ডা। নাড়ী—একেবারে শেষ অবস্থা।

তার জন্যে কয়েকদিন থেকে ঝি রাখা হয়েছিল। তার তাঁব্বে হিমানীকে রেখে আমি ছুটলুম মতিলালের সেই খবরের কাগজের আপিসে।

সেখানে গিয়ে দেখি, মতিলাল একটা চেয়ারে উবু হয়ে ব'সে বনবন ক'রে লিখে চলেছে। দু পাশে দুজন কম্পোজিটার দাঁড়িয়ে আছে। একখানা কাগজ শেষ হতেই একজন সেটা তার হাত থেকে এক রকম টেনে নিয়ে চ'লে গেল। সেই ফুরসতে একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে সে বললে কি খবর ?

বললুম, বউদির অবস্থা খুব খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে। শিগগির চল, তোমাকে ডাকতে এসেছি।

মতিলাল ততক্ষণে আর একখানা কাগজ টেনে লিখতে শুরু ক'রে দিলে। তার কাণ্ড দেখে বললুম, কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড় !

মতিলাল হেসে লিখতে লিখতেই বলতে লাগল, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর মস্ত একটা ভুল ধ'রে ফেলা গেছে তারই একটা জবাব, আর জেনারেল ফ্রেঞ্চের সমর নৈতিক চালের আর একটা মারাত্মক রকমের ত্রুটি তার ওপর খানিকটা মন্তব্য লিখতেই হবে, মনিবের হুকুম। আজকে কিছু পাবার আশা আছে, লেখাগুলো যদি শেষ না ক'রে যাই, তা হ'লে সে গুড়েও বালি পড়বে। তুমি বরং হিমানীর কাছে গিয়ে ব'স, আমি আসছি।

তখুনি আবার ছুটলুম হিমানীর কাছে। আমায় দেখে সে জিগ্যেস করলে, কোথায় গিয়েছিলে ?

বললুম, এইখানেই গিয়েছিলুম একটু।

এদিকে বারোটা বেজে গেল, তবুও মতিলালের দেখা নেই। আমি ব্যস্ত হচ্ছি দেখে হিমানী বললে, সে ঠিক আসবে, আমার একটু কাজে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর হিমানী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ঠাকুরপো, তুমি বাড়ি থেকে চট ক'রে ঘুরে এস। যাও, আজকে আর আমার অবাধ্য হ'য়ো না।

সেখান থেকে বেরিয়ে মতিলালের আপিসের দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, মতিলাল নেই। ঘণ্টাখানেক আগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।

নিজের বাসাতে এসে খেয়ে-দেয়ে যখন তাদের সেখানে গিয়ে পেঁছিলুম তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। গিয়ে দেখি, হিমানীকে একখানা লাল চওড়া

পাড়ের শাড়ি পরানো হয়েছে, তার মাথায় একরাশ সিঁদুর, পায়ে আলতা, পা থেকে গলা অবধি ফুলে ঢাকা।

খাটের কাছে গিয়ে দেখি, হিমানীর একখানা হাত মতিলালের হাতে, দুটি চোখ স্থিরভাবে মতিলালের দিকে চেয়ে আছে, আর তার দুই গাল বেয়ে অবিরল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে মতিলাল বললে, এই বোধ হয় মিনিট পাঁচেক হ'ল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে।

সেদিন দিনের আলো নিবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিমানীর অঙ্গ হিম হয়ে গেল।

হিমানী মারা যাবার পরের দিন থেকে মতিলাল খবরের কাগজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সারাদিন ব'সে কবিতা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাস কয়েকের মধ্যে সে মোটা মোটা খানকয়েক খাতা কবিতায় ভরিয়ে ফেললে। আমি সেগুলোকে মাসিক-পত্রে ছাপাতে চাইলে সে বলত, না না, থাক্, ওগুলো অন্য দরকারে লাগবে।

শ্রাবণ মাস নাগাদ, অর্থাৎ হিমানী মারা যাবার মাস ছয়েক পরে একদিন রক্তবমি ক'রে মতিলাল বিছানায় এলিয়ে পড়ল। তার অবস্থা দেখে তক্ষুনি ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার দিন কয়েক দেখে বললেন, ওষুধে কিছু হবে না, বিদেশে নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন।

আমাদের একটি বন্ধুর সাঁওতাল পরগণার এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় ছোট্ট একখানা বাড়ি ছিল। তাকে ব'লে ক'য়ে মতিলালের জন্যে বাড়িখানা যোগাড় করা গেল। কিন্তু শুধু বাড়ি হ'লেই তো চলবে না, অর্থও কিছু চাই।

মতিলাল বললে, আমার ওই কবিতাগুলো যদি বিক্রি করতে পার, তা হ'লে কিছু আসতে পারে।

কবিতার খাতা কখানা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু কবিতার বই বিক্রি করতে এসেছি শুনে বইওয়ালারা তো হেসেই আকুল। সাত দিন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে একজন বইগুলো নিয়ে দয়া ক'রে একশোটি টাকা দিলে। এ ব্যক্তি বইয়ের কারবার করার আগে সাহিত্য চর্চা করত।

মতিলালকে গিয়ে যখন সংবাদটা দিলুম, তখন সে বললে, কেমন, বলেছিলুম কিনা, ওগুলো সময়ে ভারি কাজ দেবে।

বললুম, আরও শতখানেক চাই যে—

মতিলাল বললে, ওইতেই হবে, আর লাগবে না।

মতিলালকে নিয়ে যাওয়া গেল। সে স্থানটি জনবিরল। পুজো ও শীতের সময় দু-চারজন লোক আসে, অন্য সব সময়ে প্রায় সমস্ত বাড়িতেই তালা লাগানো থাকে। সে সময়টা সেখানে বর্ষা নেমেছিল। একেলে রোজ এক পসলা বৃষ্টি হয়ে চমৎকার আলো হ'ত। মতিলাল সেখানে দিন পাঁচেক বেশ রইল। ছ দিনের দিন থেকে তার রক্তবমি শুরু হ'ল। দিন দশেক অনবরত বমি ক'রে একেবারে অবশ হয়ে পড়ল।

তারপরে দিন দুয়েক প্রায় নির্বাক অবস্থায় কাটিয়ে একদিন সকালে সে কথা বলতে আরম্ভ করলে। ইদানীং সে বেশি কথা বলত না, কিন্তু সেদিন তার কথার পরিমাণ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। আমি শাঙ্কত হয়ে উঠলুম, কারণ হিমানী যেদিন মারা যায়, সেদিন সেও ওই রকম কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

বিকেলের দিকে সেদিন আর বৃষ্টি নামল না। মতিলাল বললে আমায় বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে পার ?

বাড়িতে একটা মালী ছিল। তাকে ডেকে খাটসমেত মতিলালকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

বাড়ির কিছু দূরেই ছিল এক শালবন। তারই মাথায় একখণ্ড কালো মেঘ এসে দাঁড়াল, আর তারই মধ্যে বিজলীর ছিনিমিনি খেলা চলতে লাগল। মতিলাল আমার সঙ্গে কোন কথা না ব'লে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যের একটু পরেই মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। মতিলালকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিলুম। দেখতে দেখতে প্রলয়ের নাচন শুরু হয়ে গেল। বাইরে আকাশ তার সম্পত্তি নিঃশেষ ক'রে দিতে চায়, আর ঘরের মধ্যে মতিলালের মহাপ্রাণ সেই জীর্ণ পঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘর ও বাইরে সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে আমি একা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম।

রাত্রি তখন প্রায় চারটে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, এমন সময় মতিলাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বেশ কাটানো গেল পৃথিবীতে, কি বল ভাই ?

এবার অশ্রুসংবরণ করা দুরূহ হ'ল। বললুম, তোমার মতন দুঃখ—

মতিলাল আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললে, না না, দুঃখ আমি কিছুই পাই নি রে, আমাকে দুঃখ দেবার চেষ্টা সংসার করেছে বটে, কিন্তু তাতে আমার সুখের মাত্রা বেড়েই উঠেছে।

মতিলালের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে এল। আমি ঝুঁকে প'ড়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই একটুখানি হাসিতে তার মুমূর্ষু মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই হাসি আর একবার তার মুখে দেখেছিলুম, যেদিন তার বাবা তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার ভয় দেখিয়ে হিমানীকে ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন।

তখন বুঝতে পারি নি যে, সেই হাসিটুকুর অবকাশে তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম, মতিলাল !

বাইরে একটা ভোরের পাখি জবাব দিলে, পি-উ-উ।

তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিয়ে দেখি, মতিলালের মুমূর্ষু মুখের শেষ হাসিটুকুর মতন একটুখানি আলোর রেখা পূব-গগনে ফুটে উঠেছে।

বড়দা

বাপের বয়সী হোলেও পাড়ার সব ছেলেরাই তাকে বড়দা বলে ডাকত। এর কারণ হচ্ছে, বড়দার যে সব চেয়ে ছোট ভাই, সে ছিল আমাদের দাদাদের সমবয়সী ও বন্ধু। দাদারা তাকে বড়দা বলত আর সেই সূত্রে পাড়ার সব ছোটদেরই ছিল সে বড়দা।

বড়দা ছিল বড়লোকের ছেলে। বাপের বড় কারবার, কলকাতায় বার-চোদ্দখানা বাড়ী, তা ছাড়া নগদ টাকা, গাড়ী ঘোড়া, জন্মজন্মে সংসারের বড় ছেলে সে, খুব সমারোহেই তার দিন কাটত।

ছেলেবেলায় বাপ তাকে বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। গাড়ী চড়ে সেজেগুজে সে স্কুলে যাওয়া আসা করত বটে, কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে সম্ভাব তার কোন দিনই হোলো না। বড়দার ছোট ভাইরা অর্থাৎ মেজদা সেজদার দল যখন এনট্রেন্স পাস করে গেল, সে তখনও চতুর্থ শ্রেণীর গণ্ডী উত্তীর্ণ হতে পারল না দেখে তার বাবা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন।

বড়দার বাবা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী, এজন্য তখনকার ইংরেজ সওদাগর মহলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তিনি এদের একজনকে ধরে তাঁর আপিসে বড়দাকে ষাট টাকা মাইনেতে ঢুকিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে ষাট টাকা মাইনেকে মোটা মাইনে বলে বিবেচনা করা হোতো। বড় বড় ঘাগী কেরাণীরা সারাজীবন চাকরী করে শেষ বয়সে ষাটের কোঠায় পেঁছিত। বড়দার বরাত ছিল ভাল, কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই তার ষাট টাকা মাইনে হোয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে কাজ করলে সেই ষাট টাকা যে ভবিষ্যতে ষাট হাজারে পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল, এমন কথাও বড়দার মুখে আমরা শুনেছি।

বিদ্যার প্রতি অনুরাগ না থাকলেও বিদ্যাধরীদের প্রতি বড়দার আকর্ষণ ছিল সহজাত। চাকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আকর্ষণ প্রবল হ'য়ে উঠল। তখনকার দিনে বড়লোকদের ছেলেদের পক্ষে যদিও সেটা মারাত্মক দোষ বলে বিবেচিত হ'ত না, তবুও বড়দার বাবা ছেলের হাল চাল দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কারণ, সেই বয়সেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং তখন সে এক ছেলের বাপ।

বড়দার বাবা ভেবে চিন্তে একটা উপায় আবিষ্কার করলেন। একদিন তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মোটা-রকম একটা জীবনবীমা করিয়ে দিলেন। বন্দোবস্ত হ'ল, মাসের প্রথমেই বড়দার মাইনের টাকাটা আপিস থেকেই সোজা

জীবনবীমা আপিসে চলে যাবে। এ ব্যবস্থাটা অবশ্য গোপনেই হয়েছিল, বড়দা আগে কিছুই টের পায় নি।

কিন্তু মাস শেষ হতেই গোল বাধল। নির্দিষ্ট দিনে মাইনে নিতে গিয়ে বড়দা যখন শুনলে সে অর্থ অন্যত্র চলে গেছে, তখন সে হাঁ না কোন কথা বললে না—শুধু পরের দিন থেকে আপিসে যাওয়া বন্ধ করে দিলে। দিন পনের বাদে আপিস থেকে সংবাদ পেয়ে বড়দার বাবা একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপিসে যাচ্ছ না কেন ?

বড়দা বল্লে—আজ্ঞে আপিসে গিয়ে কি হবে! মাইনে যখন পাওয়া যাবে না—

তোমার জীবন বীমা করা হয়েছে। পঁচিশ বছর পরে পঁচিশ হাজার টাকা পাবে তুমি, সেটা ভুলো না। বছরখানেক বাদে তোমাকে ওরা একশ টাকা দেবে বলেছে, তখন চল্লিশ টাকা থাকবে তোমার হাতে। ইতিমধ্যে হাত খরচের জন্যে দু-পাঁচ টাকা যা দরকার আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও। কাল থেকে আপিসে যাও—ছেলেমানুষি করবার বয়স নাই তোমার। এখন ছেলেপুলের বাপ হয়েছ, বিবেচনা করে কাজ করতে শেখ।

কিন্তু বড়দা আর আপিসে গেল না। জীবনবীমার মাসিক দেয় প্রতি মাসে তার বাবাই যুগিয়ে যেতে লাগলেন।

বড় ছেলের উপর বাপ কোনকালেই সন্তুষ্ট ছিলেন না ; এই ব্যাপারের পর তিনি একেবারে তার ওপর হাড়ে চটে গেলেন। বড়দা সে সব গ্রাহ্য না কোরে হৈ হৈ করে পাড়ার অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে লাগল। বাপের সঙ্গে তার দেখাই হোতো না, যতক্ষণ সে বাড়ীতে থাকত অথবা তার বাবা বাড়িতে থাকতেন, ততক্ষণ সে বার-বাড়ীতে আসতই না। বাড়ীর ভেতরে ঠাকরুমা ও মার সঙ্গে সেদিনকার খাওয়া-দাওয়ার পরামর্শ করত। প্রায় সারাদিনই নানা রকমের খাওয়া-দাওয়া ও তার বন্দোবস্ত করতেই কেটে যেত। রাত্রিবেলা আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরে পরিতোষপূর্বক আহার করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়তো। তখনই সে দু-ছেলের বাপ, বয়স কুড়ি পেরোয় নি।

এই সময় অকস্মাৎ কলেরা হ'য়ে দুদিনের তফাতে বড়দার স্ত্রী ও মা মারা গেলেন। মা ও স্ত্রীর শোকে বড়দা নাকি সাত দিন না খেয়ে দরজা বন্ধ ক'রে পড়ে ছিল। দরজা ভেঙে যখন তাকে বের করা হোলো তখন সে মৃতপ্রায়। কলকাতার সেরা সেরা ডাক্তারের চিকিৎসায় সে প্রায় এক বছর পরে সেরে উঠল।

এসব ঘটনা আমরা জন্মাবার আগেই হ'য়ে গিয়েছিল।

এই রোগের পর বড়দার হালচাল একেবারে বদলে গেল। আটহাতি ধুতি আর এক জোড়া চটি এই হ'ল তার পোষাক। আহারে এবং বচনে জিহ্বার সংযম গেল একেবারে উড়ে, যার-তার সামনে যা-তা কথা বলতে আরম্ভ কোরে দিলে। বাস্তব রাজ্য ছেড়ে সে কল্পলোকে পক্ষ বিস্তার করল! কোথাও সে নেমন্তন্নে যেতো না, বাড়িতে বাইরের কোন লোক, এমন কি চেনা লোক পর্যন্ত

এলে সামনে বেরুতো না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নাচতে-নাচতে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে সেদিনকার দ্বিপ্রাহরিক আহারের একটা ফিরিস্তি দিয়ে সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরুতো। বেলা বারোটার সময় বাড়ি ফিরে আহারাদি শেষ কোরে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিত।

ডাক্তারেরা দুপুরবেলা তাকে ঘুমুতে বারণ করে দিয়েছিলেন, তাই দুপুরে জেগে থাকবার একটা উপায় বড়দা আবিষ্কার করেছিল। ঘরে ঢুকে বেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে চীৎকার করত—দারোয়ান।

কাল্পনিক দারোয়ান এসে দাঁড়াল। বড়দাই বললেন—হুজুর।

—গাড়ি জুতে বল, লাটসাহেবের বাড়ী যাব। তারপর খানসামা এলো কাপড় চোপড় পরাতে। এ পোষাক নয়, ঐটে দে—সেদিন লাটসাহেব জিজ্ঞাসা করছিল এটা কোন দরজির তৈরি ইত্যাদি। পোষাক বাছতেই আধ ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর গাড়ি এলো, এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলেছে—বড়দাই গাড়ি, বড়দাই ঘোড়া, কোচোয়ান, সহিস, মনিব সবই সে; কখনো কোচোয়ানকে ডেকে ধমক লাগানো হচ্ছে—এত জোরে গাড়ী চালাচ্ছ কেন, আমি কারু বাপের চাকর নই। এই ক'রে লাটসাহেবের বাড়ি গিয়ে পেঁছিনো হ'ল। তার আগমনে তারা সন্ত্রস্ত। আজ ত আপনার আসবার কথা নয়—বিশেষ একটা কাজে এসেছি ইত্যাদি—।

এই কোরে পাঁচটা অবধি কাটিয়ে আবার নাচতে-নাচতে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে রাত্রের আহারের ফিরিস্তি দিয়ে সে বেরিয়ে পড়তো আড্ডা দিতে।

রোজই যে লাটসাহেবের বাড়ী যেতে হবে তা নয়, কোন দিন বিরাট প্রাসাদ তৈরী হ'ত, কোন দিন বা বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন—প্রত্যহ দ্বিপ্রহরটা তার এই করেই কাটত।

এই ভাবে বড়দার দিন কাটে। ছেলেদের দল বড় হয়, বড়দা বাপের দল ছেড়ে আবার ছেলেদের দলে ঢোকে। এইরকম প্রায় তিন দল ছেলে পার করবার পর বড়দার সঙ্গে আমাদের ভাব হলো—।

পাড়ার একজনদের বাড়িতে একটা চওড়া রোয়াক ছিল। এই রোয়াকের ওপর রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ছেলেদের নিয়মিত আড্ডা বসতো, আর সেখানে বড়দা কখনো অনুপস্থিত থাকতো না।

বড়দার সঙ্গে যখন আমাদের ভাব জমলো, তখন আমাদের বয়স তেরো থেকে সতেরো আর বড়দার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বৃদ্ধ বাপ ও ঠাকুরমা তখনো বেঁচে। আটহাতি ধুতি ছেড়ে তিনি দশ হাতি ধুতি পরতে আরম্ভ করেছেন, যদিও তার লম্বা চওড়া চেহারায় দশ হাত ধুতিও ছোট হয়। খালি গায়ে অসভ্যর মতন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় দেখে ভাইয়েরা তাকে বাউলদের মতন কৌপিন ধরণের জামা তৈরি করে দিয়েছে—তাই গায়ে সে রাস্তায় বেরোয়।

ছেলেদের আড্ডায় তখন দেশোদ্ধার, কুস্তি, খেলা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সব রকমের কথাই আলোচনা হয়—বড়দা তার মধ্যে প্রধান

বক্তা। সব বিষয়ের সব কথা সে জানে। ইউরোপ আমেরিকার কথা উঠলে সে এমন ভাব দেখায় যেন সারা জীবন সেখানেই তার কেটেছে। আমি তখন একটা মিশনারী স্কুলে পড়তুম। একদিন বাইবেল সম্বন্ধে কথা উঠতেই বড়দা বললেন—বাইবেল খুব ভাল বই। বাইবেল পড়লে খুব ভাল ইংরিজি শেখা যায়।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—বড়দা বাইবেল পড়েছেন ?

—বাইবেল পড়িনি, বলিস্ কি ? ইস্কুলে ফি বছরে বাইবেলে ফার্স্ট হতুম বলে আমায় মেডেল দিয়েছিল।

আমাদের চাপা হাসি, এমন কি উচ্চহাসি পর্য্যন্তও বড়দা মাঝে-মাঝে উপেক্ষা করত। বাইবেল গ্রন্থে বড়দার এতাদৃশ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমরা হেসে উঠতেই সে বললে—জানিস একদিন ডফ্ সায়েব আমাকে বললে—আমি শুনেছি তুমি খুব ভাল বাইবেল জান। আচ্ছা, আমি যদি বাইবেল থেকে কোন প্রশ্ন করি তো ঠিক উত্তর দিতে পারবে ?

আমি বললুম—পারবো স্যার্ !

সাহেব বললে—আচ্ছা বল তো—How many commas and semi-colones in the Old Testament ?

প্রশ্ন শুনেই ঝড়াক্‌সে বলে দিলুম। ডফ্ সায়েব তো অবাক্। আমাকে ঠকাবার জন্য প্রশ্ন করেছিল বটে, কিন্তু সে নিজেই জানতো না। শেষকালে তিনটে কেরাণী ডাকিয়ে Old Testament এর comma আর semicolon গোনাতে আরম্ভ কোরে দিলে। শেষকালে দেখা গেল, আমার উত্তর ঠিক হয়েছে। তাতেই তো মেডেল দিলে—বাবা শাদা চামড়া কি অমনি ভোলে—

বাড়ীতে একমাত্র পাচকঠাকুর, ঠাকুরমা আর খাস চাকর ভোলানাথ ছাড়া আর কারুর সঙ্গে সে বড় একটা কথাবার্তা বলতো না। অধিকাংশ লোককে সে চিনতই না। তার ভাইদের ছেলেমেয়ে, তাদের ও নিজের নাতিনাতনীদেরও সবাইকে সে চিনত না। বাড়ীর আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের মুখ সে একরকম ভুলেই গিয়েছিল।

বড়দাদের বাড়ীতে খুব সমারোহ করে দুর্গাপুজো হোতো। পাড়ার ছেলেবুড়ো তিন চারদিন দিবারাত্র তাদের বাড়ীতে সে সময় আড্ডা জমাতো। বাড়ির সকলেই ব্যস্ত, নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়ন, খাওয়া দাওয়া নিয়ে ছোটরাও দম ফেলবার অবকাশ পায় না। বড়দা কিন্তু নির্বিকার। সে আমাদের সঙ্গে একটি ঘরে বসে সমানে আড্ডা দিচ্ছে। নবমীর দিন থিয়েটার হবে, অমর দত্ত ভাল অভিনয় করে কি দানী ঘোষ ভাল অভিনয় করে, এই নিয়ে তুমুল তর্ক চালিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই দুজনের একজনকেও সে দেখেনি। তর্কে তার সঙ্গে কোনদিন কেউ পেরে উঠতো না। হেরে যাবার উপক্রম দেখলেই বড়দা বলতো—তোরা কি জানিস্ ? কালকের ছোঁড়া তোরা—

তাতেও আমরা না দমলে গালাগালি দিতে দিতে সে উঠে যেতো—আর সে যাচ্ছেতাই গালাগালি।

একবার পুজোর সময় আমরা ষড়যন্ত্র করলুম বড়দাকে জব্দ করতে হবে। বড়দার বাপ ছিলেন সৌখিন লোক। তিনি এই সময় কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গা থেকে ভাল ভাল নামজাদা সানাই বাজিয়ে নিয়ে আসতেন, অবিশ্যি কলকাতার হাড়িপাড়া থেকেও সানাই বাজিয়ে আনত, তবে সে সময় তারা বিশেষ পাত্তা পেত না।

সেবারে বোধনের দিন থেকেই আমরা বড়দাকে আক্রমণ শুরু করে দিলুম—আপনাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, বাড়ির লোকেরা তো নয়ই এমন কি নিমন্ত্রিতেরা পর্য্যন্ত নয়। কেউ চেনেই না আপনাকে—সবাই মনে করে লোকটা চাকর-বাকর ক্লাসের কেউ হবে।

বেশ বুঝতে পারা গেল বড়দা মনে-মনে গরম হচ্ছে। কারণ, তখন থেকেই সে চাকর বাকরদের ধমকধামক, ভাইদের নানারকম ফরমারেস করতে শুরু করে দিলে—আমাদের দেখাবার জন্য।

সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখলুম বড়দা একটা পরিষ্কার আলখাল্লা পরে বাড়িময় পা ঘষে-ঘষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে তার ভয়ানক ব্যস্তভাব। আমাদের দেখে বললে—এই যে এসেচিস, বোস্ বোস, আমার কি ভাই মরবার সময় আছে—বোস্ গিয়ে তোরা, আমি আসছি—।

আমরা ঘরে গিয়ে বসতে না বসতে বড়দা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে হাজির। বললে—ওঃ, সকাল থেকে খাটতে-খাটতে মরে গেলুম। বাড়িতে এত লোক, কিন্তু আমি না দেখলে কোনো কাজ কি হবার যো আছে, ইত্যাদি—বলে বেশ একটা জমাট আবহাওয়া ক'রে তুলেছে, এমন সময় আমাদেরই দলের একজন হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললে—এই যে বড়দা এখানে দিব্যি বসে আছেন, আর ওদিকে ধুম-ধাড়াক্কার মহারাজা সায়েব না খেয়ে চলে যাচ্ছেন!

বলা-বাহুল্য এ সব আমাদের আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।

কথাটা শুনেই বড়দার মুখখানা যেন কি রকম হয়ে গেল। কিন্তু পাছে তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, এজন্য আমরা বলে উঠলুম—ওঃ, ধুম-ধাড়াক্কার মহারাজা না খেয়ে চলে গেলে বড় কেলেঙ্কারি হবে। বড়দা যান যান—

বড়দা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে উঠে পড়ে বলতে লাগল—দেখ দিকিন্, বাড়িতে কি আমি ছাড়া আর অন্য লোক নেই। ধুম-ধাড়াক্কার মহারাজা সায়েব না খেয়ে চলে যাচ্ছেন, কেউ একটা বলবার লোক নেই—

আমরা তাড়া দিলুম—বড়দা চলুন চলুন—এখানে দাঁড়িয়ে লেকচার দিলে কি হবে!

আর কথা না বলে বড়দা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল নীচে। আমরাও পিছু পিছু চল্লুম।

নীচে তখন লক্ষ্ণৌয়ের সানাইওয়ালার দল বাজনা বাজিয়ে বাইয়ে বেরিয়ে

যাচ্ছিল। এবার তারা রকে বসে কিছুক্ষণ বিড়িটিড়ি ফুকবে—ততক্ষণ কাশীর দল বাজাবে।

কিন্তু সানাইওয়ালা হলে কি হয়, লক্ষ্ণৌয়ে তাদের বাড়ি। মাথায় রূপোর জরিদার গোলাপি পাগড়ি, গায়ে সবুজ সিল্কের শেরওয়ানী, তাদের গায়ে বড় বড় সাদা ফুলতোলা, ফিকে গোলাপী সাটিনের ইজের, পায়ে বাহারী নাগরী।

বড়দা সিঁড়ি দিয়ে নেমেই এই দলকে দেখতে পেয়ে দু-হাত দিয়ে তাদের পথ আগলে চীৎকার করে বলতে লাগল—সে হবে না, সে হতেই পারে না। আমাদের অকল্যাণ হবে—সে হবে না।

তারা লক্ষ্ণৌয়ের লোক, বাংলা বুঝতে পারে না। হঠাৎ একটা লোককে পথ আগলে এ রকম মিনতি ও অনুনয় করতে দেখে তারা প্রথমটা ভড়কেই গেল।—তারা উর্দুতে বলতে লাগল—আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি—এক্ষুনি আবার ফিরে আসবো।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বড়দা বলতে লাগলেন—না খেয়ে যাওয়া হবে না—এই আটটার মধ্যেই আপনাদের বসিয়ে দেবো—দয়া ক'রে যখন এসেছেন, তখন এমনি ছাড়বো না—ইত্যাদি—।

এততেও লোকগুলো সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে বড়দা হাঁপাতে-হাঁপাতে ঢুকে পড়ল বাপের ঘরে।

বড়দার বাবা ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি নিজের ঘরে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন, এমন সময় বড়দার প্রবেশ। বোধহয় বিশ বছর বাপেতে ছেলেতে বাক্য-বিনিময় হয় নি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! বড়দা চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করে দিলে—এই দেখুন বাবা, ধুম-ধাড়াক্কার মহারাজা সায়েব না খেয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি এত ক'রে বলছি, তা কিছুতেই শুনছেন না। আপনি একটু না বললে তো—

বাপ প্রথমে ছেলের ঐ আতিশয্য দেখে একটু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে চলে যাচ্ছে—!

—এই ধুম-ধাড়াক্কার মহারাজা সায়েব।

বাপ ছেলেকে চিনতেন, তাই বন্ধুদের সামনে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুলি, পোঁ-ধরা ও সানাই-ওয়ালাকে ঐ রকম খাতির করতে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাদের চলে যেতে বলে তিনি বড়দাকে বললেন—নিমন্ত্রিতদের খাতির করবার লোকের অভাব বাড়ীতে নেই—তুমি নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাক।

বড়দা কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে হঠাৎ চটি জুতো চটচটিয়ে হনহন করে নাচতে-নাচতে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন—বোধহয় বাপের নামে ঠাকুরমার কাছে নালিশ করতে।

নাদির শা ছিল শালওয়ালা। তার বাড়ি ছিল কাশ্মীর না পেশোয়ারের কোনো জায়গায়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের যে সব লোক কলকাতায় শালের ব্যবসা করতে আসত, তাদের

কাবুলীওয়ালা বলা হ'ত। এখানকার সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, এরা কাবুল থেকে আসে। লোকে মনে করত তারা সাংঘাতিক জীব, ভয়ে তাদের কাছে কেউ এগুতো না। অথচ তাদের অধিকাংশই ছিল ভালমানুষ। নাদির শা প্রতি বৎসর শীতের সময় কলকাতায় আসতো শাল বিক্রি করতে। বাঙালীদের সঙ্গে তার কারবার ছিল। হাজার হাজার টাকার শাল লোকের বাড়িতে ধার দিয়ে যেত আর দু-তিন বছরে সেই টাকা আদায় হতো। আমাদের পাড়ার প্রায়

প্রত্যেক লোকের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছিল। প্রায় প্রতি রবিবারেই সে পাড়ায় আসত, রকে বসে কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্প-সল্প করতো। তার মুখে ভাঙা ভাঙা বাংলা বুলি ভারি মিষ্টি লাগতো।

বড়দাকে নাদির শা খুবই খাতির করতো। কারণ বড়দা শাল সম্বন্ধে যত কথা জানতেন, সাত পুরুষ ধরে শালের ব্যবসা করেও নাদির শা তত জানতো না। সে ছিল ব্যবসাদার, তার হিসাবের খাতায় কল্পনার স্থান ছিল না, আর বড়দা বাস করতেন কল্পলোকে। তার ওপরে ছোট বড় সব জিনিসের ওপরেই রহস্যের একটা আবরণ না দিলে বড়দা স্বস্তি পেতো না। বড়দা বলতো—হিমালয়ের চুড়োয়—সেই এভারেস্টের কাছাকাছি অন্ধকার গুহার মধ্যে এক রকম জীব বাস করে—তারা হয় জন্মান্ধ। তাদের গায়ের লোমে যে শাল হয়, তার তুল্য শাল জগতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। লাসায় সে শাল পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় তিব্বত থেকে পালিয়ে আসবার সময় সেই রকম একজোড়া শাল নিয়ে এসেছিল। তার নাতিদের গায়ে সেই শাল দেখেছি—।

নাদির শা ভালমানুষ হ'লেও বুদ্ধিমান ছিল, সে বড়দার কথার প্রতিবাদ করত না এবং এমন ভাব দেখাতো যে শাল সম্বন্ধে বড়দার কাছে সে একেবারে অজ্ঞ বললেই হয়।

একদিন রকে বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে-করতে নাদির শা বড়দাকে লক্ষ্য ক'রে বললে—এ মহল্লার ছেলে বুড়ো সবাইকে শাল বিক্রি করলুম, কিন্তু আজ পঁচিশ বছরের মধ্যে বড় বাবু আমার কাছ থেকে একখানা রুমালও খরিদ করলেন না। এ আফসোস আমার জীবনেও যাবে না।

আমরা বড়দার পেছনে লাগলুম—ছি ছি বড়দা, আপনি কতদিকে কত পয়সা খরচ করেন আর নাদির শা বেচারিকে কেন এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছেন। আপনার মত সৌখিন লোক শাল না কিনলে ওদের ব্যবসা চলবে কি করে?

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বড়দা গরম হ'য়ে উঠলো। বললে—আচ্ছা নাদির শা, ভাল শাল আছে? জামেয়ার, জামেয়ার চাই।

—আছে—বৈকি—হুজুর,—দেখুন না দয়া ক'রে।

মুটের মাথা থেকে বিরাট বোঝা নামিয়ে নাদির শা বড়দাকে শাল দেখাতে আরম্ভ করলে। ঘন্টাখানেক ধরে চেঁচামেচি ক'রে শেষে একখানা জামেয়ার বড়দা পছন্দ করলেন। চমৎকার জিনিষ, দাম ছশো টাকা। আজকের দিনে

সে জিনিষের দাম অন্ততঃ আড়াই হাজার টাকা। শালখানা হাতে নিয়ে বড়দা খুশিতে ফেটে পড়তে লাগলো। তারপর চটি ঘষতে ঘষতে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

পরের দৃশ্য—বড়দার বাবা আপিস ঘরে বসে কাজ করছেন, দু-একজন কর্ম্মচারী আসে পাশে দাঁড়িয়ে, এমন সময় শাল বগলে নিয়ে নাচতে-নাচতে বড়দার প্রবেশ। অনেকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করার পর বড়দার বাবাই মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ! কি চাই তোমার ?

বড়দা বগল-চাপা থেকে শালখানা মুক্ত করে বাপের হাতে দিয়ে বল্লে—দেখুন দিকি শালখানা কেমন হবে ?

শালখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখে তিনি বল্লেন—ভাল শাল।

বড়দা বল্লে—ছশো টাকা দাম চাইছে।

বড়দার বাবা আবার সেখানা বেশ ক'রে দেখে বল্লেন—তা বেশী বলে নি। কার শাল এটা ?

—ওটা আমি নিচ্ছি, নাদির শার কাছ থেকে।

—তুমি শাল কিনছ !

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শাল নিয়ে তুমি কি করবে ?

—এই কোথাও বেরুতে-টেরুতে হোলে শীতকালে একখানা শাল চাই কিনা, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে—।

—তুমি তো বাপু জন্মে কোথাও যাও না। বুড়ো বয়সে আমাকে ছুটতে হয় লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

—এবার থেকে ভাবছি আমিই যাব।

—বেশ ভাল কথা। আমার দশ বারোখানা ভাল শাল আছে, তাই গায়ে দিয়ে যেও। মিছিমিছি ছশো টাকা দিয়ে শাল কেনবার এখন কিছু দরকার নেই।

বড়দা শালখানা নিয়ে আসছিল, কিন্তু বহুদর্শী পিতা বল্লেন—ওখানা আমার কাছে রেখে যাও, নাদির শা এলে আমিই তাকে ফিরিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালবেলা আড্ডার দিকে যাচ্ছি। দেখি বড়দা নিজেদের বাড়ির সামনে মুখটি চূণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বল্লুম—চলুন বড়দা রকে যাবেন না ?

বড়দা ইংরেজিতে বল্লে—No

হঠাৎ বড়দার এই ভাবান্তর ও ভাষান্তর দেখে কৌতুক বোধ করলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে বড়দা ? বড় ম্লান দেখাচ্ছে আপনাকে।

বড়দা ইংরেজিতে বল্লে—I am in great distress. Can you lend me twenty rupees ? Payable when able.

—আমার কাছে তো টাকা নেই বড়দা।

—টাকা নেই তো ধার ক'রে এনে দাও।

—আমাকে কে টাকা ধার দেবে বড়দা ?

—আমাদের দারোয়ানের কাছ থেকে ধার নাও, আমি বলে দিচ্ছি।

বড়দার পেছনে লাগলেও আমাদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ ছিল। তার বিপদে সাহায্য করা এমন একটা ভয়ানক কার্য কিছু ছিল না। বল্লুম—বেশ দারোয়ানকে বলে দিন আমাকে দিতে।

কিন্তু সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক দরোয়ানকে তখন খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেই দিনই বিকেলে পাড়াময় হৈ-হৈ লেগে গেল, বড়দা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। বেলা একটার সময় স্নান ক'রে আর বাড়ির মধ্যে খেতে যায়নি। নিজের ঘরে গিয়ে আলখাল্লা পরে বেরিয়ে গিয়েছে। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই, যে যার কাজে গেছে। শুধু এক ভাই বাড়িতে ছিল, সে ছুটোছুটি করতে লাগল। বাপ শুনে গুম্ হয়ে বসে রইলেন। বাড়ির মধ্যে ঠাকুরমা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রে কান্না-কাটি আরম্ভ ক'রে দিলেন।

তদন্তে প্রকাশ হোলো, আমার সঙ্গে দেখা হবার পর পাড়ার আর একটি ছেলের সঙ্গে বড়দার দেখা হয়েছিল। এই ছেলেটির নাম নগেন। বড়দার নামও ছিল নগেন, তাই সে একে 'মিতে' বলে ডাকত। নগেনের কাছে টাকা চাইতে সে বড়দাদের দারোয়ানের কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করে তাকে দিয়েছে, অবশ্য—Payable when able systemএ। শুধু তাই নয়, বড়দা নগেনকে বলেছে যে, একজন গরীব বিধবাকে কাশী যাবার জন্য কুড়িটি টাকা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিল—তাকে—টাকা দিতে না পারলে মাথা কাটা যাবে। নগেনকে দিয়ে বড়দা City Booking Office থেকে একখানা কাশী যাবার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটও আনিয়েছে। টিকিট কিনে এনে দিয়েছে বেলা চারটের সময়।

টাইম টেবেলে দেখা গেল কাশী যাবার একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী ছাড়ে সন্ধ্যা ছটায়। আদ্যোপান্ত ব্যাপার শুনে আমরা সিদ্ধান্ত করলুম বড়দা নিশ্চয় কাশী পালিয়েছে। কিন্তু তার ভাইরা সে কথা বিশ্বাস করলে না। কোন্ বিধবাকে টাকা দেওয়া সম্ভব তারই জল্পনা তারা করতে লাগল। আমরা আর কাল বিলম্ব না কোরে দশ বারোজন ছুটলুম হাওড়া স্টেশনে।

স্টেশনে পেঁছে ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে লোক দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা তিন চারজনে, প্ল্যাটফরমে ঢুকলুম। গাড়ী ছাড়তে তখন বোধহয় মিনিট দশেক দেরী—ভীড়ে অগ্রসর হওয়া যায় না। আমরা দু-জন 'বড়দা' 'বড়দা' বলে চীৎকার ক'রে স্টেশনের এ-মুখো থেকে ও-মুখো দৌড়তে লাগলুম, আর দু-জনে গাড়ীতে-গাড়ীতে উঁকি মেরে দেখতে লাগল—কিন্তু বড়দার সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষকালে আমরা 'বড়দা' ছেড়ে 'নগেনবাবু', 'নগেন', 'ওরে নগা' বলে চ্যাঁচাতে লাগলুম, কিন্তু কোথায় সে !

একজন বুদ্ধি দিলে দেখ এমনিতে হবে না, এস গালাগালি দিয়ে ডাকতে আরম্ভ করা যাক। যাহাতক বলা অমনি চতুর্মুখ দিয়ে হুংকার বেরুতে লাগল

—'ওরে শালা নগা, 'নগা শালা আর কত জ্বালাবি রে!' 'নগেন শালা বেরিয়ে পড় না—' ইত্যাদি'!

গালাগালির কি অপূর্ব মহিমা! আমরা যতক্ষণ বড়দা, নগেনবাবু ইত্যাদি বলে চীৎকার করছিলুম ততক্ষণ স্টেশনের কোন লোকই ভ্রূক্ষেপ করছিল না। নামের আগে পেছনে 'শালা' শব্দটি জুড়তেই স্টেশন-শুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে উঠল। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কি হয়েছে মশাই, কাকে খুঁজছেন আপনারা?—

যারা স্টেশনের ধারের বেঞ্চে বসেছিল তারা কোমর অবধি বের করে ঝুঁকে দেখতে লাগল। গাড়ীতে গাড়ীতে যত 'নগা' ও 'নগেন' ছিল তারা ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। এমন কি ইঞ্জিনটা পর্য্যন্ত গাঁক-গাঁক করে ডাক ছাড়তে আরম্ভ করে দিল।

ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ী অবধি বার দুয়েক 'নগাশালা' বলে চেঁচিয়ে ছুটোছুটি করতেই দেখা গেল আমাদের বড়দা প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমরা ত তাকে দেখেই ধরে ফেল্লুম। তখুনি আমাদের চারপাশে কৌতুহলী দর্শকের ভীড় লেগে গেল।

ভীড় থেকে বেরিয়ে একটু ফাঁকে গিয়ে দাঁড়ান মাত্র আমরা কিছু বলবার আগেই বড়দা শুরু করে দিলে—বাপের বয়সী ভাইকে শালা-সম্বন্ধী করে খুব বাহাদুরী হচ্ছে, না? এত লোকের সামনে এমন করে আমাকে অপমান না করলে আর চলছিল না, কেমন—

তারপরে যে ভাষায় সে কথা বলতে আরম্ভ করলে তা আর ছাপানো যায় না।

টের পাওয়া গেল বড়দা একটা থার্ড-ক্লাস কামরার সামনে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে একটা প্রথম শ্রেণীর পায়খানায় ঢুকে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু গালাগালি বরদাস্ত করতে না পেরে শেষ কালে বেরিয়ে পড়েছে।

আমরা বললুম—যা হবার তা হয়ে গিয়েছে,—গালাগালি যা দিয়েছি, তার জন্য পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি—এবার আপনি বাড়ি চলুন।

বড়দা বললে—বাড়ি আর আমি ফিরবো না। কাশী চললুম, আমাকে বাবায় টেনেছে। কার সাধ্যি আমাকে ফেরায়; বাবার টান—

ভোঁ কোরে বাঁশি দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। বড়দা আমাদের ধাক্কা দিয়ে চলতি ট্রেনের দিকে ছুটল। স্টেশন শুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে উঠল। দু-জন টিকিট চেকার তাকে ধরে ফেলতেই সে ভয়ে তাদের হাত ছাড়িয়ে আমাদের আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালো।

বড়দাকে নিয়ে তো আমরা প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলের অন্য যারা বাইরের ঘাঁটি আগলাচ্ছিল, তারা সব এসে জুটল। বড়দাকে আমরা অনুনয় করতে লাগলুম—বড়দা লক্ষ্মীটি বাড়ি চলুন।

বড়দা গাঁট হয়ে বসে রইল। বলতে লাগল—যে-বাড়িতে এত বড় ছেলের ইজ্জত নেই, সে-বাড়ি আমার নয়, আমি কাশী চলে যাব।

বেগতিক দেখে বড়দার ঠাকুরমাকে নিয়ে আসবার জন্য জন তিনেক বাড়ির দিকে ছুটল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বড়দার ঠাকুরমা ও ছোট ছেলে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হল।

ঠাকুরমা বললেন—চল্ নগা, বাড়ি চল্।—বড়দা কিছুতেই উঠবে না। সে বলতে লাগল—আমি আর বাড়ি যাব না, সেখানে ফিরে গিয়ে কি হবে?

ঠাকুরমা কাঁদতে লাগলেন। দেখাদেখি বড়দাও কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। ঠাকুরমা বলতে লাগলেন—চল বাড়ি চল, লক্ষ্মী-ধন আমার, দাদু আমার— আমি তোকে দশখানা শাল কিনে দেবো।

বড়দা কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল—আমার জামা নেই, জুতো নেই, কিচ্ছু চাইনি আমি—একখানা শালের জন্য অপমান!

বড়দা কিছুতে উঠবে না, ঠাকুরমাও কিছুতে ছাড়বে না। পঁচাশী বছরের ঠাকুরমা—তাঁর নাতি নাতিদের হাতে খড়ি হয়ে গেছে—বাহান্ন বছরের নাতির সঙ্গে সেকি মান-অভিমানের পালা!

শেষকালে ঠাকুরমা বললেন—চল নগা, আজ কিমার পুর দিয়ে তোকে পুরি তৈরী ক'রে দেব।

কিমার পুর দিয়ে পুরীর কথা শুনে বড়দা বিচলিত হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে সে বললে—তোর সব মিছে কথা। সেদিন কিমার পুরী তৈরী করবি বললি আর খেতে গিয়ে দেখি ঠাকুর শালা ডালপুরী রেঁধে রেখেছে।

ঠাকুরমা বললে—ছি বাবা, বামুনকে কি গালাগালি দিতে আছে! চল্ আজ তোকে আমি নিজের হাতে কিমার পুরী তৈরী করে দেবো।

এবার বড়দা উঠে পড়ল। আমাদের চারপাশে তখন দু-পাঁচ হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে। ভীড় ঠেলে স্টেশনের বাইরে এসে বড়দাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলুম।

খাওয়া-দাওয়ার কথা উঠলে বড়দার জ্ঞান থাকত না। নিত্য নতুন খাবার নিজের মাথা থেকে উদ্ভাবন করে ঠাকুরমাকে গিয়ে সে ফরমাস করতো, আর সামান্য একটু ইতর-বিশেষ হলে পাচক ঠাকুরের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়তো।

শুধু তাই নয়, অন্যান্য জিনিসের মতন খাদ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারটার ওপরেও সে একটা রহস্যের আবরণ দেবার চেষ্টা করতো।

বড়দা বলত—পঁচিশ বছর আগে লক্ষ্ণৌয়ের এক বাবুর্চি নবাব বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে মারহাট্টা ডিচের কাছে এক খোলার বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। আমার কাছে বাবা ঠিক খবর আসে। খুঁজে-খুঁজে একদিন সন্ধ্যের সময় ঠিক তাকে ধরে ফেলা গেল। ইয়া ঘাত অবধি ধপধপে সাদা বাবরী চুল—বুক অবধি লম্বা শাদা দাড়ি। আরে প্রথমে সে কি মানতে চায়! সেদিন তো এক রকম তাড়িয়েই দিলে। আমিও নাছোড়বান্দা, পরের দিন আবার গেলুম। সেদিনও

সে রাজী হোলো না। তার পরের দিন আমার কথা-বার্তায় খুশী হয়ে একদিন রান্না করে খাওয়াতে রাজী হয়ে বললে—আচ্ছাবাবু, বল তুমি কি খাবে?—

বললুম—মাংস্‌টাংস কিছু রেঁধে খাওয়াও, আমরা বাঙালী, মাছ তো দু-বেলা খাচ্ছি—

আমার কথা শুনে বুড়ো বললে—আচ্ছা বাবু আমি তোমায় মাছই রেঁধে খাওয়াব। কাল সন্ধ্যের পর এস।

বাবুর্চি মিঞাকে সেদিন দশটি টাকা দিয়ে বললুম—এই নিয়ে তুমি জিনিসপত্র কেন। তোমার বকসিস কাল দোব।

পরের দিন সন্ধ্যের পর বাবুর্চির বাড়ি যাওয়া-মাত্র আমাকে সে খুব খাতির করে বসালে। বললে—বাবু ঠিক সময়ে এসেছ, আর একটু দেরী হলে মাছ ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

এই বলে একটা ফরাসের ওপরে আমাকে বসিয়ে তক্ষুনি বাড়ির ভেতরে গিয়ে একটা প্লেট এনে আমার সামনে রাখলে; প্লেটের ওপরে দেখি এক হাত লম্বা আর এক বিঘৎ চওড়া একটা কৈ মাছ। এত বড় কৈ মাছ জন্মে কখনো দেখিনি। মাছটাকে এমন ভাবে রাঁধা যে তার চোখ দুটো তখনো একেবারে জ্যান্ত মাছের মতন জ্বলজ্বল করছিল। মনে হোতে লাগল আমার দিকে চেয়ে-যেন সেটা বলছে, কিরে আমায় খাবি নাকি?

মিনিট দুয়েক ত আমি প্লেটের দিকে হাঁ কোরে চেয়েই রইলাম।

বাবুর্চি বল্লে—বাবু সায়েব খেতে শুরু করুন—খাবার ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।

তারপরে ভাই মাছটায় যেমন হাত দিয়েছি অমনি সেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আমি তো ভয়ই পেয়ে গেলুম। একি মাছ! না মাছের ভুত? কি জানি বাবা লক্ষ্নৌয়ের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না।

তবুও অপ্রস্তুত হবার ভয়ে আমি সেটাকে প্লেটের সঙ্গে চেপে ধরলুম। কিন্তু সে কি জোর। আমার হাত ছাড়িয়ে সেটা প্লেট-ময় লাফিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে। দু-হাতে সেটাকে চেপে ধরে রাখতে পারি না—এমন কাণ্ড।

শেষকালে বাবুর্চি একটা কাঁটা ও ছুরি এনে দিতে সেটাকে কাঁটায় চেপে ধরে একেবারে আট-দশ টুকরো করে ফেললুম। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবিনে—সেই কাটা টুকরোগুলো পর্যন্ত প্লেটময় তুরু তুরু করে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল।

বাবুর্চিকে জিজ্ঞসা করলুম—ব্যাপার কি বল দিকিন?

বাবুর্চি বলল্লে—ও মসলার গুণ।

তারপর এক টুকরো মাছ মুখে দিয়ে বললুম—আহা।

এই বলে বড়দা শিবনেত্র হয়ে টাকরার ওপর জিভ দিয়ে জোরে ঠাঁই করে এমন একটা শব্দ করলে যে মাথার ওপরে কার্নিশে কতকগুলো পায়রাবসেছিল—ছররা ছাড়া হচ্ছে মনে করে তারা ফরু ফরু করে উড়ে পালিয়ে গেল।

এই রকম দিল্লী, আগ্রা, বেরিলী, উইলসনের হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে পালিয়ে-আসা বাবুর্চি'দের অদ্ভুত রান্নার কথা বলতে-বলতে বড়দা দস্তুরমত উত্তেজিত হয়ে উঠত। কিন্তু কেন যে তারা তাদের নির্দিষ্ট চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার অতি জঘন্য গলিতে এসে আত্মগোপন করে বাস করে এবং অতিরিক্ত পয়সার বিনিময়েও লোককে খাবার তৈরী করে দিতে রাজী হয় না, কেনই বা তারা বড়দার অনুরোধ ঠেলতে পারে না—সে রহস্যের আবরণ কোনদিনই আমরা উন্মোচন করতে পারিনি।

একদিন আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—বড়দা, কামধেনুর দুধ খেয়েছেন?

—কামধেনু কি?

—যার দুধ খেলে চির-যৌবনই থেকে যায়, লোকে আর কখনো বুড়ো হয় না।

বড়দা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু-তিনটে ঢোঁক গিলে বল্লে—না, কামধেনুর দুধ খাই নি, তবে সোনার হাঁসের ডিম খেয়েছি। তাতে ঐ ফল একই হয়, মানুষ যে বয়সে খায় সেই বয়সই থেকে যায়।

—বলেন কি বড়দা? সোনার হাঁসের ডিম তো একমাত্র বইতেই পাওয়া যায়, বাজারে তো তা বিক্রি হয় না।

—যায় রে যায়। তেমনি করে খুঁজলে বলে ভগবানকে পাওয়া যায় তো সোনার হাঁসের ডিম।—

আচ্ছা অতখানি একতাল সোনা গিল্লেন কি করে—গলায় বাধলো না?

—দূর বোকা! ডিমটা কি আর সোনার তৈরী? খোলটা দেখলে মনে হয় যেন সোনার। মনে হয় যেন হ্যামিলটনের বাড়িতে অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো হয়েছে। ভাঙবার সময় আওয়াজও হয় টুংটাং করে। ভেতরের পদার্থটি যেন সোনা-গলানো। কাঁচা খেতে হয়, খেতে যেন একেবারে মধুর মত মিষ্টি।

বড়দা বলে যেতে লাগল—সমুদ্রের মধ্যে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় যে চূড়া একেবারে সমুদ্রের ওপর ঝুলে পড়েছে এমন জায়গায় এ সব হাঁস বাসা বাঁধে। এই হাঁস ধরতে গিয়ে কত দেশের কত লোক যে প্রাণ দিয়েছে তার ঠিকানা নেই—জোড়া ধরতে হবে কিনা। একমাত্র ঈগল পাখীরাই নির্বিবাদে তাদের ডিম খেতে পায়। ক্রমেই এই হাঁস পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমরা বল্লুম—আপনি তো আর ঈগল পাখী নন, আপনার বরাতে সে ডিম জুটল কি করে?

বড়দা বল্লে—অনেকদিন আগে থাকতেই শুনছিলুম বর্মার একজন লোক এই রকম এক-জোড়া হাঁস যোগাড় করেছে। কয়েক বছর পরে সন্ধান পেলুম লোকটা কলকাতায় এসেছে। সেই দিন থেকে তক্কে-তক্কে ফিরতে লাগলুম। শেষকালে একদিন রাত-দুপুরে ছকু খানসামা লেনের এক খোলার বাড়িতে তাকে গিয়ে ধরলুম। লোকটা প্রথমে ত মানেতেই চায় না। আরে বাবা, আমার কাছে উড়বি কতক্ষণ!—শেষকালে ধরা পড়ে গেল।

দর্-দস্তুর ঠিক হয়ে গেল—একটা ডিমের দাম একশো টাকা। সে হাঁস আবার আমাদের দেশী হাঁসের মতন অগুন্তি ডিম দেয় না, মাসে একটা ডিম পাড়ে। আমার বারোটি ডিমের দরকার, কারণ উপরি-উপরি বারো মাসে বারোটি ডিম খেতে পারলে যে বয়সে খাবে সেই বয়সই থেকে যাবে। যা হোক, প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তারিখে রাত্রি বারোটার সময় গিয়ে একটি করে ডিম খেয়ে আসতে লাগলুম। কিন্তু আমার যেমন কপাল, দশ মাস খাওয়ার পর এগারো মাসে গিয়ে দেখি লোকটা সরে পড়েছে—আমার হাজারটা টাকা লোকসান গেল।

মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ছিলেন স্বদেশী যুগের একজন নেতা। ভদ্রলোক সারাজীবন ধরে হিন্দু-মুসলমান মিলন-রূপ সোনার পাথরবাটীর স্বপ্নেই কাটিয়ে গেছেন। একবার সরকারী আদেশ অমান্য করে তাঁর বছর আড়াই-তিনেকের কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আমাদের পাড়ায় একটা মনোহারী দোকান খুলেছিলেন। দোকানে সামান্য দু-তিন শিশি গুড়ের লজঞ্জুস, পেন-হোল্ডার, Exercise Book, মোষের শিং এর বোতাম, চিরুণী, কাগজ এই ছিল বিক্রয়ের সামগ্রী। কিন্তু জিনিস সামান্য হোলে কি হয়, তিনি দোকানের নাম দিয়েছিলেন কুবের ভাণ্ডার। মৌলবী সায়েব এই দোকান ঘরেই বাস করতেন। তাঁর কাপড় চোপড়ও ঘরের এক কোণে ঝোলানো থাক্‌ত। রাত্রে ছোট একটি টিমটিমে আলোতে ঘরখানার দারিদ্র্য যেন আরও ফুটে উঠ্‌ত। আমরা দু-তিন জন একদিন গোপনে বড়দাকে বল্লুম—বড়দা, Spences Hotel থেকে একজন উঁচুদরের বাবুর্চি পালিয়ে এসেছে—।

বড়দা একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল—কোথায়, কোথায় ?

বল্লুম—পাছে লোকে জ্বালাতন করে এই ভয়ে সে অমুক জায়গায় কুবের ভাণ্ডার নাম দিয়ে একটা দোকান খুলেছে। কিন্তু ওসব দোকান-টোকান কিছুই নয়—সব আত্মগোপন করবার ছল মাত্র। শুনেছি তার রান্না খেলে নাকি মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।

কথাটা বড়দার মনে খুব লাগল। বল্লে—বলিস্ কিরে! দোকানটা দেখিয়ে দিস্ তো।

সেইদিন বিকেল বেলায় দূর থেকে বড়দাকে দোকানটা দেখিয়ে দেওয়া গেল।

পরের দৃশ্যে ঃ—রাত্রি আটটা। কুবের ভাণ্ডারের মধ্যে মৌলবী সায়েব বসে আছেন বিষন্ন মুখে। সেই সকালে পয়সা দু-একের লজঞ্জুস বিক্রি হয়েছে—মন-মেজাজ তাঁর অত্যন্ত খারাপ, বোধ হয় সকাল বেলার আহারাদিও হয় নি, টিমটিম করে আলো জ্বলছে—এমন সময় দরজার কাছে বড়দার আবির্ভাব। ঘরের মধ্যে না ঢুকে সেইখানেই দাঁড়িয়েই বড়দা লক্ষ্ণৌই উর্দুতে মৌলভী সায়েবকে ডাক দিলেন—এই একবার শুন তো ইধার আকে।

মৌলবী সায়েব লোকটার পোষাক, হালচাল ও ভাষা শুনে একটু আশ্চর্য হোয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেয়া হ্যায়! কওন হ্যায় তুম ? কেয়া মাংতা ?

বড়দা বল্লে—আরে বাবা একটু ইধার আকে শুনো না। চেঁচিয়ে বোলে গা তো তুমহারাই খারাপ হোগা।

মৌলবী সায়েবের স্বভাবটা ছিল কিছু উগ্র। যারা তাঁকে চিনত না তারা মনে করত লোকটা সব সময়ে চটেই আছে। সেদিন তাঁর মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল। তবুও বড়দার আহ্বানে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বড়দা চারিদিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বল্লে—চপ্ হ্যায়, চপ্ ?

মৌলবীর মেজাজ তখন চড়তে আরম্ভ করেছে, তিনি চীৎকার করে উঠলেন—কেয়া বোল্‌তা ? শালা পাগ্‌লা হ্যায় না কেয়া ?—

—আরে বাবা চীৎকার কাহে করতা ? জরা ধৈর্য ধরকে শুনো না। তুম তো স্পেন্‌সেস হোটেল সে ভাগ্‌কে আয়া। চপ্ তৈরী হ্যায় ? হাম সব জানতা হ্যায়, হাম্‌কে বেচনে সে কুছ গোলমাল নেহি হোগা।

এর পরের ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়। মৌলবী সাহেব যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। বড়দা তাতেও না যাওয়ায় শেষকালে কোণ থেকে বাঁশের ডাণ্ডা বের করায় বেগতিক দেখে বড়দা পালোয়ান করলেন।

পরের দিন বড়দাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—এখনো খোঁজ নিইনি—দু-একদিনের মধ্যেই যাব—দেখব তোমাদের স্পেনসেস্ হোটেলের বাবুর্চি কেমন রাঁধে।

বড়দার বাবার বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি সারা জীবন শূল বেদনায় ভুগছিলেন, ইদানীং বড় একটা বাইরে বেরুতেন না। দুই ছেলে আর নাতি অর্থাৎ বড়দার দুই ছেলে—এরাই ব্যবসায় দেখছিল। এই সময় দিন কয়েক অসুখের বাড়াবাড়ি হোয়ে তিনি মারা গেলেন—বড়দার ঠাকুরমা তখনো জীবিত।

বাপের শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যাবার পর বড়দাদের বিষয় ভাগাভাগি হোয়ে গেল। ভাইয়েরা খুব ভাল, তারা চুল চিরে তিনভাগ ক'রে একভাগ বড়দাকে দিলে। পৈত্রিক ব্যবসা একই রইল বটে কিন্তু তার লাভালাভ তিন ভাগ ক'রে একভাগ বড়দার দুই ছেলেকে দেওয়া হোলো। উপরন্তু বড়দার নামে সেই যে পঁচিশ হাজার টাকার বীমা করা হয়েছিল, সেই টাকাটা তারা বড়দাকে দিয়ে দিলে। বিষয় ভাগের সময় ভাইরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বড়দা তোমার কি চাই ? কোন্ বাড়িটা কিংবা কোনো জিনিসের উপর যদি তোমার ঝোঁক থাকে তো বল, সেটা তুমি পাবে।

বড়দা বল্লে—ঠাকুরমাকে আমার ভাগে চাই।

পাড়ার লোকেরা মনে করেছিল বড়দার ভাইয়েরা তাকে বিষয় থেকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে, জাল উইল বের হবে, তারপরে হাইকোর্টে ছুটোছুটি হবে। অন্ততঃ তাদের বড় বাড়ির মধ্যে দুটো দেওয়াল উঠে বাড়িখানা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে কোথাও কিছুই পরিবর্তন হল না। পরিবর্তন

এল এক শুধু বড়দার জীবনে—যা তারা স্বপ্নেও কোনদিন মনে করতে পারে নি।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর ন্যাড়া মাথায় তখনো আধ ইঞ্চি চুলও বাড়েনি এমন সময় বড়দা গিয়ে সাহেব বাড়ি থেকে চুল ছাঁটিয়ে এল। বাপের মৃত্যুর দিনে সেই যে সে কৌপীন খুলে ফেল্লে আর তা পরলে না। আগেও বলেছি বড়দার বাবা খুব সৌখীন লোক ছিলেন। মারা যাবার কিছুদিন আগে তিনি খুব একটা দামী মি-লর্ড ফিটনগাড়ি ও ঘোড়া কিনেছিলেন। এই গাড়ি ও ঘোড়া বড়দার ভাগে পড়েছিল। বড়দা বাহান্ন ইঞ্চি শান্তিপুরী কোঁচান ধুতি, গিলে করা ঢাকাই মসলিনের পাঞ্জাবী, বুটিদার ঢাকাই চাদর গায়ে দিয়ে, দামী আতর মেখে প্রতিদিন বিকেলে বেড়াতে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

সকালবেলা রকে আর বড়দা আসে না। বিকেলে আমরা রকে বসে আড্ডা দিই—বড়দার গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে গম্ গম্ করে চলে যায়, সে ফিরেও দেখে না—আতরের গন্ধে রাস্তা মতোয়ারা হয়ে যায়।

বড়দার এই নূতন হালচাল দেখে আমাদের বড় অভিমান হল। অবিশ্যি একথা সত্য যে তার সঙ্গে আমাদের কোন জায়গাতেই মিল ছিল না। সে ছিল আমাদের বাপের বয়সী, সে ছিল ধনী-সন্তান, তায় আধ-পাগলা। আমরা তার পিছনে লাগতুম, রেগে গিয়ে সে মুখখিস্তি করে আমাদের গালাগালি করত। এসব সত্ত্বেও তার প্রাণখোলা মিষ্টি ব্যবহার, নিরভিমানিতা ও নিরন্তর সাহচর্যের ফলে আমাদের মধ্যে অলক্ষ্যে একটা অন্তরের যোগ স্থাপিত হয়েছিল। বিশেষত আমি ও আরো তিনজন বড়দাকে ভালও বেসেছিলুম। সে যখন আমাদের এইভাবে উপেক্ষা করে নিত্য বুকের ওপর দিয়ে মি-লর্ড ফিটনে চড়ে যাতায়াত করতে লাগল, তখন আড্ডার অন্য ছেলেরা আমাদের ঠাট্টা করতে আরম্ভ করে দিলে।

এই ভাবে মাস তিনেক কাটবার পর একদিন রবিবার দুপুরবেলা আমরা চারজনে বড়দার বাড়িতে গিয়ে তাকে ধরলুম। বল্লুম—বড়দা, বাপের বিষয় পেয়ে ভাইদের একেবারে ভুলে গেলেন! পাড়া-সম্পর্কে ভাই কিনা—

বড়দা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বল্লে—কি-রকম কি রকম! নিজেরা আমায় ত্যাগ করে আবার উল্টো চাপ দেওয়া হচ্ছে? বেড়ে মজা তো!

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে, বড়দার সঙ্গে মিল হয়ে গেল। বড়দা বল্লে—বিকেলে কি করবি? চল না দিশ্বি বেড়াতে যাওয়া যাবে।

বিকেলবেলা স্নান করে ধোপ-দোস্ত জামা-কাপড় পরে চার মূর্তিতে বড়দার বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। বড়দা তখন কাপড়-চোপড় পরে তৈরী। সে আমাদের গা শুঁকে বল্লে—এ্যাঃ, গা দিয়ে যে ধোপার বাড়ির গন্ধ বেরোচ্ছে—নে নে আতর মেখে নে—

এই বলে সে এক হাত লম্বা ও সেই অনুপাতে চওড়া একটা রুপোর বাক্স বের করে ডালাটা খুলে ফেল্লে। তার ভেতরে ভেলভেটের খোপের মধ্যে কত রকমের বাহারী ছোট বড় আতরের শিশি! আমরা সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করার

মত আতর মেখে নীচে নেমে গেলুম। গাড়িতে উঠে পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস্ বের করে কল টিপে পট করে ডালাটা খুলে ফেলে বড়দা বল্লে—নে একটা করে সিগারেট ধরিয়ে ফেল।

সিগারেট তো দূরের কথা এর আগে বড়দাকে কোন দিন নস্যি পর্যন্ত নিতে দেখিনি। তারপরে আমরা পাঁচজনে ঠেসাঠেসি করে গাড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে রকের বন্ধুদের বিস্মিত দৃষ্টির বুকের ওপর দিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেলুম। সন্ধ্যে অবধি গড়ের মাঠ ও গঙ্গার ধারের রাস্তায় ঘোরবার পর আমাদের গাড়ি চলল চিৎপুর রোডের ওপর দিয়ে—খোদ জায়গায় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বড়দার হালচাল দেখে আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা এত বেড়ে চলেছিল যে, মুখ দিয়ে কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত বেরুচ্ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল—অতঃ কিম্।

এদিকে গাড়ি থামা মাত্র বড়দা বালকের মত টপ্ করে লাফিয়ে নেমে আমাদের বল্লে—নেমে আয়।

বড়দার পিছু পিছু অন্ধকার উঠোন ও সিঁড়ি পেরিয়ে দোতালার একটা বড় ঘরে ঢোকা গেল। ঘরের মধ্যে দুটো মাঝারি গোছের ইলেকট্রিক ঝাড় জ্বলছে, মেঝেতে দামী কার্পেট ও তাকিয়া। একদিকে একটা ভাল হারমোনিয়াম ও তবলা বাঁয়া—আসর সাজন খালি বসলেই হয়।

আমরা তো যে যার এক-একটা তাকিয়া নিয়ে বসে গেলুম। বড়দা চেঁচাতে লাগল—কৈ কারুকে দেখা পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল সব? অনুমতি ও ও অনুমতি, ভীখণ—

অনুমতি নাম শুনেই তো আমরা হেসে উঠলুম। বড়দা বল্লে—হাসিস নি। নাম শুনেই হাসি, চেহারা দেখলে তো তা হলে কাঁদতে থাকবি।

বলতে না বলতে ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধার প্রবেশ। স্ত্রীলোকটির মাথার চুল পাকেনি বটে; কিন্তু অতীত জীবনে সংগৃহীত পণ্য-সম্ভারে দেহ তার একেবারে নুয়ে পড়েছে। বড়দা বল্লে—কি রে কোথায় থাকিস তোরা? বন্ধুবান্ধব নিয়ে এলুম তাদের খাতির করবার একটা লোক নেই!

স্ত্রীলোকটি আসরের দিকে চেয়ে আমাদের দেখে বল্লে—এরা সব বুঝি তোমার বন্ধু!

বড়দা বললে—বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। এই বলে আসর ছেড়ে উঠে সে স্ত্রীলোকটিকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল।

বড়দা ঠিকই বলেছিল—এইবার বোধহয় কাঁদবার পালা শুরু হোলো। হায়, হায়! এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসবার জন্য কি এত করে আতর মেখেছিলুম।

গুজ-গুজ ক'রে আমরা নিজের-নিজের মন্তব্য প্রকাশ করছি, এমন সময় হাসিমুখে বড়দা ঘরে ঢুকল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—এই কি বড়দার অনুমতি নাকি?

—দূর, ও অনুমতির মা, ওর নাম গনেশ।

বড়দা বলতে লাগল—ছেলেবেলা আমি ঐ গণেশের কাছে আসা-যাওয়া করতুম। ওর যা চেহারা ছিল আজ ওকে দেখে তোরা কল্পনাও করতে পারবিনে। একটা বছর দু-তিনের মেয়ে ছিল ওর। তার নাম ছিল শান্তি। দু-চার বার যাওয়া-আসা করতেই গণেশের সঙ্গে আমার বড় ভাব হয়ে গেল। একদিন গনেশ বল্লে—নগা, আমায় রাখনা ভাই। এর তার কাছে দেহ বেচে বেড়াই, কোথায় কোন্ দিন ভেসে যাব অথচ তোকে আমি ভালবাসি। আমাকে তোর কিছু দিতে হবে না, শুধু আমার ও মেয়েটার যা খরচ—ভাত কাপড়ের—

শুনে বড় দুঃখু হোলো। বল্লুম গণেশ তুই কিচ্ছু ভাবিস্‌নি। কথা দিচ্ছি, আমি তোকে রাখব।

—তখন আমি চাকরী শুরু করেছি, ষাট টাকা মাইনে পাই। ভাবলুম, মা আর ঠাকুরমার কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে গণেশের খরচ এক-রকম চালিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মারে কেষ্ট রাখে কে? কয়েকটা মাস যেতে না যেতেই বাবা আমার নামে এমন বীমা করিয়ে দিলেন যাতে মাইনের সব টাকাটাই চলে গেল। আমি রেগে-মেগে চাকরী ছেড়ে দিলুম। সেই থেকে আর গণেশের খোঁজই করিনি। বাবা মারা যাবার পর সাবালক হোয়েই গণেশকে খুঁজে বার করলুম। গণেশ কাঁদতে-কাঁদতে বল্লে—নগা কি দেখছিস্! দেখ আমার কি হাল হয়েছে।

গণেশ আমার সব কথাই জানত। আমি না এলেও ভেতরে ভেতরে সে আমার সন্ধান নিত। ওকে বল্লুম—যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে, এবার আমি সাবালক হয়েছি, হাতে টাকাও এসেছে, আর তোর কোনো ভাবনা নেই।

গণেশ বল্লে—তা হোলে এক কাজ কর। আমি তো বুড়ি হোয়ে গিয়েছি, তুই আমার মেয়েটাকে রাখ, ও টাকা পেলেই আমার পাওয়া হবে—আমি কিছুদিন তীর্থ ধর্ম করি।

ওর মেয়ে ছিল শান্তি, এতটুকু দেখেছি তাকে। জিজ্ঞাসা করলুম—শান্তি কোথায়? ডাক তো তাকে দেখি একবার।

গণেশ বল্লে—শান্তি নেই। বছর কয়েক আগে সে তার ভালবাসার বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। আমার আর একটি মেয়ে আছে—সে শান্তির চাইতে ভাল দেখতে।

অনুমতিকে দেখেই আমার ভারি পছন্দ হোয়ে গেল। কি করি, একদিন গণেশকে কথা দিয়েছিলুম, তা রাখতেই হবে। আমার কাছে বাবা তঞ্চকতা পাবে না। কথার খেলাপ করা কি উচিত! কি বলিস?—

বল্লুম—নিশ্চয় না। বড়দা আপনি আধুনিক হরিশ্চন্দ্র। আপনার এই সত্য রক্ষার কথা জগতে প্রচার করার ভার আমি নিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর আলো করে অনুমতি এল। সুন্দর দেখতে, বয়স বোধ হয় ত্রিশ হবে। দুটি বোতল সঞ্জীবনী, বরফ ও নানা রকমের খাবার দাবার এল। বড়দা আমাদের সঙ্গে অনুমতির পরিচয় করিয়ে দিলে। সে

তক্ষুনি আমাদের নামের পেছনে 'ঠাকুরপো' যোগ দিয়ে ডাকতে আরম্ভ করে দিলে—যেন কতকালের ভাব। আর আমরা তার নাম দিলুম বড়গিন্নি।

পিতৃবিয়োগের সঙ্গে মানুষের চরিত্র পরিবর্তনের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে বোধ হয়। যে বড়দা সারাদিন কল্পনার রাজ্যে কাটিয়ে দিলে—লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসেম্বলি, প্রাসাদ নির্মাণ, লক্ষ্ণৌ থেকে পালিয়ে-আসা আত্মগোপন-বিলাসী খানসামার দল, সোনার হাঁসের ডিম, মাংসের পুর দেওয়া পরোটা ছাড়া যার কোনো চিন্তাই ছিল না, ত্রিশ বছরের মধ্যে বাড়ীর হুদো ছাড়া যে বাইরে যায় নি, কোনো কথার প্রতিবাদ করলে বিজাতীয় ভাষায় যে জবাব দিত তার এই পরিবর্তন দেখে পিতৃবিয়োগ মানুষের জীবনে একটা মহোপকারী ঘটনা বলে সেদিন মনে হয়েছিল। আহার বিহার ও ব্যবহারে পূর্ব চরিত্রের এমন নিরন্বয় নাশ ইতিপূর্বে আর দেখিনি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা অনুমতির আসরে অনুপস্থিত হোলে বড়দার তলব পড়ত—কেন আসিস্‌নি, নিশ্চয় তুই রাগ করেছিস, কেন রাগ করেছিস বল, কে তোকে কি বলেছে, আজ তোর জন্য শ্যাম্পেন অর্ডার দিয়েছি। কি খাবি বল ইত্যাদি—বড়দার আদরের অত্যাচারে অস্থির হোয়ে উঠতে হোতো। প্রতিদিন দু-বোতল মদ আস্‌ত, তার এক বোতল বড়দাই খেত। অত নেশার মধ্যেও আমাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তার নজর তীক্ষ্ন। আমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনদিন রাত্রে বড়দার ওখানেই থেকে যাবার বাসনা প্রকাশ করত তো বড়দা যেন হাতে স্বর্গ পেত। তখুনি তার জন্য অল্পবয়স্ক নীরোগা সুশীলা সুন্দরীর খোঁজে পাঁচজন দালাল ছুট্‌ত, আর সারারাত্রি ধরে বড়দা নিজে তার তত্ত্বাবধান করত।

এমনি করে সুরা সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের স্রোতে আমরা ভেসে চলেছিলুম। পাড়ার কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারি না। ছেলে বুড়ো সকলেই বলে বড়দার মতন অমন লোকটাকে এরা বকিয়ে দিলে পঞ্চাশোর্ধে লোকে এমনভাবে বয়ে যেতে পারে দেখে পাড়ার বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া সধবারা নিজের নিজের ঘর সামলাতে আরম্ভ করলেন।

পাড়ার প্রশন্ন ঘোষ ছিলেন একজন মাতব্বর লোক। বড়দার ছেলেবেলার বন্ধু। ভদ্রলোকের নামটি যেমন ব্যবহারও তেমনি সদাপ্রসন্ন ছিল—আমরা প্রায়ই সকালে তাঁর বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়তে যেতুম। তাঁর সংগে সমাজ, রাষ্ট্র, খেলাধুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হোতো এবং তিনি বন্ধুর মত আমাদের সংগে আলোচনা করতেন। আমরা প্রসন্নবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতুম এবং তিনি যে আমাদের চাইতে বয়সে অনেক বড়, তুমুল তর্কের মধ্যেও সে কথা কখনো ভুলিনি। একদিন প্রসন্নবাবুর বৈঠকখানায় কাগজ পড়তে গিয়েছি, তাঁর সঙ্গে দেখা হোতেই মুখখানা গম্ভীর করে তিনি বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। পাড়ার ছেলেরা তো অভিভাবকদের ভয়ে প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিল, মুরুব্বির দল আমাদের দেখলেই মুখ কঠিন

করে চলে যেতেন। কিন্তু প্রসন্নবাবুর অপ্রসন্নমুখ দেখে পরদিন সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি কি আমাদের ওপরে বিরক্ত হয়েছেন?

প্রসন্নবাবু আমতা-আমতা ক'রে বল্লেন—দেখ হে, আমার স্ত্রী তোমাদের ওপরে ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন। তোমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি বলে আমাকে বড় গঞ্জনা দেন তিনি। সেইজন্য ঘরের শান্তি বজায় রাখতে তোমাদের সংগে কথা বলা বন্ধ করতে হয়েছে—তোমরা আর আমার ওখানে যেও না।

বড়দাকে এসব কথা বল্লে সে বলত—কেন যাস্ ওদের সংগে সেধে কথা বলতে ওরা কি আমাদের সংগে মেশবার যুগ্যি।

যাক্‌গে পাড়ার লোক! আমাদের দিন অর্থাৎ রাত্রিগুলি পরমানন্দ কাটতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব বদলে গেল—পরিবর্তনই কালের ধর্ম।

আমাদের নিত্য আড্ডা ছাড়া মধ্যে-মধ্যে এক একদিন বড়দা বড় জলসার আয়োজন করত। সেদিন ভাল-ভাল গাইয়ে বাজিয়ে আসত আরও দু-একজন আমরা যাকে মনে করতুম, তাদের নিমন্ত্রণ করা হোতো। নাচ, গান, ভূরিভোজন ও পানে সারারাত্রি কেটে যেত।

একদিন এইরকম একটা জলসার আয়োজন করা হয়েছে। পশ্চিম থেকে একজন বিখ্যাত তবলা বাজিয়ে এসেছে, সে আসবে; তাছাড়া আরও দু-তিনজন গাইয়ে বাজিয়ে আসবে—জোর মজলিস্ হবে—

এই রকম সব মজলিসের দিন বড়দা সকাল দশটার সময় খেয়ে দেয়ে অনুমতির ওখানে চলে যেত ব্যবস্থা করতে, আর আমরা যেতুম বেলা তিনটে চারটে নাগাদ। সেদিনও বড়দা আমাদের এক একজনের ওপর এক একটা কাজের ভার চাপিয়ে দশটার সময় চলে গেল।

বেলা প্রায় তিনটের সময় আমি ও আর একজন অনুমতির বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। অন্য দুজনের মধ্যে একজন গিয়েছে বরাহনগরে বড়দাদের বাগানে ফুল আনতে। আর একজন গিয়েছে চন্দনগর—নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন চন্দননগরের খাঁটি খেতে ভালবাসত।

অনুমতিদের বাড়িতে তখন হৈ হৈ চলেছে। নানারকম সুখাদ্যের গন্ধে পাড়া মাৎ, তার ওপরে চেঁচামেচি যেন বিয়ে-বাড়ি। অনুমতি গাছা কোমর বেঁধে একতলায় কি করছিল, আমাদের দেখেই বল্লে—কি আক্কেল তোমাদের ঠাকুরপো, এই আসা হোলো! একলা লোক আমি কতদিক সামলাই বল দিকিন।

বল্লুম—বড়দা আছে, সে তো একাই একশো।

আহা, তোমাদের বড়দা যা কাজের লোক! দেখ না গিয়ে সকাল থেকেই ৫ বাতল টেনে ট্যাঁ হোয়ে আছেন।

আমরা দু-জন দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় বড়দা টলতে-টলতে দরজার কাছে এসে আমাদের দুজনের দুই কাঁধে দু-হাত

রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—এক্ষুনি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল, আমি বোধ হয় আর বাঁচব না !

—এ্যাঁ ? কি হয়েছে আপনার ?

বড়দা বল্লে—আমাকে বিষ খাইয়েছে।

বড়দার তখন চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, আওয়াজ ঘড় ঘড় করছে। —দেখতে দেখতে সে দেহভার সম্পূর্ণরূপে আমার ওপর ছেড়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কে বিষ খাওয়ালে ?

বড়দা ফিসফিস করে বল্লে—অনুমতি। এই বলে সে একেবারে এলিয়ে পড়ল।

আর দেরী করা উচিত হবে না মনে করে আমরা সেই বিরাট দেহ একরকম হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলুম। একতলায় অনুমতি তার মা, ঝি চাকর ও পাড়ার আরও দু-চারজন মিলে একটা বড় মাছ-কাটা দেখছিল, এমন সময় আমাদের দেখে তারা ছুটে এল—কি হয়েছে, কি ব্যাপার ?

—বিষ খেয়েছে।

অনুমতি চীৎকার করে উঠল—ওমা কি হবে ! কে বিষ খাওয়ালে ?

বল্লুম—বলছে তো অনুমতি খাইয়েছে।

কথাটা শোনামাত্র উৎসবক্ষেত্র একেবারে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হোয়ে গেল। অনুমতি একটা মারাত্মক চীৎকার ক'রে ঘুরে উঠোনের মাঝে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে গেল। তার মা গনেশের বৃংহিতে পাড়ার চারিদিক থেকে লোক ছুটে আসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু তখন আর দেরী করবার উপায় নেই, বড়দাকে টানতে টানতে গাড়িতে তুলে বল্লুম—বাড়ি চল।

বড়দাকে সেই অবস্থায় বাড়ি নিয়ে গেলে সেখানেও পাড়ার অভ্যর্থনাটা কি রকম হবে সে কথা আন্দাজ করেও কেলেঙ্কারীর ভয়ে আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলুম না। মিনিট দশেকের মধ্যেই তাকে বাড়িতে এনে ফেলা গেল। পাড়ায় জন-দুয়েক ছোকরা ডাক্তার ছিল, তাদের ডেকে এনে আমরা নীলরতন সরকারকে খবর দিতে ছুটলুম।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে ফিরে এসে পাড়ার ছেলেদের কাছে শুনতে পাওয়া গেল বড়দাদের বাড়িতে পাড়ার মত মুরুব্বীদের সমাবেশ হয়েছে। সেখানে অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আমরা চারজন অত্যন্ত বদমাইস ছেলে। বড়দার পতন থেকে আজকে এই মূর্চ্ছা অবধি সমস্ত ঘটনার জন্য আমরাই প্রধান দায়ী। অতএব ওদের বাড়িতে গেলেই আমাদের প্রহার দেওয়া হবে।

এই সব কথা শুনে আর বড়দা-দের ওখানে গেলুম না বটে, কিন্তু তার সংবাদ পাবার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় খবর পেলুম বড়দা ভাল আছে। বিষ-টিষ খাওয়া সব বাজে কথা, কদিন থেকে পেট সাফ হয়নি, তার ওপরে পেটে বায়ু হয়ে ঐ-রকম হয়েছিল। পেট পরিষ্কার করে দিতেই সে আরাম পেয়েছে। উঠে বসে ঘণ্টাখানেক লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এখন ঘুমুচ্ছে।

যাক্‌! নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফেরা গেল। পরের দিন সংবাদ নিয়ে জানলুম যে, বড়দা ভালই আছে, তবে সারাদিন বিছানা থেকে ওঠেনি ও কারুর সঙ্গে কথা বলেনি। ডাক্তার দেখে বলেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই, এখন সে হেঁটে বেড়াতে পারে।

বড়দার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাদের মন আকুল হচ্ছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে জানতে পেরেছিলুম যে, ওদের বাড়িতে গেলে আমাদের অপমান করা হবে। আমরা আশা করেছিলুম যে, বড়দা নিজেই আমাদের ডেকে পাঠাবে, তাহলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু শোনা গেল, সে কারুর সঙ্গে কথা বলছে না, চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

বিকেল নাগাদ শুনলুম, বড়দা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

পরদিন সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি পাড়ায় হৈ-হৈ ব্যাপার লেগে গেছে। ভোর থেকে বড়দাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে জামা জুতো, টাকা-পয়সা, চাবি সব ফেলে এক-বস্ত্রে কোথায় চলে গেছে। তিরানব্বুই বছরের ঠাকুরমা অভিশাপ দিচ্ছেন।

আমরা রকে এসেছি, এ সংবাদ পেয়ে বড়দার ছেলে, ভাইরা ও পাড়ার আরও অনেক মুরুব্বী এসে আমাদের আক্রমণ করলে—কোথা গেছে সে বল—নইলে ভাল হবে না।

বড়দার ছোট ভাই একখানা চিরকুট দেখিয়ে বললে—বিছানার ওপরে এই চিঠিখানা পড়েছিল। দেখলুম বড়দা দেবাক্ষরে লিখে গেছেন, আমি শান্তির অন্বেষণে চলিলাম, বৃথা আমার অনুসন্ধান করিও না।

সবাই মিলে আমাদের চেপে ধরলে—শান্তি কে?

কোন-রকমে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ছুটলুম অনুমতির বাড়িতে। কিন্তু কোথায় বড়দা! তার চিঠির কথা শুনে গণেশ বললে—হয়েছে। তাহলে পোড়ারমুখো আমার বড় মেয়ে শান্তির সন্ধানে বেরিয়েছে—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

অনুমতি বললে—ও-সব পাগল-ছাগল জানি না। আমার নামে সে বদনাম দিয়েছে, দেখা হলে আমি বুঝিয়ে দেব বলে দিও।

বড়দার বাড়ির লোকেরা একেই আমাদের ওপরে ক্ষেপে ছিল, তার ওপরে অনুমতির বাড়ি থেকে শান্তির খবর নিয়ে এসে বলা-মাত্র তারা এই মারে ত এই মারে মূর্তিতে আমাদের চেপে ধরলে।

কোথায় শান্তির বাড়ি, বড়দার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক ইত্যাদি একটি প্রশ্নেরও ঠিক মতো জবাব দিতে পারছি না দেখে তারা মনে করলে যে, এ ব্যাপারের সব জেনেও আমরা গোপন করছি। যাহোক, আমরা তাদের কথা দিলুম যে, এক মাসের মধ্যে বড়দাকে খুঁজে বের করবই।

হঠাৎ বিনা কারণে এইভাবে সরে পড়ায় বড়দার ওপরে আমাদেরও রাগ হয়েছিল। তাকে খুঁজে বার করতে বদ্ধ-পরিকর হয়ে কাজে নামা গেল। মাস-দুয়েক চেষ্টা কোরে বেনারস থেকে নবদ্বীপ অবধি সমস্ত জায়গায় সন্ধান নিয়ে

জানলুম যে, সেখানে শান্তি অথবা বড়দা নেই। আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে বড়দা আত্মগোপন করে রইল, কিছুতেই তাকে খুঁজে বের করতে পারা গেল না।

সময়ের চাকা ঠিক ঘুরতে লাগল। দেখতে-দেখতে ছ-মাস, এক বছর, দু-বছর কেটে গেল, কিন্তু বড়দার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বড়দার ঠাকুরমা নাতির নাতিদের দেখে স্বর্গে গেলেন। বুড়ির হাতে কিছু টাকা ছিল, মরবার সময় সবাকেই জানিয়ে গেলেন নগা যদি কোন দিন ফিরে আসে তবে সেই টাকা যেন তাকে দেওয়া হয়। কিন্তু কোথায় নগা?

বছর পাঁচেক বাদে একবার উড়ো খবর এল, বড়দা সন্ন্যাসী হয়েছে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কারা-জানি স্বচক্ষে তাকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখেছে। তার এই সন্ন্যাসী হওয়ার গুজব প্রথমেই রটে ছিল, কিন্তু তার মত লোক নিছক নিরাকার শান্তির অন্বেষণে গৃহত্যাগ করবে সে কথা লোকে তখন বিশ্বাস করতে পারে নি।

দিন যায়। সংসার চক্রে আটকে আমাদের মনেও শান্তি অন্বেষণের বাসনা মাঝে-মাঝে উঁকি দিতে থাকে। আড্ডার সবাই কে কোথায় ছটকে পড়ল, ন-মাসে, ছ-মাসে কখনো কোন দিন দেখা হয়। অতীত দিনের ইতিহাস প্রসঙ্গে কখনো হয়ত বড়দার কথা ওঠে, কখনো ওঠে না। কত নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়—কত 'অনুমতি', 'অনুজ্ঞা' ও 'আদেশের' অভিজ্ঞতায় জীবন-পাত্র পূর্ণ হতে থাকল, বড়দার স্মৃতি থিতিয়ে পড়ে রইল মনের এক কোনে।

প্রায় দশ বছর পরে এক ফাগুন সন্ধ্যায় প্রকৃতি তার দক্ষিণ দ্বার খুলি খুলি করছে, সারাদিন কাজে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত দেহে বাড়িতে ফিরেই শুনতে পেলুম—বড়দা ফিরে এসেছে, সেখান থেকে দু-বার এসে খবর দিয়ে গেছে।

আর বিশ্রাম করা হোলো না, তখুনি ছুটলুম সেখানে।

বড়দাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি সদর দরজা থেকে তার ঘর অবধি লোকে লোকারণ্য—সবাই এসেছে সন্ন্যাসী দর্শন করতে। ভিড় ঠেলে-ঠেলে ঘরের মধ্যে গেলুম, সেখানেও ভিড়ের অন্ত নেই। সেই পুরানো ঘর, যেখানে যে জিনিষটি ছিল তার কোথাও একটু নড়চড় হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর ধরে বাড়ীর লোকেরা প্রতিদিন ঘরখানির নিয়মিত পরিচর্য্যা করেছে—ঘরের মালিক ফিরে এসে অগোছাল ঘর দেখে অনর্থ বাধাবে এই ভয়ে।

ঘরের মধ্যে তীব্র আলো জ্বলছে। দেখলুম বড়দা মেঝেতে কার্পেটের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছেন। দুই হাঁটুর উপর দু-খানা হাত পড়ে আছে। পরনে এক টুকরো সাদা ছোট কাপড় লুঙ্গির মতন পরা, হাঁটুর নীচে নামেনি, বাকি অঙ্গ অনাবৃত।

দেখলুম বড়দার চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্তন হয়েছে। দেহ আগের চেয়ে অনেক স্থূল হয়েছে, উজ্জ্বল শ্যামের বদলে দেহের বর্ণ হয়েছে উজ্জ্বল গৌর। মুখ চোখের কমনীয়তায় বনের পশু ভুলে যায় এমন হয়েছে তার শ্রী।

প্রসন্ন ঘোষ বড়দার ছেলেবেলার বন্ধু। বোধ হয় সেই অধিকারেই তাঁর স্ত্রী বড়দার সঙ্গে কথাবার্ত্তা খুব বেশী বলছিলেন। আজও একবার বল্লেন—আমায় কিন্তু দয়া দিতে হবে।

বড়দা চুপ।

—চুপ করে থাকলে ছাড়ব না, কবে দীক্ষা দেবেন ?

এবার বড়দা বল্লে—আপনি দীক্ষার জন্য এত উদগ্রীব হয়েছেন কেন ?

—আমার সংসার ধর্ম্ম আর ভাল লাগছে না।

এত দিন ভাল লাগছিল আর এখন ভাল লাগছে না কেন! কারণ কিছু বঝুতে পেরেছেন ?

প্রসন্ন ঘোষের স্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন—আপনার অজানা কিছুই নাই। আপনি ইচ্ছা করলে সবই জানতে পারেন। কথাটা শুনেই বড়দা চোখ বুজে কয়েক সেকেণ্ড পরেই চোখ চাইলেন।

একটু পরে বল্লেন—এঁদের একটু বাইরে যেতে বল।

বড়দার কথা শুনে সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন তোরা বোস!

ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে যাবার পর বড়দা আমাকে বল্লেন—দরজায় খিল লাগিয়ে দে। ঘরের মধ্যে রইলুম আমরা চারজন, বড়দা আর ঘোষ গিন্নি। বড়দা বল্লেন—এ আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঐ সবুজ আলোটা জালিয়ে দে।

স্নিগ্ধ সবুজ আলোয় ঘরখানা যেন ঠাণ্ডা হোয়ে গেল। আসন্ন কোনো আশ্চর্য ঘটনার সম্ভাবনায় ঘরখানা থম-থম করতে লাগল। আমরা একরকম দম বন্ধ করে বড়দার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখলুম বড়দা চক্ষু বুঁজে নিস্পন্দ পাথরের মূর্ত্তির মত বসে আর ঘোষ-গিন্নি আকুল নয়নে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। বড়-বড় দু ফোটা অশ্রু তাঁর দু-চোখে ডবডব্ করছে।

প্রায় পনেরো মিনিট এই ভাবে কাটবার পর বড়দা চোখ খুলে ঘোষ গিন্নিকে বল্লেন—এখানে আমার পাশে এসে বস।

ঘোষ গিন্নি মন্ত্র-চালিতের মত বড়দার বাঁ পাশে গিয়ে বসলেন। তারপরে বড়দা বাঁ হাত দিয়ে গভীর আলিঙ্গনে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘোষ-গিন্নিও কোনো বাধা না দিয়ে সে আলিঙ্গনে আত্ম সমর্পণ করলেন। সেখানে আমরা যে কজন বাইরের লোক বসে আছি সে জ্ঞানও তাঁর যেন নেই। আমাদের মনে হোতে লাগল বড়দা এবার এমন একটা কেলেংকারী করবে যার ফলে আমাদেরও দেশত্যাগী হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না। পরস্পর মুখে চাওয়া-চাওয়ি করছি এমন সময় দেখি ঘোষ গিন্নির মুখখানা বড়দার বাহুমূলে হেলে পড়েছে আর তিনি তার কানে ফিস্ ফিস্ করে কি সব বলছেন।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে বোধ হয় পাঁচ-মিনিট সময়ও কাটেনি। হঠাৎ ঘোষ গিন্নি চীৎকার করে একবার দাঁড়িয়ে উঠেই দড়াম্ করে পড়ে গিয়ে গোঁ-গোঁ করে আওয়াজ করতে আরম্ভ করে দিলেন। বড়দা তাঁর মাথাটা মেঝে থেকে তুলে

এক দল স্ত্রী ও পুরুষ তাকে ঘিরে বসে আছে, ভাই, ভাইপো, ভাইঝি, ছেলে ও নাতি নাত্নীরা কেউ বা বসে কেউ বা এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে। এত লোক কিন্তু সকলেই নীরব—স্থির দৃষ্টিতে তারা বড়দার দিকে চেয়ে আছে. আর বড়দা একভাবে নিস্পন্দ হোয়ে বসে—দৃষ্টি তাঁর মাটিতে নিবদ্ধ। দেখলুম রকের প্রায় সব বন্ধুই আমার আগে এসে জুটেছে। আমাদের প্রসন্ন ঘোষের স্ত্রী সামনেই বসেছিলেন। আমি ঢুকতেই কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে যেন নীরব ভাষায় বল্লেন—তুমি আবার এখানে কেন?

আমি সংকুচিত হোয়ে তার দৃষ্টি এড়িয়ে বন্ধুদের কাছে গিয়ে বসলুম।

কিছুক্ষণ পরে প্রসন্ন ঘোষের স্ত্রী বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা কতদিন এখানে থাকবেন?

বড়দা কোন জবাব দিলে না।

কিছুক্ষণ পরে আবার প্রসন্ন ঘোষের স্ত্রী বল্লেন—যদি দয়া করে এসেছেন তবে আমায় দীক্ষা দিতে হবে।

বড়দা এবারেও কোন জবাব দিলে না। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতাটা থমথমে হোয়ে উঠল।

বন্ধুরা ইসারা করে আমায় বল্লে—প্রণাম কর।

সত্যি বড়দাকে তখনো প্রণাম করিনি। উঠে গিয়ে তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেই সে মুখ তুলে চেয়ে আমাকে দেখলে, তারপরে ওপর দিকে ঈষৎ হাত তুলে বল্লে—নমঃ শিবায়ঃ।

রাত্রি প্রায় এগারাটার সময় আমরা উঠে চলে এলুম। তখনো ঘরের মধ্যে নরনারীর ভিড়ের অন্ত নাই।

পরদিন সকালে বড়দাদের ওখানে গিয়ে শুনলুম যে তিনি তখনো দরজা খোলেন নি। রকের বন্ধুরা সবাই নীচের একটা ঘরে বসে আছে। বাইরের লোকও দু-চারজন করে আসছে সন্ন্যাসী দেখতে। কিন্তু তাদের বলে দেওয়া হচ্ছে, এখন দেখা হবে না।

আমাদের মধ্যে বড়দার কথা আলোচনা হোতে লাগল। অতীতকালে বড়দা যে-সব কীর্ত্তিকলাপ করেছেন সে সব কথা কি তার মনে আছে?

একজন বল্লে—অনুমতির কথা একবার জিজ্ঞাসা করলে হয়।

কিন্তু কি করে তার কাছে সে কথা পাড়া যায়? অথচ সেদিনকার সেই সব কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এখন তার কি মতামত তা জানবার জন্য আমাদের মনে প্রবল আগ্রহ হচ্ছিল। স্থির করা গেল কৌশলে সে সব কথার ইঙ্গিত করা যাবে। বড়দা যদি কিছু বলে তো বল্লে নইলে সে সব কথা চেপে যাওয়াই ভাল।

সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখলুম বড়দার ঘরে নরনারীর ভিড়। কালকের মত প্রসন্ন ঘোষের স্ত্রী সামনেই বসে। আরও দু-চার জন গিন্নি-বান্নি গোছের মহিলা সামনে বসে মধ্যে মধ্যে তাকে প্রশ্ন করছেন। বড়দা কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে কখনো চুপ ক'রে যাচ্ছে।

নিয়ে নিজের উরুতে রেখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ঘোষ-গিন্নির দেহটা কাটা ছাগলের মতন থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ব্যাপার দেখে আমাদের মধ্যে একজন উঠে গিয়ে দরজা খোলবার চেষ্টা করতেই বড়দা ইঙ্গিতে তাকে বারণ করলেন। তাঁর হাসিহাসি মুখখানা দেখে আমার মনে হোতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন এক রহস্য লুকিয়ে আছে।

যা হোক আধঘণ্টা এই রকম নীরবে কাটার পর ঘোষ-গিন্নি তো উঠে বসলেন। বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

ঘোষ-গিন্নি কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তিনি ভালই আছেন।

বড়দা তাকে বল্লেন—কাল ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা স্নান করে আমার কাছে আসবে, তোমাকে কিছু বলব। সারাদিন থেকে রাতে চলে যেও—খাওয়া দাওয়া এখানেই করবে।

ঘোষ-গিন্নি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। বড়দা আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন—যা তোরা একে বাড়ী পৌঁছে দে।

দরজা খুলে দেখা গেল বাইরে আগের চাইতে বেশী ভিড় জমেছে। দরজা খুলতেই তারা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল। আমরা সেই ভিড় ঠেলে প্রসন্নবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলুম।

সেদিন রাত্রে আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলুম যে, বড়দার কাছে দীক্ষা নেব। ঠিক হোল কালই দীক্ষার প্রস্তাব করা যাবে, কি জানি বড়দা যে রকমের লোক হয়ত একদিন সকাল বেলা দেখা যাবে কোথাও উধাও হয়েছে।

পরদিন বেলা দশটার সময় কাজে বেরুচ্ছি এমন সময় বাড়ির দরজার কাছেই একজন হিন্দুস্থানী চাকর গোছের লোক আমাকে অভিবাদন করে বল্লে—আপনি একটু ঐ গলির মধ্যে দয়া করে চলুন, বিবি ডাকছেন।

চমকে উঠলুম! বিবি ডাকছে কিরে বাবা! কে তোমার বিবি?

—আজ্ঞে অনুমতি বিবি।

আর বেশী কিছু বলতে হোলো না। গুটি-গুটি তার সঙ্গে চল্লুম। বাড়ির কাছেই নির্জন এক গলির মধ্যে একখানা দরজা জানালা বন্ধ সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। লোকটা গাড়িখানা দেখিয়ে বল্লে—ওর মধ্যে আছে।

আশে পাশে চারিদিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে গাড়ির দরজাটা খুলে দেখলুম সত্যিই অনুমতি বসে আছে। আমাকে দেখে সে টপ্ করে আমার একখানা হাত ধরে বল্লে—এস এস ভেতরে এস।

গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করা-মাত্র গাড়ি চলতে লাগল। কোনো রকম গৌরচন্দ্রিকা না করে অনুমতি সোজা আমায় প্রশ্ন করলে—পোড়ারমুখো নাকি ফিরে এসেছে?

ন্যাকা সেজে বল্লুম—কে?

—কে আবার, তোমার বড়দা।

হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার ? একবার জিজ্ঞাসা করব, গেলিগেলি আমার এ সর্ব্বনাশ করে গেলি কেন ?

—তোমার আবার কি সর্ব্বনাশ হোলো ?

—সর্ব্বনাশের বাকী কি রাখলে ! বিষ খাওয়ানোর বদনাম দিয়ে চলে গেল —মনে নেই ?

সেদিনের কথা মনে পড়ে হাসি পেতে লাগল ! অনুমতি আমার মুখ দেখে বল্লে—তুমি হাসচ ঠাকুরপো ! আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ ! সেই থেকে লোকে আমাকে নামদিয়েছে—"বিষে-মতি !" লোকে আমার কাছে আসতে ভয় করে, বলে—বাবা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। এই বুড়ো বয়সে আমি কি করি বল তো। আমি শুধু একবার পোড়ারমুখোকে জিজ্ঞাসা করব কি দোষে আমার এমন অপবাদ দিয়ে গেলি ?

আমি বল্লুম তা তুমি গিয়ে দেখা করলেই তো পার। দুনিয়ার লোক তো দিনরাত তাকে দেখতে যাচ্ছে।

অনুমতি বল্লে—তুমি তা হোলে তাকে বলে রেখ। কাল সন্ধ্যাবেলা আমি যাব।

বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করা গেল—কি করা যায় ! ঠিক হলো কথায়-কথায় অনুমতি অবতারণা করা যাবে। বড়দা যদি সায় দেয়, তখন বলা যাবে যে সে দেখা করতে চায়।

রাত্রে বড়দার ওখানে গিয়ে শুনলুম সকালে ঘোষ গিন্নি আসার পর বড়দা যে দরজা বন্ধ করেছিলেন, এই খানিক আগে খুলেছেন ! সন্ধ্যেবেলা অনেক লোকজন এসেছিল কিন্তু তিনি বলে দিয়েছেন আজ আর কারুর সংগে দেখা হবে না।

দরজা খোলা আছে শুনে আমরা দোতলায় উঠে বড়দার ঘরে ঢুকলুম। দেখি বড়দার সামনে ঘোষ-গিন্নি বসে আছেন আর তিনি কি বলে যাচ্ছেন।

ঘরের মধ্যে স্নিগ্ধ সবুজ আলো, বড়দার কণ্ঠস্বর তার চাইতেও স্নিগ্ধ বলে মনে হোতে লাগল।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে—বল্লেন—আয় বোস !

বড়দা বলে যেতে লাগলেন—অর্থ প্রতিপত্তি ও যৌনলিপ্সা এই তিনটি হচ্ছে যোগের প্রধান বাধা। অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যৌনলিপ্সা মানুষের মৃত্যুদিন অবধি প্রবল থাকে। আকাঙ্ক্ষাই অধিকাংশ জীবকে বার-বার এখানে টেনে নিয়ে আসে। এই জন্যই অধিকাংশ যোগীই গৃহত্যাগ করে সংসারের বাইরে গিয়ে নির্জ্জনে সাধনা করেন।

ঘোষ-গিন্নি বল্লেন—কিন্তু গৃহস্থ হোয়েও তো ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া যায়।

বড়দা বল্লেন—তা কেন হওয়া যাবে না। সংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ চোর জোচ্চোরও তো দুর্লভ নয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া আর যোগী হওয়া এক নয়। আমাদের দেশে আগে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করতেন, সেখান থেকে আবার প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করতেন। যোগী হোতে হোলে দেহ মনের সমস্ত কামনাই ত্যাগ করতে হয়।

দেখলুম বড়দার মেজাজটা বেশ খুশীই আছে। অনুমতির কথাটা এইবার পাড়ব কিনা ভাবছি এমন সময় ঘোষ গিন্নি বল্লেন—আপনি আর যাবেন না, এইখানেই থাকুন।

ঘোষ গিন্নির কথা শুনে বড়দা হেসে ফেল্লে। তার হাসি ছিল অদ্ভুত। কোনো রকম শব্দ না ক'রে হাসতে থাকত আর কাঁধ, পিঠ পেট সেই সঙ্গে থর থর করে কাঁপতে থাকত। হাসি থামতে বড়দা বল্লে—এখানে কি করে থাকি! যদি মরে যাই তো গেরস্তর অকল্যাণ হবে—ফেলবে কে?

নগেন অর্থাৎ বড়দার ভূতপূর্ব শিষ্য বল্লে—আমরা থাকতে আপনাকে ফেলবার ভাবনা হবে না—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বড়দা আবার সেইরকম করে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিছু পরে বল্লে—যদি বলি কেওড়াতলায় পুড়ব তা হোলে নিয়ে যেতে পারবি এই স্থূল দেহকে?

বড়দা আবার হাসতে আরম্ভ করলে। সমস্ত আলোচনা অন্য পথ ধরে চলতে আরম্ভ করল, কিছুতেই আমার কথাটা আর পাড়তে পারি না। শেষকালে জোর করে অন্য প্রসঙ্গের মাঝখানে আমি বল্লুম—বড়দা যদি অনুমতি করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বড়দা আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল—গুরু কিংবা ধর্মগ্রন্থ এ দুয়ের কেউই সত্য দিতে পারে না। প্রথম সত্যের জন্য অন্তরে জাগে আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা স্বতস্ফূর্ত হয়, এই আকাঙ্ক্ষাই সত্যের প্রথম প্রকাশ—এ আপনিই আসে। এর সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—"ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন"।

এর পরেই বড়দা ধর্ম, দর্শন, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সব জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রে দিলে। একের পর এক আসতে লাগল, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সেই কথা সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা এসে আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির মূলে আঘাত করতে করতে আমাকে স্থান ও কালের বাইরে এনে ফেল্লে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে লাগলুম, বড়দা গত-জীবনের সমস্ত গ্লানি ও মালিন্য কাটিয়ে দীপ্ত ভাস্করের মতন প্রভান্বিত ও তার চতুর্দিকে যেন পুরানো দিনের সেই সোনার হাঁসের ডিম, কুবেরের ভাণ্ডার, লাফানে কই, অনুমতি, গণেশ ও আমরা সবাই গ্রহ উপগ্রহের মতন ঘুরছি। হঠাৎ চটকা ভেঙে যেতে দেখলুম বড়দা সেই রকম করে হাসছে আর সবাই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

বড়দা জিজ্ঞাসা করলে—কিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

নিজেকে সামলে নিতে-নিতে বললুম—না বড়দা ঘুমুই নি। একটা কথা আপনাকে বলব বলব করে বলতে পারছি নে।'

সে তো বুঝতে পারছি—তা বল না।

আজ সকালে অনুমতি এসেছিল আমার কাছে।

কেন ?

সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কাল সন্ধ্যার সময় আসবে বলেছে।

বড়দা আবার সেই রকম করে হাসতে আরম্ভ করে দিলে। ঘোষ গিন্নি জিজ্ঞাসা করলেন—

অনুমতি কে ?

বড়দা বল্লে—আমার পূর্ব জীবনের একটি বিশেষ বন্ধু।

তারপরে আমায় বল্লে—দেখা করতে চেয়েছিল তো আজই নিয়ে এলি না কেন ? পাড়সুনি কালকের জন্য কোনো কাজ ফেলে রাখতে নেই—।

—সে বল্লে যে কাল আসবো, তাই।

'ও' বলে বড়দা হাসতে হাসতে পাশের একটা বড় তাকিয়া নিয়ে হেলে পড়লেন। ঘোষ-গিন্নি পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

বড়দা শুয়ে-শুয়ে নানা কথা বলতে আরম্ভ করলেন।' সে সব সাংসারিক কথা, তাঁর পুরানো জানা-শোনা লোকেরা কেমন আছে ইত্যাদি। হঠাৎ একবার আমায় বল্লেন—কাল অনুমতি আসবে, না রে ?

হ্যাঁ।

বড়দা হাসতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাসি থেমে যাওয়ার পর মিনিট পাঁচেক সব স্থির নিস্তব্ধ। একবার ঘোষ-গিন্নি বল্লেন—পা-টা যেন অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে।

নরেন বড়দার একখানা হাত ধরে আঙুলগুলো টেনে দিচ্ছিল। সে ডাকলে—বড়দা—বড়দা।

কোনো সাড়া নেই।

ধাক্কা দিয়ে তাকে চিৎ করা হোলো। হিম নিঃসাড় অঙ্গ, বুকে কাণ দিয়ে দেখলুম, ধুকধুকুনি বন্ধ হোয়ে গেছে।

ছুটে বাইরে গিয়ে ডাকাডাকি করতেই বাড়ির সবাই দৌড়ে এল। মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনজন ডাক্তার এসে পড়ল।

তারা পরীক্ষা করে বল্লে—প্রাণ পাখী উড়ে গেছে।

এবার বড়দা কোথায় গেল !

মুসাফির

পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি সূর্যাস্তের সমারোহ দেখছিলুম। দূর-দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—জড়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আর এই ধরণীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে—আমি, মানুষ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের দুজনের মধ্যে বোঝা পড়া চলছিল—কে বড় ?

আমার পাশে দৃঢ় পাথরের উন্নত দুর্গ স্বদেশের সমস্ত লজ্জা মাথায় নিয়ে বুক ফুলিয়ে অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যাস্তের সোনার কিরণ তার চূড়ায় চূড়ায় ঝক্‌ঝক্ করছিল।

চারিদিক স্থির নিস্তব্ধ : কোথাও একটা ঝিঁঝির সাড়া পর্যন্ত নেই, এমন সময় কোমল নারী কণ্ঠ আমার চমক ভাঙিয়ে দিলে—বাবুজী সেলাম !

আমি এতদূর তন্মনস্ক ছিলুম যে, সে আমার কাছে কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরও পাইনি। তার দিকে ফিরে চাইতে সে আবার আমায় সেলাম জানালে—বাবুজী সেলাম !

তরুণী সে। চুড়িদার পাজামা তার দেহলতাকে সাপটে রয়েছে। পায়ে একজোড়া মাঝারি দরের পাঞ্জাবী নাগ্‌রা, গায়ে ঢিলে-হাতা পিরহান, তার ভেতর দিয়ে লাল কাঁচুলীর রক্তাভ আভা ফুটে বেরুচ্ছে, সবার ওপরে পাতলা একটা যোগিয়া রংয়ের চাদর। চাদরখানা গলার কাছে দু-তিনটে ফের দেওয়ায় মাথার খানিকটা ঢাকা পড়েছে, দীর্ঘ বেনী ঝুলছে। রং তার গৌর নয়, তবে ফরসা, আর চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। তার মুখের আর কিছু আমার মনে নেই।

তরুণীকে সেলাম করে আবার অস্তগামী সূর্যের দিকে চাইলুম। প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে নিবিড় আলাপ চলছিল হঠাৎ তার মাঝে ধূমকেতুর মতন এই তরুণী এসে সে নিবিড়তাকে শ্লথ কোরে দেওয়ায় মনটা অপ্রসন্ন হোয়ে উঠল। আমি ইচ্ছা করেই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলুম।

কিছুক্ষণ ওই ভাবে কাট্‌বার পর সে চেঁচিয়ে যেন কাকে বল্লে—চলে যেও না, কাছে-কাছেই থেকো।

কার ওপরে এই হুকুমটা হোলো তা দেখবার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে, আমাদের কিছু দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

তরুণী আমায় বল্লে—ও আমার চাকর।

কথার কোন জবাব দিলুম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন হোলো—বাবুজী, আপনি বাঙালী ?

হ্যাঁ।

আবার কিছুক্ষণ কাটল। এবার সে তার জায়গাটা ছেড়ে আমার কাছেই একটা জায়গায় এসে বসে বল্লে—বাবু সাহেব আমি স্ত্রীলোক। তারপর তার পাজামা বেষ্টিত সুঠাম একখানা পা মাটি থেকে একটু তুলে আমাকে দেখিয়ে বল্লে—এই পা-জামা পরা রয়েছে বলে আমাকে পুরুষ মনে কোরো না যেন!

তার এ-রকম ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হোয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। অস্তগামী সূর্যের ম্লান আভায় দেখতে পেলুম তার চোখ দুটো দিয়ে তীব্র শ্লেষ ফুটে বেরুচ্ছে। বেশ বুঝতে পারা গেল যে, তাকে অবহেলা করায় তার নারীত্বের অভিমানে আঘাত লেগেছে। তাকে খুশী করবার জন্য তাড়াতাড়ি বল্লুম—বল কি! তুমি স্ত্রীলোক! আরে এতক্ষণ বলতে হয়। তোমায় এতক্ষণ পালোয়ান বলে ভ্রম হচ্ছিল যে!

আমার কথা শুনে সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল! তারপরে চাকরটার দিকে ফিরে আবার বল্লে—কাছেই থাকিস্।

সে লোকটা তখন একটা উঁচু পাথরের ওপর উবু হোয়ে বসে উজবুগের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তরুণী বল্লে, সে দিল্লীতে মজুরা করতে গিয়েছিল। ভূপালে তাদের বাড়ী, সেইখানেই সে থাকে। ঝাঁসিতে তার মাব এক বোন থাকে, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই তাদের সেখানে নামতে হয়েছে। তার কাছে তাদের থাকবার উপায় নেই; একজন রইস তাকে নিকে করায় তার পর্দ্দা পড়ে গিয়েছে। সেই জন্য তাকে রেখে তার। আর তার দশ বছর বয়সের বোন নাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, সেই অবসরে সে একটু বেড়িয়ে নিচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

সে বল্লে—নাম সরিফুন্নিসা, তবে লোকে সরিফুন বলে ডাকে।

জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি নিকে কর নি?

—না, এই বেশ! দু-তিনজন রইস্ আমাকে নিকে করতে চেয়েছিল কিন্তু নিকে করলেই স্বাধীনতা চলে যায়।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলতে লাগল—কহিয়ে না বাবু এই রূপ, এই জোয়ানী সে কি অন্ধকূপের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবার জন্য? হীরের ফুলদানীর চেয়ে ফুল গুলবাগে থাকতেই আনন্দ পায়, কারণ বুলবুলের মুখেতেই যে তার জীবনের সার্থকতা—কি বল?

তরুণী কথা শেষ করেই গুণ গুণ করে গান ধরলে—

গুলসন্ কি চুম্‌চুম্ বহ তে বুল্‌বুল্
রুখ্ সারা বে-দরদী বুরুখা খুল্—

সরিফুন্নিসার কথা শুনে মনটা বড় খুশী হোয়ে উঠল। বাইজী হোক আর যাই হোক, এমন মেয়েও তা হোলে আমাদের দেশে আছে!

গানের দু-চরণ গেয়ে সে আবার বল্লে—এই বেশ!

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমরা কোন্ সরাইয়ে উঠেছ? সরিফুন

তার চাকরটাকে ডেকে সরাইয়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে। লোকটা বোকার মতন আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, নাম সে জানে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানতে পারা গেল তাতে মনে হোলো, আমি যেখানে আছি তারাও সেইখানে উঠেছে।

চাকরটা আমাদের সঙ্গে কথা বলে আবার তার জায়গায় গিয়ে বস্‌ল। বাইজী আমার সঙ্গে গল্প সুরু করলে—এই কেল্লা কতদিনের কোন বাদশার কেল্লা এ, এর ভেতরে ঢুকতে হোলে কোথায় পাশ পাওয়া যায় ইত্যাদি।

অন্ধকার হোয়ে আস্‌তে আমি উঠলুম। তরুণীও আমার সঙ্গে উঠল। চল্‌তে-চল্‌তে সে বল্লে—চল বাবু আমার ডেরা দেখে আসবে।

—চল!

কিছুদূর এগিয়ে সে বল্লে—বাবু সাহেব চলিয়ে ভুপাল, আচ্ছা মুলুক।

—ভুপাল! ভুপালে কি আছে?

—কেন তালাও। ভুপালের তলাও দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে। তানাম দুনিয়ায় অত বড় তালাও আর নেই। বলেই সে গৎ আওড়ালে—

গড়্‌ তো গড়্‌ চিতোর কি গড়্‌
আওর সব গড়াইয়া
তলাও তো তলাও, ভুপাল কি তলাও
আওর সব তলাইয়া
রাণী তো রাণী কমলাবতী
আওর সব গাধাইয়া!

আমি বল্লুম—এখন আমাকে বোম্বাই যেতে হবে, ভুপালের তালাও আমার দেখা আছে।

—বোম্বাইও ভাল দেশ। আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?

আমি বল্লুম—তোমার মা তোমাকে ছাড়বে কেন?

—না যদি ছাড়ে তা হোলে আমি পালিয়ে যাব। মার সাধ্য কি যে আমায় ধরে রাখে! মার কাছে আর ফিরবোই না। তুমি আমায় রাখতে পারবে না?

ও বাবা! বলে কি! মুখ ফুটে বল্লুম—সুন্দরী ও-রকম মারাত্মক কথা ঠাট্টা হিসেবেও বোলোনা, বড় ভয় করে ওসব কথা শুনলে!

আমার কথা শুনে সে হেসে বল্লে—ঠিক যাব, নিশ্চয়ই যাব।

গল্প করতে-করতে আমরা সরাইয়ে এসে পৌঁছলুম। আমরা একই সরাইয়ে অতিথি; ওদের ঘর আর আমার ঘরের মাঝে একটি মাত্র খালি ঘর।

আমরা যখন সরাইয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই বাতি জ্বলছে। বাইজীদের ঘরটা পার হোয়ে আমার ঘরে যেতে হয়, আমি তাদের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় সরিফুন আমার বাহু আকর্ষণ করলে। তার মা সামনে পানের ডাবর খুলে সরাইয়ের

বৃদ্ধ মালিকের সঙ্গে গল্প জমিয়ে বসেছে। সরিফুন তার মাকে বল্লে—অম্মা, এই বাবুর সঙ্গে আমি বোম্বাই যাচ্ছি!

তার কথা শুনে বৃদ্ধা কঠোর দৃষ্টিতে প্রথমে আমার দিকে তার পরে তার দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে আহত হোয়ে সরিফুন সোহাগ কোরে আমার কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে চোখের ইসারায় কি বল্লে বুঝতে পারলুম না।

ব্যাপারটা বিশেষ শোভন হচ্ছে না বুঝে আমি তার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে পড়লুম।

ঘরের মধ্যে এসে খাটখানাকে বাইরে বার কোরে শুয়ে পড়া গেল। সমস্তদিন রোদে ঘুরে-ঘুরে শরীর আমার ক্লান্ত হোয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লুম।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিলুম। ঘুম তেমন গাঢ় হয়নি, ঘুমের পাতলা আবরণ ভেদ কোরে সারেঙ্গীর আওয়াজ কানে এসে লাগতে লাগল। উঠে দেখি সরাইয়ের প্রকাণ্ড উঠোনে ফরাসের ওপর জলসা চলেছে, দুজন লোক সারেঙ্গীতে লহেরা দিচ্ছে, আর সবাই গাল-গল্প করছে।

সরাইখানায় এমন দৃশ্য বিরল নয়, পথের মাঝে দুদনের বন্ধুরা প্রায়ই এমন আমোদ-প্রমোদ কোরে আবার যে যার কাজে চলে যায়। সারারাত ধরে সে কী মাতামাতি, সুরার নেশায় বন্ধুত্বের সে কত রকম বে-রকমের শপথ— তারপর রাত পোহালে যে যার আপনার ফিকিরে চলে যায়, সারা-জীবনে হয়ত আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

খানিকক্ষণ খাটের ওপরে বসে আবার শুয়ে পড়লুম। আমার কানের কাছে সারেঙ্গীর সুর কেঁদে-কেঁদে গুমরোতে লাগল। এরি মধ্যে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই হঠাৎ পিঠে একটা খোঁচা লাগতে ধড় মড় করে উঠে বসলুম। দেখি সরিফুন আমার খাটের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। খোঁচাটা কে দিয়েছে তা বুঝতে দেরী হোলো না। ঘুমের মধ্যে ও-রকম মিলিটারী খোঁচা খেয়ে মনটা ভারী বিরক্ত হোয়ে উঠল। আচ্ছা বেহায়া এই মেয়েটা তো!

শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম,—কালই এখান থেকে লম্বা দিতে হবে। এক ঘণ্টার আলাপেই সে যে রকম বাড়াবাড়ি সুরু করেছে, দিন দুয়েক থাকলে তো আমায় পাগল করে ছাড়বে।

আসরে আবার সারেঙ্গী বেজে উঠল। বেহাগ-সিন্ধু দুলকি চালে আমার মনের মধ্যে ঠমকে ঠমকে নাচ সুরু করে দিলে। মনে হোতে লাগল—সরিফুনের সঙ্গে ভূপালে যাব নাকি? কিন্তু সে ক-দিনের জন্য যাওয়া? ক্ষতি কি! চোখের নেশা যেদিন ছুটে যাবে—সেদিন আবার বেরিয়ে পড়ব নতুনের সন্ধানে। এমনি করে হয়তো বা—একদিন আমার মানসীর সঙ্গে দেখা হোয়ে যাবে!— যাকে কখনো দেখি-নি, যার কথা কখনো শুনি-নি, সেই সে চির-পরিচিত, তার সঙ্গে। তা যদি না হয়? তাতেই বা ক্ষতি কি! সৌভাগ্য অধিকাংশ মানুষের শুধু কল্পনাতেই থেকে যায়, আমার জীবনেও যদি সে সৌভাগ্য না আসে, তাতেও কোন ক্ষোভ নেই—। জীবন যাত্রার—এই গোণা-গুন্তি দিন

কটার হিসেব চুকিয়ে দিয়ে যেদিন আমি অনন্তের পথে গিয়ে দাঁড়াব, এই ধরণীর হাজার-হাজার সুখের স্মৃতির সঙ্গে আজকের স্মৃতিও আমাকে আনন্দ দেবে।

বাস্তব ও কল্পনার সুখের স্বপ্নে বিভোর আমার মন উধাও হোয়ে উড়ে চলেছিল—এমন সময় গান শুনতে পেলুম—

পরদেশী সঁইয়া
নেহ লাগায়ে মন লে গয়া
সুখ লে গয়া
দুখ দে গয়া

বুঝলুম, বাইজীকে নিয়ে গিয়ে তারা গান গাওয়াচ্ছে। আর শুয়ে থাকা চল্লো না। খাট থেকে উঠে গিয়ে আসরে বসলুম।

আমি আসরে যেতেই তারা সবাই সরে-সরে জায়গা দিয়ে আমায় খাতির করে বসালো। বাইজী আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'ভাও' বাৎলে গান গাইছিল, আমাকে দেখে সে মুচকি হেসে ধীরে-ধীরে আমার পাশে এসে বসে গাইতে লাগল। তার কাণ্ড দেখে আসরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। এতক্ষণ সবাই উচ্ছ্বসিত হোয়ে নানা রকম কথা বলে তার গানের তারিফ করছিল, কিন্তু সে আমার পাশে এসে বসতেই তাদের আনন্দের সেই উচ্ছৃঙ্খলতাটুকু উবে গেল। শ্রাদ্ধের আসরে গুরুজনদের সামনে বসে বখাটে ছেলেরা যে ভাবে সুন্দরী কীর্ত্তন-ওয়ালীর গান শোনে তাদের মুখেও অনেকটা সেই রকমের ভাব ফুটে উঠছিল।

গান থেমে গেল। সরিফুন আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে—তোমায় ডাকলুম তখন এলে না কেন?

তার বেহায়াপনা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। এত লোকের সামনে সে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বললুম—গান গাও।

আমার এই কঠোরতার যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য সে আমার আরও গা ঘেঁষে বসল। তারপর হঠাৎ এক হাতে আমার থুতনীটা ধরে গান সুরু করলে—

মজা লে লে রসিয়া নই ঝুলনিকা—

তার কাণ্ড দেখে আসর-শুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠল। তার-পরে শতমুখে বাইজীর তারিফ। আমার তখনকার অবস্থা আর বর্ণনা না করাই ভাল। দু-তিন বার চেষ্টা করেও আসর ছেড়ে উঠে আসতে পারলুম না মনে হচ্ছিল আমার দেহ যেন পাথরে পরিনত হয়েছে, নড়বার ক্ষমতা নেই।

আসর যখন ভেঙে গেল তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। বাজার থেকে খাবার কিনে খেয়ে ঘরের মধ্যে খাট নিয়ে শুয়ে পড়লুম। শুয়েই প্রথম চিন্তা হোলো কাল যেমন করেই হোক এখান থেকে লম্বা দিতে হবে। বাইজী অনেক দেখেছি কিন্তু এমনটি আর—

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিলে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি সরিফুন দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার ?

সে আমাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি বল্লুম—তোমার মতলবখানা কি বল দিকিন্ ?

সে বল্লে—আজ এখানে শোব।

—বটে ! তা হোলে আমি শোব কোথায় ?

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠল !

আমি বল্লুম—দেখ আজ আসরে যা করছে তাইতেই যথেষ্ট হয়েছে, এর ওপরে লোক যদি এত রাত্রে তোমাকে আমার ঘরে দেখতে পায়, তা হোলে কেলেঙ্কারীর আর সীমা থাকবে না।

সরিফুন হাসতে-হাসতে বল্লে—তা হোলে সাবধান ! আমাকে তাড়াতে চেষ্টা কোরো না, আমি চেঁচিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেব।

আমি অনেকদিন ধরে সরাইয়ে বাস করছি কিন্তু এমন বিভ্রাটে কখনো পড়িনি রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছিল ; কিন্তু নারী সে কিছু করবার উপায় নেই ! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি তাকে বল্লুম—দেখ তোমার সঙ্গে আমার কখনো দোস্তি হবে না। তুমি বলেছিলে যে তুমি স্ত্রীলোক ; কিন্তু তোমার মত লজ্জাহীনা আমি কখনো দেখিনি। বেরোও আমার ঘর থেকে—

একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সারারাত মনটা বড় বিশ্রী হোয়ে রইল, ঘুমোতে পারলুম না। সকাল বেলায় কুয়োতলায় স্নান করছি এমন সময় ঘটি হাতে বাইজী সেখানে হাজির। সে আমাকে কোন কথা বললে না, আমার সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে এমন ভাবই তার মুখে দেখা গেল না। আমি ভাবলুম—বাঁচা গেল ! তার কাছে কুয়োর দড়ি ছিল না ; অন্য লোকের কাছ থেকে দড়ি চেয়ে নিয়ে জল তুলে সে মুখ ধুতে লাগল।

স্নান কোরে এসে আমার যা কিছু সম্বল সব বেঁধে ঠিক কোরে রেখে বেরিয়ে পড়লুম। রাত্রি সাড়ে-নটায় গাড়ী, তখন সকাল আটটা।

সমস্ত সকালটা রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে অনেক বেলায় সরাইয়ে ফিরে এলুম। সকালের গাড়ীতে বিস্তর মুশাফির সরাইয়ে এসেছে। আমার ও সরিফুনদের ঘরের মাঝে যে ঘরটা খালি ছিল, দেখলুম সেটাতেও লোক এসেছে। সরিফুনরা তখনো যায় নি। কিন্তু সেদিকে আর না চেয়ে সোজা আমার ঘরে এসে দিবা নিদ্রার আয়োজন করা গেল।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ কার চীৎকারে চটকা ভেঙে গেল। খাটের ওপর বসে উৎকর্ণ হোয়ে শুনতে পেলুম, আমার পাশেরঘর থেকেই সেই যন্ত্রণার শব্দ আসছে। সে কাতরধ্বনি এত করুন যে, তা শুনে স্থির হোয়ে বসে থাকা অসম্ভব। আমি তাড়াতাড়ি নতুন আগন্তুকের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজান ছিল, ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে

গিয়ে দেখলুম—একটা লোক নেড়া মাথা, ছিপছিপে লম্বা কালো চেহারা, খাটের ওপরে পড়ে কাটা ছাগলের মতন ছট্‌ফট্‌ করছে। হঠাৎ সে দৃশ্য দেখে আমার ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে তোমার, অমন করছ কেন?

লোকটা স্থির হোয়ে শূন্য-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপরে আবার সেইরকম ছট্‌ফট্‌ করতে আরম্ভ করলে।

আমি তার খাটের দিকে দু-পা অগ্রসর হোয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে তোমার, ও-রমক করছ কেন?

সে আবার সেই রকম শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিড়্‌বিড়্‌ করে কি বল্লে। সে ভাষা আমি জানি না।

আমি এবার তার খাটের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে চোখ বুঁজিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ইংরেজিতে বল্লে—জ্বর, জ্বর ওঃ বড্ড জ্বর।

তার মাথায় হাত দিয়ে দেখলুম, ভয়ানক গরম, বোধ হয় একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হবে। তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম, ক্রমে তার সংজ্ঞা লোপ পেতে লাগল। তারপর বিকারের ঝোঁকে সে সেই দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল বকতে সুরু কোরে দিলে।

লোকটাকে নিয়ে যে কি করব কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। এদিকে রুগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। ঘাড় পেতে যখন তার সেবা করেছি তখন তাকে ফেলেও পালাতে পারি না। তাকে সেই অবস্থায় রেখে আমি ষ্টেশন থেকে বরফ কিনে এনে তার মাথায় দিতে লাগলুম। সে রাতে আমার আর যাওয়া হোলো না।

সেদিন আর সরাইয়ে কোন জলসা নেই, সখের-প্রাণ অতিথি যারা তারা সবাই চলে গেছে। ঘরে-ঘরে লোকে ঘুমোচ্ছে, চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম, তারই মাঝে আমি সেই অপরিচিত মুমূর্ষু রুগীর শিয়রে বসে, তাকে নিয়ে একা কি করব তাই ভাবছি।

রাত্রি বোধ হয় তখন দুটো। বরফ দিতে-দিতে লোকটার জ্বর—কমে এল। সে বেশ শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখে খাট থেকে একটু দূরে আমি মাটিতে শোবার যোগাড় করছি—এমন সময় সরিফুন ঝড়ের মত সেই ঘরে এসে ঢুকল, তার রকম দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কি! কি চাও?

পাগলের মতন একবার খিক্‌খিক্‌ কোরে হেসে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

এই নারীটির ব্যবহার ক্রমেই আমার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছিল। এমন অদ্ভুত প্রকৃতি আমি কখনো দেখি নি। মেঝেতে পড়ে গা গড়াতে লাগলুম। ঠিক করলুম আর ঘুমোব না, বাকি রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে রুগীর একটা ব্যবস্থা কোরে তারপর টানা ঘুম লাগান যাবে।

ঘুমোব না ঠিক কোরে শুয়েছিলুম বটে, কিন্তু কখন যে ঘুম চোরের মত

সন্তর্পণে এসে আমার চেতনাটুকু চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল তা টেরও পাইনি। যখন ঘুম ভাঙল তখন সকালের অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আমাদের দরজা পর্য্যন্ত রোদ এসেছে।

জেগে দেখি আমার রুগী বিছানার ওপর উঠে বসেছে। আমি তাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলুম—কেমন লাগছে?

সে বল্লে—জ্বর আর নেই। উঃ কালকের রাতটা কি কষ্টেই কেটেছে! নিবিড় কৃতজ্ঞতায় সে আমার হাত চেপে ধরে বল্লে—তুমি আমার যা করেছ তার শোধ করবার মতন আমার কিছুই নেই।

—কিছু না, পৃথিবীতে বাস করতে হোলে ও-রকম করতেই হয়, তুমি শুয়ে পড়!

তাকে শুইয়ে দিয়ে আমি মুখ ধুয়ে এসে আবার তার কাছে গিয়ে বসলুম। সে গড় গড় করে বকে যেতে লাগল। তার নাম হরকিষণ, সে লাহোরে পুলিশের চাকরী করত। ভাল কর্মচারী বলে তার বেশ সুনাম ছিল, কিন্তু বছর কয়েক চাকরী করার পর কোথা থেকে এই কাল জ্বর এসে তাকে আক্রমণ করলে। দু'দিন ভাল থাকে, আবার দু'দিন জ্বরে পড়ে। দেশ তার বোম্বাই শহরে, সেখানে তার একমাত্র বৃদ্ধা মা আছেন, সংসারে তার আর কেউ নেই। তার অসুখের খবর পেয়ে তার মা তাকে চাকরী ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে বলেছেন, তাই সে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেশে যাচ্ছে। লাহোর থেকে বোম্বাই অনেকটা পাড়ি বলে সে ঝাঁসিতে নেমেছে—বিশ্রামের জন্য।

সে বল্লে—এখনো বয়স কম আছে অন্য কাজে লেগে যাব।

আমিও বোম্বাই যাচ্ছি শুনে সে বল্লে—তা হলে এক-সঙ্গে যাব, তোমার মত বন্ধু আমি আর পাই-নি।

আমি একবার তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—জ্বর আর নেই। তাকে বল্লুম—চুপ করে শুয়ে থাক, আজ রাতে যদি জ্বর না আসে তা হোলে কাল রাতে আমরা বেরিয়ে পড়ব—বুঝলে!

সে আমার হাতখানা তার মাথায় ঠেকিয়ে বল্লে—আশীর্বাদ কর—তুমি আমার ভাই, বন্ধু সব।

কিছুক্ষণ পাখার বাতাস করতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কাছে উনুন কিংবা রান্নার কোন সরঞ্জাম ছিল না। মাসের পর মাস বাজারের কচুরী আর পুরী খেয়েই কাটিয়ে দিই, রান্নার হাঙ্গামা করি না। কিন্তু রুগীকে তো আর পুরী, কচুরী খাওয়ান চলবে না। তাকে একটু সাগু কিংবা বার্লি খাওয়াতে হবে। কোথায় বা সে সব তৈরী করি! অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে সরিফুনের শরণ নিলুম। সে সব কথা শুনে যেন দায়ে পড়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে, এই রকম ভাব দেখিয়ে বল্লে—সাগু এনে দাও, একটু পরে আমাদের উনুনে আগুন পড়বে—তার আগে কিছু হবে না।

বাজার থেকে সাগু কিনে তার হাতে দিয়ে বল্লুম—তৈরী হয়ে গেলে আমায় ডেকো।

হরকিষণের সাগু তৈরির ব্যবস্থা কোরে আমার নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। কাল প্রায় রাত্রিই বিনিদ্র অবস্থায় কেটেছে, তার ওপরে দিনের বেলায় যখন তখন ঘুম আমার একেবারে সাধা ছিল।

প্রায় বারোটা অবধি ঘুমিয়ে শরীরটাকে বেশ ঝরঝরে কোরে নিয়ে আমার রুগীর ঘরের মধ্যে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলুম তাতে আমার দেহের সমস্ত রক্ত এক মুহূর্তে চড়াৎ কোরে একেবারে মাথায় উঠে গেল! দেখলুম—খাটের ওপরে সরিফুন আর হরকিষণ গলা জড়াজড়ি কোরে বসে রয়েছে। আমাকে দেখে হরকিষণ তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে নিলে, সরিফুন যেন আমাকে দেখাবার জন্য তার গলাটা আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে নানা রকম আদরের কথা বলতে লাগল। ক্রোধে ক্ষোভে ও ঘৃণায় আমার দুটোকেই খুন কোরে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলুম না। টলতে-টলতে বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়লুম। অকৃতজ্ঞ! একেই কাল আমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছি! প্রাণ দিয়ে তার সেবা করেছি! দু হাতে তার বমি পরিষ্কার করেছি!

আর তুমি নারী! তোমাকে কি আর বলব!

কিন্তু তখুনি আমার মনে হোলো, এ আমি কার ওপরে অভিমান করছি। কে সে আমার! তারা আমার কে? গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা দুস্বপ্ন বলে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে স্নান কোরে বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় হরকিষণের ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলুম যে, তার বিছানায় সরিফুন লম্বা হোয়ে শুয়ে আছে আর সে মেঝেতে বসে নেড়া মাথায় চিরুণী ঘষছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে ডাকলে—ভাইয়া!

আমি তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলুম।

সেদিন দোকানে খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রায় সমস্ত দিনটাই ষ্টেশনে বসে কাটিয়ে দিলুম। বিকালে কেল্লার পাহাড়ে কাটিয়ে সন্ধ্যা উৎরে যাবার পর সরাইয়ে ফিরে এলুম। সেই রাতের গাড়ীতেই চলে যাব স্থির-সংকল্প হয়ে বসে আছি, এমন সময় হরকিষণ আমার ঘরে এসে উপস্থিত হোলো। সে একেবারে আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি কেন আমার ওপর রাগ করেছ ভাইয়া, আমার ওখানে গিয়ে বসবে চল।

কেন রাগ করেছি! রুদ্ধ অভিমানে তার কথার কোনো জবাব দিতে পারলুম না। সে এক রকম টেনে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

তার মুখ দিয়ে একটু একটু সুরার গন্ধ বেরুচ্ছিল, কথাও কেমন যেন জড়ানো-জড়ানো।

আমি তার একখানা হাত চেপে ধরে ভর্ৎসনার সুরে বললুম—কাল রাত্তে তুমি মরতে বসেছিলে আর আজ তুমি মদ খেয়েছ?

সে আমাকে তার খাটে বসিয়ে বললে—ও কিছু নয়, আমার খাওয়া অভ্যাস আছে, না খেলে তবিয়ত ঘাবড়ায়।

আমি বল্লুম—আজ রাতের গাড়ীতেই আমি চলে যাচ্ছি, তুমি কবে যাচ্ছ ?

নেশার বকবকানি ক্রমে আমাকে অতিষ্ট কোরে তুল্লে। মদের গন্ধে পেটের মধ্যে যেন পাক দিতে লাগল। তার কবল থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে একটু হাঁপ ছাড়বার জন্য আমার বুকের ভেতরে ধড়ফড় করছিল, আমি উঠে বল্লুম —তুমি বস, আমি একটু ঘুরে আসছি। সে খপ্ কোরে আমার হাত ধরে বল্লে—ভাইয়া তুমি পালিয়ে যাবে !

—আর পালাব কোথায় ? রাত দশটা বেজে গেছে, এখন তো আর ট্রেন নেই।

আমার কথায় তার বিশ্বাস হোলো না, সে আমার জামাটা খুলে তার জিম্মায় রেখে দিলে।

রাস্তায় বেরিয়ে ছুটে আমি বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। তার পরে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে আস্তে-আস্তে পায়চারী করতে আরম্ভ করা গেল। হরকিষণের মুখের গন্ধ যেন আমার নাকে বাসা বেঁধে বসেছিল, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই তাঁর গন্ধ পাচ্ছিলুম।

রাস্তায় বেড়াতে-বেড়াতে মনে হতে লাগল, কাল সকালেই পুলিশে গিয়ে বাইজীর নামে নালিশ কোরে আসব। সরাইয়ে মুশাফেরদের সঙ্গে সে এই রকম হুল্লোড় করছে জানতে পারলে নিশ্চয় তারা তাকে জব্দ কোরে দেবে। কিন্তু কার জন্য আমি তা করব ? হরকিষণ ! কে সে আমার ? তার যদি বাইজীকে ভাল লেগে থাকে, তবে সে তার সঙ্গে আলাপ করবে—তাতে আমার কি ? আমি তাতে বাধা দেবার কে ? কোথায় তার বাড়ী সুদূর বোম্বাই শহরে, আর আমার বাড়ী কোথায় ভারতের এক প্রান্তে বাংলায়—দু-দিন পরে আজকের ঘটনা স্বপ্নের মতন মনে হবে !

প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে রাস্তায় ঘুরে সরাইয়ে ফিরে এলুম। কিছু খেতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বার আগে একবার হরকিষণের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলুম যে, সে ঘরে নেই, লণ্ঠনটা এক কোনে জ্বলছে। কাছেই কোথাও গিয়েছে মনে কোরে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও সে ফিরল না দেখে আমার মনে হোলো নিশ্চয় সে সরাইয়ের বাইরে মদ কিনতে গিয়েছে। বিরক্ত হোয়ে সেখান থেকে উঠে আমার ঘরের কাছে গিয়ে দেখি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ! দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে ভেতর থেকে হরকিষণ বলে উঠল—কোন্ হ্যায় ?

আমি বল্লুম—দরজা খোলো, খিল দিয়েছ কেন ?

ভেতর থেকে সরিফুন খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠল। তার সেই হাসি বিষ-মাখান ছুরির মতন সোজা এসে আমার বুকে আঘাত করলে। আমার ইচ্ছা করছিল দরজা ভেঙে দুটোকে খুন কোরে ফেলি। জোরে দরজায় একটা লাথি মারলুম। জীর্ণ দরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠল। দূরে একটা লোক বাইরে খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল, সে পাশ ফিরতে-ফিরতে বল্লে—এতনা রাতমে কেয়া ঝামেলা লাগায়া—

ভেতর থেকে আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর হরকিষণের চৌকাঠে গিয়ে বসলুম। সে সময় যদি তারা বেরুত তা হোলে সেই রাত্রে ঝাঁসির সেই সরাইখানায় নিশ্চয় দুটো খুন হোয়ে যেত।

সারা-রাত্রি তাদের অপেক্ষায় সেই চৌকাঠের ওপর বসে রইলুম। সকাল হবার একটু আগে দরজায় মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম হঠাৎ কানে আওয়াজ এল—ভাইয়া!

চোখ চেয়েই দেখি আমার সামনে হরকিষণ দাঁড়িয়ে। তখনো সরাইয়ের কেউ জাগেনি, দিনের আলো একটু দেখা দিয়েছে মাত্র। সেই আলোতে দেখলুম তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হোয়ে গিয়েছে, চোখ দুটো যেন মরা মানুষের চোখ। কাঁপতে-কাঁপতে সে আমার ওপর টলে পড়ে গেল। আমি কোনরকমে তাকে সেখান থেকে টেনে খাটের ওপরে নিয়ে ফেল্লুম! সে সেই অবস্থায় মড়ার মতন নিস্পন্দ হোয়ে পড়ে রইল।

তাকে শুইয়ে তখুনি ছুটে আমার ঘরে গিয়ে দেখি যে, ঘর খালি! বাইজী আগেই পালিয়েছে।

আমার ঘর থেকে আমার দড়ি ও ঘটি বার কোরে স্নান সেরে সেই ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তায় বেশীক্ষণ ঘুরে বেড়ান সম্ভব হোলো না। সারা রাত্রি জাগরণ, তার ওপর সেই উত্তেজনায় আমার মাথার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ বাজছিল। রোদ উঠতেই সরাইয়ে ফিরে একেবারে সোজা হরকিষাণের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাকে না জানিয়ে কেন তারা আমার ঘরে ঢুকে সারারাত কাটালে তার হিসেব নিকেশ না কোরে কিছুতেই শান্ত হোতে পারছিলুম না।

ঘরে গিয়ে দেখলুম যে, হরকিষণ চিৎ হোয়ে মড়ার মতন পড়ে রয়েছে। হঠাৎ তাকে দেখলে জীবিত কি মৃত তা বোঝা যায় না। আমি তার খাটের কাছে গিয়ে ডাক দিলুম—হরকিষণ!

কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকলুম—হরকিষণ!

এবার সে চোখ চাইলে। চোখ দুটো তার একেবারে ঘোলা। সে বল্লে—ভাইয়া।

তার পরে অসহায়ের মতন একখানা হাত বাড়িয়ে আমায় ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। তার সে অবস্থা দেখে আমার দয়া হোলো। আমি তার হাতখানা ধরলুম—গরম! আমার হাত পুড়ে যেতে লাগল।

সে ইসারায় আমায় বুঝিয়ে দিলে ক্ষিদে পেয়েছে।

কালকের রাতের প্রসঙ্গ এই অবস্থায় আর খুঁটিয়ে তুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবুও বল্লুম—ঐরকম অসুখের পর তুমি কি বলে—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে সে সরিফুনদের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগল—সয়তানী—রাক্ষসী! ভাইয়া তুমি আমায় মার কাছে নিয়ে চল।

তার কথা শুনে আমার মনে হোলো সে বোধহয় ভুল বকছে। কিন্তু সে আবার বল্লে—আমি ঝাঁটি অবধি টিকিট কিনেছিলুম রাস্তায় একদিন বিশ্রাম করব বলে। তুমি আজই আমার টিকিট কিনে আন, আমাকে মার কাছে নিয়ে চল।

হরকিষণকে শান্ত কোরে আমি বেরিয়ে পড়লুম। বাজার থেকে বার্লি কিনে এই কদিন যে দোকানে খাবার খেতুম সেখানে গিয়ে তাদের অনুরোধ করতে তারা এক রকম কোরে সেটুকু খাবার উপযোগী কোরে দিলে। হরকিষণকে সেটুকু খাইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।

আজ রাতে যেতেই হবে—হরকিষণ থাক আর না থাক্—এই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। কাল রাতেও ঘুম হই নি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই আমি হরকিষণের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সে তখন খাটের ওপরে বসে ছিল। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—জ্বর আর নেই—অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে।

হরকিষণ আমায় টাকা দিয়ে বল্লে—গাড়ীর সময় যদি ভিড়ে টিকিট না করতে পারা যায়, তা হোলে আর যাওয়া হবে না। তুমি এই বেলা গিয়ে টিকিট কোরে আন। আজ যে কোরেই হোক যেতে হবে।

তার মার কাছে একটা টেলিগ্রাম করবার জন্যও আমায় টাকা দিয়ে দিলে।

সমস্ত দিন আমার কিছু খাওয়া হয় নি, দোকানে বসে খেয়ে নিয়ে ডাকঘরে টেলিগ্রাম কোরে টিকিট কিনে নিয়ে যখন সরাইয়ে ফিরলুম, তখন রাত্রি নটা; ট্রেনের মোটে আর আধঘণ্টা দেরী। আর সময় নেই তাড়াতাড়ি হরকিষণের ঘরে গিয়ে দেখি যাবার কোনো উদ্যোগই তার নেই, খাটের ওপর বসে নিশ্চিন্ত ভাবে সে মদ খাচ্ছে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না—মানুষের শরীরে এত সহ্য হয়! স্তম্ভিত হোয়ে আমি তার কাণ্ড দেখতে লাগলুম—একটা কথাও আমার মুখ ফুটে বেরুল না। সে তার ঘোলাটে চোখ দুটো আমার দিকে তুলে বল্লে—টিকিট কিনেছ ভাইয়া, আজই যেতে হবে কিন্তু—

আমি বল্লুম—যেতে যদি হয় তো এখুনি ওঠ, আর সময় নেই।

—আর একটু বস ভাইয়া।

তার সঙ্গে আর কোনো কথা না বলে আমি তার কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিষগুলোকে একসঙ্গে বাঁধতে আরম্ভ করলুম। পুঁটলী বাঁধা শেষ কোরে বল্লুম—চল, রাস্তায় গাড়ী ধরব।

হরকিষণ সেই ভাবে বসে-বসে বল্লে—আর একটু বস, একটা কথা—বাকী আছে—শেষ কথা।

আমি তার হাতখানা জোর করে ধরে বল্লুম—খবরদার! আমি তোমায় এখান থেকে তুলে নিয়ে চলে যাব। গাড়ী ছাড়তে আর পনেরো মিনিটও নেই।

হরকিষণ আচমকা হেঁচকা টান মেরে আমার হাত থেকে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে বাইরে চলে গেল।

আমি বোধহয় মিনিট দুয়েক বিমূঢ়ের মতন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কিন্তু

তখুনি মনে হলো ট্রেণের আর দেরী নেই। ঠিক করলুম তাকে ফেলেই চলে যেতে হবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আমার ঘর থেকে জিনিস আনতে গিয়ে দেখি যে, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

সর্ব্বনাশ! আবার তারা আমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে! রেগে দরজায় লাথি মারলুম। ভেতর থেকে আবার সেই হাসি! উঃ অসহ্য!

আমার জিনিষপত্র ফেলেই ষ্টেশনের দিকে ছুটলুম। ছুটতে-ছুটতে বেদম্ হোয়ে ষ্টেশনে এসে শুনলুম, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। আমার হাত, পা, মাথা সব ঝিম্ ঝিম্ করছিল, নির্জন ষ্টেশনের একটা বেঞ্চিতে লম্বা হোয়ে পড়ে রইলুম।

ঘণ্টাখানেক স্থির হোয়ে পড়ে থেকে আবার সরাইয়ে ফিরে আসা গেল। দরজা তখনো বন্ধ। সেই রাতে সরাইয়ের বুড়ো মালিককে ডেকে তুলে সব কথা বলে এখুনি পুলিশে খবর দিতে বল্লুম।

সে বল্লে—কাল সকালে সব বন্দোবস্ত করবে, আজ রাতে আর কিছু হবে না। সে রাত্রির মত তারই ঘরে শুয়ে থাকবার জন্য সে আমায় একটা খাট দিলে।

আমি তাকে বল্লুম—আমি সারারাত ঐ দরজার গোড়ায় বসে থাকব, কত বড় বাইজী আমি দেখে নেব!

সরাইওয়ালা আমায় কোনো হাঙ্গামা করতে বারণ কোরে শুয়ে পড়ল। আমি খাটখানা সেখান থেকে তুলে নিয়ে আমার ঘরের দরজার সামনে পেতে তার ওপরে বসে রইলুম।

রাত্রির প্রত্যেক পল, মুহূর্ত, ঘণ্টা আমার মনটাকে করাতের মতন কাট্তে কাটতে অতিবাহিত হোতে লাগল। আমি নিস্পন্দ হোয়ে বসে আছি, স্থির দৃষ্টিতে সেই ফাটা দরজার দিকে চেয়ে—একবার দরজা খুল্লে হয়।

আকাশের বুক ফেটে রক্তধারার মত সূর্য্যের রশ্মি সবে ধরণীর বুকে সেদিন এসে ঠেকেছে, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে দরজা খোলার শব্দ হোলো। তারপর দরজাটা একটু ফাঁক হোতেই আমি একেবারে লাফিয়ে দরজার ওপরে গিয়ে পড়লুম। বাইজী দরজা খুলছিল, সে আমাকে দেখেই পালাবার উপক্রম করলে। আমি খপ্ কোরে তার হাতখানা ধরে বল্লুম—শয়তানের বাচ্ছা, আজ তোমার শেষ দিন—

সরিফুন অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—এই চুপ্ চুপ্!

তারপর সে ফিস-ফিস কোরে বল্লে—হরকিষণ মর গিয়া!!!

আমার মাথার কে যেন জোরে এক ঘা মুগুর বসিয়ে দিলে, চোখের সামনে দিয়ে ঝক্ ঝক্ কোরে বিদ্যুতের মতন কতকগুলো কি খেলে গেল, আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুম দেওয়াল ধরে সামলে নিলুম। খাটের কাছে গিয়ে দেখলুম, হরকিষণের দেহখানা পড়ে রয়েছে—তার ঘোলাটে চোখ দুটো তখনো চেয়ে!! আমার মনে হোতে লাগল এখুনি সে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে বলবে—ভাইয়া আমাকে ক্ষমা কর।

তারপর তিনদিন ধরে পুলিশের টানাটানি। বাইজী কি করে হাজত থেকে অব্যাহতি পেলে জানি না, আমাকে আর সরাইয়ের সেই বৃদ্ধ মালিককে তিন দিন ধরে রেখে তারা ছেড়ে দিলে।

চারদিনের দিন ট্রেণে উঠে বোম্বাই রওনা হলুম। পরদিন ভোরবেলা চা-ওলাকে দাম দিতে গিয়ে ব্যাগের খোপ খুলে দেখি আমার ও হরকিষণের সেই টিকিট দু-খানা তখনো তার মধ্যে রয়েছে। টিকিট দু-খানা হাতে কোরে ভাবতে লাগলুম যে হরকিষণ বিনা টিকিটেই আজ কতদূরে পাড়ি জমিয়েছে—

চা-ওয়ালার কর্কশ তাগাদা আমার চমক ভাঙিয়ে দিলে—

আদরিণী

ভাদ্র মাসের এক পড়ন্ত বেলায় খাল-ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। ক'দিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের ঠেলায় শহরবাসীরা অস্থির। মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দেবী তাঁর ত্যজ্য-সন্তান বঙ্গবাসীদের ওপর দিয়ে তাপ সহনশীলতার যে পরীক্ষা চালান তারই একটি মহলা চলেছিল। ঘামে আর খাল-ধারের মেটে রাস্তার ধুলোয় অঙ্গটি পচা-ভাদ্রের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে-দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হ'য়ে গেল। বরাতে দুঃখ আছে ভেবে দৌড়ে হাঁটা শুরু করলুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কিছুদূর যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আরও দু-চার জন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় খোলার চালের বাড়ি, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর ঝোলা—তারই নিচে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলুম! মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাঁটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগল আর মাঝে-মাঝে দমকা বাতাস আত্মসম্ভ্রমের ওপরে বলাৎকার শুরু ক'রে দিলে।

অনন্যোপায় হোয়ে কাক-ভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাঁট বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার আশে-পাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিল তারা একে-একে সরে পড়তে লাগল। আমার বাড়ি অনেক দূরে—বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না থামিলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশ-পাশের চারদিকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ হোলো। গলিটা বেশ চওড়া—দু-খানা গরুর গাড়ি পাশা-পাশি যেতে পারে। গলির দুধারেই খোলার বাড়ি—একেবারে শেষ অবাধ।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ির গা ঘেঁষে এক ভিখারী বসে অবিশ্রান্ত চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথার লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চ্যাঁচাচ্ছিল—সে আক্ষেপের মধ্যে আল্লা ও খোদার বাহুল্য শুনে মনে হোলো সে ব্যাক্ত মুসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে সামনের সেই অন্ধ ভিখারীও অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এপারে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে লোকটার কৃচ্ছ্রসাধনা দেখছি আর মনে মনে গবেষণা করছি, আল্লা ওরকে সোনা হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগল। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হ'য়ে পড়ল। বৃষ্টি-ধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চেপে আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল-সমাধিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়া শ্রেয় এই রকম একটা সঙ্কল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার কাণের কাছে করুণ কণ্ঠে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হোল—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে চেয়ে দেখি একটি মেয়ে! বয়স তার বাইশ তেইশ বছর হবে, রংটি ফিকে মেঘের মত ময়লা। একখানা ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। শাড়িখানা ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গিয়েছে, তার ছিন্ন অবকাশ দিয়ে উত্তমাঙ্গের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিণীর মত কৃশ নয়, বেশ সুপুষ্ট—বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমেই তা ধরা পড়ে। সমস্ত দেহে এমন কমনীয়তাও লাবণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিণী আবার বল্লে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দেখলুম সে থর-থর ক'রে কাঁপছে।

বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছি এমন সময় আবার সে বলে উঠল—একটি পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখ পড়ল। চোখ দুটি এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু কি অদ্ভুত চাহনি সে চোখে! এমন করুণ দৃষ্টি আমি খুব কমই দেখেছি। হতশ্রী মালঞ্চের এক কোণে জঙ্গল পরিবেষ্টিত নির্জন স্বচ্ছ পুষ্করিণীর ধারে বসে থাকতে-থাকতে মাঝে-মাঝে ধরণীর যে মর্ম ব্যথা সেই কালো জলের বুকে ফুটে উঠতে দেখা যায়, তার দৃষ্টিতে যেন সেই ব্যথা স্থির হয়ে আছে। কোনো প্রশ্ন না ক'রে একটা পয়সা পকেট থেকে বের ক'রে তার হাতে দিলুম।

ওপারে সেই অন্ধ বৃদ্ধ তখনো তারস্বরে খোদাকে আবেদন জানাচ্ছে, বৃষ্টি-ধারা সমানে চলেছে। মেঘমণ্ডিত স্তিমিত সূর্যালোক আমার চারদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুঝতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে দাঁড়াল। তারপরে হঠাৎ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অন্ধ বৃদ্ধের হাতে পয়সাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেক্‌ল। মনে হোতে লাগ্‌ল, ঐ মেয়েটা বোধ হয় ঐ বুড়োরই কেউ হবে, চারিদিক থেকে ভিক্ষে ক'রে নিয়ে এসে বুড়োর কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়িটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে ঢুকেছে—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃষ্টি সমানে চলেছে। ওরি মধ্যে কখনো চেপে আসে কখনো বা প্রায় থেমে যায়। সন্ধ্যে হোয়ে এলেও মেঘ কেটে যাওয়ার তখনো একটু আলো আছে। বৃদ্ধ ভিখারীর চীৎকার একটু মন্দা পড়েছে, বোধ হয় সারাদিন চেঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম একটি স্ত্রীলোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজার ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বস্‌ল। চামচিকের মতন কালো আর রোগা, ধপধপে সাদা একখানা চওড়া-পাড় শাড়ি পরা—চুল বাঁধার বাহার দেখেই বুঝতে পারলুম কে সে—কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট-কয়েকের মধ্যে আর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বস্‌ল। আমি যে বাড়িটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, দেখলুম সেখানকার দরজাতেও দু-চার জন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছে। অন্ধকার ঘোর হবার আগেই তারা বেসাতি খুলে বস্‌ল। দেখলুম ওপারের সেই অন্ধ বৃদ্ধও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। কয়েক-মুহূর্ত যেতে না যেতেই দেখলুম আমার সেই দয়াময়ী ভিখারিণী পরিষ্কার কাপড় পরে দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বৃষ্টিও একেবারে থ মেরে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যারা চোখ চেয়ে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতি-সাধারণ হোয়ে ওঠে, তবুও এই ভিখারিণীর ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। আমি স্থির করলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খুলে নিংড়ে কাঁধে ফেলেছিলুম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হোয়ে ভিখারিণীর কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে একেবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাব ও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দোব না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অন্যত্র পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি ?

—আদরিণী, আৎরী বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিট্‌মারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বস্‌ল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আমাকে চিনতে পারছ ?

প্রশ্ন শুনেই আৎরী হাসতে আরম্ভ করে দিলে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—আহা কত ঢংই জান! আজ কি নেশা করা হয়েছে শুনি ?

এই বলেই সে ভিজে জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বল্লে—দাঁড়াও। উনুনের ধারে এটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আসি—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে-বসে ভাবতে লাগলুম, কি জানি বেপোট জায়গায় এসে আজ জামাটাই বুঝি আক্কেল-সেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখুনি সে ফিরে এসে বল্লে—এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে।

তারপরে আমার ধুতিটাকে হাত দিয়ে বল্লে—এঃ ধুতিও যে ভিজে গিয়েছে। একখানা শাড়ি পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ি নিয়ে এসে বল্লে —নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ধুতিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বল্লুম—ও এখুনি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হোয়ে বোসো তো, তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি।

শাড়িখানা ছুঁড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বল্লে —বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না ?

—তুমি তো মোড়ের ঐ বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে দু-তিনবার এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। বল্লুম—ছেলেবেলা থেকে বাঁশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বল্লুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি। গোটাকতক কথার ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোন মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দোব ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমায় ঠেসে গা ঘেঁসে বসেছিল, বেশ বুঝতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে

মন্ত ক'রে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আপনি কি পুলিশের লোক ? বাবা আমি কোনো দোষ করি নি, আমার ওপর কোনো অত্যাচার করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষে করুন।

এই বলে সে আমার পা দুটো চেপে ধরলে।

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লুম। কেন যে আদরিণী অতখানি বাড়াবাড়ি করলে, তা বুঝতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সান্তনা দিয়ে বল্লুম—আমি মোটেই পুলিশের লোক নই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড় ভাল মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচয় পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। আশ্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে। বল্লে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লে—বাবার বয়স কত ?—

তেইশ বছর।

আদরিণী খিল-খিল করে হেসে উঠে বল্লে—বেশ হোলো, বাপ আর মেয়ে একই বয়সী। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে ঝঙ্কার দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মস্করা হচ্ছে! কে এয়েচে ?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সে বলে উঠল—তোর বর এয়েচে। রাস্তা থেকে তোর বর নিয়ে এয়েছি—আয় না ভেতরে।

দরজা ধাক্কা দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে হোলো দীনবন্ধু মিত্তিরের 'জগদম্বা' বুঝি নাটক থেকে উঠে এল।

আদরিণী বল্লে—দেখ্ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে এনেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয় ?

—মুখে আগুন! দিনে-দিনে কত রঙ্গই হচ্ছে! নে নে আঁ রেখে শিগ্গির কর। আবার লোক আস্বে—

এই বলে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আদরিণী হাসতে-হাসতে বল্লে—কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে আমার মাকে ?

জিজ্ঞাসা করলুম—উনি কি তোমার মা নাকি ?

আদরিণী অন্যদিকে মুখ করে সম্মতি-সূচক ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাটা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল। দেখলুম আমার ধপধপে সাদা সিল্ক টুইলের সার্ট ধোঁয়ায় প্রায় কাল হ'য়ে গিয়েছে আর তা থেকে মাছের ঝোল আর ধোঁয়া মিলিয়ে এমন একটা বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে যে, গায়ে দেওয়া দূরের কথা, সেটাকে কাছে রাখলে বমি ঠেলে আসে।

জামাটাকে গুটিয়ে পাশে রেখে বল্লুম—রসিকতা তো খুব হোলো এবার আমার কথার জবাব দাও দিকিন।

—কি বল ?

আমার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়ে ঐ যে অন্ধ বুড়োটাকে দিলে, ও তোমার কে হয় ?

আদরিণী কিছুক্ষণ অবাক হোয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—ও তুমিই বুঝি ঐখানে দাঁড়িয়েছিলে ! এতক্ষণে বুঝেছি !

—কে হয় ও বুড়োটা তোমার ?

—কে আবার হবে ! ও তো মোচলমান।

—তবে ?

আদরিণী কোনো কথা বল্লে না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

বল্লুম—তোমার তো অভাব কিছুই দেখ্ছি না, তবে তুমি ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন ? আর কার জন্যেই বা কর ?

আদরিণী চট্ ক'রে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে কি দেখে ফিরে এসে বল্লে—বাবা, আজ তুমি বাড়ি যাও, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে—বল্‌ব—তোমাকে আমার সব কথা বল্‌ব,—কিন্তু আজ নয়—কবে আস্‌বে বল ?

—আবার আসতে হবে ?

—নিশ্চয় আসতে হবে। ভুলো না, আমি তোমার মেয়ে।

আদরণী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কি জাত ?

—জাত-টাত আমি মানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

—কি গোত্তর ?

—ভরদ্বাজ।

—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল—পরশু এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামে তাদের বাড়ি ছিল। কলকাতায় রসুইয়ে বামুনের কাজ ক'রে সে বেশ দু-পয়সা উপার্জন করত। পরিবার থাকত দেশে, কিন্তু আদরিণীর যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতায় নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুল্লে। বছরখানেক যেতে না যেতে তার এক ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সঙ্গে আগে থাকতেই বাড়িউলির প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলা-খুলি ভাবেই ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে ঘর করতে লাগল। আট বছরের আদরিণী তার মা-মরা ভাইটিকে মানুষ করতে লাগল।

ভাইটি তার কাছেই থাকে, সেই তাকে খাওয়ায় দাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। তার ওপরে নতুন মার সঙ্গে খাটে, সংসারের কাজে যোগান দেয়, বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে আনে। দোষ করলে বাপও ঠেঙায়, নতুন মা-ও ঠেঙায়—গালাগালিগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

এমনি করে দিন চল্‌ছিল। যখন তার দশ এগার বছর বয়েস, সেই সময়

তার বাপ মারা গেল। বাপ মারা যেতে নতুন মা তাকে এক বাবুদের বাড়ি বাসন-মাজার কাজে লাগিয়ে দিলে। সকালবেলা উঠে সে তার ভাই নন্দকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি চলে যেতো কাজ করতে, আর বাড়ি ফিরত রাত্রি দশটা এগারোটার সময়—সেখানেই দু-বেলা খেতে পেত। দু-টাকা তার মাইনে ছিল বটে; কিন্তু সে টাকা সে পেত না। তার নতুন মা ঠিক সময়ে গিয়ে বাবুদের কাছে গিয়ে তার মাইনেটা নিয়ে আসত—ছেলেমানুষ হারিয়ে ফেলতে পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বালিকা-মনের অভিমান। নন্দর জামা-কাপড় কোনো কিছুর খরচই নতুন মা দেয় না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝে-মাঝে বাবুদের বাড়ি থেকে নন্দকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষে করতে। দু-চার পয়সা যা পায়, তাই জমিয়ে ভাইকে জামা-কাপড় কিনে দেয়। মধ্যে -মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছোট ছেলেদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসে সংসার পাতবে, দিদির দুঃখ ঘোচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সুখ। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করে। আরও কষ্ট সহ্য করতে রাজী।

নন্দর ছ-বছর বয়স হোলো। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইস্কুলে পাঠাবে। তার জামা-কাপড়, ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছুই দিতে চায় না। নন্দকে ইস্কুলে পাঠাবার জন্য বেশী জেদাজেদী আরম্ভ করায় নতুন মা বল্লে—আমি এত পয়সা কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার পয়সা রোজগার ক'রে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দের সঙ্গে তারও বয়স বেড়েছে—বিনা সুপারিশে সে নিজেই পয়সা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মতন করে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশ্যা-বৃত্তি তো দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজে-গুজে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়, আর তারই খরচ জোগাবার জন্য আদরিণী সন্ধ্যেবেলায় সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রতি রাত্রে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে—তোদের মানুষ করার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা উঠে গেলে তোর পয়সা তুই রাখিস—তার আগে একটি পয়সাও পাবি নে।

আদরিণীর কোনো দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে করে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কাটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেল নন্দ আর ইস্কুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধি-বিড়ি খেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—ইস্কুলের মাইনে তাতেই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেল্লে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন করিসনি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হোলে আমার দুঃখ ঘুচবে।

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মা-ও তার সঙ্গে সায়

দিলে। বল্লে—এতগুলো করেটাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—যদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায় দায় হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে রাতে বাড়ি আসে না। বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ি আসে—চুল উস্কোখুস্কো, চোখ রাঙা।

নতুন মা-র সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোকে আর খেতে দিতে পারব না—বেড়িয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

আদরিণী তাকে বোঝায়। নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সন্ধান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা ক'রে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কি নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন-মা তাকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলে। আদরিণী তাকে কত মানা করলে। বল্লে, যাস্নি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কি রইল। দু-দিন থাক, দেনাটা শোধ হোয়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব।

নন্দ শুনলে না, চলে গেল।

আদরিণীর সংসার শূন্য হোয়ে গেল। ভাইকে মানুষ ক'রে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে কোরে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল। এই জন্য তেরো বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালো মেঘ এসে তার মানস-উদ্যান ছেয়ে ফেল্লে, তার জীবন অন্ধকার হোয়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচেছিল, সে-ই অতি রূঢ় আঘাত দিয়ে তার সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুক্ষ চুল, মনে হয় কতদিন নাওয়া-খাওয়া হয় নি। সে পয়সা চায়। কিন্তু আদরিণী পয়সা কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেরুতে লাগ্ল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু-তিন ঘুরে বেশ রোজগার হোতে লাগল। ভিক্ষার পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার তার মনে রঙীন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে—তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময় আদরিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিন নয়, তার ঘরে চৌদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু দেখে কিছু শুনে একটু একটু করে জানতে পারলুম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন-যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়-দায় কাজকর্ম করে, অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাইরের সংসারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানস জীবন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোনো সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরুচি ও কল্পনা দিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি ক'রে সেখানে বাস করে। হয়ত বাস্তব জীবনে সে

রাস্তার মুটে, মানস-জীবনে সে বিশ্বের রাজা। এই কর্ম-জীবনের সঙ্গে মানস-জীবনের যে যত বেশী আপোষ করতে পারে সেই তত বেশী কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না, তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তব-জীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী হোলেও আমি দেখতে পেতুম মানব-জীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী সে। সেখানে স্বামী, পুত্র পরিজন ও আশ্রিতজনে ভরা তার গৃহ। বাস্তব জীবনে সে নিঃস্ব কিন্তু মানস জীবনে তার দান-ধ্যানের অন্ত নাই—দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরম-কারুণিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি দেহ বিক্রয় করা যার উপজীবিকা কিন্তু মনে সে সাবিত্রী-সমা। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বল্লে—বাবা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। যে ভাইকে মানুষ করবার জন্য স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি বরণ করেছিলুম সে তো বদমায়েস হোয়ে গেল। আর কেন! তুমি আমায় নিয়ে চল তোমার বাড়িতে।

বল্লুম—আমার বাড়িতে গিয়ে কি করবে?

সে বল্লে—তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করব। আমায় মাইনে দিতে হবে না—দু'বেলা দুটি খেতে দেবে।

সমান-বয়সী মেয়ে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হোলে আমার পিতৃত্বে যে কেউ বিশ্বাস করবে না সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সংকোচ হোলো। বল্লুম—আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌ব।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠোনে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে আর সে তার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোঁড়াটা চলে গেল। দেখলুম আদরিণীর ডান দিকের ভুরুর পাশে রগটা একটু ফোলা আর তার চারদিকে অনেকখানি জায়গা কালশিরে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে, কি ক'রে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বল্লে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা ক'রে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিন-দশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকায় দুপুরবেলা ভিক্ষায় বেরুতে পারেনি। নন্দ সেকথা মানলে না। শেষকালে রেগে গিয়ে সে তাকে মেরে অজ্ঞান ক'রে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বল্‌ব না তো আর কি বল্‌ব!

সেদিন সে আশ্চর্য রকমের গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাকে

আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার কি হোলো একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশংকা করছিলুম এবার বোধ হয় সে কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বল্লে—বাবা তোমাকে একটা কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

—খুব ভাল। কি করবে?

—আমি বিয়ে ক'রে চলে যাব এখান থেকে।

—সে তো ভাল কথা। কাকে বিয়ে করবে?

—হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বল্লুম—সম্প্রদান করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

ঐ—যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

—ও কাদের ছেলে?

—হাড়ীদের!!!

আদরিণীদের বস্তির একটু দূরেই একটা বড় মাঠ পড়েছিল। বড় মানে শহরের হিসাবে বড়। এই মাঠের একদিকে কয়েকঘর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড় বড় চেটাই পেতে টিকে দিত, এই জন্য এই মাঠকে ও-অঞ্চলের লোকেরা 'টিকে-পাড়া'র মাঠ বলত। সে সময় কলকাতার অনেক জায়গায় এই রকম টিকে-পাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকে-পাড়ার মাঠের আর এককোণে ছিল ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শুয়োর পুষত আর সেই শুয়োরের দল মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চেটাইয়ের আধ-শুকনো টিকে চটকে দিত বলে টিকে-ওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোতো।

হাড়ীদের মধ্যেও বড়লোক, মেজোলোক ও ছোটলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়লোকের মেয়েরা মেথরাণীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেঁড়া জামা-কাপড়ের বদলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুজো পার্বণে লোকের বাড়িতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চ্যাঁচারি দিয়ে ঝুড়ি, চেটাই, দর্মা ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড় বড় পুতুল তৈরী করত। মেজোলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ি মেথরাণীর কাজ করত আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটলোকদের স্ত্রী পুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে তাদের বাড়ির কেউ মেথর মেথরাণীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মায়ের নাম ছিল নিস্তারিনী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাস করত এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হোতো। এই মেয়েগুলি তাকে নিস্তার মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলুম—ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়িতে কতকগুলো খালি ঘর ছিল। সেগুলো সে ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে বলা হোতো খোঞ্চে। আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন মিলনকুঞ্জ। বাইরের যে কোনো স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টায় দু আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোঞ্চের কথা তখনকার দিনে গুণীলোক মাত্রেরই জানা ছিল।

হাড়ি পাড়ার মেয়েদের দেহসৌষ্ঠবের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দু পাট্টির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেককেই ফাদার নিস্তারের খোঞ্চেতে দেখা যেত। মাঝে-মাঝে সেখানে শাশুড়ী-বৌয়ে, মায়ে-ঝিয়ে ঠোকাঠুকি হোয়ে গিয়ে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হোতো। এইখানকারই এক বয়স্থা হাড়ী গিন্নীর সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোঞ্চেতে আসত মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোকটি খোঞ্চেতে আসত তার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে দু-দিকে ঘোঁট বাধিয়ে তুল্লে। এই ঘোঁট যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলুম।

সত্যি কথা বলতে কি, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভাল লাগল না। বিয়েতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল।

আদরিণী আমায় বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা তুমি কি বল ?

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা তুমি বিয়ে করতে চাও কেন ? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে করে কি তার চেয়ে ভাল থাকবে ?

আদরিণী বল্লে—এখন আমি কিছুই ভাল নেই, বিয়ে করলে হয়ত এর চেয়ে ভাল থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলুম, নইলে লোকের বাড়ি গতর খেটে আমার ভাত-কাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়ত একটা ভাল লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুম সে হোলো একটা অমানুষ—আমার দুঃখ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বল্লুম—আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত ক'রে দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোন একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভদ্রলোককে বিয়ে করবে—না হয় এমনিই ভদ্রভাবে থাকবে—এমন তো অনেক মেয়ে আছে।

আমার কথা শুনে আদরিণীর মুখখানা খুশীতে ভরে উঠল। সে বল্লে—আমার লেখাপড়া হবে বাবা ? বয়েস যে অনেক হয়ে গিয়েছে তোমার মেয়ের !

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি ? মন দিলে সব বয়সেই লেখাপড়া দেখা যায়।

—সেই ভাল বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর—বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতেন। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের টাকাকড়ি কিছু ছিল না, চারদিকে থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরুব্বী ছিলেন। আশ্রমে অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে কয়েকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হোতো। আমি সাহস ক'রে একদিন আশ্রমের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বল্লুম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চেপে গিয়েছিলুম। তার সম্বন্ধে সত্য মিথ্যায় মিলিয়ে বেশ একটি করুণ কাহিনী রচনা ক'রে তাঁকে শোনালুম।

সব শুনে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ? কোথায় আলাপ হোলো ?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্যে আমি প্রস্তুত হোয়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টা টাক জেরা ক'রে তিনি আমায় বল্লেন—আপাতত তাঁদের ফণ্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ধারকামী যুবতী আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী—এই শুভ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়িতে জানিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সঙ্গে একই সরকারী দপ্তরে এক ভদ্রলোক চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখী জনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বাবাও মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতেন। কলকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ বালক বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কি ক'রে একটা আশ্রম খোলা যায় এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হোতো। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ির কাছেই সস্তায় একখানা ভাঙা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট-দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি কাজ সুরু করে দিলেন। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড় একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি মুষ্টি ভিক্ষায় বেরুতেন। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ আধ-মণটাক চাল ও কিছু তরকারি নিয়ে বাড়ি ফিরে রান্না চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোলো। সাধারন ও সরকারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হোলো—দেশজোড়া তাঁর নামডাক হোলো, তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হোলো। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ আছে। বৃদ্ধবয়সে বদনামের পশরা মাথায় নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে হোলো।

সে কথা যাক্, আমি একদিন সন্ধ্যের সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে যে দুঃখের কাহিনী আমি তৈরী করেছিলুম, তা শুনে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হোয়ে উঠল। কি ক'রে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোনো প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বল্লেন—দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোনো মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তুমি ছেলেমানুষ (তখন আমার চব্বিশ বছর বয়স), এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই বলে, ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠতেই তিনি বল্লেন—তাইত হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? তুমি যে রকম বল্লে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভাল আশ্রয় না পায় তা হোলে বিপথগামিনী হোতে পারে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে। তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরে এসেছে। তার ভালমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ তো হোতে পারছি না। কি বল?

আমি আর কি বলব। চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বল্লেন—এক কাজ করা যাক। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপততঃ তাকে আমার ভাই কিংবা বোনের বাড়িতে রেখে দোব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ভগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বল্লুম—তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছি। ভাল গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—খুব ভাল লোক তারা।

আদরিণী একবার লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি আমার সত্যিকার বাবা। গেল জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম, ফাদার নিস্তার এ কয়দিন উঠতে-বসতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাকে সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ ক'রে দিয়েছে, কিন্তু হেমা কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বল্লে—আহা! আমি চলে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে—বড্ড ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড়-গড় ক'রে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল্। আমি বল্লুম—আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কি নেবার গুছিয়ে নাও—এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

আদরিণী বল্লে—এখানকার কোনো জিনিস নেব না বাবা—এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকব না। নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ

করব। এতদিন আমার জীবন যে-ভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়। এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই—কেউ কোনদিন ছিল না। আমি যেন এক্ষুনি জন্মিয়েছি—যারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বল্লুম—তবুও একটা-দুটো শাড়ি-গামছা ইত্যাদি নাও, কি জানি সেখানে গিয়ে তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজী হোয়ে আদরিণী আলমারী থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পোঁটলা বাঁধতে-বাঁধতে সে বল্লে—এবার বাবা আমি মন্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে কিন্তু—

বল্লুম—বেশ!

আদরিণী জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত তারা?

—কারা?

—যেখানে যাচ্ছ।

—তারা ক্রীশ্চান, জাত-টাত মানে না।

—এ্যাঁ! ক্রীশ্চান! গরু খায়?

আদরিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পোঁটলাটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বল্লুম—ক্রীশ্চান হোলেই কি গরু খেতে হবে নাকি? তারা বোধ হয় মাছ-মাংসও খায় না।

আদরিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কঠিন সুরে বল্লে—না বাবা, জীবন-ভোর অনেক পাপ করেছি, আর ক্রীশ্চানের অন্ন খাব না। বরাতে যা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে আমি।

কথাগুলো শুনে আমার রাগ হোলো। প্রতিদিন ছত্রিশ জাতের কাছে দেহ বিক্রী ক'রে যে হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, ক্রীশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দুত্ব যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সে-কথা মানতে রাজী হোলো না। শেষকালে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এরই মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি হোলো। দিনরাত অমন ক'রে মরছ কেন?

আদরিণী কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগল। নিস্তারিণী আমার দিকে চেয়ে বল্লে—হ্যাঁ গা ভালমানুষের বাছা! ওর মাথায় এ সব কি বুদ্ধি দিচ্ছ? এতে কি তোমার ভাল হবে, না ওরই ভাল হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচানাচি সুরু করেছে—বলি কেন? কিসের জন্য শুনি?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?

—বলে চলে যাব, বিয়ে করব—লেখাপড়া শিখব। যা দিকিনু তুই—

আদরিণী এবার গর্জে উঠল—আলবৎ যাব।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহ বিক্রমে আদরিণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে আরম্ভ করলে। আদরিণী কোনো বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগল—মার, মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে বুঝব।

ফাদার নিস্তারের চীৎকারে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদরিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটা ঘটি টেনে নিয়ে তাই দিয়ে আদরিণীর মাথা ও মুখ থেঁৎলাতে আরম্ভ ক'রে দিল।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে ফেললুম। বাড়ির মধ্যে বাইরেরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে জমা হয়েছিল, তারা সকলেই পাড়ার লোক, সকলেই আৎরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত্র নিস্তারিণী গর্জে উঠল—ভাল হবে না বলছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়িউলি—আমায় চেনো না?

আমার মাথায় তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলুম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বল্লুম—আমি একে পুলিশে দোব—তোমরা সবাই দেখেছ, এ আৎরীকে কি রকম মেরেছে।

পুলিশের নাম শুনেই ভিড়ের পুরুষ দর্শকরা একে-একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদেরপ ড়ার এক পাল স্ত্রী-পুরুষ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কে কাকে মেলে! আৎরী—আৎরী কোথায়?

একবার চারিদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক ক'রে দাওয়ায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আদরিণীকে দেখে বল্লে—ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে! কে মেলে? বল কে মেলে?

আদরিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটি ফাটি করছে, এমন সময় হেমা বল্লে—চ আৎরী আমাদের ঘরকে চ—কাল নগনসা আছে—

আদরিণী মাটি থেকে উঠে টলতে-টলতে বল্লে—চ

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপরের মতন ভোঁস ভোঁস করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম ক'রে কিছু ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদরিণীকে অগ্রসর হোতে দেখে সে গর্জে উঠে বল্লে—খবর্দার আৎরী, বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ কি খুন ক'রে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হোতে না হোতে আদরিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া টপ্‌কে একেবারে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাঁদি নৎ। দুই কাণের ওপর থেকে

ডিম অবধি সারি করে মাকড়ী—এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নৎ ও কাণের দু-তিনটে মাকড়ী ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তধারা ছুটতে লাগ্‌ল।

—ওরে বাবা, এত রক্ত—বলে নিস্তারিণী তো ঘুরে মাটিতে পড়ল, ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আর্দারিণীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে তারই ওপরে তার পেটে দমাদম লাথি মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বাড়ির অন্য মেয়েরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগ্‌ল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগ্‌ল। আর্দারিণীকে গিয়ে ধরব না পলায়ন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিয়ে তাকে ধরে ফেল্লে।

আর্দারিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—চ হেমা।

আমি গুটি-গুটি দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলুম। আর্দারিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বল্লে—বাবা বুঝি মেয়ের কীর্তি দেখে সরে পড়ছিলে?

আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মাঠের কাছে পেঁছে আমি বল্লুম—আচ্ছা এবার আমি চল্লুম।

আর্দারিণী বল্লে—চল্লে বাবা! আচ্ছা তা'হলে কাল নিশ্চয় এস—কাল আমার বিয়ে।

বল্লুম—ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু-এক দিনের মধ্যে আস্‌ব।

—না না কাল আসতেই হবে।

তারপর একটু হেসে বল্লে—তোমার ভরদ্বাজের দিব্যি রইল।

তার সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভরদ্বাজের দিব্যি রাখতে পারি নি। বোধ হয় সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেলে আর্দারিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলুম তার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে ক'রে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হোতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই খুশিতে ডগমগ হোয়ে আর্দারিণী বল্লে—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমাদের দু-জনেরই রেলে চাকরি হয়েছে—মেথর ও মেথরাণীর কাজ। ও পাশ আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব—

পঞ্চম পক্ষ

বাংলা দেশের একখানি গ্রাম। ঠিক গ্রাম নয়, মহকুমা-শহর। তবে তার গ্রামত্ব এখনও কাটে নি, শহর হয়ে উঠ্ছে। কলকাতা থেকে মাইল কুড়িকের মধ্যে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছত্রিশ জাতেরই বাস সেখানে। আধুনিক কাল। একটি লাইব্রেরি ও সেই সঙ্গে থিয়েটারের ক্লাবও আছে।

কাল—ঘরের বাইরে বিকেলের শেষ, ঘরের মধ্যে সন্ধ্যের প্রথম।

এই আলো-আঁধারে লাইব্রেরি-ঘরের মধ্যে ব'সে সুরপ্রিয় মুখুজ্জে ওরফে গ্রামের যুবকদের খুড়ো, আর সকলের—সুরো বুড়ো হরলালের সঙ্গে দাবা খেলেছে। সুরপ্রিয়র বয়স একচল্লিশ।

সুরপ্রিয় একসময় ক্লাবের খুব উৎসাহী সভ্য ছিল, কিন্তু আজকাল সে আর ক্লাবে আসে না। অনেকদিন পরে তাকে ক্লাবে আসতে দেখে উপস্থিত সবাই খুশি এবং বিশেষ উৎসাহিত। তাদের খেলার চারপাশে আরও পাঁচ-ছজন ব'সে খুব মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখছে। উপরি-চাল বলা একদম বারণ। খেলা বেশ জ'মে উঠেছে।

দাবার পাশ থেকে ঘোড়া তুলে নিয়ে এক ঘরে টিপে দিয়ে সুরো হাঁকলে, এই পড়ল কিস্তি।

কাট্

গাঁয়ের আর একদিকে একখানা দোতলা বাড়ি। বাড়ির আয়তন ও অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, মালিকের অবস্থা ভাল। দালানের পেছনে উত্তর দিকে প্রকাণ্ড দীঘি—টল্‌টলে কানায়-কানায় জল। দীঘির এক কোণে কলাবাগানের ঝোপে একটি তরুণী ও একজন তরুণ দাঁড়িয়ে। বাগানের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, বাইরে থেকে কারুর দেখতে পাবার উপায় নেই—কাজেই তারা একটু বেপরোয়া।

তরুণী হচ্ছেন সুরপ্রিয় মুখুজ্জে অর্থাৎ ওরফে খুড়োর পত্নী। তরুণ যিনি তিনি গ্রামেরই এক যুবক—নাম নন্দলাল নন্দী, ডাকনাম বাঁটুল। এই বছর বি. এস-সি. পাস ক'রে ভেরেণ্ডা ভাজ্‌ছেন।

তরুণ তরুণীকে half embrace-এ জড়িয়ে ধরে বললে—রাগ করলে?

তরুণী—রাগ করি নি, কিন্তু সত্যি যদি আমায় ভালবাস, তা হ'লে এখুনি আমায় এখান থেকে নিয়ে চল। আর এক মুহূর্তও আমার এখানে সহ্য হচ্ছে না।

—তোমায় বলেছি তো রাধা, আমার যতদিন না একটা কাজকর্ম জোটে, ততদিন কোথায় নিয়ে গিয়ে তোমায় রাখ্‌ব?

রাধারাণী বাঁটুলের দিকে মুখ তুলে চাইলে। তার চোখে ফুটে উঠল

অশ্রুমুক্তা, আর বাঁটুলের চোখে ফুট্‌ল করুণা ও আতঙ্কমিশ্রিত এক অপূর্ব ভাব।

বাঁটুলের চোখ থেকে চোখ নামিয়ে রাধারাণী তার কাঁধের ওপর হেলে পড়ে শ্রুতিমূলে বিচিত্র গুঞ্জন আরম্ভ করলে। বাঁটুলের মনে হতে লাগল, যেন রাধিকার বিরহাশ্রু সঙ্গীতধারায় তার কানে বর্ষিত হচ্ছে। কাতর মিনতিতে যমী যেন যমকে অনুনয় করছে।* তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল, ইদন উদ্যোনের বিচিত্র শোভা, ইভ যেন সবে-মাত্র নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলটি ছিঁড়ে আদমকে চোখ ঠারছে।

বিহ্বল বাঁটুলের অবস্থা দেখে রাধারাণী তার কাঁধ থেকে মুখ তুলে নিয়ে বললে—তুমি পাঁচ মিনিট দাঁড়াও, আমি বাড়ির ভেতর থেকে খানকয়েক শাড়ি নিয়ে আসি। এখুনি, এই মুহূর্তেই আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। পোড়ারমুখোর মুখ যেন আর না দেখতে হয়।

বাঁটুল মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে—তোমাকে নিয়ে চলে যাই এ কি আমার অসাধ রাধারাণী! কটা দিন সবুর কর, আমার এই চাকরিটা হোক—

বাঁটুলের কথা থামিয়ে দিয়ে রাধারাণী ব'লে উঠল—চুপ কর। খালি চাকরি, চাকরি, কাজ আর কাজ! তুমি কি পুরুষমানুষ! ধিক্‌! শত ধিক্‌ তোমাকে।

রাধারাণী ছুটে বাড়ির দিকে চলে গেল।

অপসৃয়মানা রাধামূর্তি দেখতে-দেখতে বাঁটুলের দেহ-মন কি রকম একটা বিহ্বলতায় আবিষ্ট হয়ে পড়েতে লাগল। ঠিক সেই সময় দূরে আমগাছে পাপিয়া ডেকে উঠতেই তার মনে হ'ল, গাছের ওপর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে। কাছেই ছাইয়ের গাদায় লুটিয়ে পড়ে একদল ছাতারে পাখি চ্যাঁ-চ্যাঁ করছিল। বাঁটুলের মনে হতে লাগল, একদল বোষ্টম যেন কেত্তনের শেষ অংক অভিনয় করছে।

চারিদিকে শব্দ। রাধার ধিক্কারে যেন আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বাঁটুলের কানে আর কোন শব্দ যাচ্ছে না। কেবল ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌। ঠিক সেই সময় পুকুরের পূব দিকে শোনা গেল, গ্রামের অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র গাইতে গাইতে চলেছে—

> ধিক্‌ ধিক্‌ তোরে নিঠুর কালিয়ে
> ধিক্‌ তোরে শত ধিক্‌—
> তোরেও ধিক্‌ তোর প্রেমেও ধিক্‌—

---

* ঋক্‌ বেদে যমী ও যমের আখ্যায়িকাকার সত্যযুগের লোক হলেও অতি আধুনিকত্বের একটু touch তাঁর মধ্যে ছিল। যমী ও যম ভাই বোন তারা, যমীর মুখ দিয়ে ভাইকে দেহদানের প্রস্তাব করিয়ে তিনি অমন একটা tense situation তৈরি করলেন বটে, কিন্তু Cinema sense না থাকায় Climaxটি murder করলেন।

উত্তেজনায় বাঁটুলের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ তার বাঁ পায়ের মাঝের আঙুলটায় খিল ধরতেই সাপে কামড়েছে মনে ক'রে সে বসে পড়ে আঙুলটা চেপে ধরলে। একটু সম্বিৎ ফিরে পেতেই বাঁটুল উঠে দাঁড়াল। ভয়ে তার বুকের ভেতরটা তখনও ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকটা কলাপাতা চড়্‌চড়্‌ ক'রে ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে সে চিবোতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

অন্ধ কেষ্টর গান অস্পষ্ট হয়ে এলেও তখনও শোনা যাচ্ছিল—

ধিক্‌ ধিক্‌ তোরে নিঠুর কালিয়ে
ধিক্‌ তোরে শত ধিক্‌—

এক ঢোঁক কলাপাতাপিণ্ড পেটে যেতেই বাঁটুল প্রকৃতিস্থ হয়ে থু থু ক'রে বাকিটা মুখ থেকে ফেলে দিলে। তারপরে মনে-মনে দৃঢ় হয়ে স্থির করলে, আজকের মতন কোণ রকমে রাধারাণীকে নিবৃত্ত করতেই হবে।

মন যখন প্রায় স্থির হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় রাধারাণীর আওয়াজ কানে এল—চল।

বাঁটুল মুখ ফিরে দেখলে হাতে তার দুটি পুঁটলি—একটি ছোট একটি বড়, চোখে তার বিশ্ব জোড়া ক্ষুধা, কানে তার খসে-পড়া আড়-ঘোমটা, অধর-পল্লবে অস্ফুট ভাষা, একটি মাত্র ছোট্ট অনুনয়—আমায় নিয়ে চল।

বাঁটুল কি একটা বলবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তার মুখে ভাষা যোগাবার আগেই রাধারাণী তার বাম বাহু একখানা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ডান হাতে ছোট পুঁটলিটা দিয়ে বললে—ধর। ওজনেই বুঝতে পারা গেল, তার মধ্যে—রুধিরেরর স্রোত বইছে।

বাঁটুলের দেহ-মনে বৈদ্যুতিক প্রবাহে উৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এক হাতে কামিনী, আর এক হাতে কাঞ্চন—এবার তো সে বিশ্বজয়ে বের হতে পারে। মুহূর্ত মধ্যে কর্তব্য স্থির ক'রে সে বললে—চল রাধারাণী।

কাট্‌

বাঁটুল ও রাধারাণীর দু জোড়া ছুটন্ত পা দূরে দেখা যেতে লাগল।

ফেড্‌ আউট্‌

ফেড্‌ ইন্‌

ক্লাব-ঘরে আলো দেওয়া হয়েছে। লোকজন বিশেষ নেই। এক কোণে সুরপ্রিয় ও হরলাল তখনও দাবা টিপ্‌ছে। সুরপ্রিয় বললে—নাও, এই কিস্তি মাত।

বার বার তিনবার হেরে হরলাল উঠে পড়ে বললে—আজ তোমার দিন ভাল হে।

সুরো বাড়িমুখো চলেছে। মন তার খানিকা খুশিতে ভরপুর। আজ সত্যিই তার দিন ভাল। সকালবেলা ছিপ নিয়ে বসতে না বসতে একটা পাঁচ-সেরী কাতলা উঠেছে। দুপুরবেলা নায়েব মশায় এসে বলে গেছে, এগারো হাজার টাকা ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা উপরি-উপরি তিনবার

হরলালকে মাত করেছে। আজ ছেলেরা বড্ড ধরেছে, আবার তাকে অভিনয় করতে হবে। পুরোনো দিনগুলোর কথা সুরোর মনে পড়তে লাগল, আবার কি সে দিন ফিরবে!

ছেলেদের অনুরোধে সুরো নিমরাজি হয়েছে অভিনয় করতে। এবার তারা ঠিক করেছে 'সীতা' অভিনয় করবে। তাকে নিতে হবে রামের পার্ট। সন্ধ্যার একটু পরেই রিহার্স্যাল বসবে। অষ্টমীর দিন প্লে।

আজ কার মুখ দেখে সে ঘুম থেকে উঠেছিল! তার মনে পড়ল, আজ সকালে—সকাল মানে বেলা প্রায় নটার সময়, ঘুম থেকে উঠেই প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর তার কানে গিয়েছিল—পোড়ারমুখোর কি রাত পুইয়েছে যে এখুনি উঠবে!

বাগানের দিকে যেতে-যেতে একবার রাধারাণীর মুখখানা তার চোখে পড়েছিল। হোক্ না সে রাগত মুখ, কিন্তু সে বরাবর দেখেছে যে রাধারাণীর মুখ দেখলে তার দিন ভাল যায়। আজকের দিনটা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

সুরপ্রিয় ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে চলেছে—আচ্ছা, রাধারানী তাকে এত অশ্রদ্ধা করে কেন? তার তো রাধারানীকে ভালই লাগে। সে যে ভালবাসতে জানে না তা নয়, তবে স্বামীকে তার ভাল লাগে না। পুরুষের যেমন পরস্ত্রীর প্রতি সহজাত উদারতা আছে, স্ত্রীজাতিরও কি পরপুরুষের প্রতি তেমনই ঔদার্য আছে? তা তো নয়। স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক আনুকূল্য, সারা প্রকৃতির মধ্যে তার তুলনা কোথায়! পরপুরুষের প্রতি স্ত্রীজাতির আনুকূল্য অনেক দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রায়ই তো তা ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধ। স্ত্রী পুরুষের এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সামঞ্জস্য কে কোথায় করতে পেরেছে!

চিন্তা করতে-করতে সুরপ্রিয় হেসে ফেললে।

এখনও বাড়ি খানিকটা দূরে। সুরপ্রিয় একটু জোরে পা চালালে। বাড়ি গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ ক'রে এখুনি তাকে ফিরতে হবে ক্লাবে। ছেলেরা অনেক করে ধরেছে, রামের পার্ট তাকে করতেই হবে। সামনেই পুজো মহাষ্টমীর দিন প্লে।

সুরপ্রিয় বাড়িতে এসেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ফেললে। প্রতিদিন সন্ধ্যে-বেলা তরিবৎ করে সে সিদ্ধি খেত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন সে চুল আঁচড়াচ্ছে, সে সময় কাচের গেলাসে ক'রে বৃন্দা ঝি সিদ্ধির শরবৎ নিয়ে এল। এক চুমুকে সেটা শেষ ক'রে সুরপ্রিয় বললে—তাড়াতাড়ি জলখাবার দিতে বল।

বৃন্দা চলে গেল।

খাবার খেতে-খেতে চাকরকে সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে—তোর মা কোথায় রে?

—কোথায় গিয়েছেন।

—কোথায় গেছেন?

তা তো জানি না।

বৃন্দাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল। সে বললে মা তো বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছেন ?

বৃন্দা বললে তা তো জানি না, বিকেল থেকেই দেখতে পাচ্ছি না।

কাট্

ক্লোজ্ আপ্

সুরপ্রিয়র মুখ।

ফেড আউট্

ফেড ইন্

রাত্রি দশটা। সুরপ্রিয় শোবার ঘরের জানালার ধারে গালে হাত দিয়ে আছে। পাশে রাধারাণীর শূন্য শয্যা।

ফ্ল্যাশ ব্যাক্

সুরপ্রিয়র উনিশ বছর বয়েস। বাড়ি লোকজনে গম্‌গম্ করছে! তার বাবা ফিরে এসেছেন তার ভাবী পত্নীকে আশীর্বাদ ক'রে। সামনের সপ্তাহে বিয়ে, মহা হৈ-চৈ চলেছে। কন্যার বাবা মা নেই, মধ্যবিত্ত মামার বাড়িতে সে মানুষ হচ্ছে। মামী ভদ্র, তাই বেচারার কষ্ট কিছু নেই। দিতে-থুতে কিছু পারবে না, কিন্তু মেয়ের মুখ দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না, এমনই লক্ষ্মীশ্রী।

কাট্

সুরপ্রিয় এক ঘরে বসে ভাবছে—ড্যান ইওর দেওয়া থোওয়া

আর একদিন। সুরপ্রিয় বউ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সুধার রং শ্যামলা হলেও তাকে তার খুবই ভাল লেগেছে। বাসর-ঘরে ঐ ভিড়ের মধ্যেও সুধার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। সুরপ্রিয় তাকে ঠিক চিনে জানিয়েও ফেলেছে যে, সে তাকে ভালবাসে। সুধাও অম্‌নি—ধারা কি একটা কথা তার কানে-কানে বলেছে, যার রেশটা সানাই ও ঢক্কা-নিনাদের মধ্যেও ডুবে যায় নি।

কাট্

সুধার যেমন মিষ্টি মুখ, তেমনই তার মিষ্টি ব্যবহার। শাশুড়ীর নয়নের মণি সে। তিনি তাকে বুকে আগলে থাকেন। আহা, বাপ মা-মরা মেয়ে, একমাত্র ছেলের বউ।

সংসারে এক একটি মেয়ে আছে, যারা বাঙালীর ঘরের গিন্নী হয়েই যেন জন্মগ্রহণ করে। মামার বাড়িতে অতি ছোট অবস্থা থেকেই সে মামীর গিন্নীত্বের ভার লাঘব করত, শ্বশুর-বাড়িতে এসে অতি সহজেই সে অত বড় জমিদার বাড়ির গিন্নিত্ব ধীরে-ধীরে নিজের কাঁধে তুলে নিতে আরম্ভ করলে। গ্রামসুদ্ধ লোক সুধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন লক্ষ্মী মেয়ে নাকি তারা আর দেখে নি।

কাট্

গৌরবে মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বিত্তহীন।

সুরপ্রিয়র বিয়ের পর মাস-পাঁচেক যেতে না যেতেই তার বাবা হরপ্রিয় মুখুজ্জের মৃত্যু।

সুধার লক্ষ্মীত্ব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সন্দেহ।

কাট্

আবার ছ-মাস বাদে হঠাৎ একদিন সকালবেলা সুরপ্রিয়র মা হার্টফেল হয়ে মারা গেলেন।

সুধার লক্ষ্মীত্ব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সন্দেহ কেটে গেল।

ওয়াইপ

পনেরো বছরের সুধা সংসারের বিশাল ভার ঠেলে নিয়ে চলেছে হাসিমুখে। সুরপ্রিয় খায়-দায় তাস পেটে, ক্লাবে রিহার্স্যাল দেয়। দুপুরবেলা ঘুম মেরে ঘণ্টা-দুয়েক জমিদারির কাজ দেখে। দিন স্বচ্ছন্দে কাটছে। সুধা প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা শ্বশুর-শাশুড়ীর বড় ছবি দুটোতে নতুন ফুলের মালা পরিয়ে হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। বেরোবার মুখে কোনদিন সে দৃশ্য চোখে পড়লে সুরপ্রিয়র বাবা-মার কথা মনে পড়ে। ক্লাবে যেতে-যেতে পথেই সে কথা সে ভুলে যায়।

ওয়াইপ

রাত্রি গভীর। সুরপ্রিয়ও গভীর নিদ্রায় অচেতন। আশ্বিন মাস, সেবারে কার্তিক মাসে পুজো। ক্লাবে 'রঘুবীরের' রিহার্স্যাল চলেছে। তার হীরোর পার্ট। এর আগে সে হীরোর পার্ট করে নি। খুব জোর রিহার্স্যাল— সুরপ্রিয় শয়নে-স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে রিহার্স্যাল চালিয়েছে। স্বপ্নের ঘোরে নর্মদা বয়ে চলেছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে—উত্তালতরঙ্গময়ী ভীষণা নর্মদা—

একটা জোর ধাক্কা লেগে তার ঘুম ভেঙে গেল। সুধা বললে ওগো, বাতিটা একবার জ্বাল তো।

সুরপ্রিয় তড়াক ক'রে উঠে বাতি জ্বালিয়ে দেখলে, সুধা বিছানার ওপর বসে তার দিকে অবাক হয়ে দেখছে। সুরপ্রিয় তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কি হয়েছে?

—আমার যেন কি রকম মনে হচ্ছে!

—কি মনে হচ্ছে? ভয় পেয়েছ! এই তো আমি রয়েছি, ভয় কিসের?

সুধার মুখে হাসি। লজ্জার হাসি তাই তো তুমি রয়েছ তবুও আমার ভয়!!!

সুরপ্রিয় এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে এল। জল খেয়ে সুধা একখানা হাত সুরপ্রিয়র গায়ে রেখে শুয়ে পড়ল। সুরপ্রিয় তার মাথা চুলকে দিতে লাগল।

ওয়াইপ্

---

* ইতিপূর্বে নিঃসম্পর্কীয়া কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে সুরপ্রিয়র কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।

আর এক রাত্রি। পুজো শেষ হয়ে গেছে। অঘ্রাণ মাসের মাঝামাঝি, বেশ জেঁকে শীত পড়েছে। নিশ্চিন্ত আরামে সুরপ্রিয় ঘুমোচ্ছে, সুধা তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে—তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বাল একবার শিগ্‌গির।

সুরপ্রিয় তাড়াতাড়ি আলো জেবলে দেখলে, সেই দিনের মত সুধা বিছানায় উঠে বসে হাঁপাচ্ছে। তার চোখে-মুখে একটা হতাশা।

সুধার পাশে বসে সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে কি হয়েছে! অমন করছ কেন?

আমার মনে হচ্ছে এক্ষুনি বুঝি মরে যাব।

অ্যাঁ! আমি ডাক্তার ডেকে আনছি—হরি পিসীকে ডাকি, ততক্ষণ তোমার কাছে বসুক—

সুধা হাঁপাতে-হাঁপাতে দু-হাত দিয়ে তার একখানা হাত জড়িয়ে ধ'রে বললে—না না, তুমি যেও না, তুমি আমার কাছে বস।

সুরপ্রিয় সুধাকে এক রকম বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে—কি রকম লাগছে বল তো?

আমার যেন কি রকম ভয় ভয় করছে।

সুরপ্রিয় হেসে বললে—ভয়! কিসের ভয়? এই তো আমি রয়েছি।

সুধা আর কিছু না বলে সুরপ্রিয়র গায়ে হেলান দিয়ে তার বুকে মুখ রাখলে। সুরপ্রিয় তাকে জড়িয়ে ধরে বলে যেতে লাগল—দিনরাত শুধু খাটবে, অথচ দাস-দাসীতে ঘর ভর্তি। তোমায় এত বারণ করি, কথা তো শোন না। কালই তোমায় নিয়ে কলকাতায় চলে যাব।

সুধার কোন উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। সুরপ্রিয়র মনে হতে লাগল, সুধার বাহুবন্ধন যেন শিথিল হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ক'রে সে তাকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করতেই তার দেহ আপনিই বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

কাট্

ক্লোজ্ আপ্

সুধার প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ।

সুরপ্রিয় বুঝতে পারলে সুধা মরে গেছে। কিন্তু সে মরে যাওয়াটা এত অসময়ে এমন অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত যে, তার ধাক্কায় সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে ভাবটা কেটে যাওয়ার পর তার একবার চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠবার ইচ্ছা হল, সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মার কথা মনে পড়ে গেল। তারপরেই মনে হ'ল কতখানি অসহায় সে!

সুরপ্রিয় চীৎকারও করলে না, উঠলও না। সুধার মৃত্যুমলিন মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

রাস্তা দিয়ে সেই শেষরাত্রে কোন্ রসিক ছোকরা গান গাইতে-গাইতে চলে গেল—ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।

সুরপ্রিয় স্থির হয়ে বসে আছে। তার চোখ দুটি নিষ্কম্প দীপশিখার মত অবিচল, সুধার মুখের ওপর ন্যস্ত। নয়নে অশ্রু নেই, অন্তরে বিশেষ কোন চিন্তা নেই।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর অনেকদূরে কোথায় যেন একটা অজানা পাখি ডেকে উঠল। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে প্রকৃতি নিস্তব্ধ। তারপরে এখানে-সেখানে নিকটে-দূরে পাখির ডাক শুরু হল। ক্রমে আর পাখির ডাক শোনা যায় না, তার মধ্যে অন্য শব্দও প্রবেশ করেছে, আলোর মধ্যে যেমন আলো মিলিয়ে থাকে। তারপরে সেই সমস্ত শব্দ এক অখণ্ড শব্দসাগরে মিলিয়ে গেল। তার মধ্যে আছে পুরুরবার মর্মভেদী আহ্বান—কোথায় তুমি উর্বশী, আমার কাছে এস। আর আছে উর্বশীর সেই শাশ্বত সত্য উত্তর—আমাকে তুমি আর দেখতে পাবে না।

আর এক সূর্যোদয়।

লঙ্ ফেড্ আউট

ফেড্ ইন্

সুরপ্রিয় একদম সন্ন্যাসী।

কাট্

সুরপ্রিয় ঠিক সন্ন্যাসী নয়, তবে কিছু উদাসীন

কাট

সুরপ্রিয় ধর্মকর্মানুরাগী।

কাট

ক্লাবের উন্নতিতে সুরপ্রিয় গভীর মনোযোগী।

ফেড্ আউট্

বাইশ বছর বয়সে সুরপ্রিয় বিপত্নীক হয়েছিল, এখন তার ত্রিশ বছর বয়স। মা বাপ না থাকলেও মাসী-পিসীর দল বাড়িতে গজ্ গজ্ করছে। তাঁদেরই আগ্রহে তাকে আবার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে হল।

সুরপ্রিয়র দ্বিতীয়ার নাম নিভা অর্থাৎ নিভাননী অর্থাৎ ইন্দুনিভাননী। সুধা ও নিভার মধ্যে কোনও মিলই নেই। সুধা ছিল গরিবের মেয়ে, সংসারে তার তেমন আপনার কেউ ছিল না। নিভা বড়লোকের মেয়ে, তার সবই আছে। সুধা ছিল ধীর স্থির সংযতবাক্, নিভার উচ্ছল কলহাস্যে জমিদার-বাড়ি মুখর। কি ভাল লাগে আর কি ভাল লাগে না, সে কথা সুধা কোনদিন মুখ ফুটে বলে নি। নিভার পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় স্পষ্ট। সুধার ছিল শ্যামবর্ণ, নিভা উজ্জ্বল সুবর্ণ-গৌরী। সুধার চোখ মুখ কান নাক ছিল প্রতিমার মতন সুন্দর, তাকে দেখলে কমলবাসিনী বলে ভ্রম হ'ত, নিভার মুখ দেখলে এ দেশের লোকের ভ্রম হবে সে নিপ্পনবাসিনী, আর জাপানীদের মনে হবে সে ভারতবাসিনী। সুধাকে দেখলে মনে হত, পর্বতসানুদেশে যেন সে ক্ষীণা পাহাড়ে নদী, অতি সন্তর্পণে ধরণীর বুকের ওপর দিয়ে ঝির-ঝির ক'রে বয়ে চলেছে। উষ্ণ বায়ু তাকে শোষণ করছে,

ধরণী তাকে শোষণ করছে—কখন কোথায় তার অস্তিত্ব মুছে যাবে তা সে জানে না, কিন্তু সে নিতাই প্রস্তুত। নিভা যেন কুলপ্লাবিনী কীর্তিনাশা—আপনার প্রাণশক্তিতে আত্মহারা।

ফুলশয্যার রাত্রে নিভা যখন কাছে এল তখন সুরপ্রিয় তার সঙ্গে কথা কইতে পারলে না। তার মনে পড়তে লাগল, বছর দশেক আগে এই রকম ফুলের বিছানায় সুধা এসেছিল তার পাশে, তখন তার উনিশ বছর বয়স। জীবন ছিল একটা বিরাট রামধনুর ফ্রেমে আঁটা কল্পচিত্র। আজ তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞতার অশ্রুধারায় রামধনুর অনেক রংই মলিন হয়েছে। হঠাৎ তার চিন্তাকে চমকে দিয়ে নিভা বললে—কি গো, আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমাকে বুঝি পছন্দ হয় নি?

আবেগে সুরপ্রিয় তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললে।

কাট্

স্বর্গে সুরপ্রিয়র আসরে দুম-দেওট চলেছে, নাচতে নাচতে উর্বশী তালকানা হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রের অভিশাপ।*

নিভাননীর প্রাণশক্তি সুরপ্রিয়র মুমূর্ষু জীবনে অনুপ্রাণিত হতে লাগল। আবার তার মনে হতে লাগল, পিতা মাতা, এমন কি সুধা না থাকলেও এ জীবন মধুময়, নিভা যদি তার পাশে থাকে।

কাট্

তিন বছর কেটে গেল।

একদিন, ফাগুন মাসের শেষাশেষি। সুরপ্রিয় পুকুরে সাঁতার কাটছে আর নিভা ঘাটে দাঁড়িয়ে তার কেরামতি দেখছে। নিভা শহরের মেয়ে, জলে তার বড় ভয়। দুজনে গল্প চলেছে। সুরপ্রিয়র আগ্রহে নিভা সাঁতার শিখতে রাজি, সে গাছ-কোমর বেঁধে জলে নেমে পড়ল।

পুকুরের মধ্যে এক-কোমর জলেই নিভা খুব ঝাঁপাই ছুঁড়তে লাগল। ডুব-জলে যেতে সে কিছুতেই রাজি নয়, সুরপ্রিয় সঙ্গে রয়েছে, তবুও নয়। ডাঙায় সে হাজার বার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পারে, কিন্তু জলে বড় ভয় হয়। বাড়ির ভেতর থেকে ঘড়া এল। সুরপ্রিয় তাকে শেখলে ঘড়া উল্টে ধরে কেমন ক'রে ভেসে থাকা যায়—নিভার ভারী মজা লাগল। সে সারা পুকুর তোলপাড় করতে লাগল। সুরপ্রিয় বললে, এইবার চল ওঠা যাক, কিন্তু সে কথা কে শোনে! পুকুর-ঘাটে ঝি-চাকর এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতর থেকে মাসী পিসী ছুটে এল, এ কি ঢলাঢলি! নিভার গ্রাহ্য নেই।

কাট্

* উর্বশী স্বর্গের ইয়ে হ'লেও, তিনি আমার সমস্যা। মর্তবাসিনীদের প্রতি ঈর্ষাবশত তিনি মাঝে মাঝে ইচ্ছা ক'রে এইভাবে তালকানা হয়ে ইন্দ্রের শাপে মর্ত্যের সুখ ভোগ ক'রে থাকেন। 'শাপে বর' এই বাক্যটি উৎপত্তির ইতিহাস এই। ইন্দ্রের আসর-ফেরতা একাধিক ব্যক্তির কাছে এ কথা শুনেছি।

সেদিন বিকেলে সুরপ্রিয় ক্লাবে বসে দাবা টিপছে, এমন সময় বাড়ি থেকে ছুটতে-ছুটতে লোক এসে বললে, শিগ্‌গির আসুন।

কাট্

জমিদার-বাড়িতে হাঁক-ডাক, লোকলস্কর, হৈ-হৈ পড়ে গেছে! জমিদার-গিন্নী সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে গেছে।

পুকুরে লোক ডুবেছে আর উঠছে পানকৌটির মত। জাল পড়ছে ছপাহপ—

ঘণ্টাখানেক পরে নিভার দেহ উঠল, সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা।

কাট্

First Aid, Second Aid, Third Aid—নিভার নিশ্বাস নেই, দেহে স্পন্দন জাগল না!

ডাক্তার বললেন, লাশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, Fourth Aid-এর জন্য।

কাট্

ক্লোজ আপ্

উপস্থিত নরনারীদের বিস্মিত মুখমণ্ডল, জমিদার-গিন্নীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে কি?*

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

সুরপ্রিয় গুরুর সামনে করজোড় হয়ে বসেছে। সংসারে বীতরাগ। বন্ধুরা বলে, সুরোর পত্নীভাগ্য ভাল। তারা তাকে ভালও বাসে এবং সময়মত সরেও পড়ে।

তবুও সুরপ্রিয় ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী।

গুরু বললেন—বৎস—অন্নের সাধনা কর, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে।

সুরপ্রিয় জিজ্ঞেসা করলে—প্রভু পানীয়ের কি হবে?

গুরু বললেন—পানীয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পানীয়, তা অন্নের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে, রিসার্চ ক'রে আবিষ্কার কর, মোক্ষলাভের উপায় হবে।

সুরপ্রিয় অন্নের সাধনায় মন দিলে। তার দিব্যদৃষ্টি ক্রমেই প্রসারিত হতে লাগল। অন্নেই এই ভূতজগত সৃষ্ট এবং অন্নেই তা পুষ্ট—এই জ্ঞানের বীজ বাল্য থেকেই তার মধ্যে নিহিত ছিল, * এখন সাধনবলে তা জাগ্রত চেতনায় আসতে লাগল! কিন্তু অন্নেই এই প্রবিষ্ট হচ্ছে এবং বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হচ্ছে। —এই হেঁয়ালির অর্থ ভাল ক'রে বোধগম্য হচ্ছে না, এমন সময়ে একদিন হারু-পিসী আর মধু-মাসী কাঁদতে-কাঁদতে এসে বললেন—হ্যাঁ বাবা সুরো, এমন ক'রেই কি নিজে ভেসে যাবি আর সংসারটাকে ভাসিয়ে দিবি? আমরা এখনও মরি নি।

কাট্

---

* হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি, manage করা হয়েছিল।

* ভাগ্যবানের পত্নী মারা যায়—কিম্বদন্তী।

ক্লোজ্ আপ্
সুরপ্রিয় ত্রস্ত, চমকিত।

কাট্

আবার গুরুদেবের সামনে সুরপ্রিয় গরুড়াসনে উপবিষ্ট। গুরু বললেন—বৎস দ্বিধা ক'রো না। দু-বার যখন ঝুলেছ, তখন তৃতীয়বারও ঝুলে পড়তে পার—মাভৈ।

সুরপ্রিয় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললে—কিন্তু প্রভু, সুধা ও নিভার প্রতি আমার প্রেম এখনও সমভাবেই আছে। এক্ষেত্রে—

গুরুদেব চমকে উঠে বললে—কি বললে! সুধা ও নিভার প্রতি এখনও তোমার প্রেম আছে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! কিন্তু তাঁরা তো এখন বিদেহী, তাঁদের দেহ তো নষ্ট হয়েছে, তাঁদের প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হওয়া তো বাতুলতার নামান্তর মাত্র।

সুরপ্রিয় আরও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললে—আমার এই প্রেম দেহাতীত। তাদের আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার মিলন ঘটেছে—

গুরুদেব উষ্ণ হয়ে বললেন—এসব ছেঁদো কথা, সাজানো কথা এবং ঘোরতর মিথ্যা কথা। একবার অন্তরের অন্তস্তলে অবগাহন ক'রে দেখ, তোমার জাগ্রত-চেতনার মধ্যেই তাদের দেহের প্রতিই কামভাব তোমার অন্তরে এখনও বর্তমান আছে। যে দেহ একদিন তুমি উপভোগ করেছ, যার চরিত্রের মাধুর্য একদিন তোমার মানসলোকে ব্যঞ্জনা এনেছিল, সেই দেহসম্ভোগের স্মৃতি। প্রীতি শ্রদ্ধাবশত তুমি বলছ, এখনও তাদের প্রতি তোমার প্রেম আছে সেই প্রেম দেহাতীত। বৎস, তাঁদের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার প্রেমটি তাঁদের দেহকেই ঘিরে আছে! কারণ দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম অসম্ভব। এই জন্যই যোগীরা কোনও ভাবা বস্তুকে মানসলোকে স্থান দেন না। কাম ও শব্দ প্রেম দুটির মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য যতই থাকুক, দুটির অর্থ একই। সংস্কৃত সাহিত্যিকরা একই অর্থে কথা দুটি ব্যবহার করেছেন। প্রেমের সঙ্গে দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত —এই ল্যাংগুল অপেক্ষাকৃত আধুনিক আবিষ্কার। বৈষ্ণব-সাহিত্যিকরা প্রেম ও কাম কথা দুটিকে পৃথক পর্যায়ে ফেলে এই দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ভাবের আরোপ করেছেন। অবশ্য—

গুরুদেব একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন—অবশ্য তার বিশেষ কারণ ছিল।

সুরপ্রিয়ের নাক দিয়ে তার অজ্ঞাতসারে সাঁ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

গুরুদেব আবার আরম্ভ করলেন—সাহিত্যিকদের দেহাতীত প্রেমের কল্পনা করতে পেরেছে ক্রীশ্চানেরা। যেমন ধর, "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত প্রেম করিলেন

---

* সুরপ্রিয় জমিদার-সন্তান। গৃহ তার আজও অন্ন-দাসদাসীতে পরিপূর্ণ।

* যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—তৈঃ উঃ

যে, মনুষ্যের কল্যাণের জন্য তাঁহার একমাত্র পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।" অতি-আধুনিক যৌন রসায়নাগারে বিশ্লেষণ করলেও এই প্রেমের সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক পাবে না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ।

গুরুদেব আবার শুরু করলেন—আত্মার ফুটানি কর! আত্মাকে চিনেছ? আগে আত্মাকে চেন—আত্মানাং বিদ্ধি। আত্মাকে উপলব্ধি কর, তখন বুঝতে পারবে তার অন্য কোন কামনা নাই। আত্মার একমাত্র কামনা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন।

সুরপ্রিয় বললে—প্রভু, আমি আশ্চর্য হচ্ছি, বৈষ্ণব-কবিরাও—

গুরুদেব হুঙ্কার দিলেন—হ্যাঁ, বৈষ্ণব-কবিরাও। বুঝতে পার না, চণ্ডীদাস বলেছেন, রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়। ভাল ক'রে কান পেতে শোন। কথাটা কি ওকালতির মতন শোনাচ্ছে না? অতি-আধুনিকভাবে যদি এই লাইনটিকে প্রকাশ করা যায়, তা হলে লিখতে হবে—বারো বছর ধরে ছিপ চাগিয়ে বগলে বিচি তুলে যে মাছটি ধরেছি—হে জগদ্বাসী, তোমরা বিশ্বাস কর তাতে আমিষের গন্ধনাত্র নেই।

সুরপ্রিয় বললে—চণ্ডীদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে রজকিনীর প্রতি কামাবিষ্ট হয়েছিলেন এ কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না প্রভু।

—মন না চাইলেও বৈজ্ঞানিক সত্যে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। রজকিনী তো দূরের কথা, কালিদাস বলেছেন, কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনা-চেতনেষু—কাব্যের অবতারণায় এত বড় সত্যকথা খুব কম কবিই বলতে পেরেছেন। এই বাক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ তোমাকে একটি কাহিনী শোনাই, মনে রেখো।

ক্রীশ্চান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এক ইংরেজ মহাপুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুষ্ঠরোগীদের সেবায় আত্ম-উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রশংসা-গানে তখন সারা পৃথিবীর লোক সে সময় গাইয়ে হয়ে উঠল। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর ছবি বেরুতে লাগল রং-বেরঙের—একেবারে হৈহৈ ব্যাপার! তারপরে তাঁর আশ্রমে এলেন এক সুন্দরী তরুণী, মহাব্যাধিতে তার সর্বাঙ্গ গলিত। তরুণীর প্রতি দয়া, সহানুভূতি তৎপরে অনুরাগ এবং তজ্জনিত ঘনিষ্ঠতার ফলে মহানুভবও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।* ভদ্রলোক কবিতা লিখতে জানতেন না, তাই তাঁর হয়ে ওকালতি করবার ভার কিছুই রইল না, নিন্দায় সারা পৃথিবী ভরে উঠল।

—সাধারণ মানুষের কাছে প্রেম যতই দেহাতীত বলে প্রতীয়মান হোকনা কেন, যোগীর পক্ষে নয়। মনে রেখো যোগীর পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা মহাপাপ।

* My Life and Loves—(4 vols, Frank Harris). এই বইখানি ইংরেজ রাজত্বে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ। ফরাসী রাজ্যে বসিয়া

১।

বৎস সুরপ্রিয়, এই কাম অথবা প্রেমভাব পরমাত্মার দান. এর দ্বারা মনুষ্যসন্তান দেবতায় এবং দেবতা পশুতে পরিণত হয়। এর মধ্যে দিয়ে মানব-মনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। যদিও তোমার চিত্ত যোগীজনোচিত, তবুও তোমার মনে প্রেমভাব এখনও প্রবল মাত্রায় বর্তমান। সুখের বিষয় যে, বিশেষ কোন আধারের প্রতি তা সীমাবদ্ধ নয়। তোমার আরও কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। মনে রেখো, অভিজ্ঞতাই মোক্ষলাভের সোপান।* বিনা দ্বিধায় তুমি তৃতীয়াকে গৃহে নিয়ে এস।

মিস্ট্রেস ইনটু

সুরপ্রিয় বরসজ্জায়।

ইনটু

ফুলশয্যার রাত্রি দশটা বাজে। লোকজন খাওয়ানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি। সুরপ্রিয় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে আছে। অদূরে ফুলশয্যা. ঘরের মধ্যে তীব্র ফুলের গন্ধে দু-চারটে মাছি উড়ছে।*

পরশু রাতে সে চতুর্থবার* পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, রাধারাণীর সঙ্গে। রাধারাণী সুন্দরী, সুধা ও নিভা দুজনের সৌন্দর্য যেন তার অঙ্গে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাকে দেখেই সুরপ্রিয়র মনে হয়েছিল, গুরুদেব ঠিকই বলেছেন, আরও কিছু অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রয়োজন।

সুধা, নিভা ও রাধারাণীর চিন্তায় সুরপ্রিয় বিভোর, এমন সময় রাধারাণী ঘরের মধ্যে এল। তাকে দেখে সুরপ্রিয়র মনে হল, রঙ্গমঞ্চে যেন মন্দোদরী প্রবেশ করলেন রাধারাণী একবার চারিদিকে চেয়ে সোজা খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিয়ের দিন থেকে এখনও পর্যন্ত রাধারাণীর সঙ্গে তার একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নি। সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রাধারাণী চিত হয়ে শুয়ে আছে, তার একখানা নিটোল গৌর হাত চোখ দুটোর ওপরে চাপা। দূরে থেকে যে সৌন্দর্য দেখতে-দেখতে সুরপ্রিয়র মনে হতে লাগল, গুরুদেব ঠিকই

* এই theory আধুনিক আবিষ্কার। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চতন্ত্র অবধি কোন শাস্ত্রেই মোক্ষলাভের এই সরল পন্থার উল্লেখ নাই।

* এক দলের মাছি আছে যারা ব্রণও ইচ্ছাশিত মধুও ইচ্ছাশিত—এরা সেই দলের।

* যে ব্যক্তির বার বার স্ত্রী মারা যায়, তৃতীয়বার বিবাহ করবার আগে তার সঙ্গে কোন ক্ষীণপ্রাণ গাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তৃতীয় পক্ষ কাটিয়ে দেওয়া হয়; সাধারণের বিশ্বাস যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী মারা যায় না। ঐ বিশ্বাসের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কি না, সে সম্বন্ধে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলেছে।

বলেছেন, আরও কিছু অভিজ্ঞতা তার বাকি আছে। অভিজ্ঞতাই মোক্ষলাভের সোপান।

"জয় গুরু" ব'লে সে খাটের ওপর গিয়ে রাধারাণীর পাশে শুয়ে পড়ল। প্রথমটা তার সঙ্কোচ হতে লাগল। ইতিপূর্বে দু-বার তার ফুলশয্যা হয়ে গেছে। রাধারাণীর অগ্রবর্তিনীদের প্রতি কথা, প্রত্যেকটি ভঙ্গি, তাদের চোখের চাহনি মূর্তিমতী হয়ে তার মনের সামনে ভাসতে লাগল। নববধূ তাকে কি মনে করছে! তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করতে তার লজ্জা করতে লাগল—কি ভাবে কথা আরম্ভ করা যায়!

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িটা তাকে ধমক দিয়ে এগারোটা বেজে গেল। সুরপ্রিয় প্রায় মরিয়া হয়ে ব'লে ফেললে—কি গো, কথা বলবে না?

রাধারাণী যেন এই কথাটা শোনাবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে বললে—কি কথা বলব! যে গোমড়া মুখ ক'রে রয়েছ, যেন আমিই তেজপক্ষে বিয়ে করেছি।

রাধার কথাগুলি কিছু স্পষ্ট।

ফেড আউট্

ফেড ইন্

মাসী পিসী সব কাশী চললেন।

কাট্

সুধা ও নিভার ছবি দু-খানা শোবার ঘর থেকে বাইরের বৈঠকখানায় আশ্রয় নিলে।

কাট্

সুরপ্রিয়র জীবনে মোক্ষলাভের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে লাগল। তাকে তামাক খাওয়া ছাড়তে হ'ল। তামাক খেলে মুখে গন্ধ হয়, মুখে গন্ধ হ'লে বাইরের ঘরে সুধা ও নিভার ছবি দেখতে-দেখতে রাত কাটাতে হয়, কিন্তু তাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাঘাত ঘটে। এতদিনে সুরপ্রিয় কিছু কিছু বুঝতে পারছে, দেহাতীত প্রেম জিনিসটা কিছু নয়।

কাট্

সুরপ্রিয়র আচারে-ব্যবহারে, চলনে-বলনে যে এত দোষ আছে, তা সে কখনও লক্ষ্যই করে নি। জমিদারের একমাত্র সন্তান সে, সবার কাছে আবদারই পেয়ে এসেছে। সুধা ও নিভা ছিল প্রেমেই মশগুল, তার দোষের দিকে তাদের নজরই পড়ে নি, কাজেই তা সংশোধন করবার প্রয়োজন হয় নি। রাধারাণীর শাসনে আত্মত্রুটির দিকে তার চোখ পড়ল। অতি আদরে পোষিত ও লালিত অভ্যাসগুলি একে-একে তার চরিত্র থেকে খসে পড়তে লাগল, তবু রাধারাণীর নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা-জ্যোতিতে প্রতিদিনই তার কোন না কোন দোষ ধরা পড়তে লাগল।

কাট্

সুরপ্রিয়র জীবনে ধীরে-ধীরে পরিবর্তন আসতে লাগল। আগে সামান্য

কথা-কাটাকাটি হলেই রাধারাণী তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিত, বারান্দায় বসে সে রাত্রি কাটিয়ে দিত। এখন সে বাইরের ঘরেই শোয়। সুধা ও নিভার ছবি ঝুলে আছে—সেদিকে চোখ পড়লেও তার মনে কোন ভাবই আসে না। সুধা, নিভা, রাধারাণী ও সদু মেথরানীর মধ্যে কোনও প্রভেদই সে বুঝতে পারে না। গুরুদেব বলেন, তোমার চেতনাকে আরও বিস্তার কর।

কাট্

আশ্বিন মাসের একদিন। শরতের সোনালী আলোয় সকালটা ঝলমল করছে। রাধারাণীর তীব্র চীৎকারে এইমাত্র সুরপ্রিয়র ঘুম ভেঙেছে, দেরি ক'রে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আজও তার যায় নি। রাধারাণীর গালাগালিতে আগে তার মনে দুঃখ হত, সুধা ও নিভার কথা মনে পড়ে চোখ জলে ভরে উঠত, আজ তার মনে কোন বিকারই নেই। নিন্দা, প্রশংসা, গালাগালি প্রায় সমান হয়ে এসেছে। রাধারাণীর সৌন্দর্য উপভোগ করার অভিজ্ঞতাও প্রায় শেষ হয়েছে।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে সুরপ্রিয় বাগানে এসে দাঁড়াল। সুরপ্রিয়র বাবা শৌখিন লোক ছিলে। দীর্ঘ লাল-কাঁকর-ফেলা বীথিকা—একদিকে কামিনী আর একদিকে কাঞ্চনের সারি। কামিনীর সৌন্দর্যের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণই নেই, কাঞ্চনের প্রতিও আজ সে তেমনই উদাসীন। উদাসীনের মতন সে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখল, তার মনের বাসনাগুলি বাগানে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে গুচ্ছে গুচ্ছে। শরতের সোনালী রোদে সেগুলো জ্বলজ্বল করছে। সেগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ সে হো হো ক'রে হেসে উঠল। এ কি আনন্দের প্রবাহ নিয়ে এল আজ শরতের সকাল! এই আনন্দই কি—

—পোড়ারমুখোকে এইবার যমে ধরেছে! মরেও না, ছাড়েও না—

সুরপ্রিয়র হাসি থেমে গেল। হঠাৎ এই প্রেম-ভাষণে বিগলিত-চিত্ত হয়ে ঘাড় ফেরাতেই সে দেখতে পেলে বৃন্দা ঝি সলজ্জবদনে ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, অদূরেই রাধারাণী।

বৃন্দার চোখে চোখ পড়তেই সে বললে—আজ দুপুরবেলা কয়েকজনকে বলা হয়েছে, কিন্তু বাজারে মাছ পাওয়া গেল না। মা বলছেন—একবার ছিপ নিতে বলতে।

—কাকে খেতে বলা হয়েছে?

—বাটুলবাবু, সিধুবাবু, মধুবাবু, আরও জানি কে কে খাবে।

সুরপ্রিয় বিনা চারেই ছিপ ফেললে। এই পুকুরেই দশ বছর আগে নিভা ডুবেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় রাধারাণীর অন্তর্ধান।

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

সকাল হতেই জমিদার বাড়িতে লোকারণ্য। রাধারাণী পালিয়েছে, সে কথা

সকলেই জানে। বৃদ্ধারা বললেন—পালিয়ে কেলেঙ্কারি বাড়াবার কি দরকার ছিল, ঘরে বসেই তো সব চলছিল।

বৃদ্ধরা বললেন—প্রথম থেকেই যদি হাত চালাতে সুরো, তা হলে আজ এ কেলেঙ্কারিটা হত না। তোমরা লেখাপড়া শিখে সায়েব হয়েছে, পুরোনো রীতির প্রতি তো তোমাদের শ্রদ্ধা নেই।

যুবতীরা কিছু বললে না।

সুরপ্রিয়র প্রতি সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন, বিশেষ ক'রে যুবকেরা। তারা বললে—খুড়ো, তুমি একবার হুকুম দাও, বাঁটুল কত বাপের ব্যাটা একবার দেখে নিই।

সিধু আর মধুর বুকে যেন আঘাতটা লেগেছে বেশি। সিধুর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল।

মধু বললে—খুড়ো, তুমি হুকুম দাও আর না দাও, বাঁটুল শালাকে আমি খুন করবই।

সিধু আর মধুকে কিছুতে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সুরপ্রিয় আর এক বিপদে পড়ল।

সিধু বললে—বাঁটুলের মত বিশ্বাসঘাতককে বাঁচতে দিলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন, আরও অনেক পরিবারের সর্বনাশ করতে পারে সে।

মধু বললে—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতিকাকেও—

বিশ্বাসঘাতিকাকে শেষ করা নিয়ে সিধুতে আর মধুতে হাতাহাতি হয় আর কি! অনেক কষ্টে বিবাদ থামিয়ে সুরপ্রিয় সেদিনকার মত তাদের বিদায় করলে।

ওয়াইপ্

গুরুদেবের ঘর। রাধারাণীর গৃহত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে গুরু-শিষ্যে। গুরু বললেন, রাধারাণী হচ্ছেন সেই জাতীয়া স্ত্রীলোক, পুরুষ যাঁদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, অথচ কোনও পুরুষের সঙ্গেই তাঁরা একত্রে বাস করতে পারেন না।

সুরপ্রিয় বললে—গুরুদেব, স্ত্রী গৃহত্যাগ করায় আমার মনে কোন বিকারই হয় নি, তিনি থাকলেও আমার কোন ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু পড়শীদের সহানুভূতির ঠেলায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি, বিশেষ ক'রে মধু ও সিধুর।

—তারা কারা?

—আজ্ঞে, গ্রামেরই যুবক তারা। রাধারাণীর অন্তর্ধানে তারা সত্যিই অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে, অথচ এতকাল আমার সম্বন্ধে তারা নিরপেক্ষই ছিল।

—কি বলে তারা?

—তারা বাঁটুলকে হত্যা করতে চায় প্রভু। মধু তো রাধারাণীকেও হত্যা করতে চায়। উভয়ের উদ্দেশ্য প্রায় এক হলেও তাদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ মিল আছে বলে বোধ হয় না। ব্যাপারটা আমাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করেছে।

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন—বিচলিত হয়ো না, কোন কিছুতে বিচলিত হলেই যোগভ্রষ্ট হবে। সংসারে এ ঘটনা নিত্যই ঘটেছে। কাব্যে অসঙ্গতি-অলংকারের মতন মানব-জীবনের মধ্যেও এমন বহু অসঙ্গতি দেখতে পাবে। এগুলিকে সাংসারিক অলঙ্কার হিসাবে ধরে নিও। গভীরভাবে চিন্তা করলে এর মধ্যেও সঙ্গতি দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে একটি চলতি কথা আছে। শোন বলি—

তস্সেঅ বণো অস্সেঅ বেঅণা ভণই তং জণো অলীঅং।
দন্তক্খঅং কবোলে বহূএ বেঅণা সবত্তীণাং ।।*

এর মর্মার্থ হচ্ছে—যেখানেই ব্রণ সেখানেই বেদনা, বৃথাই লোকে এ কথা বলে থাকে। যেমন নব-পরিণীতা বধূর কপোলে দংশন ক্ষত হলে বেদনা বাজে তার সতীনের বুকে। শ্লোকটি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হলেও এর অর্থটি অতিপ্রাকৃত। সতীনের বুকের বেদনার কারণটি যতই হোক না কেন, বেদনাটি অবহেলনীয় নয়। অতএব হে বৎস সারিপ্রিয়, মধু ও সিধুর বুকে যে বেদনা বেজেছে, তা অতি প্রচণ্ড। অবিলম্বে তাদের শান্ত করবার ব্যবস্থা কর বৃথা জগতে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে কোন লাভ নেই।

ফেড্ আউট্

ফেড্ ইন্

রাধারাণী ও বাঁটুল সপ্তাহখানেক হ'ল কলকাতায় এসেছে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একখানি ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছে। কিছু আসবাব পত্রও কেনা হয়েছে। দু দিন আসবও পান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কালীঘাটে পুজো দেওয়া, যাদুঘর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও পরেশনাথের মন্দির দেখা শেষ হয়েছে।

কাট্

মাসখানেক কেটে গেছে। সিনেমার লোকেরা আনা-যাওয়া করছে। রাধারাণীর ভ্রু চাঁচা হয়েছে, ঠোঁটে লালিমা লেগেছে। টাকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু গয়নাগুলো এখনো ইনট্যাক্ট্। বাঁটুলের সঙ্গে ইতিমধ্যে রাধারাণীর বার কতেক বেশ বচসা হয়ে গেছে।

কাট্

আরও তিন মাস কেটেছে। রাধারাণী বলতে আরম্ভ করেছে, পোড়ারমুখো, এমন যদি ইচ্ছে ছিল তো আমার এ সর্বনাশ করলি কেন? দিনরাত বাড়িতে বসে থাকলে কি চাকরি জুটবে? বসে বসে আর কতদিন পিণ্ডি গিলবে?

বাঁটুল দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে চাকরির সন্ধানে বেরোয়, সেই সময় সিনেমার লোক আসে রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করতে। রাধারাণী ভাবে, দূর থেকে এদের নামে কত বদনামই না শোনা যায়, অথচ এরা কি ভীষণ ভদ্রলোক! কাছে না এলে লোক চেনা যায় না।

* কাব্যপ্রকাশ—মম্মটভট্ট

বাঁটুল সারাদিন চাকরির সন্ধানে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে লেকে গিয়ে বসে—এ জায়গাটা তার বেশ লেগেছে।

একদিন দুপুরবেলায় বাঁটুল চাকরির সন্ধানে বেরুচ্ছে, এমন সময় ডাক-পিয়ন এসে হাঁক দিলে—নন্দলাল নন্দী।

—আমার নাম।

মনি-অর্ডার আছে, দুশো টাকা। পাঠাচ্ছেন ইন্দ্র শর্ম্মা।

চিনতে না পারলেও বাঁটুল নাম সই ক'রে টাকাগুলো গুণে নিলে,—পিয়ন চলে গেল। টাকাগুলো ট্যাকস্থ করতে-করতে বাঁটুল ভাবছিল, এই বেলা সরে পড়ি, এমন সময় রাধারাণীর আবির্ভাব। সে ভেতর থেকে সব দেখেছে ও শুনেছে।

বাঁটুল বললে—এক জমিদার বন্ধুকে সে চিঠি লিখেছিল, সেই পাঠিয়েছে টাকা। রাধারাণী হেসে টাকাগুলো গুণে নিয়ে বাক্সের মধ্যে পুরে ফেললে।

অর্থের ভাবনা আর রইল না। প্রতি মাসের পনেরো তারিখে দুশো টাকা আসতে লাগল—বাঁটুলের অজ্ঞাত জমিদার বন্ধুর কাছ থেকে।

কাট্

দার্জিলিংয়ের ম্যাল। স্ল্যাকস-পরিহিতা ভুরু-চাঁচা রাধারাণী উঁচু হিলের জুতো পরে দু-পাশের লোককে সচকিত ক'রে নজগজ করতে-করতে পায়চারি করছে। পাশে বাঁটুল।

কাট্

তাজমহলের চত্বরে বাঁটুল ও রাধারাণী।

কাট্

কুতবের চূড়ায়।

কাট্

কলকাতার ফ্ল্যাটে। বাঁটুল গোমড়ামুখে এক কোণে ব'সে আছে।

কাট্

তার বাঁ চোখের নীচে কালো দাগ। গত রাত্রের প্রেমদ্বন্দ্বের চিহ্ন। রাধারাণী ঘরে নেই। সিনেমার লোকদের সঙ্গে ফোটো তোলাতে গেছে, সেখান থেকে মার্কেট ঘুরে বাড়ি ফিরবে।

কাট্

বাঁটুলের অন্তর্ধান। কিন্তু কুছ্‌পরোয়া নেই। রাধারাণীর শিগ্‌গিরই সিনেমা কোম্পানিতে চাকরি হবে। এখন থেকেই তালিম চলেছে। সকালে একজন আসে—এগারোটায় যায়, বেলা একটায় আর একজন আসে—সে পাঁচটায় যায়, রীতিমত তালিম চলেছে। নতুন কোম্পানি খোলা হবে, সে হবে হিরোইন।

রাত্রে একা থাকতে রাধারাণীর ভয় করে। কোম্পানীর একজন সহকারী কথা দিয়েছে, আসছে মাস থেকে রাত্রে সে তাকে আগলাবে। তরুণ সে, তার আশা আছে দিন পনোরোর মধ্যেই তার পত্নীর ডানা গজাবে।

ফেড্ আউট্

সুরপ্রিয় নির্জ্জন ঘরে বসে আছে। তার চিত্ত একেবারে শান্ত। কোথাও কোন মালিন্য বা উদ্বেগ নেই। মধু ও সিধু শান্ত হয়েছে! তারা সুরপ্রিয়র পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, বাঁটুল ও রাধারাণীকে কিছু বলবে না। সিধু ঠাণ্ডা হয়ে এবার সামাজিক কাজে মন দিয়েছে। বিশ্বনাথ কর্ম্মকার, বয়স তার ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। ঘড়ির কাজ ক'রে ক'রে চোখ দুটি প্রায় অন্ধ। কলকাতায় কোন বড় ঘড়ির দোকানে কাজ করে, অনেক দিনের লোক বলে তারা জবাব দেয় নি। কাজকর্ম্ম করতে হয় না বটে, তবে নিত্য হাজিরা দিতে হয়। উপরি-উপরি তিনটি স্ত্রী গত হওয়ায় বিশ্বনাথ সংসার-রক্ষার জন্য চতুর্থ পক্ষ করেছে, সিধু আজকাল সারাদিন তাকেই আগলায়।

মধু আজকাল কলকাতায় চাকরি পেয়েছে। বড্ড কাজের চাপ, তাই রাত্রি বারোটার ট্রেনে বাড়ি ফেরে। স্টেশনের কর্ম্মচারী যারা সে সময় স্টেশনে থাকে, তাদের মধ্যে দু-একজনের মুখে শোনা যায়, মধু আজকাল এক রকম নতুন ধাঁজে চলে—কি রকম হেলে-দুলে।

কাট্

কিছুদিন থেকে সুরপ্রিয় কিছু চিন্তিত। পাঁচ মাস উপরি-উপরি-তার মনি-অর্ডার ফেরত আসছে। ডাকঘর-ওয়ালারা খবর দিয়েছে, নন্দলাল নন্দী সেখানে নেই। রাধারানী দেবীর নামে টাকা পাঠাবে কি না ভাবছে, এমন সময় একদিন সিধু এসে সংবাদ দিলে, খুড়ো বাঁটুল ফিরে এসেছে যে!

কাট্

সুরপ্রিয় বাঁটুলকে ধরবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। রোজই শোনে সে কলকাতায় গেছে। এর মধ্যে একদিন সে শুনতে পেলে, ইতিমধ্যে তার বিয়েও হয়ে গেছে। কোথায় নাকি একটা ভাল চাকরিও যোগাড় হয়েছে। বাঁটুল বি, এস, সি, পাস।

কাট্

বাঁটুলের ফিরে আসার পর প্রায় বছর-খানেক কেটে গেছে। কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি, অনেকের কাঁধেই র‍্যাপার চড়েছে, এমন একটা সময়ে একদিন সুরপ্রিয় দূর গ্রাম থেকে বাড়ি হেঁটে বাড়ি ফিরছিল—দু-পাশে দিগন্তবিস্তৃত ধান-ক্ষেত, কেউ কোথাও নেই, একলা সে মন্থরগতিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ি পেঁাছবে—এই আন্দাজে। চলতে-চলতে একটা চৌমাথায় হঠাৎ বাঁটুলের সঙ্গে দেখা, একেবারে চারি চক্ষুর মিলন। বাঁটুল একবার মুখ ফিরিয়ে সরে পড়বার উদ্যোগ ক'রেই আবার ঘুরে একেবারে সুরপ্রিয়র পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—কি খুড়ো, ভাল আছ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

—আছি এক রকম।

—বিয়ে করেছ শুনলুম!

মাথা নেড়ে বাঁটুল জানালে, কথাটি সত্য। কিন্তু তখনি সে মুখ ফুটে বললে —সবাই জেদাজেদি করতে লাগল।

একটু চুপ ক'রে থেকে বাঁটুল আবার বললে—আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

তারপর কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই। নীড়-প্রত্যাগত পাখিদের কলধ্বনি, শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগল। সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে— রাধারাণী কোথায় ?

—কাশীতে বেড়াতে গেছে।

—কতদিন তাকে দেখ নি ?

—বছরখানেক হবে। সেই চলে এসেছি, তারপর আর তো যাই নি। তবে বরাবর তার খোঁজ রেখেছি।

—আমি যে টাকা পাঠাতুম, তা ঠিক পেতে ?

বাঁটুল নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে—হঁা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাবার পর সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে—কতদিন একসঙ্গে ছিলে ?

—প্রায় ছ মাস হবে।

—চলে এলে কেন ? টাকার অভাব তো তোমার ছিল না। আর ভাল লাগল না বুঝি ?

—থাকতে পারলুম না খুড়ো। সে অত্যাচার জানোয়ারেও সহ্য করতে পারে না।

সুরপ্রিয় দেখলে, বাঁটুলের চোখ জলে ভরে উঠেছে। কি একটা রূঢ় কথা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। আবার চুপচাপ, কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর সুরপ্রিয় বললে—তাই তো হে, ঐ স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি ছ-বছর ঘর করেছি, আর তুমি ছ-মাস ঘর করতে পারলে না ?

বাঁটুল চট ক'রে সুরপ্রিয়র পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে—খুড়ো, তুমি দেবতা, তোমার সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

সুরপ্রিয় পকেট থেকে কাগজ বের ক'রে বাঁটুলের কাছ থেকে পেন্সিল চেয়ে নিয়ে রাধারাণীর ঠিকানাটা লিখে নিলে।

শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

ফেড্ আউট্

ফেড ইন্

সুরপ্রিয় জিজ্ঞাসা করলে—নায়েব মশায়, একবার দেখুন তো কাশী যাবার ট্রেন কখন আছে ?

নায়েব মনে করলে কর্তা বোধ হয় এবার কাশীবাসী হবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কাশী যাবেন! কবে ?

—কাল।

বিকেল হতে না হতেই পাড়াময় রটে গেল, সুরপ্রিয় সংসার ত্যাগ ক'রে কাশীবাসী হবে।

প্রাচীনরা বললেন—কাশীবাসী হবে কি হে? দেশে বসে কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না?

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে—কাশী চললে কেন হে?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

—আবার কি—

—ঠিক ধরেছ।

—বল কি হে! এই বয়সে আবার?

—বয়স আর এমন কি হয়েছে! এখনও তো পঁয়তাল্লিশ পেরোয় নি।

—কোন পক্ষ হল?

—এটি পঞ্চম পক্ষ।

—কবে ফিরবে?

—দিন সাতেকের মধ্যে।

—মানে! ফুলশয্যা হবে না?

—সেখানেই হবে। এ বাড়িতে ফুলশয্যা সহ্য হয় না।

কাট্

ভোরের ট্রেনে সুরপ্রিয় কাশী যাত্রা করলে।

ফেড্ আউট

সাতদিন ধরে সদরে-অন্দরে সুরপ্রিয়র বিয়ে নিয়ে আন্দোলন চলল।

যুবকেরা বললে—এ অত্যন্ত অনুচিত।

বৃদ্ধরা বললেন—সুরো ঠিক করেছে।

তরুণীরা হাসলে। সে হাসির অর্থ তারাই জানে।

বৃদ্ধারা বিড়বিড় ক'রে কি বললে, তা শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না।

আটদিন পরে সারা পল্লীকে সচকিত ক'রে জমিদার-বাড়ির সামনে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল সুরপ্রিয়, তারপরে হরি-পিসী, তার পেছনে নববধূ। বৃন্দা ঝি তাদের অভ্যর্থনা করলে।

চারিদিক থেকে বুড়ো-বুড়ী, তরুণ-তরুণী ছুটল জমিদার-বাড়িতে। উনুনে ভাত, তরকারি, ডাল, মাছের ঝোল বে-পরোয়াভাবে পুড়তে থাকল!

শঙ্খরব-উলুধ্বনিতে শান্ত জমিদার-বাড়ি ফেটে পড়তে লাগল। বৃদ্ধারা নববধূর ঘোমটা উন্মোচন ক'রে দেখলে, এ যে হুবহু সুরোর চতুর্থ পক্ষ গো!!!

নববধূর মুখে হাসি, মোনা লিজার রহস্যময়ী হাসি।

অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্রের গান শোনা যেতে লাগল—

ছি ছি, কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধুরে হারায়েছিনু—

ফেড আউট্

একটি আষাঢ়ে গল্প

সেদিন ছিল শনিবার। সুধাংশু বেলাবেলি আপিস থেকে ফিরে দেখতে পেলে তার ঘরের দরজাটা শক্ত ক'রে ভেজানো রয়েছে। স্ত্রী মণিমালা ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—একটু দাঁড়াও, এখন ঘরে ঢুকো না। একটু—এই দু-মিনিট—এই খুলো না—খুলো না—

বলতে-বলতে ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে সুধাংশু যে দৃশ্য দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল। তার স্ত্রী মণিমালা ওরফে মণি গাছকোমর বেঁধে খাটের ওপরে চড়ে হাতে একটা লম্বা ঝুল-ঝাড়া নিয়ে ঘরের ঝুল পরিষ্কার করছে। একটা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ পেঁচিয়ে বাঁধায় মণিকে অনেকটা হাসপাতালের সিস্টারদের মত দেখাচ্ছিল।

সুধাংশু ঘরে ঢুকে পড়তেই মণি বললে—কেন এলে! ওদিককার দরজা দিয়ে একেবারে কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকে গেলে না কেন?

সুধাংশু হেসে বললে—তা'হলে তো এ দৃশ্য দেখতে পেতুম না। সত্যি মণি তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

মণি বললে—আপাতত ইচ্ছেটা সম্বরণ ক'রে এদিক দিয়ে কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকে যাও।

সুধাংশু বললে—দরজাটা তা'হলে খিল লাগিয়ে দিয়ে যাই। না হলে অন্য কেউ ঢুকে পড়লে তার পক্ষে লোভ সম্বরণ করা মুস্কিল হতে পারে।

মণি কৃত্রিম কোপে-ঝাড়াটা উঁচিয়ে বললে—দেখ, হাতে কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছ?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি ক্যামেরা এনে এই ভঙ্গির একখানা ফোটো তুলে নিলে। ক্যামেরাটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে সে বলতে লাগল—ছবিখানা বড় করে কোনো কাগজে ছাপতে পাঠিয়ে দেব। নিচে লেখা থাকবে—যা দেবী মম গৃহেষু ঝুলঝাড়া হস্তেন সংস্থিতা—

স্যার অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে লক্ষী ও সরস্বতীর বরপুত্র। জীবনে তাঁকে কখনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়নি। সত্য বটে, তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিকে দারিদ্রের জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। তবুও তিনি ছিলেন বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তার ওপরে সৃষ্টিকর্তা তাঁকে অসাধারণ মেধার অধিকারী করে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সাগর অকাতরে পার হয়ে এসে তিনি দেখলেন তাঁর জন্য ধনীর সুন্দরী কন্যা মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ের পরেই অভয়াচরণ শ্বশুরের পয়সায় বিলেত গিয়ে আই সি এস পাশ ক'রে দেশে ফিরে এলেন।

কাজে যোগ দিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছেন সেখানেই গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন—যদিও এই দুই তরফকেই সন্তুষ্ট করা তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল বললেই চলে, কিন্তু দেবতার দয়া থাকলে কি না হয়! স্ত্রীর দিক দিয়েও তাঁকে কখনো ভুগতে হয়নি। মনোরমা সত্যিই ছিলেন মনোরমা—সুন্দরী, নীরোগ, সাধ্বী এবং স্বামীর গর্ব্বে গর্ব্বিতা। তিনি একেধারে সংসার চালিয়েছেন ঘড়ির কাঁটার মত, ছেলেদের মানুষ করেছেন এবং স্বামীর কর্মজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাইরেও তাল দিয়েছেন। চাকরি-জীবনের শেষ দিকে গভর্মেণ্ট পুরস্কার স্বরূপ অভয়াচরণকে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেছিলেন। বার বছর এই চাকরী করে সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।

অভয়াচরণের তিন ছেলে—তিনটিই হীরের টুকরো। বড় ও মেজ ছেলে—অংশুপ্রকাশ ও বিমলাংশুপ্রকাশ—দু-জনেই সিভিলিয়ান। ছোট ছেলে সুধাংশুপ্রকাশ তিন ভায়ের মধ্যে ছিল সবচেয়ে মেধাবী। স্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাতেই সে জীবনে কখনো দ্বিতীয় হয়নি। অভয়াচরণের খুবই ইচ্ছা ছিল যে, সুধাংশুও বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসে, কিন্তু তা হয়নি।

বি-এ পাশ করার পরে সুধাংশুর মার একান্ত ইচ্ছায় মনিমালার সঙ্গে সুধাংশুর বিয়ে হয়ে গেল। এই বিবাহ অনেক দিন আগেই ঠিক হয়েছিল। মনোরমা ছিলেন মণিমালার মার বন্ধু, তিনি কথা দিয়েছিলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দেবেন। এঁদের দুই পরিবারের মধ্যে খুবই মাখামাখি ছিল এবং ছেলেবেলা থেকে সুধাংশু ও মণিমালা উভয়েই জানত যে, তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

বিয়ের সময় মণির বয়স ছিল পনেরো। তখন সবে সে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আই-এ পড়তে আরম্ভ করেছে আর সুধাংশু বি-এ পাশ করেছে। বিয়ের পর ঠিক হল যে, মণি বাপের বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করবে আর সুধাংশু এম-এ পাশ ক'রে বিলেতে যাবে এবং সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ ক'রে এসে একত্রে ঘরকন্না করবে। তার আগে পালে-পার্বণে বাপের বাড়ীতে এবং শ্বশুরবাড়ীতে উভয়ের দেখা-শুনো চলবে কিন্তু অভিভাবকদের তত্বাবধানে।

কিছু দিন যেতে না যেতে অভয়াচরণ ও মনোরমা উভয়েই জানতে পারলেন যে, সুধাংশু প্রতিদিনই বিকেল বেলা শ্বশুরবাড়ীতে যায় এবং সন্ধ্যা অবধি সেখানে আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফেরে।

সুধাংশু ছোট ছেলে অত্যন্ত আদরের ছেলে বলে অভয়াচরণ কিংবা মনোরমা কোনো দিন তাকে ধমক পর্যন্ত দেননি। সুধাংশুও বাপ-মায়ের এত বাধ্য ছিল যে, ধমক দেবার কখনো দরকার হয়নি। বাপ-মার সঙ্গে সব ছেলেরই, বিশেষ ক'রে সুধাংশুর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। সে প্রতিদিন শ্বশুর-মন্দিরে যাতায়াত করছে জানতে পেরে মনোরমা তাকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ রে সুধা, তুই নাকি রোজ মণির সঙ্গে দেখা করতে যাস?

সুধাংশু অনেক ভেবে-চিন্তে বললে—হ্যাঁ, দু-দিন গিয়েছিলুম। একদিন ফাউনটেন পেনটা আনতে, আরেক দিন—

মনোরমা বলে দিলেন—ছি বাবা, ও-রকম যেতে নেই। ওতে তোমার নিন্দে হবে, আমাদের নিন্দে হবে, বৌমাকে সবাই নিন্দে করবে।

সুধাংশু মাকে কথা দিলে, আর সে না বলে শ্বশুরবাড়ীতে যাবে না। সপ্তাহখানেক অদর্শনের পর তারা চিঠি লিখে ঠিক করলে মনির কলেজের সামনে শুধাংশু এসে দাঁড়িয়ে থাকবে ও সেইখানেই দেখা হবে। প্লান কাজে পরিণত করতে দেরী হল না।

এখন থেকে সুধাংশু -মণির নিয়মিত মিলন হয়। মধ্যে-মধ্যে পরেশ-নাথের বাগান, আলিপুরের চিরিয়াখানাও চলতে লাগল। কিন্তু চেনা-লোকে যে পৃথিবী ভর্ত্তি হয়ে আছে প্রায়ই সে অভিজ্ঞতা হওয়ায় মধ্যে-মধ্যে কলেজ পলায়ন ক'রে চন্দননগর বর্দ্ধমানও চলে। বছর-খানেক সময় বেশ নিশ্চিন্তে এই ভাবে তারা কাটিয়ে দিলে।

একদিন, তখন শীতকাল। সুধাংশু ও মণি গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছেই একটা বড় গাছের তলায় শুয়ে-শুয়ে গল্প করছে এমন সময় আলিপুরে কি একটা কাজ সেরে স্যর অভয়াচরণ মাঠের রাস্তা দিয়ে ফেরবার মুখে দেখলেন, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ চিৎ হয়ে মাঠে পড়ে আছে—দুজনের মুখে দু-টুকরো দুর্বা ঘাস।

স্যর অভয়াচরণ প্রথমে তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি গাড়ী থেকে নেমে গুটি-গুটি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাদের কি তৃতীয় ব্যক্তির দিকে নজর দেবার ফুরসৎ আছে? তারা তখন উচ্চহাস্য ও কথাবার্তায় মশগুল। শেষকালে অভয়াচরণ ডাক দিলেন সুধা, মণি!

সুধার কথাবার্তায় এতই মশগুল ছিল যে, বাপের আওয়াজ তার কানেই যায়নি। কিন্তু মণি এই বিজন প্রান্তরে অকস্মাৎ শ্বশুরের ডাক শুনে ব্যাঘ্র-তাড়িত হরিণ-শাবকের মত ঠিকরে দাঁড়িয়ে উঠেই দেখে, সামনে শ্বশুর মহাশয় দাঁড়িয়ে আছেন। মনিকে দেখে সুধাংশুও ধড়মড় ক'রে উঠে বাপকে দেখে কি করবে ঠিক পায় না, এমন সময় অভয়াচরণই বললেন—রোদে থাকে না, আয়!

সুধা ও মণি গুঠি-গুটি অভয়াচরণের পিছু-পিছু চলল। গাড়ীর কাছে এসেই সুধাংশু সামনের দিকের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। মণি ও অভয়াচরণ ভেতরে বসলেন। এতক্ষণ মণি ঠিক ছিল কিন্তু গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই সে লজ্জায় কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অভয়াচরণ তাকে কাঁদতে দেখে একখানা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ছি, কাঁদছ কেন? কাঁদবার কি হয়েছে!

শ্বশুরের কাছে এই প্রশ্রয় পেয়ে মণি চোখ মুছতে মুছতে ভাবতে লাগল, সব দোষ ওই ওর—

যা হোক, অভয়াচরণ সেখান থেকে বাড়ী না গিয়ে সোজা বেয়াই-বাড়ী গিয়ে

উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে মণির বাক্স-প্যাটরা জিনিষপত্র সব গাড়ীতে বোঝাই ক'রে নিজেদের বাড়ীতে এলেন। অভয়াচরণের বিরাট বাড়ী, দুই ছেলে বাইরে থাকে, বাড়ী এক রকম খালি বললেই হয়। তেতলটা সব সময়ে চাবিই দেওয়া থাকে। তারি এক দিকে তিন-চারটি ঘর সুধাংশুদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেল—সেই দিন থেকে এই দিকটার নাম হয়ে গেল—মণিমহল।

স্বামীর এই ব্যবস্থায় মনোরমা যদিও বাধা দেননি তবুও একদিন সুধাংশুকে ডেকে তিনি বলেছিলেন—বৌমাকে নিয়ে এলে কিন্তু যদি পরীক্ষায় ফেল কর তো দু-জনেরই বদনাম হবে।

সুধাংশু মা-র পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল—তোমার আশীর্বাদে পরীক্ষার ফল ভালোই হবে, দেখে নিও।

সেবার পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল সুধাংশু যথারীতি এবারও প্রথম হয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেবার মণিও প্রথম বিভাগে পাশ করলে। আশাতীত আনন্দে অভয়াচরণ ও মনোরমা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

মহা-সমারোহে সুধাংশুর বিলাত-যাত্রার অয়োজন চলতে লাগল। আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল দাদাদের মত সেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে। সব বন্দোবস্ত চলেছে, বিলেতে চিঠিপত্রও লেখালেখি হচ্ছে, এমন সময় একদিন সুধাংশু তার বাবাকে জানালে তার বিলেতে যাবার ইচ্ছে নেই।

সুধাংশুর কথা শুনে অভয়াচরণ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিবেচক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। কোনো রকম গোলমাল না ক'রে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তা'হলে তুমি কি করবে?

সুধাংশু বললে—সিভিলিয়ানের চাকরীর প্রতি তার কোনোও ঝোঁক নেই এবং অদূরে ভবিষ্যতে দিশি সিভিলিয়ানদের অবস্থা আরোও খারাপ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে। তার ইচ্ছা, এখানকার ফাইন্যান্স পরীক্ষা দিয়ে ভারত গভর্মেন্টের দপ্তরে ঢুকতে পারলে ভবিষ্যতে মাইনের দিক দিয়ে ভালো তো হবেই অথচ সিভিলিয়ানের মত ঝুঁকি পোয়াতে হবে না। এই পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় যদি না পারা যায় তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কথা বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

মন্দ লোকে বলে, বিলেত যাবার কথা শুনে মণি কান্নাকাটি করেছিল বলে সুধাংশু যেতে চায়নি, কিন্তু মণি সে অভিযোগ অস্বীকার করত।

বছর-খানেক পরিশ্রম করে সুধাংশু পরীক্ষায় এবারেও প্রথম স্থান অধিকার করলে। সরকারী মহলে অভয়াচরণের নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। তারই ফলে সুধাংশু প্রথমেই একটি দায়িত্বপূর্ণ বড় চাকরী পেয়ে গেল।

বৈশাখ মাসে এক দিন সে বাপ-মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে গেল সিমলের পাহাড়ে চাকরী করতে—মণিও সঙ্গে রৈল।

কাজে ঢুকেই সুধাংশু কাজের লোক বলে নাম ক'রে ফেললে। ধাঁ-ধাঁ ক'রে তার উন্নতি ও প্রোমোশন হতে লাগল। লোকে বলত, পৃথিবীতে

সুধাংশুর দুটো নেশা আছে—এক মণি আর এক আপিস। কিন্তু সুধাংশু আপিসকে নেশা বলে স্বীকার করলেও মণিকে সে নেশা বলত না। মণি ছিল তার সকল কর্মের—তার জীবনের সকল ধর্মের অনুপ্রেরণা। আপিস ছাড়া সে সিমলার সামাজিক কোনো কাজেই মিশতে পারত না। সেখানকার সামাজিক-গিন্নীরা প্রথম-প্রথম মণিকে তাঁদের কাজে ও হুল্লোড়ের আবর্তে টানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মণিও তাতে তেমন ক'রে ধরা দিতে পারলে না। শেষকালে সবাই তাদের হাল ছেড়ে দিলেন—তারা দু-জনে দু-জনকে একান্তে পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

সুধাংশু আপিসের কাজ করতে-করতে ভাবত কখন মণির কাছে ফিরে যাবে, আর সারাদিন সংসার গুছোতে গুছোতে মণি ভাবত সুধাংশু কখন ফিরে আসবে। বাইরের জগত থেকে ক্রমেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। সুধাংশুকে সকলেই ভাবত লোকটা বড় কুনো—কেউ বলত চেলো, কেউ বলত স্ত্রৈণ। কিন্তু এ সব কথায় তাদের কিছু আসত-যেত না। মণি তার ভালবাসা দিয়ে প্রাণপণে আকর্ষণ করত সুধাংশুকে, সেও মণিকে ঠিক সেই রকম প্রবল ভাবে ভালবাসত—কিন্তু তবুও যেন তৃপ্তি হত না, সুধাংশ ভাবতে থাকত তার মধ্যেও যেন কোথায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

সুধাংশু ও মণি দু-জনেই বলাবলি করত, এক দিন সে আজ হোক কাল হোক কিংবা পঞ্চাশ বছর পরেই হোক যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে তাদের দু-জনের মাঝখানে তখন কি হবে! তারা শুনেছিল মৃত্যুর পর পরলোকে অনন্ত জীবন আছে। সুধাংশু মণিকে বোঝাত, আমি মরে গেলে তুমি তো আর অনন্ত কাল বাঁচবে না, কিছুদিন পরে আবার আমরা মিলব।

সুধাংশু পর-জীবনের অনেক কথাই বলতে থাকত—সবই তার শোনা এবং পড়া। মণি তার কাঁধে মাথা রেখে শুনে যেত, কখনো বা তার চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রু ফুটে উঠত—সে বুঝতে পারত না কোন্ বেদনার অশ্রু এ—বেদনার না আনন্দের!

একদিন সিমলেতে এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে মণি ও সুধাংশু প্রকাণ্ড এক কাচের জানলার ভেতরে সোফায় বসেছিল। বাইরে পাহাড়ের ওপর চাঁদের আলো ও আবছায়ায় মিলিয়ে এক স্বপ্নরাজ্য তৈরি হয়েছিল। এই রহস্যময় আলো-আঁধারিতে মিশে গিয়ে তাদেরও মনে হতে লাগল—এই জীবনটাও যেন একটা রহস্য। কিছু আলো কিছু আঁধার, যেন কিছু বোঝা যায় বাকিটা সবই আচ্ছাদিত। তবুও কি সুন্দর, মধুময় এই পরিবেশ!

সুধাংশু মণিকে পাশে টেনে নিয়ে বললে—দেখ মণি, এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মানুষকে যেখানে যেতে হয় সে জায়গা কি এর চেয়েও সুন্দর?

মণি বললে—যতই সুন্দর হোক আমি সেখানে যেতে চাই না।

সুধাংশু বললে—যেতে চাই না বললেই হবে না মণি, যেতেই হবে, তোমাকে আমাকে সবাইকে—দু-দিন আগে আর পরে।

—যেতেই যখন হবে তখন আমি সেই অজানা পুরীতে একা যেতে চাই না।

তুমি না থাকলে সেখানে আমি একলা কি ক'রে থাকব ? ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই যে, তুমি যেন আগে যাও তার এক দিন পরেই যেন আমি যাই।

সুধাংশু হেসে বললে—কিন্তু মণি, হিন্দু মেয়েরা সধবাই মরতে চায়।

মণি বললে—মরতে চাইত তখন সহমরণ এড়াবার জন্যে।

সুধাংশু ও মণি দু-জনেই হেসে উঠল।

কিন্তু মণিকে আগেই যেতে হল!

কি একটা জরুরি সরকারী কাজে সুধাংশুকে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় আসতে হয়েছিল। ট্রেণে কি রকমে ঠাণ্ডা লেগে মণির হল জ্বর, বাড়ীতে পৌঁছিয়েই ডাক্তার ডাকা হল। তিনি এসে বললেন-ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, দিন দুয়েক শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। কিন্তু সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ডবল-নিমোনিয়ায় দাঁড়িয়ে দিন দশেকের মধ্যেই মণি মারা গেল। মণির তখন ত্রিশ বছর বয়স আর সুধাংশুর বয়স পঁইত্রিশ। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক মাস ছাড়া এই পনেরো বছরের মধ্যে কখনো তারা ছাড়াছাড়ি হয়নি—এর মধ্যে তাদের সন্তানাদিও হয়নি।

বলা বাহুল্য, মণির মৃত্যুতে সুধাংশু চারিদিক অন্ধকার দেখলে। তখনো তার বাপ-মা দু-জনেই বেঁচে। কিন্তু বাবা মা ভাই বৌদি ভাইপো ভাইঝি কারুর মুখ চেয়েই সে সান্ত্বনা পেলে না। আপিসে সে দীর্ঘ দিনের ছুটির আবেদন পাঠালে—এই দশ বছর চাকরির মধ্যে সে একবারও ছুটি নেয়নি।

সুধাংশুর ছিল ফোটোগ্রাফির সখ—ছাত্র-জীবনেই সে দেশবিদেশে এই ক্ষেত্রে নাম করেছিল। বিয়ের পর সে মণিমালার ছবি তুলেছিল—নানান ভঙ্গিমায়, এবং সেগুলি বড় ক'রে বাঁধিয়ে ঘর-ময় সাজিয়ে রেখেছিল। এ বিষয়ে সে স্ত্রীকেও ওস্তাদ ক'রে তুলেছিল। তারা কলেজ থেকে পালিয়ে চন্দননগর, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে ছবি তুলত। মণিও সুধাংশুর অনেক ছবি তুলেছিল—দশ-বারোটা এ্যালবাম ভর্তি ছিল কেবল মণির তোলা ছবিতে।

ছ-মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়ে এল। সুধাংশু মণির ছবিগুলো নামিয়ে নিজের হাতে ধুলো ঝেড়ে তাতে প্রতিদিন টাটকা ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিতে লাগল। মণি একটা বিশেষ গন্ধের ধূপ পছন্দ করত, প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরের মধ্যে ধূপ জ্বলতে লাগল। সুধাংশুর ব্যাপার দেখে তার মা বাবা ভয় পেয়ে গেলেন কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—সুধাংশু যে রকম করছে তাতে বছর খানেকের মধ্যেই সে বিয়ে করল বলে।

সুধাংশু কিন্তু বেশি দিন ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারলে না, মাস খানেক যেতে না যেতেই সে হাঁপিয়ে উঠল। শেষকালে আপিসে আবার দরখাস্ত ক'রে কাজে গিয়ে যোগ দিল। সিমলাতে যাবার সময় মণির ছবিগুলো নিয়ে যেতেও সে ভুলল না।

মণি-জ্ঞান ও মণি-ধ্যানে সুধাংশুর দিন কাটতে লাগল। চাকরীর সময়টুকু

ছাড়া বাড়ীর বাইরে সে থাকত না। কোনো পার্টি, সভাসমিতি পুজো উৎসবে সে যোগ দিত না।

দেশভ্রমণ করবার ইচ্ছা তার প্রবল ছিল। সে ও মণি প্রায়ই পরামর্শ করত ছুটি নিয়ে একবার দু-জনে ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে আসবে। এখন দেশভ্রমণের ইচ্ছা হলেই তার মনে হত, সে একলা গেলে মণির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে। সে ভাবতে থাকত, মণিও নিশ্চয় তার কথা ভাবছে—যেখানে সে গিয়েছে সেখান থেকে এসে দেখা দেওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব, তা না হলে মণি কি দেখা দিত না?

আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে এই চিন্তায় তার দিনরাত কাটত। ক্রমেই মণির চিন্তা তার একটা প্রবল নেশায় দাঁড়িয়ে গেল—এমনি ক'রে কখন যৌবন পেরিয়ে সে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হল, প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে বার্ধক্যের সামনে এসে দাঁড়াল, তা সে নিজেই জানতে পারেনি। হঠাৎ একদিন আপিসে তাকে মনে করিয়ে দিলে—মাস তিনেক বাদেই তার পেন্সন পাবার সময় হবে—যদি আরও কিছু কাল চাকরী করবার ইচ্ছে থাকে তবে এই বেলাতেই তাকে আবেদন ক'রে রাখতে হবে। কিন্তু চাকরির মেয়াদ আর না বাড়িয়ে সে পেন্সন্ নেওয়াই সাব্যস্ত করলে।

পেন্সন্ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেই সুধাংশু অনুভব করলে, সংসারে আপনার বলতে তার আর কেউই নেই। এই ক-বছর তার জীবনের ওপর দিয়ে দুটো ঝড় বইত—এক চাকরি আর এক মণির স্মৃতি। এর মধ্যে বাপ-মা মারা গিয়েছেন। বড় দু-ভাই—তারা পাকা সাহেব, তার ওপরে তাঁদের চাকরিতে ছুটি পাওয়া না কি সম্ভব নয়। তাই পিতা-মাতার মৃত্যুতে অশৌচ, শ্রাদ্ধ, মাথা নেড়া হওয়া পর্যন্ত তাকেই করতে হয়েছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও সুধাংশু তাঁদের অভাব বোধ করেনি। এর মধ্যেই তার বড় দুই ভাই ও এক বৌদিও চলে গেছেন। বড় ভায়ের এক ছেলে এবং মেজ ভায়ের দুই ছেলে—তারা বিয়ে করেছে, দু-একটি ক'রে নাতিনাতনিও আসতে আরম্ভ করেছে।

সুধাংশু বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলে তার বিধবা মেজ বৌদি এদের নিয়ে সমারোহে সংসার করছে। পঁচিশ বছর পরে বাড়ীতে ফিরে এসে এই অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে পড়ে মঙ্জমান ব্যক্তির অবলম্বনের মতন প্রাণপণে সে মণির স্মৃতিকেই আঁকড়ে রইল।

দেওয়ালের যে সব জায়গা থেকে সে মণির ছবিগুলো নামিয়ে নিয়েছিল সেখানকার পেরেকগুলো তখনও ঠিক সেই রকমই ছিল। সেখানে সেই ছবিগুলো আবার সে টাঙিয়ে দিলে, আবার তাতে ফুলের মালা চড়তে লাগল, সন্ধ্যেবেলা মণির প্রিয় অগুরু-গন্ধ ধূপ জ্বলতে লাগল। মৃগনাভির সুরভি আবার নতুন ক'রে তাকে যেন সেই দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল—যেদিন মণিই ছিল এই গৃহের কর্ত্রী।

একদিন সুধাংশু মণির তোলা ছবির এ্যালবামগুলো ঝাড়া-মোছা করছিল, একটা বড় আয়না-টেবিলে বসে। ছবিগুলোকে এ্যালব্যাম থেকে খুলে ময়লা

মুছে আবার এ্যালবামে পুরে রাখছিল। পঁচিশ-ত্রিশ বছর বা তারও আগেকার তোলা সব ফোটো, এত দিনে সেগুলো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কত লোকের, কত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের ছবি মণি তুলেছিল, সবাইকে সুধাংশু চিনতেও পারছিল না। হঠাৎ একখানা তার নিজের ছবির দিকে নজর পড়ল—ফাইনান্স পরীক্ষার পর মণি যত্ন ক'রে সেখানা তুলেছিল। সুধাংশু নিজের ছবিখানা ভালো ক'রে দেখতে লাগল—তার মনে হল তখন সে দেখতে সুন্দর ছিল, বয়স ছিল পঁচিশ বছর। ছবিখানা বার-বার দেখতে-দেখতে একবার সম্মুখে নজর পড়ায় দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। তার কি খেয়াল হল, সে নিজের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান চেহারা মিলিয়ে দেখতে লাগলো। এ্যালবামে নিজের সেই ছবিখানার পাশে হাস্যমুখী মণিরও একখানা ছবি ছিল। সুধাংশুর মনে হতে লাগল আজ যদি মণি বেঁচে থাকত তবে সে কি রকম দেখতে হত?

সেই দিন থেকে মণির স্মৃতির সঙ্গে এই একটা খেলা তার শুরু হল। যত দিন যেতে থাকে ততই সে কল্পনায় মণির চেহারা তৈরি করে। মণি মোটা হয়েছে, তার মাথার চুল ধীরে-ধীরে সব শাদা হয়ে যাচ্ছে, কপালে মুখে বলি-রেখা পড়ছে—এই মূর্তিতে সে যেন আরো সুন্দর দেখতে হয়েছে। সুধাংশুর একটানা চিন্তার মধ্যে একটুখানি বৈচিত্র এল।

একদিন সুধাংশুর মেজ-বৌদি এসে বললেন—ঠাকুরপো, চল ভাই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছে না, দিন কতক তীর্থ ক'রে আসি। সুধাংশু ভাবলে জীবনে সে কোন দিন ধর্মের কথা, দেবতার কথা ভাবেনি, আজ আবার তীর্থ করতে যাবে কি? মণি থাকলেও না হয় হত। বলা বাহুল্য, সে গেল না।

ভাইপোরা বিষয়-আশয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে সে এক কথায় পরামর্শ দিয়ে দিত কিংবা বলত যা তোরা ভাল বুঝিস কর না, আমি আর ক-দিন! এই রকম চলতে-চলতে তার মেজ বৌদিদিও একদিন মারা গেলেন—সুধাংশুর বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে।

ভাইপোদের ছেলেরা বড় হতে লাগল। তারা একে নাতি তায় আজ কালকার ছেলে। তারা মানে না, তাদের কুনো দাদুকে ঘর থেকে টেনে বার করতে আরম্ভ করলে। আজ যাদুঘর, কাল বোট্যানিক্যাল গার্ডেন—এই ক'রে তারা বেড়াতে লাগল। এ সব জায়গায় যেতে সুধাংশুর ভালোই লাগত, কারণ সে আর মণি কলেজ থেকে পালিয়ে বাড়ীর সকলকে লুকিয়ে এই সব জায়গায় এসে বসত—এ সব স্থান মণির স্মৃতিতে ভরা। সেখানে গেলে সুধাংশু আগের সেই দিনগুলির ভেতর ফিরে যেত, তফাতের মধ্যে মণি নেই আর সে স্বাস্থ্য ও বয়স নেই।

এক দিন নাতিরা সুধাংশুকে নিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকে ফিরছে। মাঠের মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ী হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে, এমন সময় এক জায়গায় সুধাংশু গাড়ী থামাতে বললে। নাতিদের মধ্যেই একজন গাড়ী চালাচ্ছিল সে মাঠের ধারে গাড়ী থামালে। সুধাংশু গাড়ী থেকে নেমে থপ-থপ ক'রে মাঠের মধ্যে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল—নাতিরা অবাক হয়ে তার কাণ্ড দেখতে লাগল। সুধাংশু কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধপ্ করে

বসে পড়ল, তারপরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল আকাশের দিকে মুখ ক'রে।

নাতিরা হাসাহাসি করতে লাগল—দেখ, দাদুর কাণ্ড দেখ!

অনেক ডাকাডাকি করার পরও সুধাংশুর কোনো সাড়া না পেয়ে সবাই সেই গাছের নিচে গিয়ে দেখলে—সুধাংশুর দেহে প্রাণ নেই।

* * *

মৃত্যুমোহ কেটে যাওয়ার পর যখন জ্ঞান হল তখন সুধাংশু দেখলে, তার চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা সে বুঝতেই পারেনি যে, তার মৃত্যু হয়েছে। কয়েক-মুহূর্ত এই ভাবে কাটবারপর যনখ বুঝতে পারলে, সে মরলোক ত্যাগ করেছে তখনই তার মণির কথা মনে পড়ল। মণি কোথায় কিভাবে আছে, সে কি তার সঙ্গে দেখা করবেনা? এই অজ্ঞাত অপার অন্ধকারের মধ্যে কি ক'রে তাকে খুঁজে বার করবে! একান্তভাবে মণির কথা ভাবতে ভাবতে সুধাংশু দেখতেপেল, সেই অন্ধকার ফুঁড়ে মণির মুখখানি ভেসে উঠল। সুধাংশু কতকাল মণিকে দেখেনি, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সে নিরবধি তারই ধ্যানে কাটিয়েছে। মনের আবেগে সে হু-হু ক'রে মণিকে ব'লে যেতে লাগল কি ক'রে, কি দুঃখে পৃথিবীতে তার দিন কেটেছে। শুধু আজকের এই মিলনের আশায় সে এত দিন কাটিয়েছে। আর তার দুঃখ নেই, এবার তারা অনন্ত মিলনে বাঁধা পড়ল, অনন্ত কালের জন্য।

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর মণির দেখা পেয়ে সুধাংশু এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে লক্ষ্যই করেনি যে মণি তার একটি কথারও জবাব দিচ্ছে না। তার মুখে কিন্তু সেই হাসিটি লেগে আছে, যে হাসি পৃথিবীতে সকলের কাছে তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। সুধাংশু তার মা দাদা বৌদি আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করলে—জিজ্ঞাসা করলে—তারা কোথায় আছে? চল মণি তাদের কাছে যাই—মনি কিন্তু কোন উত্তর দেয় না। তার মুখে সেই হাসি—অনির্বাণ রহস্যময় হাসি—সে হাসি কি কান্না, সুধাংশু তাও বুঝতে পারে না।

সুধাংশু মনে করলে, হয়তো এখানকার কোনো নিয়মবশত কিছু কালের জন্য মণি চুপ ক'রে আছে, পরে আবার সে কথা বলবে। কিন্তু যে মহাকালের নিঃসীম সমুদ্রে দিন-রাত্রি আলো-অন্ধকারে চিত্র-বিচিত্রিত পৃথিবীর বৎসরগুলি রঙিন ধূলিকণার মত নিমেষে মিলিয়ে যায়, সে মহাকালের কোন পরিমাণ কে করতে পারে! এমনিভাবে ক্রমে সে নিঃসীম অন্ধকার সমুদ্র কোন্ অন্তর্লোক-বিচ্ছুরিত আলোকে ধীরে-ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল—তবুও মণি নীরব। ক্রমে সুধাংশু বুঝতে পারলে, তার পাশে যে হাস্যমুখী মণির মুখখানি দেখা যাচ্ছে সে আসল মণি নয়, সে তারই কল্পনা রূপ ধরেছে মাত্র। এই কথা মনে হওয়া-মাত্র মণির মুখখানা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সুধাংশু মণির সন্ধান করতে লাগল। কত লোককে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে যে এসেছে কে তার খোঁজ রাখে? এই রকম ক'রে ঘুরতে-ঘুরতে সে একটা অপূর্ব আলোকময় জায়গায় এক দিন এসে পৌঁছল। কিন্তু এ আলো বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারা যায় না। সেদিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে

তার যেন কি রকম ঘুম পেতে লাগল—কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়ল।

*　　　*　　　*

এবার শুধাংশু জন্মগ্রহণ করলে এক দরিদ্র কায়স্থ-পরিবারে। গরীব হলেও তার বাপ-মা উভয়েই শিক্ষিত। তার বাবা এম-এ পাশ ক'রে একটা কলেজে অধ্যাপকের চাকরি করেন, মাইনে পান দেড়শো টাকা। মা ম্যাট্রিক পাশ। পৈত্রিক একখানা বাড়ী আছে, তারই একাংশ ভাড়ায় খাটে আর বাকিটায় তারা থাকে।

নতুন-জন্মে সুধাংশুর নাম হল অসিতকুমার। বাড়ীর বড় ছেলে সে, সুখেই মানুষ হতে লাগল। তার পরে আরো একটি ভাই আসতেই একটু একটু ক'রে সে দারিদ্র্যের দংশন বুঝতে আরম্ভ করলে। সেই বয়সেই মাঝে-মাঝে তার মনে নানান চিন্তার উদয় হয়। তার চারপাশের অনেক ধনীর ছেলেকে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে দেখে তার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠত—তারা কেন সে রকম থাকতে পায় না। কিন্তু সে ছিল শান্ত প্রকৃতির ছেলে, তার মনের এই আলোড়ন মনেতেই লয় পেত, বাইরে প্রকাশ পেত না।

সেদিন সপ্তমী পূজা। অসিতের তখন বছর-ছয়েক বয়স হবে। সে তার দু-বছরের ভাই নিশীথকে নিয়ে তাদের রকে বসেছিল। দূরে পূজা-বাড়ী থেকে ঢাক ও শানাইএর মিশ্রিত সুর এসে তার কানে লাগছিল—বহু দিন বিস্মৃত সুখস্মৃতির মত। তবে মনে হতে লাগল—এই শরতের সোণালি রোদ, এই পূজার প্রভাতটি এরা যেন তার বহুদিনের পরিচিত। রাস্তা দিয়ে দলে-দলে সুন্দর পোষাক-পরা ছেলে-মেয়ে চলে যাচ্ছিল। অসিত একটা কোরা ধুতি পরে বসেছিল—এর বেশি সেবারে পূজোর সময় তার বাবা দিতে পারেনি, এই জন্য অসিতের দুঃখ কিছুই ছিল না। কিন্তু সুন্দর বেশে সজ্জিত তারই বয়সী ছেলে-মেয়েদের দেখতে-দেখতে তার যেন মনে হতে লাগল, সেও একদিন ঐ রকম সুন্দর পোষাক পরত, একদিন যেন তারাও খুব ধনী ছিল। কে একজন তাকে খুব ভালবাসত, সে চলে গিয়েছে, তাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। একটা অকারণ বেদনা তার বুকের মধ্যেগুমরে উঠতে লাগল।

চোখের সামনে দিয়ে সুসজ্জিত ছেলে-মেয়ের দল চলে যেতে লাগল, দূরে সানাইয়ের সাহানা করুণতর হয়ে আকাশ ও বাতাসে প্রসারিত হতে লাগল, কি একটা বেদনায় অসিতের দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল, সে একখানা হাত দিয়ে তার ভাই নিশীথকে আরো কাছে টেনে নিলে। দাদার স্পর্শ পেয়ে নিশীথ তার গা ঘেঁষে এসে বসল।

অসিত তার এই নূতন অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে-দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত জাগিয়ে রাখলে—সে প্রায়ই নির্জনে বসে ভাবতে থাকত তার কথা, যাকে সে ভালবাসে অথচ চেনে না,—বেশ লাগত তার সে কথা ভাবতে।

সেই বছরের শেষের দিকে তার হাতে-খড়ি হল। তার পরে সটকে, কড়াঙ্কে ও নয়ের ঘরের নামতার বক্রতালে তার সেই অনুভূতি পিষে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল—আবার নবজীবন সুরু হল।

একটি পুরনো কাহিনী

পিছনে তাকালেই দেখা যায় বিস্মৃতির সীমানা থেকে সমুদ্রের অফুরন্ত ঢেউ-এর মতো শত-শত কাহিনী একের পর এক মাথা তুলছে আর স্মৃতির সীমানায় এসে ভেঙে পড়ছে। এই মুহূর্তে যেটিকে মনের পায়ের কাছে এসে ভেঙে লুটিয়ে পড়তে দেখছি তার চেহারাটা মন্দ লাগছে না। এই জীবনেই একের পর এক কত গল্প রচিত হয়ে আছে, তাদের সবগুলিকে এক সঙ্গে আবিষ্কার করার মতো দীর্ঘ আয়ু পাব কোথায়? সংখ্যায় তারা অগুণতি, জীবনেরই সীমানায় তাদের বাস, কিন্তু উদ্ধার করতে গেলে তারা আয়ুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

সিকি শতাব্দী আগের কাহিনী। আমি আর দুই বন্ধু ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। বন্ধুদের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী, অপর জন গ্রন্থ-প্রকাশক। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি হয়ে আমরা এসে পেঁছিলাম বোম্বাই শহরে। বন্ধুটি তখন ছিলেন একমাত্র আইন-গ্রন্থ প্রকাশক, তাঁর যোগাযোগের প্রয়োজন ছিল বোম্বাইয়ের বিখ্যাত এক আইন-গ্রন্থ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন দু-জন, নাম করব না তাঁদের—ধরে নেওয়া যাক একজনের নাম নটবর আর একজনের নাম বংশীধর। এঁরা প্রকাশক হিসাবে বিরাট ব্যবসায়ের মালিক অথচ গোড়ায় যখন শুরু করেছিলেন তখন তাঁরা ছিলেন বইয়ের ফেরিওয়ালা-মাত্র। দুই দরিদ্র বালক পুস্তক ফেরি ক'রে একই সঙ্গে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে বহু লক্ষ টাকার ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। দু-জনের মধ্যে আশ্চর্য বন্ধুত্ব—এবং যেমন দু-জনে এক সঙ্গে জীবন আরম্ভ করেছেন তেমনি মনের মিল, যে-কোন যৌথ কারবারীর আদর্শ। এখন ওঁরা দু-জনেই বৃদ্ধ এক সঙ্গেই জীবন শেষ করবেন এই বিশ্বাস ছিল সবার, কিন্তু শুনে বিস্মিত হওয়া গেল যে, কিছুকাল পূর্বে তাঁরা পৃথক হয়েছেন এবং একজন আর একজনকে তাঁর গুড-উইল বিক্রি করে দিয়েছেন।

কথাটা শুনলাম আমরা নটবরের কাছ থেকে। তিনি বল্লেন—আমাদের এত দিনের কারাবারের মধ্যে বাইরের কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারেনি, কিন্তু যখন দেখলাম বংশীধর তার জামাইকে একটা অংশ দেবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন আমার পক্ষে সরে আসা ভিন্ন আর উপায় ছিল না।

শুনে সত্যিই খুব দুঃখ হল। মানুষের কোথায় দৌর্বল্য থাকে সব সময় তা বোঝা যায় না, কিন্তু যখন তা প্রকাশ পায় তখন সব ভেঙে-চুরেই প্রকাশ পায়। বংশীধরের জামাই-দৌর্বল্যও এই জাতীয় একটি জিনিস। কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই এতে, সংসারে এই রকমই হয়।

যাই হোক যখন দুই বন্ধু পৃথক হয়েই পড়েছেন তখন আমাদের সঙ্গী

বন্ধুর পালা ক'রে দুই জনের সঙ্গেই দেখা করতে হল, অর্থাৎ একবার এঁর কাছে একবার ওঁর কাছে। পরদিন সকালে নটবরের সঙ্গে দেখা করার পর আবার আসতে হল বংশীধরের কাছে। বলা বাহুল্য আমারা তিনবন্ধু বরাবর এক সঙ্গেই আছি।

ব্যবসার কথা শেষ হলে কথা উঠল ওঁদের পৃথক হওয়া বিষয়ে। আমরা বললাম—আমরা সবই শুনেছি। নটবর বলেছেন সবই। আপনার জামাইকে অংশ দেওয়া নিয়েই নাকি গোলমালের সূত্রপাত।

বংশীধর কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে বললেন—জিজ্ঞাসা করেননি আমার জামাইটি কে?

আমরা সবাই সবিস্ময়ে চাইলাম বংশীধরের দিকে। বললাম—না, জিজ্ঞাসা করিনি তো।

—করা উচিত ছিল। বললেন বংশীধর,—কারণ আমার জামাই নটবরেরই একমাত্র পুত্র।

কেলো কামড়ায়

কিছুক্ষণ থেকে রাস্তায় একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু তেমন কান দিইনি। পাড়ার অনেকের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সবার আওয়াজ ছাপিয়ে আশুদার গলা উঠছিল। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে দেরি হল না। আশুদার সঙ্গে কোনোদিনই পাড়ার কারুর সদ্ভাব নেই, কারুর না কারুর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই আছে—আজকাল হাঙ্গামাটা যেন একটু ঘন-ঘন হচ্ছে। কাজেই ওদিকে মন না দিয়ে নিজের চরকায় মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে চেঁচামেচি যেন বেড়েই চলল। পাড়ার অনুকূল, গজেন, সতু, জিতু, মিতু, সবার গলা শুনতে পাওয়া যেতে লাগল, আর সবার, ওপরে আশুদার ক্যানক্যানে গলা ছাপিয়ে উঠতে লাগল।

ব্যাপার কি! মুখ বাড়িয়ে দেখি, আশুদার বাড়ীর সামনে বেশ বড় রকমের একটি ভিড় জমা হয়েছে। কাজ-টাজ ফেলে ছুটলুম সেখানে। হাঙ্গামা মেটানোর চাইতে কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছাই যে প্রবলতর ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছিলুম তাই। আশুদার পেয়ারের কুকুর কেলোকে নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে।

কেলোর একটু ইতিহাস আছে। বছর দুয়েক আগে আশুদা তাকে বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন। তার বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে আশুদা বলতেন —আপিসের এক সায়েব দিয়েছে।

চাকরি থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গে আজীবন বিশ্বস্ততার পুরস্কার-রূপে বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতীকস্বরূপ এই সারমেয় শিশুটিকে কোলে নিয়ে আশুদা যেদিন বাড়ী ফিরলেন সেদিন সে বাড়ীর শিশুমহলে খুবই সোরগোল পড়েছিল।

ভাল জাতের বিলিতি কুকুর বলে দিন কয়েক তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি। কালো রঙ বলে তখুনি তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল কেলো। কিছুদিন কোলে-কোলেই কেলোর দিন কাটতে লাগল, বাড়ীর বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হত না। তার পরে জিনিষ পুরনো হতে থাকলে যা হয় অর্থাৎ কেলো সম্বন্ধে সবাই উদাসীন হয়ে পড়ল। কেলোও সবার অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

বড় ঘরের ছেলে, তার ওপরে আদরে মানুষ, দেখতে-দেখতে কেলোর দেহ হয়ে পড়ল বিরাট, সঙ্গে-সঙ্গে মেজাজটিও সেই অনুপাতে হতে লাগল কড়া। কেলো দিনরাত ঘেউ-ঘেউ করে, পাড়ার ছেলেরা পেয়ে গেল মজা, তারা কেলোকে দেখতে পেলেই দূর থেকে ইঁট মারা সুরু করলে। কেলো তার অদ্ভুত স্ব-প্রতিভায় আততায়ীকে চিনে রেখে দেয় এবং সুবিধা পেলেই আঘাতের তারতম্য অনুসারে তাকে দংশন করে। ফলে পাড়ার প্রায় সব ছেলেকেই কেলো দংশন

করেছে। তাদের অঙ্গে যেমন কেলোর দংশন-ক্ষতচিহ্ন বর্তমান, তেমনি কেলোও শতাধিক লোষ্ট্রনিক্ষেপচিহ্ন সর্বদাই অঙ্গে ধারণ ক'রে থাকে। তার অঙ্গের ঘা আর শুকোয় না। অবশ্য তাতে তার তেজোবৃদ্ধিই হয়ে চলেছে দিনে-দিনে।

শুধু পাড়ার নয়, বে-পাড়া ছেলে-মেয়েরাও কেলোকে চেনে। তারা স্কুলে যাবার-আসবার পথে সাবধান হয়ে চলে। আশুদার বাড়ীর কাছাকাছি এলেই তাদের গতি মন্থর হয়। মেয়েরা বলে—ও ভাই, কেলো আছে কিনা দেখ!

কেলোকে সকলেই চেনে। কেলোর অত্যাচারে পাড়ায় ফেরিওয়ালা, বাঁদর-নাচানেওয়ালা, ভালুক নাচানেওয়ালা, এমন কি বিয়ের শোভাযাত্রার পর্যন্ত যাবার জো নেই। কেলো দিনের বেলায় বাড়ীতে থাকে না। বাড়ীর সামনেই রাস্তার ঠিক মাঝখানে সটান পড়ে থাকে। ঠেলাগাড়ীর চীৎকার, মোটরের ভোঁক--ভোঁক কিছুতেই তার গ্রাহ্য নেই, শেষকালে তারাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একবার এক রিক্সওয়ালা কেলোর একটা পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিল, তাতে কেলো পাড়া ফাটিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ধরে এমন আর্তনাদ করেছিল যে, তার অতি বড় দুষমনের মনও তার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছিল।

দিন দুই সে পেছনকার একটা পা লেংড়ে চলল বটে, কিন্তু তার পরেই তার বিক্রম হ'য়ে উঠল তিন গুণ। কারণ পা-টা একটু সারা-মাত্র সে পাড়ার মধ্যে রিক্সওয়ালা দেখলেই তাকে কামড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শুধু পাড়ার মধ্যেই নয়, এমন কি বড় রাস্তায় রিক্সার ঠুং-ঠাং আওয়াজ শুনতে পেলেও সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকত।

পৃথিবী-শুদ্ধ লোক কেলোর বিরুদ্ধ হলেও একা আশুদা ছিলেন তার স্বপক্ষে। সন্ধ্যেবেলা আশুদা যখন নিজের হাতে বাড়ীর রকটি ধুয়ে মুছে তাতে মাদুর পেতে বসতেন, কেলো সে সময়টা আর কোথাও থাকতে পারত না। সে-ও এসে আশুদার গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ত। আর আশুদা তার ঘেয়ো গায়ে হাত বুলোতেন ও আস্তে-আস্তে ছেলে ঘুম-পাড়ানো ছড়া গাইতেন আর কেলো চোখ বুজে শুয়ে এই আদর উপভোগ করত!

কেলোর সঙ্গে অন্যের যে রকম সম্পর্কই থাক না কেন, আমাকে সে কখনো কিছু বলত না, বরং আমার একটু অনুগতই ছিল সে। এক সময় আমার নিজের অনেকগুলি কুকুর ছিল এবং কুক্কুরের এই জীবটির প্রতি আমার মমতাও ছিল অনন্যসাধারণ। একদিন কি একটা কাজে সন্ধ্যেবেলা আশুদার বাড়ী গিয়েছিলুম। কেলো যে সদর দরজার কাছে শুয়েছিল অতটা লক্ষ্য করিনি। আশুদা বলে ডাকতেই কেলো গর্জে উঠল—গর্‌গর্‌—

কামড়ায় আর কি!

আমি ভড়কে না গিয়ে বললুম—এই যে কেলো বাবু, আশুদা বাড়ী আছেন?

বলা মাত্র কেলো চেনা লোকের মত ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে কাছে এসে একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। সেই থেকে কেলো আমাকে দেখলেই কাছে

এসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে। আমিও মাঝে-মাঝে তাকে এক আধ পয়সার জিলিপি ঘুষ দিয়ে তার মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করি।

ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে, সময় বিশেষে অনেক কুকুরকেই আজকাল 'বাবু' বলতে হয় এবং বদমাইসকে ঘুষ না দিলে সংসার-যাত্রা সুগম হয় না। যাক, এখন কেলোর কাহিনীই হোক।

হঠাৎ দেখা গেল কেলো বাড়ীতে আহার করা ত্যাগ ক'রে রাস্তায় আস্তাকুড় ঘেঁটে খেতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই নয়, পাড়ায় এমন কি বে-পাড়ায় পর্যন্ত উৎসব বাড়ীর দরজায় ঋর্ণা দিয়ে পড়ে আছে—মাঝে মাঝে দু-তিন দিন পর্যন্ত সে জায়গা ছাড়বার নাম করে না। নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট মৎস্য, মাংস ও দরবেশ মেরে-মেরে দেহের পরিধি তার যে রকম বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে বে-পাড়ার লেড়ী-কুত্তাদের সঙ্গে যুদ্ধে দন্তাঘাত ও ছেলেদের লোষ্ট্রাঘাতের চিহ্নেও সর্বাঙ্গ ভরে উঠল। কেলোকে এইভাবে আস্তাকুড় ঘাঁটতে দেখে একদিন আশুদাকে বললুম—অমন ভালো কুকুরটা অযত্নে খারাপ হ'য়ে গেল।

আশুদা হাসতে-হাসতে বললেন—আরে ভাই অযত্নে নয়, ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোক মেরে যাওয়াই তো order of the day!

বললুম—তা ব'লে রাস্তায় আস্তাকুঁড় ঘেঁটে খেয়ে বেড়াবে বাড়ী থাকতে!

আশুদা বললেন—কি করবে বল, ওতো আর মানুষ নয়! রেশানে যে চাল দেয় তার ভাত কুকুরের অখাদ্য। যেমন তার রূপ, তেমনি তার গন্ধ, রসের কথা ছেড়েই দাও। আমরা পয়সা খরচ করে আস্তাকুঁড় খাই, ও বিনি পয়সায় তার চেয়ে ভাল আস্তাকুঁড় পেয়েছে বলেই বাড়ীতে খায় না। তাতে মনিবেরও দু-পয়সা বাঁচে।

সেদিন সকালে আশুদার বাড়ীর সামনে চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলুম—হৈ হৈ ব্যাপার বেধেছে। অশোকস্তম্ভ গুহরায়, স্বাধীনতা সেনচৌধুরী, আজাদহিন্দ বক্সী, দামোদরভ্যালি সরখেল, জহরলাল মিত্রমজুমদার প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিরা খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছেন। দেখলুম ভারতী সেনগুপ্তা, অমৃতপাক চক্রবর্তী প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিনীরাও সেখানে উপস্থিত আছেন।

আমি যেতেই আশুদা চীৎকার করে উঠলেন—এই যে নিরংকুশ! দেখত ভাই সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এরা কি হাঙ্গামা লাগিয়েছে!

জিজ্ঞাসা করলুম—কি, হ'ল কি?

দু-পক্ষই হৈ হৈ ক'রে উঠল। পাড়ার অধিকাংশ লোকই কেলোর অর্থাৎ আশুদার বিরুদ্ধে। তাদের নালিশ হচ্চে, কেলোর অত্যাচারে পাড়ায় বাস করা মুস্কিল হয়ে পড়েছে এবং আশুদার আস্কারা না পেলে সে কখনই এতটা বাড় বাড়তে পারত না। কিন্তু এতদিন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, আর তারা সহ্য করবে না। এবার যা হয় একটা এসপার কি ওসপার হয়ে যাবে।

আশুদাও কম যান না। তিনি একাই একশ'। হাত পা ছুঁড়ে গলাবাজি ক'রে তিনি জাহির করতে লাগলেন, কেলো অত্যন্ত শান্ত নিরীহ জীব, সকলে উত্যক্ত করায় স্রেফ আত্মরক্ষার্থে তাকে মাঝে-মাঝে একটু অসভ্য ব্যবহার করতে হয়। তার মত অবস্থায় পড়লে পাড়ার যে কোন লোক তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করত এবং বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে হামেশা ক'রে থাকে।

দু-পক্ষের কথা শুনে সেদিনকার ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা হল তা এই—বিঠলভাই গুপ্তভায়া, পাড়ার সবাই তাঁকে বিটকেল ভাই বলে ডাকে। তাঁর দুই খলিফা ছেলে প্যান্তা আর খ্যাঁচাকে চেনে না এ মহল্লায় ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই। কেলোকে তারা বড় ভালবাসে। যেতে-আসতে ঢেলাটা খোঁচাটা দিয়ে প্রায়ই তাকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে। মাসকয়েক আগে কেলোর দংশনে খ্যাঁচাকে প্রায় দিন পনেরোর জন্য শয্যা নিতে হয়েছিল। এর পর কিছুদিন তারা কেলো সম্বন্ধে উদাসীনই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন থেকে আবার এদের ইঁটের জ্বালায় কেলোকে দিবা-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ করতে হয়েছে বেচারির সর্বাঙ্গে ঘা হয়েছে দগ্‌দগে।

আজ সকালবেলা প্যান্তা বাজার ক'রে বাড়ি ফিরছিল। দু-হাত জোড়া। একহাতে রেশনের ঝুলি অন্য হাতে বাজারের—মনের সাধে "লারে-লাপ্পা" গাইতে-গাইতে বাড়ির দিকে চলেছে এমন সময় কেলো কোথা থেকে নিঃশব্দে এসে তার পায়ের ডিমের খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে।

আশুদা অবিশ্যি বলছেন—ও কিছু না, একটু বড়ির মত মাংস কেটে নিয়েছে, তাতে আর হয়েছে কি!

বিঠলভাই চীৎকার করতে লাগলেন—নিরংকুশ, তুমি ভাই একটু বিচার কর। নিত্যি এই কুকুরের অত্যাচার সহ্য ক'রে তো আর বাঁচা যায় না।

হঠাৎ কেলো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে 'ঘেউ' শব্দে এক বিরাট হুংকার ছাড়ল। অর্থাৎ—খবরদার কুকুর-কুকুর কোরোনা বলছি। 'সারমেয়' বলতে পারনা?

এই রকম দু-পক্ষেই চেঁচামেচি—চলছে, এমন সময় শ্রীমতী ভারতী দেবী এক প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন—দেখুন, এ-রকম চেঁচামেচি করলে কিছু হবে না। এখন বেলা প্রায় দশটা বাজে, সকলেরই কাজকর্ম আছে। তার চেয়ে সন্ধ্যেবেলা নিরংকুশবাবুর বৈঠকখানায় সব আসুন, দু-পক্ষেরই সওয়াল-জবাব শুনে নিরংকুশ বাবু বিচার ক'রে যা বলবেন তাই হবে।

বিঠলভাই-এর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এতে রাজী আছেন?

বিঠলভাই বললেন—তা আছি। নিরংকুশ ভাই, ন্যায় বিচার করতে হবে।

ঠিক হ'ল সেদিন সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় পঞ্চায়েত বসবে। পাড়ার সব

মুরুব্বিরাই আসবেন। আশুদাও ঠিক সময়ে কেলোকে নিয়ে সেখানে হাজিরা দেবেন! দশজনে পরামর্শ ক'রে দেখা যাক কি করতে পারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে থাকতেই আমার বৈঠকখানায় পাড়ার মুরুব্বিরা এসে জমতে লাগলেন। এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনেও চোরাবাজার থেকে কিছু চিনি কিনে এনে রেখেছিলুম। অতগুলো লোক আসবে আমার বাড়ীতে, এক কাপ ক'রে চা অন্তত না দিলে কি চলে! যথাসময়ে আশুদাও এলেন, সঙ্গে কেলো। আশুদা আসরে এসে বসতেই কেলোও তাঁর পাশে এসে বসে পড়ল। লোকজন আসবে বলে সেদিন গদির ময়লা চাদর তুলে পরিষ্কার চাদর পেতেছিলুম, কেলোর পদচিহ্নে বেশ খানিকটা জায়গা ময়লা হয়ে গেল। কেলোর আসাটা অনেকে পছন্দ না করে আপত্তি করলেন। কিন্তু আশুদা বললেন—এ বিষয়ে আমি বিচারকের অনুমতি চাইছি। বিচারালয়ে আসামীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয়।

আর কেউ কিছু বললেন না। আমি আশুদাকে বললুম—তাহলে কেলোকে আপনি ধরে থাকবেন। এখানে যদি সে কাউকে কামড়ায় তা'হলে তাকে আদালত-অবমাননার অপরাধে অপরাধী করা হবে।

সকলেই উপস্থিত! পাড়ার কয়েকজন মহিলাও এসেছেন। কয়েকটি কৌতূহলী ছেলেও জানালায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে। পরিস্থিতি প্রায় আদালতের মতনই হয়ে উঠেছে এমন সময় মহিলাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলেন—এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করলেই তো হয়, আর দেরি কিসের? কদিন থেকে আমার রাঁধবার লোকটাও আবার আসছে না—

প্রথমে বিঠলভাই আরম্ভ করলেন—এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন এবং আশুবাবুর কুকুর দ্বারা দংশিত হয়েছেন এমন অনেকে যাঁরা উপস্থিত নাই, তাঁরা সকলে আমাকে তাঁদের মুখপাত্র ক'রে এই সভায় পাঠিয়েছেন। অবিশ্যি মহিলাদের তরফ থেকে আমার কাছে এ সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ আসেনি। তবুও—

শ্রীমতী চক্রবর্তী বললেন—যদি কিছু বলবার থাকে তো আমরা নিজেরাই বলব।

বিঠলভাই বললেন—বেশ। আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে, আশুবাবুর কুকুরের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হয়েছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কোনো ব্যবস্থা তো করেনই না, বরং তাঁর হালচাল দেখে মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর প্রশ্রয় পেয়েই যেন তাঁর কুকুর দিনে-দিনে অত্যাচার বাড়িয়েই চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এ বিষয়ে আশুবাবুর কিছু বলবার আছে?

আশুদা বললেন—আমার কুকুর আপনাদের প্রতি কি রকম অত্যাচার ক'রে থাকে এবং আমি কি রকমে তাকে প্রশ্রয় দিই তা প্রকাশ না করলে আমি কিছুই বলতে পারি না।

স্বদেশজীবনবাবু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—দেখুন, ন্যাকা সাজবেন না। কি রকম অত্যাচার করে আপনি জানেন না যেন। মশাই পাড়াশুদ্ধ ছেলেবুড়ো

সবাইকে কামড়ে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়লে, আর উনি জিজ্ঞেস করছেন—কি রকম অত্যাচার করেছে !

স্বদেশজীবনকে সাবধান ক'রে দিতে হল—দেখুন ও-রকম ভাষা ব্যবহার করলে প্রতিপক্ষও আপনার প্রতি অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। অতএব সকলের প্রতিই আমার অনুরোধ যে, ভাষা সম্বন্ধে একটু সংযত হবেন।

আশুবাবু বললেন—আমার কুকুর কখনো যাকে-তাকে কামড়ায় না। যে তাকে বিনা কারণে মারে তাকেই সে কামড়ায়। আঘাত না পেলে কখনো সে অন্যকে দংশন করে না। পাড়ার ছেলেবুড়ো যাকে-যাকে সে কিমা করেছে, তাদের প্রত্যেকেই পূর্বে কখনো-না-কখনো তাকে আঘাত করেছে।

অধমতারণ ঘোষ-দস্তিদার বললেন—আপনি ইচ্ছে করলেই তাকে সামলাতে পারেন।

আশুদা জোর ক'রে বললেন—না সামলাতে পারি না। আজকালকার দিনে লোকে নিজের ছেলেকেই সামলাতে পারে না তো কুকুর ! এই, আপনার ছেলে শ্রীমান পতিতপাবন—আপনার খায়, আপনার পরে, থাকে আপনার আশ্রয়ে, কিন্তু সে কি আপনার বাধ্য ? সেদিন যে সে বৌবাজারে বোমা মেরে ধরা পড়ল—আমি কি বলব সে কার্য সে আপনার প্রশ্রয় পেয়ে করেছে ?

স্বদেশজীবনবাবু বললেন—দেখুন নিরঙ্কুশবাবু, আমি একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। আশুবাবু যদি তা পারেন তাহ'লে দু-পক্ষই রক্ষা পায়। আমি বলি কি, কেলোর মুখে একটা muzzle অর্থাৎ মুখবন্ধ পরিয়ে দিলে ও আর কাউকে কামড়াতে পারবে না। muzzle টার দাম না হয় পাড়ার সবাই চাঁদা ক'রে তুলে দেওয়া যাবে। টাকা চার পাঁচের মধ্যেই একটা লোহার তারের muzzle পাওয়া যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলুম—আশুবাবু কি বলেন ?

আশুদা ঘোরতর আপত্তি ক'রে বললেন—না তা হতে পারে না। প্রথমত—কালুর (আশুদা আবার আদর ক'রে কেলোকে কালু বলেন) প্রতি অত্যাচার না করলে ও কখনো কামড়ায় না। দ্বিতীয়ত—মুখে muzzle লাগিয়ে রাখা মানে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—এ কুকুর যাকে-তাকে বিনা কারণে কামড়ায়। কালু মোটেই সে রকম নয়। যদিই বা তর্কের খাতিরে তাকে সেই জাতের কুকুর বলেই ধরা যায়, তবুও muzzle লাগানোটা ভদ্র উপায় নয়। কালু কুকুর বলেই স্বদেশজীবনবাবু তাকে muzzle লাগাতে বলতে পারলেন। তাঁর ভাই যে গেল বছর বাসে পকেট মেরে ধরা পড়ে দু-মাস জেল খেটে এল—পাড়ার লোকেরা তো বলতে পারে রাস্তায় বেরুবার সময় এবার থেকে যেন তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার সেই অবস্থা দেখলেই সকলে পকেট সামলাবে কিংবা তাকে পকেটমার বলে চিনতে পারবে। Muzzle লাগাতে আপত্তির তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে, কালু রাস্তায় খেয়ে উদরপূর্তি ক'রে থাকে। সেই পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে কালুর ও আমার দু-জনেরই অসুবিধা। রেশনের চাল ওর মুখে রোচেনা, রুচলেও সরকার কুকুরের

জন্য রেশন দেয় না, দিলেও উনি দুটি লোকের আহার একাই ক'রে থাকেন।

শ্রীমতী অমৃতপাক বললেন—আশুবাবুর কথা সকলকেই মানতে হবে আমাদের একটা নতুন চাকর এসেছে, সে তিনজনের ভাত একা খায়, তাতেও তার পেট ভরে না। তার জন্য আজ একমাস বাড়ীশুদ্ধ সকলে আধপেটা খেয়ে আছি। এর একটা কিছু ব্যবস্থা হয় না! গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার—

শ্রীমতী অমৃতপাককে স্মরণ করিয়ে দিতে হোলো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে—কেলোর অত্যাচার! আপনারা ইচ্ছা করেন তো গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিষয়ও এখানে আলোচিত হতে পারে। কিন্তু এখন নয়।

আজাদহিন্দ্ বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ঠিক কথা। আচ্ছা কেলোর আরেকটি অত্যাচারের কথা আমি এই সভায় উপস্থিত করছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কি বলেন শুনতে চাই। কেলো রোজ সকালবেলা আমার বাড়ীর দরজার সামনেই ময়লা ত্যাগ ক'রে প্রাতর্ভ্রমণে যায়। এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করি আশুবাবুকে।

আশুবাবু বললেন—এর বিহিত করতে অনুরোধ করুন শহর পরিষ্কার করবার ভার যাঁদের ওপর আছে তাঁদের। কেলোকে শেখানো হয়েছে ঐ কর্মগুলি রাস্তাতেই সারবার জন্য।

স্বদেশজীবনবাবু শ্লেষ ক'রে বললেন—কি শিক্ষাই দিয়েছেন!

আশুদা হাসতে-হাসতে বললেন—দেখুন স্বদেশজীবনবাবু, কেলোকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—খবরদার বাড়ীতে সে ওসব কর্ম করবে না। সেই শিক্ষার জন্য কেলো ভুলেও কখনো বাড়ীতে ও কাজ করে না। আর আপনাকে জন্মাবধি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বাড়ীতেই ওসব কাজগুলো সারতে কিন্তু তথাপি আপনি প্রতিদিন বাড়ীতে ঢোকবার সময় আমার বাড়ীর গায়ে সেটী সেরে তবে বাড়ী ঢোকেন। এ বিষয়ে কালু আপনার চাইতে অনেক উন্নত। তার পরে শহর-রক্ষক কোম্পানি এই জন্য বৎসরান্তে তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা খাজনা আদায় ক'রে থাকে। আপনি কত খাজনা দেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আশুদার কথা শুনে ঘরে একটা উচ্চ হাসির রোল উঠল।

অনেকক্ষণ থেকেই দূরেই একটা ঠুনঠুন আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হতেই কেলো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে হুমকি ছাড়লে—গর্‌র্‌র্।

হঠাৎ কেলোর এই ভাবান্তর দেখে সভাস্থ প্রায় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। একজন মহিলা বলেই ফেললেন—আশুবাবু ওকে সামলান। আমাদের কামড়াবে নাতো?

আশুবাবু কেলোর ঘেয়ো গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন—কালু, চুপ ক'রে বসো।

ওদিকে ঠুনঠুন্ আওয়াজ ক্রমে স্পষ্টতর হতে হতে ঘুঙুরের আওয়াজে পরিণত হ'ল। কেলো আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেলোর বিরোধী পক্ষ

তার এই ভাব দেখে পাশ কাটাবার বন্দোবস্ত করছে এমন সময় রাস্তায় সুরের প্রস্রবণ ছুটল—হরিদাসের গুল্‌গুল্‌ ভাজা,

খেতে বাবু বড়ই মজা—।
টাট্‌কা ভাজা গরম তাজা"—

বাস, আর কথা নয়। কেলো একটা হুংকার ছেড়ে এক লাফে সভাস্থল পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সভা হ'ল নিস্তব্ধ!

মিনিট দুয়েক যেতে না যেতেই বাইরে বিকট আর্তনাদ উঠল—ওরে বাবা, গেছি রে! মেরে ফেলরে রে! ওরে হরিদাসের গুল্‌গুল্‌ ভাজা রে!

সবাই মিলে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম দূরে তিনকড়িদের বাড়ীর সামনে ভিড় জমেছে। তিনকড়ির গলা শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি ভয়ানক কান্ড—কেলো এক ঘুগ্‌নিদানা-ওয়ালাকে কামড়ে পালিয়েছে। লোকটার মাথায় স্ট্র-হ্যাট, চোখে কাল চশমা, একটা লাল কম্ফর্টর স্কার্ফ ক'রে পরা হয়েছে। হাত-কাটা খাকি সার্ট, ধুতি পরা, দু-পায়ে মোটা ক'রে ঘুঙুর বাঁধা। কেলো তাকে কামড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিয়েছে।

তিনকড়ি সন্ধ্যেবেলা তার বৈঠকখানার চারিদিক বন্ধ ক'রে নিরিবিলি বসে খাঁটি খাচ্ছিল এমন সময় তার শান্তিভঙ্গ ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালার বিরাট আর্তনাদ!!!

সেখানে পেঁাছে দেখি ঘুগ্‌নি-ওয়ালা তিনকড়ি সমানে চেঁচাচ্ছে। তিনকড়ি ঘুগ্‌নি-ওয়ালাকে ধরে বলছে—ঘুগ্‌নি বিক্রি করিস্‌ তো এমন অদ্ভূত সেজেছিস কেন?

ঘুগ্‌নি-ওয়ালা বললে—তা'বলে কুকুরে কামড়াবে?

—আলবৎ কামড়াবে! তোর এই সাজ দেখে আমারই তোকে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ঘুগ্‌নি-ওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনকড়ি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে বললে—যাও বলছি, নইলে—

এই বলে সে বিরাট মুখব্যাদন ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালাকে তাড়া করতেই—ওরে বাপ্‌রে—বলে তল্পি তুলে সে মারলে টেনে দৌড়।

সেদিনকার বিচার সভা এইখানেই শেষ হ'ল।

এবারে বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে হিমালয় থেকে ঢল নামেনি, নেমেছিল সন্ন্যাসীর দল। সন্ন্যাসীরা এত কাল সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু কালধর্মে তাদের এই ঔদাসীন্য যে ক্রমেই ছুটে যাচ্ছে, তার কিছু-কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে আরম্ভ করেছে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায় সন্ন্যাসীদের Destitute-পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। Destitute কথার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিরাশ্রয়, নিঃস্ব, দীন ইত্যাদি। আসমুদ্রহিমাচল এই বিশাল ভারতভূমি যাঁদের আশ্রয়। এখানকার কানন, কান্তার, প্রাত বৃক্ষতল, এখানকার মন্দির, দেউল, তীর্থস্থান ও নদীতীর যাঁদের আশ্রয় দেবার জন্য সর্বদাই কোল পেতে আছে তাঁদের নিরাশ্রয় বলে দেগে দেবার মধ্যে শুধু যে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায় তা নয়, তার মধ্যে সাহসিকতাও আছে অপরিমিত। কিন্তু সন্ন্যাসীরা কর্তৃপক্ষের এই ধৃষ্টতা সহ্য করেননি। তারা কর্তৃপক্ষের এই স্পর্ধার প্রতিবাদ করায় কর্তৃপক্ষ অবহিত হয়েছেন বটে, তবে সন্ন্যাসীদের এখন কোন্ পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে তা জানি না।

রাজনীতি, ডিমোক্র্যাসির দিকে সন্ন্যাসীদের সচেতন ক'রে তোলবার জন্য ভারত সরকার তাঁদের ভোটের অধিকার দান করেছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই পার্লামেণ্টে নাগা সন্ন্যাসী সদস্যকে বক্তৃতা দিতে দেখতে পাওয়া যাবে। অবিশ্যি, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সন্ন্যাসী না হ'য়েও অনেকের পক্ষে নাগা হয়ে পার্লামেণ্টে হাজির হওয়া বিচিত্র নয়। শ্রীশ্রী ৭১২ চরমানন্দ অথবা শ্রীশ্রী ১২৪ ধ্বান্তনাশ বাবাজির ভারতের প্রধান মন্ত্রীর তক্তে বসাও আশ্চর্য নয়। হয়তো গৃহী ও সন্ন্যাসী দুটো রাজনীতিক দলই তৈরী হয়ে যাবে। গৃহীরা চাইবে নানা দিকে খাল কেটে কুমীর আনতে আর সন্ন্যাসীরা চাইবে বনমহোৎসব ক'রে ভারতবর্ষকে জঙ্গলে পরিণত করতে। সে যাই হোক, যা হবে যখন হবে তা নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসল কথাটা এখন প্রকাশ করা যাক—

সন্ন্যাসীরা দিল্লীতে এসে কয়েকদিন ধরে খুব হৈ-চৈ ক'রে গেলেন। তাঁরা যমুনায় স্নান করলেন, সভা করলেন, দিল্লীর ঐ দারুণ গরমে শোভাযাত্রা বার ক'রে শহর পরিক্রমণ করলেন। তাঁদের প্রতিদিনকার কার্যকলাপের খবর সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে—একটি খবর ছাড়া। দিল্লীতে থাকা-কালীন তাঁরা সকল সম্প্রদায় মিলে এক অন্ধকার রাত্রে যমুনার ধারে বিরাট এক গুপ্ত সভা আহ্বান করেছিলেন। এত লোক নিয়ে, যমুনার ধারের মত অমন খোলা জায়গায় গুপ্ত সভার অনুষ্ঠান একমাত্র সন্ন্যাসীদের দ্বারাই সম্ভব। কারণ, দেখেছি গৃহী-

লোকেরা মৃত্তিকা-গর্ভে গৃহ নির্মাণ ক'রে গুপ্ত সভা করলেও পুলিশে টের পায়। কথা গোপন রাখবার আর্ট শিখতে হয় এবং অনেক সাধনার পর সে শিক্ষা আয়ত্ত হয়। তাই সন্ন্যাসীরা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান ক'রেও যা গোপন রাখতে পারেন, গৃহীরা গোপনে অনুষ্ঠান ক'রেও তা পারে না।

অনেকের মনে হতে পারে যে, এমন একটা গোপন কথা আমি জানতে পারলুম কি ক'রে? জানবার কারণটা তাহলে প্রকাশ ক'রেই বলি। আমি সন্ন্যাসীদের তরফ থেকে তাদের এই গুপ্ত সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম! নিমন্ত্রিত হবার পূর্বেই তাঁরা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, সেখানে যা দেখব অথবা যা শুনব তা কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারব না। সন্ন্যাসীরা হয়তো চেয়েছিলেন যে, তাঁদের এই সভার কথা বহুল প্রচার হয়। কারণ কোনো কথা গোপন রাখতে বললেই যে গৃহী-লোক সে কথা খুব বেশি করেই প্রচার ক'রে বেড়াবে সে তথ্য তাঁদের অজানা নেই।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যমুনার ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমি মনে করেছিলুম কয়েকজন উদাসী সাধু-সন্ন্যাসী মিলে কিছু একটা পরামর্শ করবার জন্য তাঁরা গোপনে এই সভা আহ্বান করেছেন। আমাকে ডাকা হয়েছে, হয়তো তাঁরা আমার কাছ থেকে বিশেষ কোনো পরামর্শ চান। সংসারে এত সবজান্তা থাকতে তাদের বাদ দিয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করায় মনের মধ্যে বেশ একটা গর্ববোধও করেছিলুম।

গিয়ে দেখি সে এক বিরাট ব্যাপার! কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি দ্বিপ্রহর, যমুনার ধারে বালির ওপরে সন্ন্যাসীরা বসে আছেন, মাঝে-মাঝে আলোর জন্যে বড়-বড় ধুনি ও মশাল জ্বালান হয়েছে। অগণিত জটাধারী ও মুণ্ডিত মস্তক সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে, যত দূর দৃষ্টি চলে। প্রকাণ্ড একটা বেদী করা হয়েছে, তার সামনে বড় একটা ধুনি জ্বলছে, তার আলোতে বেদীর সবটা আলোকিত না হলেও অন্য জায়গার চেয়ে সে জায়গাটার বেশি আলো বলে মনে হচ্ছে। আমি যেতেই কয়েকজন উঠে আদরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে আমায় সেই বেদীর এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। দেখলুম সেখানে আরো অনেক বসে আছেন, বোধ হয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে হোমরা-চোমরা কেউ হবেন তাঁরা।

কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, খুব জাঁদরেল জটাওয়ালা এবং সেই অনুপাতে লম্বা দাড়ি একজন খুব মোটা সন্ন্যাসী হয়েছেন সভাপতি এবং তাঁর পাশেই বসে আছেন—অঙ্গে বিভূতি ছাড়া বস্ত্রের কোনো বালাই নেই—একজন নাগা সন্ন্যাসী। তিনি হচ্ছেন প্রধান অতিথি। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ও বিজলী-বাতি ব্যবহার না করলেও দেখলুম, সভা করবার আধুনিক কায়দা-কানুন সবই তাঁদের জানা আছে। সভার এক কোণে জন-কত সন্ন্যাসী মিলে চিমটে বাজিয়ে ভজন গান করলেন। গান শেষ হয়ে গেলে সভাপতি উঠে জলদগম্ভীর স্বরে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন—

ভো ভো সাধু-সজ্জন! অদ্য আমরা অর্থাৎ হিমালয়বাসী ও অন্যান্য স্থানবাসী সন্ন্যাসীরা বিশেষ এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। আপনারা

সকলেই জানেন যে, আমরা বিপদকে গ্রাহ্য করি না। ধরণীর সমতল ক্ষেত্র থেকে অনেক উর্ধ্বে, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখানে আমরা বাস করি। পৃথিবীর লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই, পাছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্পর্শে আসতে হয় সে জন্য লোকালয়ের ত্রিসীমানায় আমরা পারতপক্ষে আসি না। অবশ্য বিশেষ কোনো-কোনো উৎসবের জন্য মধ্যে-মধ্যে এখানে আমাদের আসতে হয় বটে, কিন্তু আমাদের দ্বারা তাদের কোনো রকম ক্ষতি না হয় সেদিকে আমরা খর দৃষ্টি রাখি। আমরা পৃথিবীর লোকের ভালো বই কখনো মন্দ করি না। এ জন্য তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু তা না ক'রে তারা আমাদের ওপরেই জুলুম করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

বক্তৃতা শুনতে-শুনতে কেউ-কেউ উষ্ণ হয়ে ঠন্‌ঠন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে চিমটে বাজাতে সুরু ক'রে দিলেন।

সভাপতি ক্ষণকাল তুষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে আবার বলতে আরম্ভ করলেন —দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ উত্তেজিত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু শুধু-শুধু উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ নেই। আগে আমার কথাগুলো আনুপূর্বিক ভাল ক'রে শুনুন, তার পরে সকলে পরামর্শ ক'রে যা করবার তা করা যাবে।

সভাপতি বলে চললেন—দেখুন, আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকি, কাজেই লজ্জা নিবারণের তেমন প্রয়োজন সকল সময়ে বোধ করি না। কিন্তু শীতাতপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কখনো-কখনো আমরা বল্কল ব্যবহার ক'রে থাকি। দয়াময়ী প্রকৃতি আবহমান কাল থেকে এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি আমাদের সরবরাহ ক'রে আসছেন। কখনো-কখনো কোনো ভক্ত অথবা শিষ্য আমাদের অঙ্গের আচ্ছাদন দিয়ে থাকেন বটে কিন্তু প্রধানত এ বিষয়ে আমরা চিরকাল প্রকৃতির ওপরেই নির্ভর ক'রে এসেছি। আমাদের এই আবশ্যকীয় জিনিষটিতে গৃহী-লোকের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর গৃহী-লোক এই জিনিষ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। কেন করেছে, কি তাদের উদ্দেশ্য তা আমরা জানতে চাই না, জানবার কোনো আগ্রহই আমাদের নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে তুচ্ছ উদরান্ন ও নশ্বর দেহাচ্ছাদন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গেলে আমাদের সাধন-ভজনে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের আরো কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি না এবং থাকলেও কি উপায়ে তার প্রতিকার হতে পারে তা স্থির করাই এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সভাপতি মশায় চুপ করতেই সম্মানিত অতিথি মহারাজ ব্যাঘ্র-চর্মাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সাধু—সাধু শব্দে যমুনার তীর প্রকম্পিত হ'তে লাগল। নাগা মাহারাজ একবার হাত তুলতেই আওয়াজ থেমে গেল।

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সভাপতি মহারাজের মতন জলদগম্ভীর নয় বটে কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ম। তাঁর প্রত্যেকটি কথা "কানের ভিতর দিয়া" মরমে পশে না কিন্তু তা যেন বক্ষচর্ম ভেদ করে একেবারে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে

আঘাত করে। তিনি বলতে লাগলেন—সভাপতি মহারাজ এবং সমবেত সাধুগণ! আপনাদের বল্কলের এই অবস্থা হয়েছে জেনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেম। গৃহী-লোকের এতাদৃশ ধৃষ্টতায় আমিও কম বিস্মিত হইনি কিন্তু কি প্রকারে তারা আপনাদের বল্কলে বঞ্চিত করেছে তা না জানলে কিছুই বলা সমীচীন বোধ করছি না। সব কথা ব্যক্ত করবার জন্যে আমি সভাপতি মহারাজকে অনুরোধ করছি।

সভাপতি মহারাজ আবার আরম্ভ করলেন—সমবেত সাধুগণ! আপনারা জানেন যে, গাছের ছাল দিয়ে আমরা পরিধেয় ও জলপাত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে থাকি। কিন্তু কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় সেই সব বিশেষ গাছের ছাল কারা যেন ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু এক জায়গায় নয়, সারা হিমালয়েই এই ব্যাপার চলেছে। এ ব্যাপারটা কোনো নৈসর্গিক কারণে ঘটেনি। আমরা সঠিক জানতে পেরেছি যে, কোনো কোনো গৃহী লোক মজুর লাগিয়ে এই কাজ করাচ্ছে—স্রেফ আমাদের জব্দ করবার জন্য।

মাননীয় অতিথি নাগা মহারাজ আবার উঠলেন। তিনি বললেন—সভাপতি মহারাজ যা বললেন তা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছি। গৃহী লোকেরা যে এত বাড় বেড়েছে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। তারা শেষকালে সন্ন্যাসীদের বস্ত্রহরণ করতে সাহস করলে! তাদের এই কার্যের সমুচিত শাস্তি আমরা দেব! কিন্তু তার আগে একটা কথা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। আমি প্রস্তাব করছি যে, আপনারা যখন সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন করেছেন তখন সংসারীদের মত লজ্জা-নিবারণের জন্য আচ্ছাদন রেখেছেন কেন? আপনারা বল্কল ত্যাগ ক'রে আমাদের মতন নাঙ্গা হয়ে পড়ুন। দেখুন. আপনারা যদি কিছু না মনে করেন তো একটা কথা বলি!

চারিদিক থেকে "বলুন" "বলুন" চীৎকার উঠল।

সভাপতি মহারাজ উঠে বললেন—আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি, আপনি যা বলবেন তা আমাদের শিরোধার্য। প্রকাশ ক'রে বলুন কি বলতে চান।

নাগা মহারাজ বললেন—দেখুন আমি বলতে চাই যে, আমাদের সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্যগণের দূরদৃষ্টি ছিল খুবই প্রখর। আজ বল্কল-ঘটিত যে দুরবস্থার সূচনা দেখা যাচ্ছে তা তাঁরা আগেই জানতে পেরেছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন বলেই ও-বালাইএর মূলেই কুঠারাঘাত ক'রে গিয়েছিলেন। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা বল্কল ত্যাগ ক'রে নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ুন!

সভাপতি মহারাজ বললেন—আমাদের মাননীয় অতিথি মহারাজ যা বললেন তা প্রণিধানযোগ্য। ভবিষ্যতে যাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন তাঁদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন সারা জীবনের বস্ত্রের ব্যবস্থা ক'রে তবে সন্ন্যাসী হন। তা যদি অসম্ভব হয়, তাহ'লে যেন তাঁরা নাগা সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কিন্তু সে তো গেল ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন

তাঁদের কথা। এখন আমাদের কথা হচ্ছে যে, আমরা নিজেদের সম্প্রদায় তুলে দিয়ে নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত হব কি না? আমার মনে হয়, আমরা যদি তাই হই তাহলে আমাদের পূর্বাচার্যগণের সম্মান রক্ষা তো হবেই না পরন্তু আমরা গৃহী লোকের কাছে এ ক্ষেত্রে প্রকারান্তরে পরাজয়ই স্বীকার করলুম—যা করতে আমরা রাজি নই। আমি প্রস্তাব করছি, যারা আমাদের বল্কল থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে তাদের ধ্বংসের জন্য আমরা এই যমুনার তীরে যজ্ঞ ক'রে তাদের অভিসম্পাত করব। তার ফলে অগ্নিকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, যুদ্ধ, বিগ্রহ প্রভৃতি অশেষ রকম অশুভ ব্যাপারে, জনসমাজ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। বিশেষ যারা এই কার্য করেছে তাদের বংশে বাতি দিতে কেউ আর থাকবে না—

সভাপতি মহারাজের বক্তৃতা তখনো শেষ হয়নি, এমন সময় সভার মধ্যস্থলে একটা গগনভেদী তীব্র চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। আমার মনে হ'ল বোধ হয় চার-পাঁচটা গাধা একসঙ্গে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে। সভাস্থ সকলে, বিশেষ ক'রে বেদীতে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। কি হয়েছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সেই আলো-আঁধারিতে ভালো ক'রে কিছু দেখবারও যো নেই।

কিছুক্ষণ এই রকম অবস্থায় কাটবার পর টের পাওয়া গেল যেন কারা কাঁদছে, কে কাঁদছে কি হয়েছে সে বিষয়ে তারা কিছুই বলে না, শুধু প্রাণপণে চীৎকার করে আর বলে—হুজুর মহারাজ মাপ করো, হুজুর কসুর মাপ করো!

কি ব্যাপার! শেষকালে অন্যান্য সাধুরা তাদের পাঁজা-কোলে ক'রে তুলে একেবারে বেদীর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে। যাতে তাদের মুখ ভালো ক'রে দেখা যায় সে জন্য সেখানে একটা মশাল পুঁতে দেওয়া হল। দেখা গেল দু-জন সন্ন্যাসী, মাথায় তাদের বৃহৎ জটা—এত বৃহৎ যে, মাথা থেকে দুটো-তিনটে জট একেবারে মাটিতে এসে পড়েছে। যেমন মাথার জটা তেমনি দাড়ি, মনে হয় যেন দাড়িতেও জটা বেঁধেছে। ভীষণ স্থূলকায় তারা। জঙ্গলে থেকে শুধু মাত্র ফল মূল কন্দ খেয়ে মানুষের দেহ এত মেদবহুল হতে পারে তা আগে জানা ছিল না। অবিশ্যি যোগে অনেক অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হয়। বিরাট ভুঁড়ি প্রায় একেবারে হাঁটু অবধি ঝুলে পড়েছে, সর্বাঙ্গে বিভূতি লিপ্ত। লোক দুটো তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল—মহারাজ দয়া করো। আমরা তোমার সন্তান, সন্তানকে ধ্বংস কোরো না।

সভাপতি মহারাজ বললে—কারা তোমরা? কি চাই তোমাদের? কেন কাঁদছ প্রকাশ ক'রে বলো।

সভাপতি মহারাজের কথা শুনে বোধ হয় তারা একটু আশ্বস্ত হল। সভা একেবারে নিস্তব্ধ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, কি হয় কি হয়! হঠাৎ দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন মাথার সেই বিরাট জটা টপ ক'রে খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখলে।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!!

সভায় যত যোগী-ঋষি, সাধু-সজ্জন, বৈরাগী-সন্ন্যাসী ছিল, সব একেবারে thunder-struck। তাঁরা ভাবতে লাগলেন যে এত রকম বিভূতির কথা শোনা গিয়েছে বটে কিন্তু এক নিমেষে জটার বাঁধন খসিয়ে ফেলবার মত বিভূতি তাঁদের দেখাও নেই শোনাও নেই। হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে সভাপতি মহারাজও কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি কথার সুরকে একটু নরম পর্দায় নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে আপনারা? এরূপ রোদনের কারণ কি ব্যক্ত করুন। হঠাৎ জটাই-বা ত্যাগ করলেন কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

যে লোকটা মাথার জটা খুলে রেখেছিল, সে এবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে—মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা অজ্ঞাতে আপনাদের পায়ে মহা অপরাধ ক'রে ফেলেছি। প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যা করতে বলবেন, আমরা তাতেই রাজি আছি।

সভাপতি মহারাজ, মাননীয় প্রধান অতিথি মহারাজ এবং সমবেত যোগী-সন্ন্যাসী-নাগা সকলে স্তম্ভিত। ইতিমধ্যে ক্রন্দনরত অপর ব্যক্তিও মাথা থেকে জটা ও মুখ থেকে দাড়ি খুলে নামিয়ে রাখল।

সভাপতি মহারাজের সম্বিৎ ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে তোমরা, কি অপরাধ করেছ ব্যক্ত কর। তার পরে এই সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা তোমাদের সম্বন্ধে যা বিহিত করবেন তাই হবে।

লোকটি বললে—মহারাজ আমরা গৃহস্থ লোক—

সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মাননীয় অতিথি মহারাজ জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন—শুধু গৃহস্থ নয়, তোমাদের দেহের পরিধি দেখে মনে হচ্ছে যে তোমরা ধনী লোক। সরকারী চাকরি কর বুঝি?

—আজ্ঞে না, আমরা চাকরি করি না, ব্যবসা করে থাকি।

—তবে? হীরে জহরতের ব্যবসা বুঝি?

—আজ্ঞে না, মহারাজের অনুমান ঠিক নয়। হীরে জহরত প্রভৃতি দামী জিনিসের ব্যবসা করার মত অর্থ আমাদের নেই। আমরা সামান্য চাল, ডাল, তেল, ঘি কাপড় প্রভৃতি লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কারবার ক'রে থাকি।

সভাপতি মহারাজ বললেন—কারবারী গৃহী লোক হয়ে গুপ্তভাবে আমাদের এ সভায় আসবার কারণ কি? নিশ্চয়ই তোমাদের কোনো অভিসন্ধি আছে!

লোকটি বললে—প্রভু, অভিসন্ধি আমাদের কিছুই নেই। দয়া ক'রে আনুপূর্বিক আমাদের নিবেদন শুনলেই আমাদের এখানে এ ভাবে আসবার কারণ বুঝতে পারবেন।

—বেশ বলো।

—আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, মহা অত্যাচারী ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি।

মাননীয় অতিথি মহারাজ হুঙ্কার ছাড়লেন—গৃহী লোকেদের অন্নাভাব

বস্ত্রাভাব, রোগে ঔষধাভাব, ও চতুর্দিকে এই রকম হাহাকার আমাদের নির্জন গুহাবাসের শৈলভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলেছে দেখেই ঠিক ভেবেছিলুম যে এখানে একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তা যে স্বাধীনতা লাভ—সে কথা সম্প্রতি জানতে পেয়েছি। কিন্তু সে স্বাধীনতার সঙ্গে তোমাদের মাথায় জটা পরে এখানে আসবার সম্বন্ধটা কি তাই বলো—চট্ ক'রে বলো।

—আছে প্রভু আছে। সেই কথাটাই বলতে এসেছি আমরা। আপনারা হয়তো জানেন না যে, গত যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কালো-বাজার তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধের পর অন্য দেশে কালো-বাজার আর নেই বললেই চলে কিন্তু ভারতের কালো-বাজার সেই সময় থেকেই নানা অনুকূল অবস্থা পেয়ে মিশ-কালোয় পরিণত হয়েছে।

সভাপতি মহারাজ বললেন—সেটা কি বস্তু আমাদের বুঝিয়ে বলো। কখনো-কখনো আমরা লাল বাজারের কথা শুনতে পাই বটে কিন্তু কালো-শাদা বাজারের কথা ইতিপূর্বে শুনতে পাইনি।

—আজ্ঞে কালো বাজারের কথা বেশি ফলাও ক'রে বললে বুঝতে পারবেন না। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, বাজারে যখন কোথাও মাল পাওয়া যায় না, সেখানে সে মাল বিক্রি হয়। তবে এক টাকার মালটা লোককে দশ টাকায় কিনতে বাধ্য করা হয়। এই কালো বাজারে চাল ঘি কাপড় সবই ঢুকে গেছে। গৃহী লোক এক টাকার কাপড় আজ দশ টাকা দিয়েও কিনতে পায় না। আমরা অর্থাৎ এই কালো-বাজারের কারবারীরা, আমাদের দূরদৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েছি যে, এবার কাপড়ের অভাবে গৃহী লোকেরা বল্কলের দ্বারা লজ্জানিবারণ করতে বাধ্য হবে। সেই জন্য কিছুদিন আগেই আমরা সরকারের কাছ থেকে হিমালয়ের সমস্ত গাছ ইজারা নিয়ে ফেলেছি—

অবশ্য যে সব গাছের ছাল দিয়ে বল্কল তৈরি হয়। এ সব গাছ এমনি পড়ে থাকতো, এখন এগুলো থেকে সরকারের তবিলে বেশ কিছু আমদানি হচ্ছে। যা হোক গাছগুলো ইজারা নিয়ে আমরা সেগুলির ছাল ছাড়িয়ে কালো-বাজারে চালান ক'রে দিয়েছি। যাঁরা কিনতে ইচ্ছা করেন তাঁদের কালো-বাজারের দরে বল্কল কিনতে হবে। অবিশ্যি আপনাদের কথা আমরা চিন্তা করিনি তা নয়। আপনাদের প্রয়োজন মত যত জোড়া বল্কলের দরকার আমাদের বলুন নিজের-নিজের ডেরায় বসেই তা পেয়ে যাবেন। শুধু তাই নয় যদি কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো মন্দির সংস্কারের কাজে কিছু টাকা দিলে আপনারা খুশি হন তা আমরা এখুনি দিতে প্রস্তুত আছি—দয়া ক'রে শাপ-মন্যি ঝাড়বেন না, আমরা জানি লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করলেও আপনাদের অভিশাপের হাত থেকে ত্রাণ পাব না। এই অনুরোধটি করবার জন্যেই আজ আমাদের এই সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করতে হয়েছে। আমরা আপনাদের আশ্রিত বলেই জানবেন, আপনাদের দয়াতেই দু-পয়সা ক'রে খাচ্ছি।

এই অবধি বলেই লোকটি বসে পড়ল।

চোরা কারবারীদের বক্তৃতা শুনে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় একেবারে স্তম্ভিত!

অমাবস্যার অন্ধকার যেন আরও জমাট হোয়ে নামল, জ্বলন্ত মশালগুলোর শিখা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ল। অন্ধকারে কারুকে আর ভালো করে চেনা যায় না। একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় সেই যমুনা-পুলিন থমথম করতে লাগল। এরই মধ্যে সভাপতি মহারাজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। তিনি বললেন —সমবেত সাধু মহারাজগণ! আমাদের এই সভার কার্য অদ্য এইখানেই স্থগিত হোক। আমরা গোপনে এই সভা করব বলে স্থির করেছিলুম কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তা হয়নি। ভবিষ্যতে কোথায় এবং কখন এই গুরুতর বিষয়টি আলোচনা করবার জন্য আবার সভা আহূত হবে তা যথাসময়ে আপনাদের জানানো হবে।

সভাপতি মহারাজের এই কথা শুনে সাধুরা যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লেন। হর হর বোম্ বোম্ প্রভৃতি নানা রকম শ্লোগান ছাড়তে ছাড়তে তাঁরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে লাগলেন, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম।

হিমালয়ের অতি নিভৃত তুষারাবৃত এক স্থানে পরে সাধুদের এই সভার আরেকটি গোপণ অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে যাবার জন্য যথাসময়ে আমার কাছে নিমন্ত্রণও এসেছিল। কিন্তু একে সেই ভীষণ শীত তার ওপরে কিছুদিন আগেই সেখানে prohibitior চালু হওয়ায় আমার আর যাওয়া ঘটে ওঠেনি। সভায় কি স্থির হয়েছে তা জানতে পারলে সময়মত সাধারণের গোচরে আনবার ইচ্ছা রইল। ইতি—

রাস্তার ধারেই পড়বার ঘর। সেই ঘরের রাস্তার দিকের দুটো জানালা খুলে আমরা দুই ভাই বসে আছি—পথের দিকে চোখ ও মন খুলে। একটু আগেই শিশি-বোতল-বিক্রিওয়ালার কাছে এক সের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা দু-আনায় বেচে ছ-পয়সায় ছ-টা কালো-জাম কিনে এক-এক জন তিনটে ক'রে খেয়ে দেহ ও মন পরিতৃপ্ত। এ কালো-জাম গাছে ফলে না, ফলে ময়রার দোকানে—এক রকম ছানার পান্তুয়া-গোছের জিনিষ। পান্তুয়াকে একটু বেশী ভেজে ওপরটা কালো ক'রে রসে চোবানো হয়—আজকাল সে দ্রব্যটির আর দেখা পাওয়া যায় না।

বাকী দু-টো পয়সা হাতে নিয়ে বসে আছি—লজঞ্চুসওয়ালাকে দিতে হবে, তার কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খাওয়া হয়েছে। ধারের কথা জানতে পারলে বাড়ীতে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

রাস্তার ধারে বসে আছি—গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম চুকে গেছে। মা-রা সব ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। দুপুর বেলা একটু শব্দ কোথাও হবার জো নেই—রাতে ঘুম হোক্ বা না হোক, দিনে ঘুমের ব্যাঘাত হ'লে অনর্থ হবে। আমাদের চলা-ফেরা, অকার্য ও কার্যালাপে একটু শব্দ হ'লেই তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় অথচ পার্শ্বে শায়িত শিশুর চীৎকারে পাড়ার লোক বিরক্ত হয়ে গাল পাড়তে থাকে তবুও তাঁদের নিদ্রা ভাঙে না।

আমাদের অপরাধে ঘুম ছুটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা ইস্কুলের কর্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন—গর্মির ছুটির জন্য। বোধ হয় তার ফলেই ইস্কুল-মাষ্টারদের দুঃখ-দুর্দশা আজও ঘুচলো না।

রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি দুই ভাইয়ে—ঐ অনাথের মা বুড়ী স্নান ক'রে ভিজে-কাপড়ে চলে যাচ্ছে। অনাথের মাকে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে। এ-পাড়ায় প্রায় সব বাড়ীতেই সে কাজ করেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর এ-পাড়াতেই তার কাটল। কোমর ভেঙে গিয়েছে তবুও আজও তাকে খেটে খেতে হচ্ছে। তার বাড়ী সেই গড়পারের কোন বস্তীর মধ্যে। এখন গিয়ে সে রান্না-বান্না ক'রে খাবে, তার পরে আবার বেলা চারটে বাজতে না বাজতে কাজে এসে লাগতে হবে। আবার রাত্রি আটটা-নটায় বাড়ীতে গিয়ে রান্না ক'রে খেয়ে-দেয়ে শোবে। অনাথের মা বলে সবাই তাকে ডাকে বটে, কিন্তু অনাথ তার ছেলে নয়—তার এক বোন-পোকে সে মানুষ করেছিল, তার নাম ছিল অনাথ। সে-ও মরে গেছে শৈশবে, পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু আজও লোকে তাকে

অনাথের মা বলে ডাকে।

অনাথের মা কিছুদিন আমাদের বাড়ীতেও কাজ করেছিল, কিন্তু কাজের ঠেলায় পালাতে পথ পায়নি। সে সময়ে অনাথের অনেক গল্প সে আমাদের কাছে বল্‌ত। কেমন সুন্দর দেখতে ছিল সে, সে তাকে মা বলে ডাক্‌ত—সেই ডাক এখনো তার কানে লেগে রয়েছে। এক দিন রাতে তার জ্বর হয়েছিল—রাত দুপুরে অনাথ তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—মা, তোর জ্বর হয়েছে।

অনাথ সম্বন্ধে এই গল্পটি অনেকবার সে আমাদের কাছে কয়েছে আর প্রতিবারেই তার চক্ষু সজল হয়েছে, গলা ধরে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে মরে-যাওয়া অচেনা অনাথের দুঃখে আমাদেরও কণ্ঠরোধ হয়েছে, আমাদের গল্পের আসর ভেঙে গিয়েছে।

অনাথের মা চলে গেল। বসে আছি লজঞ্চুসওয়ালার আশায়। দু-পয়সা শোধ দিয়ে আবার দু-পয়সার লজঞ্চুস খাব—ঐ যায় রিপুকর্ম্মওয়ালা—রোগা, একেবারে হাড়গোড় বার করা, নুয়ে পড়া। সুরে গেঁঙিয়ে-গেঁঙিয়ে চলে যায় রি-পু-কম-মও, দূর থেকে শুনতে লাগে যেন—কি-কু-ম্‌ মও।

দূরে গলির মোড়ে লজঞ্চুসওয়ালার পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ল্যাওন-চুস ল্যাঞ্চুস—

তড়াক্‌ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে রকে দাঁড়ান গেল। লজঞ্চুসওয়ালা কাছে আসতেই ইসারায় তাকে ডেকে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলুম। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক গৃহবিধির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে বাড়ীর সামনে এসে হাঁক-ডাক থামিয়ে কিছুক্ষণ এদিক্‌-ওদিক্‌ দেখে টপ্‌ ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে এসে ঢুক্‌ত, আমরা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতুম। এত সাবধানতার কারণ এই যে, কোনো রকম শব্দ হোলে ওপরওয়ালাদের ঘুম ভেঙে যাবে—যার ফলে আমাদের নানান অসুবিধা, এমন কি বিপদ-আপদ ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল। ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে দেনা-পাওনার কথা হোতো, তার পরে লজঞ্চুস খেতে-খেতে গল্প চল্‌ত। বলা বাহুল্য, এক ভাগ লজঞ্চুস তারও প্রাপ্য ছিল। সব দিনই তাকে ভেতরে আনবার সুবিধা হোতো না, মধ্যে-মধ্যে রাস্তা থেকেই তাকে বিদেয় দিতে হোতো।

এই লজঞ্চুসওয়ালা ছিল আমাদের বন্ধু। আমাদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু এই মিলনের দৌত্য করেছিল আমাদের কৈশোর আর তার দিকে ছিল প্রাণৈশ্বর্য।

সে ছিল মুসলমান। বিহারের কোন এক জেলায় তাদের বাড়ী ছিল, কিন্তু দেশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই—অনেক দিন থেকে তারা ব্যারাকপুরে বাস করছে। তার আপনার জন বলতে কেউ নেই। তার বড় বোনের স্বামী ব্যারাকপুরের কাছে কোন এক কলে কুলীগিরি করে, সেই সূত্রেই ওখানে

বাস! বড় বোনও বেঁচে নেই, ভগিনীপতি আবার বিয়ে করেছে, এ বৌয়ের ছেলেপুলেও হয়েছে। ঐখানেই সে থাকে কারণ, তাদের ওপরে মায়া পড়ে গিয়েছে, ছাড়তে পারে না। বছরের মধ্যে কয়েক মাস সে-ও কলে কাজ করে। বাকী কয়েক মাস লজঞ্চুস বিক্রি করে কলকাতায়। রোজ বেলা নটা-দশটার সময়ে ট্রেণে চড়ে আসে এখানে, আর রাতের ট্রেণে ফিরে যায়। রামবাগানে কোথায় দিশি লজঞ্চুসের কারখানা আছে, সেখান থেকে পাইকারী দরে মাল খরিদ করে।

তার নাম ছিল মুখিয়া। মুখিয়া মানে সর্দার। কিন্তু কোনো দেশের মনুষ্য জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সর্দার হবার মতন গুণ বা চেহারা তার ছিল না। অবিশ্যি এ জন্য তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের নাম অতি অল্প ক্ষেত্রেই গুণবাচক হ'য়ে থাকে। দেখা যায় বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে নামের গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের অহি-নকুল সম্পর্ক দাঁড়াতে থাকে। নামকরণ সংস্কারটি মানুষের মৃত্যুর পরই হওয়া উচিত।

আমরা তখন বালক হ'লেও মুখিয়ার চাইতে মাথায় উঁচু ছিলুম। বামনের মতন মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের বড় হ'লেও তাকে ঠিক বামন বলা চলত না। তার রং ছিল কালো। কিন্তু বাপ' রে, সে কি কালো! ডান দিকের মাথার মাঝখান থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে চিবুক অবধি পোড়া। এতখানি জায়গা একেবারে মসৃণ ও চকচকে এবং তার মাঝে মাঝে সাদা দাগ, ধবলের মতন—অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে যেন তারা ঝক্ ঝক্ করছে। পুড়ে যাওয়ার ফলে ডান চোখের কোণটা যেন টেনে ধরা হয়েছে গোছের, আর চোখের তলার দিকের লাল্‌টা বেরিয়ে এসেছে—যেন দগ্‌দগে ঘা। ডান দিকে মাথায় চুল, ভুরু, গোঁফ কিংবা দাড়ি এক গাছিও নেই। বাঁ দিকের মাথায় চুল এবং ভুরু আছে বটে, কিন্তু দাড়ি এখানে দুটি ওখানে চারটি—গোঁফও সেই রকম। এক দিক্‌কার দাড়ি-গোঁফ চেঁচে ফেলে তাকে ভদ্র হ'তে বললেই সে তার সেই কয়েক গাছা দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বলত—ওরে বাবা, তা হয় না—আমি নেমাজী লোক, দাড়ি ফেলতে পারি কখনো? বয়স ছিল তার ত্রিশের ওপর। একবার কল্পনা করুন সেই চেহারাখানা!

কিন্তু সেই কুৎসিতের মধ্যে বাস করত একটি সুন্দর প্রাণ।

মুখিয়া মাসে প্রায় পনেরো-ষোলো টাকা রোজগার করত; কিন্তু তা থেকে নিজের সম্ভোগের জন্য একটি পয়সাও খরচ করত না, সব ভগিনীপতির হাতে তুলে দিত। সে বলত—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে বড় ভালবাসি, তাই তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না। নইলে এত বড় দুনিয়ায় কি থাকবার জায়গার অভাব আছে?

অথচ তারা তার নিজের বোনের ছেলেপিলে নয়। তার ভগিনীপতির দ্বিতীয়া স্ত্রীও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। সে মুখিয়াকে 'পোড়ার-

মুখো' বলে ডাকত।

আমরা বলতুম—তুই কিছু বলতে পারিস্ না?

মুখিয়া বলত—কি আর বলব! সত্যিই তো আমার মুখ পোড়া।

এই সবের জন্য তাকে আমাদের বড় ভাল লাগত ও পরে সেই আকর্ষণ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

তার সঙ্গে কেমন ক'রে বিচ্ছেদ হোলো সেই কাহিনীটাই বলি।

আমাদের সেই দ্বিপ্রাহরিক আড্ডাটা সেবার গরমের ছুটির সময় খুবই জমে উঠেছিল। মুখিয়া ছাড়াও লজঞ্চুসের লোভে-লোভে পাড়ার আরও দুটি-তিনটি ছেলে এসে রোজ জমতে লাগল সেখানে। বাড়ীর কেউ জানে না, খুবই সন্তর্পণে আড্ডাধারীরা যাওয়া-আসা করে। আমরা দুই ভাই বাড়ীর মধ্যে উচ্চহাসির জন্য কুখ্যাত ছিলুম, কিন্তু আড্ডা ধরা পড়বার ভয়ে সে সময়টা আমরা প্রাণপণে হাসি সামলে রাখতুম। একটি ছেলে ছিল, সে ভারি মজার মজার সব গল্প ও কাহিনী বলতে পারত। সেই বয়সেই গল্প বলবার বেশ একটা চাল সে আয়ত্ত করেছিল।

মাঝে-মাঝে তার গল্প শুনে হাসি সামলাতে না পেরে আমরা মুখে কাপড় ঠেসে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে আসতুম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সে নিজে একটুও হাসত না বরং আমাদের মুখের দিকে এমন জিজ্ঞাসু ভাবে চাইত যে মনে হোতো সে বলতে চায়—কি রে, হাস্‌চিস কেন—এতে হাসবার কি আছে রে?

মুখিয়া ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানত বটে, কিন্তু সব কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সে সব সময়ে ধরতে পারত না—আমাদের হাসতে দেখে সে হাসবার চেষ্টা করত মাত্র।

সেদিন সেই ছেলেটি একটা মজার গল্প বেশ জমিয়ে বলছিল, এমন সময় গল্পের মাঝখানেই হঠাৎ মুখিয়া তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—ঠিক বাচ্ছা গাধার মতন।

হঠাৎ তার সেই চীৎকার শুনে আমরা তো ভড়কেই গেলুম কিন্তু একটু পরেই টের পাওয়া গেল যে সেটা তার হাসি।

হাসি আর থামে না। আমরা যত বলি, এই মুখিয়া, চুপ কর—চুপ কর ভাই, মা উঠে পড়বেন—

আর চুপ কর! একটা দম-দেওয়া কলের মতন মুখিয়া সেই ভাবে গাধার ডাক ছেড়ে চল্‌ল। হাসির সময় তার মুখের চেহারা হ'য়ে উঠল একেবারে বীভৎস। তার মুখের সেই পোড়া দিক্‌টা কি রকম কুঁক্‌ড়ে গিয়ে বেরিয়ে-পড়া চোখটা যেন আরও ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিছুতেই তাকে থামাতে পারি না। ওদিকে মার ঘরের দরজা খুল্‌ল, তাকে তাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু কে কার কথা শোনে! হাসির

ধমকে সে-সব কথা সে বুঝতেই পারলে না। ইতিমধ্যে মা এসে আমাদের দরজা খুলে দাঁড়াতেই মুখিয়ার হাসি গেল থেমে। হাসি থামল বটে কিন্তু তার মুখখানার অবস্থা সেই রকমই বেঁকে-চুরে তুবড়ে রইল।

মা বোধ হয় প্রথমে মুখিয়াকে দেখতে পাননি। ঘরে ঢুকে সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে দেখে চমকে—এটা কে রে! বলে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

মুখিয়া ততক্ষণে তার লজঞ্চুসের ডালাটা সামলে নিয়ে মাকে ছোট্ট একটা সেলাম ক'রে সরে পড়ল—তার পেছনে-পেছনে পাড়ার অন্য দুটি ছেলেও সরে পড়ল। হাঙ্গামার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরাও তখনকার মতন চিলের-ছাতে উঠে আত্মগোপন করলুম।

বাবা আপিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে একটা খোলা বারান্দায় মাদুর পেতে রোজই আমাদের এক পারিবারিক বৈঠক বসত। বাড়ীতে কয়েকজন মহিলা থাকতেন, তাঁরা আমাদের সংসারেরই লোক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের ওপরে চোপরা, অথবা প্রকাশ্যে তাঁদের সম্বন্ধে কোন রকম অসম্মানকর মন্তব্য করলে আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হোতো। প্রাত্যহিক এই পারিবারিক সভায় তাঁরাও উপস্থিত থাকতেন। এইখানে প্রতিদিনই—বাবা আপিসে চলে যাবার পর এতক্ষণ পর্যন্ত—অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা তাঁর চোখের আড়ালে ছিলুম—আমরা কি করেছি, অর্থাৎ কেমন ভাবে-দিন কাটিয়েছি, তার একটা ফিরিস্তি পেশ করতে হোতো। বলা বাহুল্য, রোজই বলতুম, এগারোটা থেকে চারটে অবধি লেখাপড়া করেছি—প্রমাণ-স্বরূপ, হাতের লেখা অঙ্ক কষা প্রভৃতি তিনি রোজই নিয়ম মত দেখে তাতে সই ক'রে দিতেন।

সেদিন আসরে ডাকের ধরণ দেখেই বুঝতে পারলুম, আজ বরাতে কিছু দক্ষিণা আছে।

আসরে উপস্থিত হতেই বাবা গম্ভীর সুরে বললেন—বোসো।

একটু নিরাপদ ব্যবধানেই গুটি-সুটি হ'য়ে বসে পড়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই সনাতন প্রশ্ন—আজ দুপুরে কি কি করলে?

যদিও জানতুম যে, আজ দুপুরের কাহিনী বেশ পল্লবিত হ'য়েই তার কানে পৌঁছেচে তবুও বুক ঠুকে সেই সনাতন উত্তরই দিয়ে চললুম—এগারোটা থেকে পৌনে বারটা অবধি অঙ্ক কষেছি, পৌনে বারোটা থেকে পৌনে একটা অবধি ভূগোল পড়েছি, পৌনে একটা থেকে একটা অবধি ম্যাপ দেখেছি—

আর বেশী অগ্রসর হবার আগেই একটি মহিলা বলে উঠলেন—ম্যাপ দেখেছ না ছাই দেখেছ!

তারপরে বাবার দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—সারাদিন খালি হুল্লোড়, হাসি, আড্ডা, গল্প এই তো চলে দেখছি, পড়ে কখন তা তো জানি না।

সঙ্গে-সঙ্গে আর এক জন সুরু করলেন—দুপুর বেলা ওদের অত্যাচারে চোখের পাতাটি বোজবার যো আছে! হৈ-হৈ চলেইছে!

আর এক জন মন্তব্য করলেন—এই বয়সে এত বন্ধুই বা এদের জোটে কি ক'রে তাই ভাবি। রাজ্যের লোকের সঙ্গে গলাগলি!

এবারে মা বললেন—আর সে সব বন্ধুর চেহারাই বা কি!

বাবা বললেন—সারা দিন হি হি হি হি আর হো হো হো হো ক'রে ক'রে নিজেদের যে রকম চেহারা হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবও তো জুটবে সেই মেকদারের—

যা হোক্, সেদিনকার সভায় ঠিক হ'য়ে গেল যে দুপুর বেলা আমাদের সায়েস্তা রাখবার এক জন জবরদস্ত শিক্ষক রাখা হবে, আর সকাল-সন্ধ্যের জন্য বাবা তো আছেনই। তাঁর সন্ধানে এমন লোক আছে এ-কথা তিনি সভাক্ষেত্রে প্রকাশ করলেন।

পরের দিন দুপুর বেলায় আড্ডায় দুঃসংবাদটি প্রকাশ করা গেল।

মুখিয়াকে বললুম—বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার দু-বার 'ল্যাবেঞ্চুস্' বলে হাঁক দিলেই আমরা বেরিয়ে আসব।

দিন দুই বাদে আমরা দুপুরের মাষ্টার মশায়কে দেখলুম। আফিস থেকে ফেরবার সময় বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বেশ চেহারা ও দিব্যি ভদ্র অমায়িক ভাব। আমাদের দুই ভাইয়ের গাল টিপে-টিপে আদর ক'রে বললেন —এরা তো বেশ ছেলে! আপনি যে রকম বললেন দেখে তো তা মনে হয় না।

বাবা একটু হেসে বললেন—এক একটি বর্ণচোরা। দু দিনেই পরিচয় পাবেন।

ঠিক হ'য়ে গেল কাল দুপুর থেকেই তিনি আমাদের গুরুভার গ্রহণ করবেন।

সেদিন রাত্রি বেলা আমাদের পড়াতে-পড়াতে বাবা বললেন—আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দিয়েছি, তোমাদের মেরে ফেললেও আমি তাঁকে কিছু বলব না অতএব সাবধান হয়ে চোলো।

প্রাণধারণের উপকরণগুলি দুর্মূল্যতার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ জিনিষটি আজকাল যে রকম সুলভ হ'য়ে উঠেছে সে যুগে তা ছিল না, কাজেই আত্মরক্ষার তাগাদায় সাবধান হবারই সংকল্প করতে লাগলুম মনে-মনে।

ছুটির সময় দুপুর বেলা এই রকম সাজার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা বাড়ী-শুদ্ধ সবার ওপরে হাড়ে চটে গেলুম; আমরা যে রকম সন্তর্পণে কথা বলতুম, চলতুম এবং যে রকম সাবধানতার সঙ্গে দরজা খোলা ও বন্ধ করা হোত তাতে কারুরই কখনো ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি এক দিন মুখিয়া তার অদ্ভুত হাসি হেসে সবাইকে চমকে দিয়েছিল স্বীকার করি। অদ্ভুত

রসে চমক লেগেই থাকে—সেটা তাঁরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন যে, দুপুর বেলা আমাদের অত্যাচারে কোনো দিনই তাঁরা ঘুমুতে পারেন না!

কি ক'রে তাঁদের সেই আরামের দ্বিপ্রাহরিক সুখস্বপ্নটির ব্যাঘাত জন্মাতে পারা যায়, তারই পরামর্শ আঁটতে লাগলুম দুই ভাইয়ে।

পরের দিন দুপুর বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে মাষ্টার মশায় এসে হাজির হলেন। এগারোটা থেকে চারটে অবধি কবে কখন কি পড়া বা লেখা হবে প্রথমেই তার একটা রুটিন তৈরী হোলো, তার পরে আসল পড়া সুরু হোলো।

পড়তে লাগলুম মনে মনে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে মাষ্টার মশায় বললেন—চেঁচিয়ে পড়, তা না হলে আমি বুঝব কি ক'রে যে তোমরা পড়ছ না ফাঁকি দিচ্ছ। চেঁচিয়ে পড়ার আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, যা পড়বে সঙ্গে-সঙ্গে মুখস্থ হয়ে যাবে।

ব্যাস্! আর বলতে হোলো না, সঙ্গে-সঙ্গে হদিশ লেগে গেল। সেই থেকে শুরু ক'রে বেলা চারটে অবধি আমরা এমন চেঁচিয়ে পড়লুম যে বাড়ী-শুদ্ধ লোকের ঘুম তো দূরের কথা, ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওপর-নীচ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

যথা সময় মাষ্টার মশায় চলে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল যে, আমাদের পড়া মুখস্থ করার আগ্রহটা তিনি ভালো ভাবে গ্রহণ করেননি।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখলুম, সবারই মুখ বেশ গম্ভীর—বুঝলুম ওষুধ লেগেছে।

দিন কতক এই রকম চলল—কিন্তু কাঁহাতক রোজ পাঁচ ঘণ্টা ক'রে চেঁচানো যায়; চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পেটে ও কোঁকে ব্যথা ধরে গেল। তার ওপরে দিনে ঘুমোনো যাদের অভ্যেস, তারা ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় পড়েও দিব্যি ঘুম লাগাতে পারে, দু-এক দিন একটু কষ্ট হয় মাত্র।

বাড়ীতে দিন কয়েক মিস্ত্রি খেটেছিল। উদ্‌বৃত্ত বিলিতী-মাটি, বালি, চূণ ইত্যাদি বাড়ীর এক জায়গায় যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতের জন্য। এর কাছেই মিস্ত্রিদের ছোট-বড় কর্ণিক ইত্যাদি সব জড় করা ছিল। মিস্ত্রিদের কাজ ও সরঞ্জাম দেখতে-দেখতে আমাদের স্থপতি-প্রতিভা মাথা-চাড়া দিলেন—ঠিক করা গেল, একটি ছোট বাড়ী তৈরি করতে হবে।

ক'দিন ধরে ছোট-বড় দেশলাইয়ের মধ্যে এঁটেল মাটি পুরে সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে একরাশ ইট ও টালি তৈরি করা হোলো। এক দিন রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের এক কোণে মেজে খুঁড়ে বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা গেল। সকাল বেলা বাড়ীর চারদিকে লোক-জন চলাফেরা ইত্যাদি নানা

ব্যাঘাতে কাজ তেমন অগ্রসর হোলো না। ঠিক হোলো, দুপুর বেলা পড়বার সময় এক- একবার এক এক জন ক'রে উঠে এসে কাজ করা যাবে।

যথা সময়ে মাষ্টার মশায় এলেন। ওপরওয়ালীরা সব শয়নমন্দিরে প্রবেশ করবার পর আমি উঠে গিয়ে আধ ঘণ্টাটাক কাজ ক'রে ফিরে এলুম। ভায়া উঠে গেল তার পর, সে ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে। এই রকম ক'রে দুজনে বার দু-তিন গিয়ে কাজ করা গেল। মনে হোলো এই রেটে কাজ চালাতে পারলে পরের দিনেই একতলার কাজটা শেষ হ'য়ে যেতে পারে।

কিন্তু হায় রে পরের দিন! সেদিনটায় তিথি-নক্ষত্রের যে কি সমাবেশ ছিল তা আজও ভাবি।

সেদিন মাষ্টার মশায় এসে বসতে না বসতে আমি উঠে গেলুম, কারণ সিমেণ্টটা মাখা হয়েছিল, দেরী হোলে আবার শুকিয়ে যাবে। প্রায় ঘণ্টা-খানেক কাটিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে ফিরে এলুম—অর্থাৎ মাষ্টার মশায় যেন মনে করে, বই খুঁজতে দেরী হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ বসতে না বসতে ভায়া উঠে গেল ও প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসে গুটিগুটি নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় মাষ্টার মশায় চেঁচিয়ে উঠলেন ইংরেজীতে—You boy, come here.

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা ভড়কে গেলুম। মাষ্টার মশায় আমাকেও ডাক ছাড়লেন ইংরাজীতে, ঐ সুরেই।

আমরা দু-জনে তাঁর কাছে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। তিনি বললেন—কাল থেকে দেখছি পড়তে-পড়তে উঠে যাচ্ছ—কোথায় যাও—এ্যাঁ—

এই বলে, আমাদের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই দু-জনের মাথায় টাঁই-টাঁই ক'রে কয়েকটি শ্রীগাঁট্টা জমিয়ে দিলেন।

উঃ, মাথা একেবারে চিড়্বিড়িয়ে গেল। যে কখনো মারে না তার হাতের আঘাতে লাগে বেশী, কারণ দেহ ও দেহাতীত দু-জায়গাতে লাগে সে আঘাত।

যা হোক, মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তো নিজের জায়গায় এসে বসলুম। মাষ্টার মশায়ের রাগ তখনো পড়েনি। তিনি গর্জে-গর্জে বলতে লাগলেন—চারটের আগে এখান থেকে একপা নড়েছ কি দেখবে মজা!

ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে খোলা পড়েছিল। মাথার যন্ত্রণায় মনে হ'তে লাগল সমস্ত ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সর্ষের ক্ষেত ভরে উঠেছে।

মাষ্টার মশায় আবার গর্জে উঠলেন—তোমাদের বাবা যে তোমাদের 'বর্ণচোরা' নাম দিয়েছেন তা ঠিকই দিয়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি।

নামকরণ করার ব্যাপারে বাবার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদেরও কোনো সন্দেহ ছিল না, কারণ আমাদের নামের জোড়া সেদিন জগতে দুর্লভ ছিল, আজও সুলভ নয়। তাই সেদিক্ দিয়ে না গিয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর অনেক লোকই বর্ণচোরা—যেমন আপনি একটি।

নানা রকম আবোল-তাবোল চিন্তা পাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে, এমন সময় গলির মোড়ে আওয়াজ হোলো—ল্যা—বেন—চুওওস্।

মুখিয়ার কাছে এক পয়সা দু-পয়সা ক'রে সেবার প্রায় চার আনা ধার হ'য়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে পয়সার জন্য তাগাদা করায় সেদিন তাকে নিশ্চয় দিয়ে দেবার কথা ছিল—পয়সার জোগাড়ও হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু কি ক'রে উঠে গিয়ে তাকে পয়সা দেওয়া যায়! ওদিকে মুখিয়া হাঁকতে-হাঁকতে বাড়ীর সামনে এসে সাঙ্কেতিক ডাক ছাড়লে—ল্যাওনচোস্!

আমাদের ভাবান্তর দেখে মাষ্টার মশায়ের সজাগ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে উঠল। ওদিকে মুখিয়া আরও দু-তিনবার অতি বিনীতভাবে ল্যাবেনচোস্—ল্যাওনচোস্ বলে হঠাৎ বীরদর্পে চোওওস্ বলে এমন একটা হাঁক ছাড়লে যে, দেশকালপাত্র ভুলে আমরা দু-জনেই হেসে ফেল্লুম।

আমাদের হাসতে দেখে মাষ্টার মশায় রেগে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হাস্‌ছ কেন?

ঠিক সেই মুখে ছুঁচোবাজীর চালে মুখিয়া আর এক হাঁক ছাড়লে—চোঁই ওঁই ওঁই ওঁই ও ও ওস্।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! হাসি চাপা আর সম্ভব হোলো না, এবার আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

আমাদের ধৃষ্টতা দেখে মাষ্টার মশায় বললেন—আচ্ছা, তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ছি।

বলার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের ওপর এলোধাপাড়ি কীল, চড়, গাঁট্টা পড়তে লাগল। আমাদেরও কি রকম রোখ চেপে গেল—মাষ্টার মশায় যতই মারুন না কেন কিছুতেই হাসি থামাব না।

ওদিকে সেদিন যেন মুখিয়ার প্রতিভা খুলে গেল। সে অদ্ভুত রকমারী বাঁট-কর্ত্তবে 'ল্যাবেঞ্চুস্' শব্দটি হাঁকতে শুরু ক'রে দিলে। মোট কথা, লজঞ্চুস্ চুষে চুষে উপভোগ করার বাণীমূর্ত্তি সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল সেই তৃতীয় প্রহরের রোদে পথে দাঁড়িয়ে।

এদিকে মাষ্টার মশায় দুই হাতে বাজনা বাজাচ্ছেন আমাদের ওপর—চটাচট্, পটাপট। মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একই সঙ্গীত—কাঁদিয়ে তবে ছাড়ব। আর আমরা কাঁদতে-কাঁদতে উচ্চৈস্বরে হেসে চলেছি হা হা, হো হো, হি হি—

এই অভূতপূর্ব কনসার্টের শব্দে বাড়ীর সবার দিবানিদ্রা ছুটে গেল, তাঁরা দুদ্দাড় ক'রে এক রকম ছুটেই নীচে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু তখন দু-পক্ষই অর্দ্ধক্ষিপ্ত। তাঁদের দেখে মাষ্টার মশায়ও হাত থামালেন না, আমরাও আগের মতনই হাসতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে মা এসে ঘরে ঢুকলেন—উভয় পক্ষেরই ইজ্জৎ বাঁচল।

মাকে দেখে মাষ্টার মশায় ও আমরা থেমে গেলুম। মা আমাদের বলতে

লাগলেন—তোমরা বড় বাড় বেড়েছ ! আচ্ছা হচ্ছে তোমাদের—

মা যেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল ! অনেক লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ও মধ্যে মধ্যে মুখিয়ার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। অন্য সময় হোলে আমরা ছুটে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু মাথার ওপরে অত-বড় একটা অপরাধের বোঝা থাকায় তখনকার মতন উত্থান-শক্তি রহিত হ'য়ে গিয়েছিল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কি রকম হোলো তাই ভাবছি, এমন সময় মনে পড়ল আজ যে শনিবার।

আবার বাবার আওয়াজ পাওয়া গেল। মা আমাদের বললেন—দেখ তো, কি হয়েছে ?

বলা-মাত্র তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেলুম। বাইরে গিয়ে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার ! রাজ্যের লোক দাঁড়িয়েছে মুখিয়াকে ঘিরে ! তার লজঞ্চুস রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়েছে, কাঠের কাণা-উঁচু ডালাটাও এক দিকে পড়ে রয়েছে। মুখিয়ার হাত-পা ও মুখের স্থানে-স্থানে ছ'ড়ে গিয়েছে—দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না।

করুণ সে দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এল। সেখানকার তর্কাতর্কি শুনে ব্যাপারটি যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

পাড়ার গুটিকয়েক লোক ছিলেন বেকার। মুখিয়া নাকি প্রতিদিন বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে তাঁদের দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মায়। এত দিন তাঁরা নীরবে তার এই অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছিলেন, কিন্তু আজ নাকি খুব বাড়াবাড়ি করায় নিতান্ত সহ্য করতে না পেরে অসময়ে স্বপ্নাগার ছেড়ে এই রোদে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে। অধ্যাপনার কার্য্যটি প্রায় সুসম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময় বাবা এসে তাঁদের হাত থেকে মুখিয়াকে উদ্ধার করেছেন—এই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা বলতে লাগলেন—ছি ছি, আপনারা কি মানুষ ! এই পঙ্গুকে ধরে তিন-চার জনে মিলে মারতে একটু মায়া হলো না আপনাদের ?

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললে—মশায়, আপনি যা রাগী, আপনি হোলে মেরেই ফেলতেন ওকে।

বাবা চুপ ক'রে আছেন দেখে আর এক ব্যক্তি বললে—আপনিও তো মশায় আচ্ছা লোক ! পাড়ার লোকে একটা কাজ না হয় ক'রেই ফেলেছে। আপনি কোথায় সেটা চেপে যাবেন, না উল্টে ওর হ'য়ে লড়াই শুরু করেছেন ! আশ্চর্য !

তিনি কোনো জবাব দেবার আগেই আর এক জন বলে উঠ্‌ল— ছেলেদের বন্ধু যে !

ভীড়ের লোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

বাবা আর তাদের কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে ছেলেদের বন্ধুর রূপখানি দেখতে লাগলেন। রূপ-তরাস কেটে গেলে মুখিয়ার একখানা হাত ধরে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

মুখিয়ার অবস্থা দেখে বাড়ীর সবাই দুঃখ করতে লাগলেন। মা তাকে জেরা করলেন—তুই এ-বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিলি কেন তারপরে আমাদের দুজনকে দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয় এদের ডাকছিলি। বল, তোর কোনো ভয় নেই।

মুখিয়া বললে—চলতে চলতে—ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেঁচানোই আমার অভ্যেস—ওদের ডাকবার আমার কি দরকার!

মা বললেন—আমি জানি, এরা তোর কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খায়—এদের কাছে কিছু কি পাবি?

সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়া প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না না না, কিছু পাব না—ওরা আর ধারে খায় না।

এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে মুখিয়া তার শূন্য ডালাটা বগলে নিয়ে চলে গেল।

মুখিয়া চলে যাবার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন। বাবা ও মাস্টার মশাই দু-জনেই এই নিয়ে অনেক কথা বললেন।

বাবা বললেন—কেউ কারুকে ধরে মারছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ ক'রে সে ব্যক্তি যখন উল্টে মারতে পারবে না।

মাস্টার মশায়ও দেখলুম এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একেবারে একমত।

সেদিন দিবানিদ্রার ব্যাঘাতের জন্য যাঁরা মুখিয়ার অঙ্গে ব্যথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দিবানিদ্রা থেকে গভীরতর নিদ্রায় অপসৃত হয়েছেন—জানি না, আজও নিদ্রা ভেঙেছে কি না।

মাষ্টার মশায় কিন্তু পরদিন থেকে আর এলেন না। সে জন্য দুঃখ নেই, কারণ মাষ্টারের অভাব জীবনে কোনো দিনই ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু মুখিয়া আর এল না, যার অভাবে মনের একটা জায়গা আজও খালি হ'য়ে আছে।

২

রাস্তা-ধারের জানালায় বসে আছি—পথ ক্রমেই জনবিরল হ'য়ে উঠছে। বেরিয়েছে দুপুর বেলাকার যত ফেরিওয়ালার দল। সে সময় অধিকাংশ বাড়ীরই বাবুদের দল বাড়ীতে থাকে না—মেয়েদের কাছে জিনিষ বিক্রি করা সহজ।

ঐ যায় চুড়িওয়ালা—বেলোয়ারি চুড়ি চাইয়া—বালা চাইয়া—খেলোনা

চাঁইয়া—

তখনকার দিনে সব বাড়ীরই রাস্তার দিকের বারান্দায় নীল কাপড়ে মোড়া চিক্ ঝুলত। রাস্তায় চলা, ট্রামে-বাসে চড়া, কিংবা বাজার করবার ছলে সকাল থেকে দোকানে-দোকানে ঘুরে-ঘুরে সঙ্গের পুরুষ জীবগুলিকে নিম খুন ক'রে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে ঘণ্টা দুয়েক হুল্লোড় ক'রে কল-ঘরে ঢোকবার রীতি বা সাহস তখনকার মেয়েদের ছিল না।

চুড়িওয়ালা হেঁকে চলেছে সুর ক'রে—এক বাড়ীর ওপরকার বারান্দার চিক্ ফাঁক ক'রে সরু-গলায় কে যেন ডাকলে—চুড়িয়ালা!

চুড়িওয়ালার সজাগ কান নারীকণ্ঠের এই ক্ষীণ আহ্বানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ বাড়ী গো?

—এই যে, এই বাড়ী।

সদর দরজা খুলে গেল। চুড়িওয়ালা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল—তার পেছনে পেছনে পাড়ার একপাল ছোট ছেলেও ঢুকে পড়ল।

চুড়িওয়ালা উঠোনে তার সেই বিরাট ঝোড়া নামিয়ে একখানা চার-চৌকো পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। ইতিমধ্যে বাড়ীতে যত মেয়ে আছে তারা একে-একে চুড়িওয়ালার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, শিশু—গৃহিণী, দাসী, কন্যা, বৌ—সধবা, বিধবা, পতিসোহাগিনী বা পতিপরিত্যক্তা কেউ বাদ গেলেন না।

চুড়িওয়ালা তার বোচকার বাঁধন খুলে ফেলল। ওপরেই নানা রকমের খেলনা, বাঁশী, চক্চকে ফুলদানী ইত্যাদি মনোহারী জিনিষ। দেখামাত্র ছেলেদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হোলো—তারা সবাই মিলে সশব্দে এই জিনিষগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিজেদের অভিজ্ঞতা জাহির করতে লাগল। এরই মধ্যে মেয়েদের চুড়ি দেখানো আরম্ভ হোলো।

এই চুড়িওয়ালারা প্রায়ই ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান। কথাবার্তা ছিল মিষ্টি, মুখে একেবারে মধু মাখানো যাকে বলে। তাদের অমানুষিক তিতিক্ষা আজকের দিনে যে কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্লভ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা সংসারে কোন মহিলার স্থান কোথায় তা বুঝে নিয়ে বড়মা, ছোটমা, বৌমা, দিদিমণি প্রভৃতি ডাক শুরু ক'রে দিত।

তার পরে সেই মেয়ে-সভায় চুড়ি পছন্দ করানো—ঝাঁকা-মুটের পক্ষে অতি জটিল-রকমের অপারেশন করাও বোধ হয় তার চাইতে সোজা। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

পাঁচ জন মহিলা ও একটি ছোট মেয়ে হয়ত চুড়ি পরবে। প্রথমে ছোট মেয়েটির চুড়ি পছন্দের পালা। পঁচিশ রকমের চুড়ি দেখাবার পর এক রকম চুড়ি পছন্দ হোলো। দরে আর কিছুতেই বনে না। চুড়িওয়ালা বার-

দুয়েক তার বোচকা বেঁধে ফেল্লে। শেষকালে সব ঠিক হ'য়ে যাবার পর চুড়ি পরাতে যাচ্ছে, এমন সময় এক জন বলে উঠলেন যে, তাঁর মামার বাড়ীর পাড়ায় একজনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে একটি ছোট মেয়ের হাতে দু-গাছি চুড়ি তিনি যে দেখেছিলেন—আহা, সে একেবারে চোখ জুড়িয়ে যায়!

চুড়িওয়ালাকে সেই চুড়ির বিবরণ শুনিয়ে বলা হোলো—সেই রকম চুড়ি দেখাও।

চুড়িওয়ালা অতি বিনীতভাবে বললে—না মা, সে রকম চুড়ি আমার কাছে আজ নেই, বলেন তো এনে দিতে পারি।

খুকুর মা এই সুযোগে খুকুকে ফাঁকি দেবার তালে তাকে বললেন—তোকে ভাল চুড়ি পরে এনে দেবে, আজ আর চুড়ি পরিস্‌নি।

খুকু অমনি পোঁ ধরলে। সকলে মিলে তাকে বোঝাতে লাগলেন যে অচিরেই তার জন্য এমন ভাল চুড়ি আসবে যে সে রকমটি আর কারুর হাতেই দেখতে পাওয়া যায় না।

বাক্যটির ব্যাঙ্গার্থ ধরে ফেলে খুকুমণি তার সুর আরও এক গ্রাম উচ্চে তুলে দিলে। খুকীর মা সহ্য করতে না পেরে রেগে তাকে দিলেন ঘা দু-তিন।

কিন্তু খুকু তো আর খোকা নয়। যে-পাপ থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে সে-পাপে সহজাত অধিকার নিয়েই যে সে এসেছে—সে থামবে কেন! একটা মহা হট্টগোলের পর সাব্যস্ত হোলো, আচ্ছা তা হোলে ঐ চুড়িই খুকীকে পরিয়ে দেওয়া হোক।

খুকীর বেলাতেই যদি এই হয় তা হোলে খুকীর মা, খুড়ী, জেঠিদের ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়।

এর পরে চুড়ি পরবার পালা। সে এক লাঠালাঠি, ফাটাফাটি ব্যাপার! কারণ, সকলেই চান যে, চুড়ি হাতের কব্‌জিতে একেবারে সেঁটে বসে যাবে। তাঁদের অধিকাংশের কব্‌জিতেই যে ছোট মেয়েদের মল সেঁটে বসে যাবার অধিকার রাখে, এক সোনার চুড়ি গড়াবার সময় ছাড়া সে খবরটা তাঁরা প্রায় একেবারে ভুলেই যেতেন। সেই গুণ-ছুঁচের ছ্যাঁদায় জাহাজের কাছি ভরার কসরৎ বালক মহলে খুবই উপভোগ্য ছিল।

এত কাণ্ডের পর, বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক বাদে চুড়িওয়ালা এক বাড়ী থেকে মুক্তি পেল। এত ক'রে তারা লাভ করত কি ক'রে তাই ভাবি—কারণ পরাতে-পরাতে চুড়ি ভেঙে গেলে তা চুড়িওয়ালার যেত—বোধহয় চুড়ি পরানোটুকুই ছিল তাদের লাভ।

চলেছে ফেরিওয়ালা এক-এক জন এক এক সুরে হেঁকে—আমাদের মগজে চিত্রবহার তরঙ্গ তুলে। বাসনওয়ালা চলেছে, তারা হাঁকে না—বাজায়। রকমারি বাজনা সে—গিন্নিরা শুনেই বলে দিতে পারতেন, কার কাছে কি ধরণের

বাসন পাওয়া যায়। ঐ যায় বেদের মেয়ে, পিঠে পোঁট্‌লা বাঁধা। ক্ষীণ দেহযষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে ভারতের রাজধানীর বুকের ওপর দিয়ে ঘোষণা করতে-করতে চলছে—ব্যাত ভালো করি—দাঁতের পোকা বের করি—এমন মন্ত্র ঝাড়বে যে দাঁতের পোকার বাবা তো দূরের কথা তাদের তিন কুলে যে যেখানে আছে পিল্‌-পিল্‌ ক'রে বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না। শুনতুম ওরা না কি আরও অনেক সাংঘাতিক রকমের তুক-তাক্‌, ঝাড়-ফুক, মন্ত্র-তন্ত্র জানে, কিন্তু ছাড়ে না।

ঐ আসে মাড়োয়ারী কাপড়ওয়ালা—রামশিঙের মতন আওযাজে পাড়া কাঁপিয়ে—একটী—য়াকায়—তিন খা—না কাপড়—এক্‌খি—য়ানা ফাউ!!!

টাকায় চারখানা ধুতি! হোক না কেন সে পাঁচ-হাতি! আজ যে একখানা রুমালের দাম পাঁচ সিকে। কিন্তু আশ্চর্য! সেদিনও মাতব্বরদের মুখে শুনেছিলুম—কি দুর্দিনই না পড়েছে।

দুর্দিনের জয়ডঙ্কা কালের বুকে চিরদিনই বেজে চলেছে। মানুষ রাজ্য জয় করবার কৌশল শিখেছে বটে' কিন্তু দুর্দিনের কাছে তাকে চিরকাল হার মানতে হয়েছে।

এই দুপুরের যাত্রীদের মধ্যে আর এক জনের কথা মনে পড়ছে—সে ছিল ভিখারী, অন্ধ ভিখারী। খুব লম্বা-চওড়া ও হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ছিল তার—বিশেষ কোরে পা দু-খানা ছিল তার অদ্ভুত। অত বড় লম্বা-চওড়া ও শক্তিব্যঞ্জক পা পালোয়ানদের মধ্যেও দুর্লভ। ডান হাতে তার মাথা সমান উঁচু একটা মোটা বাঁশের লাঠি ঝুলাত আর বাঁ হাতে ঝুল্‌ত একটা রোগা কালো মতন প্যাংলা মেয়ে।

অন্ধ আবার গান গাইত। যেমন ছিল তার বিরাট দেহ, তেমনি ছিল তার কণ্ঠস্বর। উঃ, সে যেমন গম্ভীর, তেমনি কর্কশ ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু গাইয়ে হওয়ার পক্ষে এতগুলি প্রতিকূল গুণাবলীর সমাবেশ সত্ত্বেও তার গান পড়শীদের বুকে করুণার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিত, এমনি দরদ ছিল তাতে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে কর্কশ কণ্ঠে, কিন্তু তার সমস্ত অক্ষমতা ভেদ ক'রে হৃদয়-বেদনা শতধা উৎসারিত হচ্ছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে, সে গান নিশ্চয় তার নিজের রচনা নয়। চমৎকার গান—অন্ততঃ সে সময় খুবই ভাল লাগত। আজ সে গানের কথা ও স্মৃতি থেকে মুছে গেলেও ভাবটা মনে আছে।

অন্ধ গান গেয়ে চলেছে—অন্ধের যা কণ্ট তা ধৃতরাষ্ট্রই জানেন আর জানেন সেই অন্ধ মুনি—তিন যুগের ব্যাথার ঢল নামল স্তব্ধ দুপুরের বুকে! গান গেয়ে চলতে-চলতে এক জায়গায় এসে অন্ধ দাঁড়িয়ে বললে—মা জননী, অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটা পিঁ-পিঁ শব্দে টেনে-টেনে সুর ক'রে চীৎকার

করতে আরম্ভ করলে—মা গো, দয়া ক'রে অন্ধকে একটি পয়সা দিন।

হয়ত কোনো গৃহস্থবধূ তাকে একটা পয়সা দিলে কিংবা কেউ-ই কিছু দিলে না। অল্প কিছুক্ষণ চেঁচামেচি ক'রে আবার অন্ধ ফিরলে সামনের দিকে, আবার সুরু হোলো সেই গান আবার সুরু হোলো তার যাত্রা।

অন্ধ গান গেয়ে চলছে—আমি শুনেছি মাথার ওপরে নাকি আকাশ আছে, তার রং নাকি নীল। রাত্রিবেলা নাকি আকাশে ঝক্‌ঝকে সব তারা ফোটে, সে দৃশ্য নাকি খুব সুন্দর। কিন্তু নীল বা ঝক্‌ঝকে কাকে বলে তা আমি জানি না—আমি যে অন্ধ!

তার সেই নিদারুণ অভিযোগ আমাদের অন্তরে যে তরঙ্গ তুলত তা একমাত্র বালক-মনেই সম্ভব!

অন্ধ গেয়ে চলল—শুনেছি নাকি গাছে নানারকম ফুল হয়, বিচিত্র তাদের রং ও রূপ। সেখানে নাকি প্রজাপতি ওড়ে, তাদের রং ও রূপ বিচিত্রতর। হায়! আমি যে অন্ধ, আমার কিছুই দেখা হোলো না।

তার গানের মধ্যে একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে যেটা শাশ্বত সত্য। প্রত্যেক লোকেই জীবনে তা হয়ত বহুবার উপলব্ধি করেছেন। সে কথাটি হচ্ছে আঁখি নেই বিধি দিলি আঁখি জল—

এই অন্ধের সঙ্গে ছেলেবেলার আর একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়ির প্রায় সামনেই একজনেরা থাকত। ভাড়াটে বাড়ি হোলেও বেশ বড় বাড়ি, অবস্থা সচ্ছল ছিল তাঁদের। ছেলেরা দু-জন কলেজে পড়ত আর দু-জন চাকরী করত। বাড়ির কর্তা ভাল চাকরি করতেন—চোগা চাপকান পরে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াটে গাড়ি চড়ে রোজ আপিসে যাওয়া-আসা করতেন। এ ছাড়া দেশে জমি-জমা ছিল এবং সেখান থেকে আমদানিও মন্দ ছিল না। সেখান থেকে প্রায় তরি-তরকারী ও ফল-মূল আসত এবং বাড়ির গিন্নি পাড়ার প্রায় সব বাড়িতেই সে সব জিনিষ বিতরণ করতেন। তাঁদের বাড়িতে ছোট ছেলে-পিলে কেউ ছিল না বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ও ব্যবহারটি এমন মধুর ছিল যে পাড়ার অধিকাংশ ছোট ছেলে ও মেয়েদের আড্ডা ছিল সেখানে। বাড়ির কর্তা মাঝে-মাঝে ছেলেদের চার নম্বরের ফুটবল কিনে দিতেন—বিকেলে তাঁদের বড় উঠোনে আমরা খেলতুম। পাড়ার প্রায় সব ছেলেই এখানে যাতায়াত করলেও আমরা দু-ভাই এদের ভারি প্রিয়পাত্র ছিলুম, বোধ হয় সামনা-সামনি বাড়ি থাকায়।

কিছু দিন পরে বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে হোলো। বিয়ে, বৌভাত প্রভৃতি সেরে তাঁরা দেশ থেকে ফিরে এলেন। আমরা বৌ দেখলুম। জমিদারের মেয়ে, রং খুব ফর্শা না হোলেও বেশ দেখতে—বছর চোদ্দ-পনেরো হবে। চমৎকার হাসি-হাসি মুখ, টানা-টানা চোখ। বিদেশে শ্বশুরবাড়িতে এসে তখনকার দিনে মেয়েরা যে-রকম কান্নাকাটি করত তার সে-রকম কোন বালাই

ছিল না, বরং আমাদের মতন এতগুলি বাচ্ছা দেওর দেখে সে বেশ খুশিই হ'য়ে উঠল। কনে-বৌ অবস্থাতেই সে একদিন গাছ-কোমর বেঁধে আমাদের সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল, ফুটবল খেলতে। কিন্তু সে ঐ এক দিনই, খুব সম্ভব তার শাশুড়ী বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। তবে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সমানে ঝগড়া ক'রে ড্যাংগুলি খেলেছে।

যা হোক, ঐটুকু মেয়ে—আমাদের চাইতে আর কতই বা বড় ছিল সে, সেই এক পাল ছেলেকে সে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিল। এমনি ছিল তার আকর্ষণী শক্তি। মুখের কথা খসবার আগেই আমরা তার কাজ ক'রে দিতুম। বৌদির কোনো দুঃখই ছিল না, অন্তত আমরা বুঝতে পারতুম না—তবে বাড়ি থেকে একলা বেরিয়ে নিজের ইচ্ছামত এর-তার বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে গল্প করা অর্থাৎ মনের সুখে পাড়া-বেড়াতে পারে না বলে মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে চাপা দুঃখ প্রকাশ করত।

এক দিন দুপুর বেলা আমরা দু-ভাই এই রকম জানালায় বসে আছি, দূরে অন্ধ ভিখারীর গান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, মুখ তুলতেই চোখ পড়ল, বৌদি বারান্দায় চিক্ ফাঁক ক'রে দূরে অন্ধকে দেখবার চেষ্টা করছে। অন্ধ তাদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে বারান্দা থেকে সরে গেল।

একটু বাদেই দেখলুম, বৌদি তাদের সদর দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দু-দিকে দেখতে লাগল—লোকজন কেউ কোথাও আছে কি না! গ্রীষ্মের দুপুর, রাস্তায় লোকজন নেই, খাঁ-খাঁ করছে—একমাত্র সেই ভিখারী ও তার হস্তলগ্ন কন্যা ছাড়া।

ভিখারী বাড়ির সামনে বরাবর আসতেই বৌদি দরজা খুলে বেরিয়ে টপ্ ক'রে তাদের বাড়ির রকে উঠে পড়ল। রকের ঠিক নীচেই একবারে ভিতের গা-ঘেঁষে হাত-দুই চওড়া একটা নর্দমা ছিল—সে সময়ে শহরে অনেক রাস্তাতেই দু-পাশের বাড়ির গা দিয়ে এই রকম খোলা নর্দমা থাক্‌ত।

দেখলুম, বৌদি বিনা আয়াসে একটি লম্ফে একেবারে নর্দমা টপ্‌কে রাস্তায় পড়ল। তার পরে ভিখারীর হাতে পয়সা দিয়েই মারলে দৌড় বাড়ির দিকে।

ভিখারীর আশীর্বাণী তখনো শেষ হয়নি—দরজার সামনেই আমের খোশায় পা পড়ে বৌদি সশব্দে আছাড় খেল, সেই নর্দমা-ঢাকা পাথরের ওপরে।

ভিখারী গান গাইতে-গাইতে চলে গেল! আমরা দেখছি, বৌদি আর ওঠে না। দু-একবার ঘেঁষ্‌ড়ে ঘেঁষ্‌ড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে এলিয়ে পড়ল।

আমরা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু আমাদের সাধ্য কি যে তাকে তুলি! শেষকালে কোনো রকমে হেঁচ্‌ড়ে

টেনে তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলুম।

বৌদি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে কিংবা চলতে পারলে না—কাঁদতে-কাঁদতে আমাদের বললে—কোনো রকমে আমাকে ঘরে নিয়ে চল।

দুই ভাই তার দুই হাত ধরে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে ওপরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। যন্ত্রণার চোটে দেখতে-দেখতে তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। আমরা তার কষ্ট দেখে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তার শাশুড়ীকে ডাকবার উপক্রম করছি দেখে সে বললে—এখন যা, বিকেলে আসিস্—কারুকে কিছু বলিস্‌নি যেন!

বিকেলে সেখানে যাওয়া হয়নি। সন্ধ্যা বেলা মা বললেন—ও-বাড়ির বৌমার কি হয়েছে, দু দু-জন ডাক্তার এল।

পরের দিন বিকেলে বৌদিকে দেখতে গেলুম। এক দিনেই তার চেহারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, শুনলুম, কল-ঘরে পড়ে গিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে, কাল সকালে অজ্ঞান ক'রে হাড় জোড়া লাগানো হবে।

একটু নিরালা হ'তেই বৌদি আমাদের বললে—একটা কথা বলব, রাখবি ভাই?

—নিশ্চয় রাখব।

—আমি এদের বলেছি যে কল-ঘরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে। ভিকিরিকে পয়সা দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলুম জানতে পারলে এরা আর আমায় আস্ত রাখবে না। লক্ষ্মী ভাই, তোরা কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

পরদুঃখকাতরতা তখনকার দিনেও গুণ বলেই বিবেচিত হোতো, কিন্তু পরদুঃখে কাতর হ'য়ে বৌ-মানুষের রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়া অমার্জনীয় ছিল।

বৌদির পায়ে কাঠ বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হোলো বটে, কিন্তু অসুখ তার আর সারল না। দিনে-দিনে নানা উপসর্গ জুটে অবস্থা ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠতে লাগল। দেশ থেকে তার বাপ-মা এলেন, সায়েব ডাক্তারও এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। দু-দিনের জন্য এসে সবাইকে আপন ক'রে, পাড়া-শুদ্ধ ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে এক দিন সে চলে গেল।

বিশ্বাস ক'রে এক দিন সে আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করেছিল আজ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সে ঋণ শোধ করলুম।

জানলার ধারে বসে আছি—বাইরে জগৎ গড়িয়ে চলেছে, রোদও গড়াতে-গড়াতে গলি পেরিয়ে চলে গেল। ঠিকে-ঝিরা সব কাজে আসতে লাগল। বিকেল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার রংই বদলে গেল।

দুপুরের ফেরিওয়ালার দল চলে গেছে অনেক দূরে। বিকেলের ফেরিওয়ালারা প্রায়ই খাবার-দাবার ও সৌখিন জিনিষ বিক্রি করে। একটা

জিনিষ সেকালে খুবই চলত, সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ-বেকারির পাঁউরুটি-বিস্কুট। মাথায় টিনের বাক্স, খালি গায়ে গলায় লম্বা পৈতে-ঝোলানো ব্রাহ্মণ ফেরি-ওয়ালার দল বেরুত। শীতকালে জামার গলার কাছে পৈতের খানিকটা বের করা থাকত। সেদিনের হিসেবেও সেগুলো ছিল যাচ্ছে তাই খাদ্য। সে সময় পাঁউরুটি খাওয়ার রেওয়াজ খুবই কম ছিল, বিশেষ ক'রে মুসলমানের দোকানের কিংবা গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের পাঁউরুটি অধিকাংশ বাড়ীতেই ঢুকতে পেত না।

চলেছে বিকেলের ফেরিওয়ালার দল—ঘুগনিদানা, নকলদানা, চীনেবাদাম, চানাচুর, পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি, আলু-কাচালু, প্রভৃতি যত সব মুখরোচক ও প্রাণঘাতক অখাদ্য। পাঁঠার ঘুগনি, ডিমের ঘুগনি ছেলেরা লুকিয়ে খেত। সাধারণ লোক প্রকাশ্যে মুরগী অথবা মুরগীর ডিম খাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। হাঁসের ডিমও অনেক বাড়ীর হেঁসেলে ঢুকতে পেত না, বিশেষ ক'রে যে বাড়ীতে উড়ে-বামুন পাচক থাকত। এই উড়ে-বামুনের প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল।

সেকালে, শুধু সেকালে কেন, একালেও অনেক বাঙালী গৃহস্থের বাড়ীতেই উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ রাখা হয় রান্না করবার জন্য। কেন জানি না, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ডিমের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। আমাদের একটি বিশেষ জানা লোক উড়িষ্যার কোন দেশীয় রাজ্যে চাকরী করতেন। মাঝে-মাঝে ছুটিতে তিনি বাড়ীতে অর্থাৎ কলকাতায় এসে কিছু দিন ক'রে কাটিয়ে যেতেন। এই রকম সময়ে এক দিন সকাল বেলায় ভদ্রলোক বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময় সামনের বাড়ীর ঠাকুর কি কাজে বেরুচ্ছিল—পড়ে গেল তাঁর সামনে। লোকটাকে তিনি চিনতেন, কারণ চাকুরী-স্থানে তাঁর বাগানে সে দিন-কয়েক মালীর কাজ করেছিল। সে ছিল জাতে 'পান' অর্থাৎ হাড়ি-মুচী শ্রেণীর—কলকাতায় এসে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বামুন সেজে লোকের জাত মেরে বেড়াচ্ছিল। যেখানে সে কাজ করত, তাঁরা ছিলেন অব্রাহ্মণ। তাই রাঁধুনী-বামুন হোলেও শাপমন্যির ভয়ে তাঁরা তাকে যতদূর সম্ভব সম্ভ্রম ক'রেই চলতেন। কিন্তু যাঁহাতক প্রকাশ হওয়া যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়, অমনি পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাঁরাও তাকে ধড়াধ্বড় পিটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। লোকটা তো পালিয়ে বাঁচল—তখুনি ঠিকে-গাড়ি চড়ে বাড়িশুদ্ধ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁরা গঙ্গা নাইতে ছুটলেন এত দিনের হজম-করা পাপ খণ্ডাবার জন্য। সেদিন আর তাঁদের বাড়ি হাঁড়ি চড়ল না। এ রকম ব্যাপার নিত্য ধরা না পড়লেও অনেক অব্রাহ্মণকে কলকাতায় এসে দায়ে পড়ে যে ব্রাহ্মণ হ'তে হোতো সে কথা বলাই বাহুল্য।

ছাতে

ছাতের ছবি সারাদিন ধরেই বদলে চলত সেকালে। বাড়ীর সব চাইতে উঁচু ও সবার মাথার ওপরে থেকেও প্রতিদিন নিজের অঙ্গে সে এত ধুলো মাখে কোথা থেকে, ছেলেবেলা সে একটা সমস্যা ছিল। তা ছাড়া, আর এক রকম কালো-কালো গুঁড়ো. ধুলোর চেয়ে একটু শক্ত জিনিষ—সেগুলোই বা কি? দু-পা চলতে না চলতে পায়ের তলাটা একেবারে কালো হ'য়ে যায়!

খুব ভোরে ছাতে উঠে দেখেছি, দূরে এক বাড়ির ছাতে এক জন সদ্য-রোগমুক্ত—রাস্তায় বেরুবার শক্তি নেই কিন্তু চলশক্তি আছে, ধীরে-ধীরে বেড়াচ্ছে। দু-এক জন অতি-বৃদ্ধকেও দেখেছি, এই সময় ছাতে উঠে তাঁরা আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করতেন। রোদ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু এই দল নীচে নেমে যেতেন। ব্যস্, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে ছাতের সম্পর্ক এই পর্যন্ত। কারণ, অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে আসার পূর্বে পুরুষেরা আর ছাতে উঠতে পারতেন না—পাড়ায় সদ্ভাব রেখে যাঁরা থাকতে চাইতেন তাঁরা এ নিয়মটীর প্রতি খুব সজাগ থাকতেন।

বৃদ্ধ ও রুগ্নের দল নেমে গেলে ঝি উঠল ছাত ঝাঁট দিতে আর সন্ধ্যে-বেলায় মেলে-দেওয়া কাপড়ের আণ্ডিল কুঁচিয়ে, পাট ক'রে তুলতে। এই ছাত ঝাঁট দেবার সময়টা ছিল তাদের সকালবেলা বিশ্রামের সময়। একবার ছাতে চড়তে পারলে আর নামবার নামটি নেই। নীচে থেকে গিন্নিরা চেঁচাচ্ছেন, ঝিয়ের কানেও পৌঁচচ্ছে না। যদি বা একবার সাড়া দিলে তো কাজ তখনো অনেক বাকি। সেকালে গালাগালি দিয়ে এক রকম টেনে নীচে নামানো হোলো—এ ব্যাপার প্রায় প্রতি সংসারেই প্রতিদিনকার ব্যাপার ছিল। অনেক গিন্নিকেই বলতে শুনেছি যে, ওরা সারা রাত জাগে কি না তাই ছাতে উঠে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আসল কথা, তারা ছাতে গিয়ে ঘুমোত না, সেখানে গিয়ে জেগে উঠত।

তখনকার দিনে, শুধু তখন কেন এখনকার দিনেও ঝি-রা থাকে বস্তির মধ্যে খোলার বাড়িতে। সে সব বাড়ি আমরা দেখেছি। ছোট্ট একখানা ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে, খোলার চাল। হয়ত কোনো ঘরে একহাত চৌকো বাঁশের জালি দেওয়া একটু জানালা। সে মেজেতে শোওয়া যায় না, তাই তক্তাপোষ একখানা করতেই হয়। তক্তাপোষের চারটে পায়ার নীচে ইঁট দিয়ে-দিয়ে সেখানাকে যত দূর সম্ভব উঁচু করা! কারণ, তক্তাপোষের নীচে সেই জায়গা-টুকুতে হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন, ভাঁড়ার, জলের কলসী, পানের বাসন প্রভৃতি থাকে এবং সেইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া চলে।

পাশাপাশি ঘর প্রায় চারদিকেই, মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠোন। উঠোনের

এক কোনে একটা কুয়ো। এই কুয়োর জলই ব্যবহৃত হয়, যার গতর আছে সে রাস্তার কল থেকে খাবার জল সংগ্রহ করে। ঘরের সামনে হাত-তিনেক চওড়া একটু বারান্দা মতন, এই বারান্দা অথবা দাওয়া যার ঘরের সামনে যতটুকু পড়েছে সেইটুকু রান্না করবার জায়গা। দাওয়ার চালটা উঠোনের দিকে এতখানি ঝোলা যে, যে-কোনো সাইজের বয়স্ক লোককে প্রায় গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়, অসাবধান হোলে মাথা বাঁচানো দায়। ঘরে আলো-বাতাস একদম ঢোকে না বললেই চলে। শব্দ শুনে টের পেতে হয় যে বাইরে ঝড় উঠেছে। কিন্তু চার ফোঁটা বৃষ্টি হোলেও তা চালের ফাঁক দিয়ে ঘরে পড়ে। তার ওপরে বাড়ীর মধ্যে কি গন্ধ! উঃ, সে কথা মনে করলেও পাপ হয়!

এই নরককুণ্ডের মধ্যে বাস ক'রে মনিব বাড়ির উঁচু ছাতে উঠে সকাল বেলাকার সেই ঝলমলে আলো, দূর-দিগন্ত অবধি উঁচু, নীচু ছোট বড় বাড়ী এর মধ্যে-মধ্যে নারকোল ও কেষ্টচূড়া ফুলের গাছ, কোন্ দূরে কলের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কোন মন্দির-চূড়োর স্বর্ণকুম্ভ ঝক্ ঝক্ করছে! অনেক-অনেক দূরে মনিমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম দৃষ্টিতেই আবার তাকে দেখা যায় না, উঁচু-উঁচু বাড়ীগুলোর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে—এ সবই যে তার কাছে নতুন, তার জীবনযাত্রার সীমার বাইরে। এই বিস্ময়লোকে জেগে উঠে তারা আত্মহারা হ'য়ে যেত—গিন্নির কর্কশ চীৎকারে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার কাজে লেগে যেত।

এ আমার কল্পনা নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে একজন ঝি ছিল, তাকে আমরা জন্মাবধিই দেখেছি। খুব বয়স হয়েছিল তার, কোমরটা এমন বেঁকে গিয়েছিল যে হাঁটবার সময় নীচের দিকে মুখ ক'রে চলত। ভোর হ'তে না হ'তে সে আসত। বলত, সারা-রাত ঘুম হয় না, রাত পোয়ালেই বেরিয়ে পড়ি। বেলা দশটা নাগাদ চলে যেত আবার আসত তিনটেয় আর বাড়ী ফিরত রাত্রি ন-টায়—কোন দিন আমরা আব্দার ধরলে রাত্রে বাড়ী যেত না—আমাদের কাছে শুয়ে গল্প বলত।

শরতের মাকে কোন কাজ করতে হোতো না শুধু আমাদের, অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের তদারক করতে হোতো। সে কাজ যে কতখানি শক্ত তা যেদিন সে কামাই করত সেদিন বাড়ীর সবাই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতেন। শরতের মা তার নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনীগুলোকে খুব মর্মস্পর্শী ক'রে বলতে পারত। প্রধানত এই গুণেই সে আমার মতন সাংঘাতিক দুষ্টু ছেলেকেও বশে এনেছিল। তারই মুখে শুনেছি সে প্রথম-প্রথম চাকরী করতে এসে ছাতে গিয়ে চারিদিকের দৃশ্যের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলত—দু-তিন জায়গায় এই অপরাধে চাকরীও গিয়েছে।

শরতের মার আর একটি গুণ ছিল এই যে, তাকে বকে-ঝকে গালা-গালি দিয়ে কেউ রাগাতে পারত না। গালাগালি দিলে সে ফোগলা মুখ

হাঁ ক'রে হাসতে থাক্‌ত। দুঃখ পেয়ে-পেয়ে সংসারের কাছে এমন নিঃশেষে সে আত্মসমর্পণ করেছিল যা 'যোগিজনোচিত' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শরতের মা বল্‌তো যে খুব ছোটবেলা থেকেই সে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের দেশের এক বড়লোকের বাড়িতে তাদের আড়াই বছরের মেয়ের খেলার সঙ্গী হ'য়ে যখন সে প্রথম চাকরী করতে ঢোকে তখন তার বয়েস আট বছরের বেশী হবে না। বড়লোকের বাড়ী চতুর্দিকে কত রকমের সব জিনিষ পড়ে থাকে যা তার চোখে আগে কখনো পড়েনি—ভাঙা চুড়ির ঝক্‌ঝকে টুকরো, কাগজের ভাঙা বাক্স, হাত-পা-মাথা ভাঙা মাটির পুতুল, ছেঁড়া রেশমের ও রঙিন কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মহামূল্য জিনিষ যেখানে যা কুড়িয়ে পেত তাই নিয়ে বাড়ীর এক জায়গায় সে খেলা-ঘর জমিয়ে তুলেছিল। মেয়েটিকে নিয়ে সে এই খেলা-ঘরে গিয়ে বসত। সে খেলতে থাক্‌ত আর মেয়েটি চুপচাপ বসে একমনে তার কথা শুনত আর খেলা দেখত।

কিছু দিন খেলা দেখতে-দেখতে মেয়েটিরও খেলবার সখ চাপল। তখন সুরু হোলো দু-জনে ঝগড়া। একদিন একটু বাড়াবাড়ি হ'তেই মেয়েটা উঠল কেঁদে, ফলে দু-তিন জন গিন্নি ছুটে এলেন ওপরে। দু-পক্ষের কথা শুনে তাঁরা তার সব জিনিষপত্র টেনে এনে মেয়েটিকে দিয়ে তাকে বললেন, এ সব জিনিষ কি তুই তোর বাপের ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলি ?

সে বললে—আমার জিনিষ ফেরত না দিলে আমি কাজ করব না।

তারা বললে—দূর হ'য়ে যা !

এই অবধি বলে সে একটা নিশ্বাস ফেলে বলত—কিন্তু দূর যে হওয়া যায় না, তা আমার অন্তরাত্মা জানত। তাই তাদের চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে বাগানের দিকের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, গরাদ ধরে।

বেলা গড়াতে লাগল। দু-একবার তারা খেতে ডাকলে কিন্তু আমার জিদ—জিনি। না পেলে কিছুতেই খাব না।

ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, চারদিক্‌ অন্ধকার থম্‌থম করছে, আমার ভয় করতে লাগল। মনে হোতে লাগল যে, মার কাছে চলে যাই, কিন্তু সেও অনেকখানি অন্ধকার পেরুতে হবে। ভাবছি লাগাই দৌড়—এমন সময়ে বাগানের দিক থেকে কে যেন ডাকলে—শোন।

এত ভয় করছিল তো, কিন্তু আওয়াজটা কানে যেতেই আমার সব ভয় চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে দেখি যে জানালা থেকে একটু দূরে এক জন লোক শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাক, মুখ, চোখ কিছুই ভাল ক'রে দেখতে না পেলেও সে যে মানুষ তা বেশ বোঝা যেতে লাগল। আমাকে বলতে লাগল—তুই এ বাড়ির ঝি, ঝিয়ের আবার অভিমান কিসের রে ! তোকে জীবন ভোর ঝি-গিরি ক'রে খেতে হবে, এ রকম অভিমান করলে সারা জীবন কষ্ট পাবি।

এই রকম সব অনেক কথা, সব কথা আজ মনে নেই—বলতে বলতে লোকটা শ্নোই মিলিয়ে গেল।

সে বলত—সেই থেকেই ঠিক করল্ম, ভগবান যদি আজকের দিনটা আমার ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দেন, তা হোলে আর কখনো অভিমান করব না। তা ভগবান ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দিলেন। একটু পরেই সেই মেয়েটির মা এসে আমার জিনিষপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজে সামনে বসে খাওয়ালেন।

সে কথাগ্লো যে আমায় বলেছিল সে নিশ্চয় কোন দেবতা-টেবতা হবে। কারণ, তার কথাগ্লো ঠিক ফলে গেছে—আমাকে সারাজীবন খেটেই খেতে হোল। স্বামী, প্ত্র কেউ আমাকে ভাত দেয়নি। সারা জীবন ধরে আপনার লোক ও পর কত অন্যায় করেছে, অত্যাচার করেছে আমার ওপর, কিন্তু কার্র ওপরে রাগ বা অভিমান করিনি। নিজের বরাতকেই দ্ষেছি। এই জন্য ভগবান আজও আমাকে অন্নবস্ত্রের দ্ঃখ দেননি।

বাল্যকালে, অন্ভূতির অর্ণরাগে মানসাকাশ যখন সবে-মাত্র রাঙিয়ে উঠছে, সেই সময় শরতের মার এই কাহিনী সেখানে একখণ্ড কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলেছিল, এত দিন পরে এখানে তার বর্ষণ হ'য়ে গেল।

আবার ছাতে ওঠা যাক্!

ঝি ছাত থেকে নেমে যেতেই বাড়ীর মেয়েরা ছাতে উঠতে আরম্ভ করলে। একসঙ্গে নয়, পরে পরে, যার যখন স্নান শেষ হচ্ছে। আস্ছে একে-একে— কিশোরী, য্বতী, প্রৌঢ়া, খালি পিঠে ভিজে চ্ল এলানো। সকলে নিজের শাড়ী প্রভৃতি পরিপাটি ক'রে শ্কোতে দিয়ে নেমে গেল।

সে-য্গে বাঙালী পরিবারে ফ্রকের এত বাহ্ল্য ছিল না। অনেক বাড়ীতে পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েরাও শাড়ী পরত। তার পরে আস্তে লাগল কাঁথা, মাদ্র, সতরঞ্চি, মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কি নয়! ছাতে কাপড় শোকানো দেখে বাড়ীর হাল-চাল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে দিতে পারা যেত।

এর পরে গ্রীষ্মের খর রোদ পোহাতে এল আমসত্ত্ব, আমচ্র, জারক লেব্, গ্ল ইত্যাদির দল। গিন্নিরা যে-যার শয়ন-গৃহে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে ভাগ্যহীনার ওপরে রইল ছাতের ওপরকার ঐ মহার্ঘ দ্রব্যগ্লির তদারকের ভার—শ্ধ্ কাক নয়, বাড়ীর ছোটরাও যে তক্কে-তক্কে ফিরছে, সে কথা সবাই জানে।

প্রকৃতি দেবী নারীরই স্বজাতি, মধ্যে-মধ্যে বিদ্রোহ করা তাঁর স্বভাব। তাই গ্রীষ্মের দার্ণ দ্বিপ্রহরকে চমকে দিয়ে হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে যেদিন তিনি ঝড় তুলতেন সেদিন লাগত মজা। রাস্তার ধ্লো পাক খেয়ে-খেয়ে উঠতে লাগল ঘরে ও ছাতে, দ্মদাম্ ক'রে দরজা-জানালা পড়তে লাগল।

গিন্নিদের ঘুম ছুটে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে চোখ খুলেই আকাশের ঐ মূর্ত্তি দেখে ছুটলেন ছাতের সিঁড়ির দিকে—যাবার সময় চিল-চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁরা ঘুমের কোলে যে যেমন অবস্থায় ছিলেন, উঠে সেই অবস্থাতেই ছুটলেন ছাতের দিকে—ছোটরাও, হুল্লোড়ের এমন সুযোগ পেয়ে ছুটল তাঁদের পিছু-পিছু।

প্রকৃতির বুকে উঠেছে ঝঞ্ঝা আর ছাতে-ছাতে উঠেছে ঝঞ্ঝারূপিণীর ঝাঁক—চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, অর্দ্ধ বিবসনা কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাতও নেই—ঝড়ের উন্মাদ নর্ত্তনের মাঝে তারা যেন একাকার হ'য়ে গিয়েছে। আমসত্ত বাঁচাতেই হবে—ছোট ছেলেটা কি কারণে আম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমসত্ত পেলে খায়। অমুকে আমচুর ভালবাসে, তমুকে আমসি ভালবাসে। মিষ্টি আচার ও জারক লেবুকেও ভালবাসবার লোকের অভাব সংসারে নেই। শুকনো কাপড়গুলো, বিশেষ ক'রে ছোটদের কাপড় ও কাঁথাগুলি বাঁচাতে না পারলে বিকেলের মধ্যেই সংসারচক্র লাইনচ্যুত হবার সম্ভাবনা—বাঁচা বাঁচা, তোল তোল, ছোট্ ছোট্—যাক, সব বেঁচে গেল!

ঐ যা! গুল্‌গুলো তোলা হয়নি। সে বেচারারা ছাতের এক কোণে পড়ে ভিজতে লাগল। গুল্ খেতে কেউ ভালবাসে না, তাই তার কথা কারুরই মনে পড়ল না।

কবি বলেছেন, গ্রীষ্মের 'দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ'। কথাটা সে যুগের কলকাতার লোকদের বাড়ির ছাত সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিকেল হবার আগে থাকতেই মেয়েদের চুল বাঁধবার পালা সুরু হোতো। তার পরে কাজ-কর্ম সেরে স্নান ক'রে ধোপদোস্ত, একেবারে ঝক্‌ঝকে হ'য়ে তাঁরা ছাতে উঠতেন, ছোট-বড় কেউ বাদ নয়। কুমারী ও যাদের ছেলেপুলে এখনো হয়নি এমন বৌ-রা সাধারণতঃ কাঁচপোকা বা খয়েরের টিপ পরত। বড়রা টিপ পরতেন না এবং যতদূর মনে পড়ছে, সিঁদুরের টিপ পরার রেওয়াজ সে সময় ছিল না।

এ-ছাত ও ছাত ও সে-ছাতে সশব্দে আলাপচারী সুরু হ'য়ে গেল। বাড়ীর ছেলেদের এবং কর্তাদের উদ্ভাবিত অথবা সংগ্রহ করা যত সব বাতেল্লা পল্লবিত হয়ে শাখা বিস্তার করতে লাগল ছাত থেকে ছাতান্তরে। যে ছাতে পুরুষের কণ্ঠস্বর অবধি পেঁছয় না—সেই ছাতের সঙ্গেও সশব্দ-ইসারায় আলাপচারী হ'তে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রত্যেকেই প্রত্যেক বাড়ি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে গেল—এমন কি ও-বাড়ির সেজো-বৌয়ের মেজ ভাজ ক'মাস গর্ভবতী সে খবরটি পর্যন্ত।

এ আড্ডায় বয়সের পার্থক্য এক রকম উপেক্ষাই করা হোতো। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে কর্তারা সব বাড়ি ফিরতে লাগলেন আর মেয়েরাও একে-একে ছাত থেকে নেমে পড়তে আরম্ভ করলেন। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে-

সঙ্গে ছাত হ'য়ে পড়ল ভোঁ-ভাঁ—শুধু এখানে-সেখানে দু-একখানি অভাগিনী শাড়ী আকুল আবেগে বন্ধন-মোচনের চেষ্টা করতে লাগল।

২

ছাতের সঙ্গে আরও কিছু স্মৃতি জীবনকে জড়িয়ে আছে, যা না বললে ছাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা করা হবে। সুখ-স্মৃতি হ'লেও তা অশ্রুময় সুখ-স্মৃতি।

গ্রীষ্মকালে বাড়ীর প্রায় সকলেই, মানে বড়রা, রাত্রে ছাতে শুতেন। ছোটদের ছাতে শোওয়া বারণ ছিল। ছাতে শুতে আমাদের দুই ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু ইতিপূর্বেই ছোটদের ছাতে শোয়ার বিরুদ্ধে বাড়ীতে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী হ'য়েছিল যে, মনের ইচ্ছাটা সকলের সামনে প্রকাশ করতে সাহসই হোতো না। ছাতে শুলে ছোটদের বিছে, সাপ ও নানা প্রকার বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়াতে পারে, তা ছাড়া ঠাণ্ডা লেগে কিনা হ'তে পারে!

সংসারে এত ভাল-ভাল জায়গা থাকতে ঐ কাঁকড়া-বিছে প্রমুখ সাংঘাতিক জীবগুলি ছাতে বাস করেন কেন এবং দংশনবিলাসের ভাল-ভাল উপকরণ ছাতময় এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ ক'রে ছোটদের ওপরে তাঁদের এত আক্রোশের কারণ কি—এ প্রশ্নটা সে সময় খুবই পীড়া দিয়েছিল।

তথাপি একদিন এই বিরুদ্ধ-ব্যূহ ভেদ ক'রে মার কাছে মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ ক'রে ফেলা গেল। কিন্তু মা হাঁ কিম্বা না কিছুই না বলায় আমাদের সাহস বেড়ে গেল। দুই ভাই, মাকে একলা পেলেই ছাতে শোবার জন্য বায়না সুরু ক'রে দিলুম। শেষকালে মা-ই আমাদের হ'য়ে সুপারিশ করায় বাবা আমাদের ছাতে শোওয়া মঞ্জুর করলেন—কিন্তু সব দিন নয়। কেবল মাত্র শনি ও রবিবার রাতে, তবে জামা গায়ে দিয়ে শুতে হবে।

শনিবার আমার জীবন-প্রভাতেই মধুবার রূপে দেখা দিয়েছিল।

ছাতে শোবার আবেদন মঞ্জুর হওয়াতে যে কি রকম খুশী হলুম, তা উল্লেখ করাই বাহুল্য। প্রায় শৈশব থেকেই আমাদের আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেহাৎ অসুখ-বিসুখ না করলে রাতে মাকে কাছে পেতুম না। ছাতে শোওয়া হবে, আর মার কাছে শোওয়া হবে, এটা কম খুশীর কথা ছিল না সেদিন।

একটা বড় সতরঞ্চির ওপরে পাশাপাশি তিনটে বালিশ। মধ্যে মা শুয়ে দুপাশ থেকে আমরা দু-ভাই তাঁকে একান্ত দখল করেছি। বাবা একটু দূরে শুয়ে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে—কারণ তাঁর বিছানাটা আমরাই করেছি কি না। আর-আর দু-চার জন, তাঁরাও দূরে-দূরে শুয়ে আছেন।

ছাতে শুয়ে আকাশের সঙ্গে প্রথমে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে আমসত্ত্ব বা আচার চুরি করতে উঠে কিংবা দিনের বেলায় কখনো সখনো ঘাড়

ভুলে যে-আকাশ এতদিন দেখেছি, সে আকাশ আকাশই নয়। চোখের সামনে আলোর আড়াল দিয়ে আকাশ তার আসল রূপ আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল—আকাশের স্বরূপ প্রকাশ হয় রাত্রে।

কোনো আয়াস নেই, চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে দেখি চাঁদে আর মেঘে লুকোচুরি খেলা চলেছে। নীল পটে হাল্কা মেঘ দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে বাতাস। কত সম্ভব ও অসম্ভব চিত্রলেখা—কিছুক্ষণ দেখতে-দেখতে আত্মহারা হ'য়ে যেতে হয়। তারাদের কথা ভাবতে-ভাবতে কল্পনা হাঁপিয়ে পড়ে— এই রহস্যের আবরণ মা একটু একটু ক'রে মোচন করতেন।

ঐ যে চাঁদ, ওকে ঘিরে সাতাশটি তারা আছে, তারা সব চাঁদের স্ত্রী—দক্ষ রাজার মেয়ে তারা। দেবতা হোলেও একদিন ওরা আমাদেরই মতন পৃথিবীতে বিচরণ করত। চাঁদের বুকে ঐ কলঙ্কের দাগ কেমন ক'রে হোলো, এমনি কত কাহিনী—কত যুগ-যুগ আগের লোকেরাও চাঁদকে ঠিক এমনিই দেখেছে আজ আমরা যেমনটি দেখছি। এখানে আর ওরা আসতে পারে না, আমরাও ওখানে যেতে পারি না তবুও এইখানকার কত অশ্রু ও বেদনার ইতিহাস ওদের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে। ওরা এই পৃথিবীর লোকের কত কীর্ত্তিই না দেখেছে! ওরা আমাদেরই আপনার লোক, আজ অনেক দূরে চলে গেলে কি হবে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়নি। ওদের আমরা সব জানি, ওরাও আমাদের সব জানে। ঐ যে জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত তারার দল, ওর নাম সপ্তর্ষি। বশিষ্ঠ ঋষিরা ঐখানে থাকেন। কোন এক রাজার সঙ্গে বশিষ্ঠের বাধল ঝগড়া, তার ফলে ত্রিশঙ্কু বেচারা সপরিবারে ঐখানে আটকে আছেন। কি আর করবেন, ঐখানেই তাঁরা ঘরবাড়ী বানিয়ে নিয়েছেন।

শুনতে-শুনতে রহস্যলোকের অনেক গুপ্তকথাই আমাদের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ত। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মনে হোতো—আমাদের সঙ্গে তারাও যেন গল্প শুনছে। আমরা ওদের কথা জানতে পেরেছি দেখে মিট-মিট ক'রে কৌতুক-ভরা হাসি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। দোষ ধরা পড়ে গেলে যেমন ধরা পড়বার ভয় আর থাকে না, থাকে মাত্র একটু লজ্জা, তারার দল তেমনি যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ত আমাদের কাছে। একটু পরেই দুই দলে হ'য়ে যেত ভাব, মনের কথা সুরু হ'য়ে যেত।

মা গল্প বলতেন খুবই আস্তে-আস্তে। গল্প সুরু হবার আগেই আমাদের কল্পনা-ঘোড়া চনমন্ করতে থাকত ছোটবার জন্য—গল্প আরম্ভ হওয়া-মাত্র আসল কাহিনীকে পেছনে ফেলে সে মাইলের পর মাইল এগিয়ে ছুটত। প্রায়ই গল্প পুরো শোনা হোতো না, ঘুম এসে করত বিশ্বাসঘাতকতা —আজ যে ঘুমের প্রতীক্ষায় সারা-রাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়।

এক দিন, সেদিন ভয়ানক গরম। বাড়ীশুদ্ধ সব কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। খালি-পায়ে রাস্তায় বেরুনো-রূপ অন্যায় কার্যের শাস্তি-স্বরূপ সেই নিমন্ত্রণ-

স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে গৃহারণ্যের একতলা তেতলা ক'রে বেড়াচ্ছি। নিম্ন-প্রকৃতির কুলুর, আমুর প্রভৃতির সন্ধানে ফিরতে থাকলেও, সংসারে আমি একক, আমার কেউ নেই, আমিও কারুর নই, এই রকম একটা উচ্চ ভাব মনের মধ্যে লালন ক'রে চলেছি বিকেল থেকে! এই ভাবটিকে মনের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে ছাতে চড়া গেল শোবার উদ্দেশ্যে—যদিও ছাতে শোওয়া সেদিন আমার বারণ ছিল।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। বাড়ীতে কেউ নেই এই ভরসায় বীরদর্পে ছাতে উঠেই চোখে পড়ল, সেখানে বাবা শুয়ে রয়েছেন। নিঃশব্দ ত্বরিতগতিতে একেবারে উল্টোমুখ হ'য়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই বাবা আমাকে কাছে ডাকলেন। বাবা যে সে সময়ে ছাতে শুয়ে আছেন বা তাঁর সেখানে থাকবার সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমার কল্পনাতেও ছিল না। যা হোক, উপায় নেই, কাছে যেতেই হোলো।

বাবার ভয়াল গাম্ভীর্য, কঠিন শাসন, সামনে পড়লেই পাঠ্যবিষয়ক অপ্রীতিকর প্রশ্ন, চরিত্র সংশোধনের জন্য তস্মিন্ প্রীতি ও তস্য প্রিয়কার্য সাধনের উপদেশাবলী—এই সব মাল-মশলা মিলিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা দুল ঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হ'য়ে উঠেছিল। মোট কথা, তাঁর সান্নিধ্যে এলে আমরা অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করতুম।

কাছে যেতেই বাবা বললেন—এইখানে, আমার পাশে শোও।

বাক্যব্যয় না ক'রে শুয়ে পড়লুম। একটু বাদেই তিনি আদর করে আমার মাথায় হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন। বিকেল থেকে 'সংসারে আমার কেউ নেই' এই ভাব মনের মধ্যে পোষণ ক'রে শুতে এসে বাবার এই আদর—দুই বিপরীত ভাব-তরঙ্গের মাঝখানে পড়ে মনতরী টাল-মটাল খেতে শুরু করলে।

বাবা বলতে লাগলেন—আজ সারা বিকেলটা ধরে তোমাকে দেখলুম যে তুমি খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! কেন, তোমার কি চটি নেই?

—আছে।

—তবে? এই এক বছরও এখনো হয়নি, পায়ে ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফুটে কত দিন কষ্ট পেলে! তিন তিন-বার অস্ত্র ক'রে কাঁটা বেরুল না, শেষে অজ্ঞান ক'রে কাঁটা বের করতে হোলো—ভুলে গেছ! সে কষ্ট পেলে শুধু খালি পায়ে ঘোরার অভ্যেসে।

চুপ ক'রে রইলুম। বাবা বলে চল্লেন—শুধু কি তুমিই কষ্ট পেলে? তোমার সেই কষ্ট দেখে আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি! তোমার পায়ে এক-এক বার অস্ত্র করা হয়েছে, আর চিন্তায় ও কষ্টে দু-তিন রাত্রি ধরে আমি ঘুমুতে পারিনি, আপিসেও কাজ করতে পারিনি। তুমি বড় হচ্ছ, এ-সব তোমার বোঝা উচিত।

এমন করুণ ও স্নেহের সুর বাবার কণ্ঠে এর আগে আর শুনিনি—বাবার

প্রাচীর ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। বাবা বল্লেন—প্রতিজ্ঞা কর যে আজ থেকে আর কখনো খালি পায়ে ঘোরা-ফেরা করব না।

সেদিনের বাবার দেওয়া দেড় টাকা মূল্যের জুতো জোড়া আজ নিজের পয়সায় পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনতে হবে এমন দূরদৃষ্টের কথা শুধু আমি কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন বালকেরই কল্পনায় আসেনি, তাই প্রতিজ্ঞাটা টপ্‌ ক'রেই ক'রে ফেলেছিলুম। সেই কথা মনে হচ্ছে আর ভাবছি, বাবা এখন থাকলে কি সুবিধেটাই না হোতো?

জুতার পাট শেষ ক'রেই তিনি কাজের কথা পাড়লেন—আচ্ছা, এই যে আকাশ দেখছ, এর শেষ কোথায় বল তো?

বললুম—এর শেষ নেই, আকাশ অসীম।

শৈশব থেকেই অসীম, অনাদি, অনন্ত, অখিল ইত্যাদি কথাগুলোর সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—কথাটা তাল মতন লাগাতে পেরে বেশ খুশী হ'য়ে উঠলুম।

বাবা আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বল তো, এই আকাশ কে তৈরী করেছে?

বললুম—ভগবান।

উপরি-উপরি তত্ত্ববিদ্যার এই রকম দু-টি দুরূহ প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর পেয়ে বাবা দস্তুরমতন উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ভগবান কোথায় থাকেন বল তো?

খুব ছেলেবেলা থেকে রাত্রে ঘুমোবার আগে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় খাবার আগে আমরা চোখ বুজে হাত-জোড় করে প্রার্থনা করতুম। খাবার ও শোবার পূর্বের প্রার্থনার ভিন্ন-ভিন্ন বয়েৎ বাবাই আমাদের শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া, অন্যায় কাজ ক'রে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, না-পড়ে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, কড়া মাষ্টারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, জাগ্রত অবস্থায় প্রায় প্রতি মুহূর্তেই ভগবানের নাম জপ করতে থাকলেও তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার কৌতূহলই কখনো হয়নি—কাজেই এবারকার প্রশ্নে কাৎই হলুম।

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষই চুপ-চাপ। শেষকালে আমিই উল্টে প্রশ্ন করলুম—ভগবান কোথায় থাকেন বাবা?

—তিনি সব জায়গাতে সব সময়েই থাকেন।

—তাঁকে দেখা যায় না কেন বাবা?

—যারা তাঁকে দেখতে চায় তারা দেখতে পায়। তুমি ধ্রুবর গল্প জানো তো? ধ্রুব তাঁকে দেখবার জন্য কত কষ্ট করেছিলেন—শেষ কালে ভগবান তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—সাধু লোককে ভগবান দেখা দেন।

—আচ্ছা বাবা, তাঁকে চিঠি লেখা যায় না ?

—না।

—তিনি কারুকে চিঠি লেখেন ?

—হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের জন্যই চিঠি লিখে রেখেছেন—ফুলে, ফলে, গাছের পাতায়, কত জায়গায় তাঁর লেখা ছড়িয়ে রয়েছে—সাধু লোকেরা সে-সব লেখা পড়তে পারেন।

বাবা বলতে লাগলেন—আমরা ঐ যে আকাশ দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে তারা-ভরা আকাশ, ওখানেও কত কথা লেখা আছে !

বললুম—কৈ, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না বাবা ?

বাবা বল্লেন—মনে কর, আকাশটা যেন একখানা বিরাট শ্লেট্—তার ওপরে তিনি জ্যোতির অক্ষরে ঐ সব লেখা লিখে রেখেছেন—কায়মনে চেষ্টা করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি কি বলছেন।

—আমরা বুঝতে পারি না বাবা ?

এবার তিনি নিবিড়ভাবে আমায় আদর করতে-করতে ধরা ধরা গলায় বললেন—তুমি যখন বড় হবে বাবা, তখন চেষ্টা কোরো, ঠিক বুঝতে পারবে।

বাবা আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু সে-সব আর আমার কানে গেল না। ঐ কালো শ্লেটে আলোর অক্ষরে চিঠির কথাই কেবল মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গুঞ্জরণ করতে লাগল।

সেই থেকে, সেই সুদূরে অতীতে, বাল্যকালের বিস্মৃতপ্রায় এক রাত্রির অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে যে আকর্ষণে আমি বাঁধা পড়েছিলুম, সে বন্ধন আজও অটুট আছে। সারা জীবন ধরে, সুখে দুঃখে শোকে ও ভোগে সর্ব অবস্থায় আকাশ আমাকে টেনেছে তার কাছে—ভোগের অজস্র উপাদানের মধ্যে আত্মহারা হ'য়ে সমাজ, সংস্কার ও সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেছি, তারই মধ্যে আহ্বান পাঠিয়েছে আমাকে সেই কালো শ্লেটে আঁকা জ্যোতির অক্ষর। উন্মাদনা ঝেড়ে ফেলে ছুটে গিয়ে বসেছি তার নীচে। কত দিন আকাশের দিকে দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে, ঐ সুনীল রহস্যের যবনিকা এইবার বোধ হয় খসে পড়ল—ঐ জ্যোতির ইঙ্গিত এতদিনে বুঝি বা ধরা দেয় ! কিন্তু হায় ! বারে বারে আমারই মানসাকাশ আত্ম-অভিমানের মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে, আর সব ঝাপ্সা হ'য়ে গিয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশের চেয়ে বড় আকর্ষণ আমার আর নেই।

রাতে

আজকাল শহর বড় হয়েছে, লোকজন গাড়ী অনেক বেড়েছে, রাস্তায় বেরুলে মনে হয় যেন রথের মেলায় ঢুকে পড়েছি। শহরের অনেক পরিবর্তন হ'লেও বাঙালী-চরিত্রের একটা দিকের পরিবর্ত্তন হয়েছে খুবই কম। অর্থাৎ কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরলে তারা আর গর্ত্ত ছেড়ে বেরুতে চায় না। সাধারণতঃ বাঙালীর জীবন তার চাকরী-ব্যবসা-কাজকর্ম অর্থাৎ অর্থ অন্বেষণ ও সংসার, এই নিয়ে। মুখে যাই বলুক না কেন, কার্য্যতঃ অধিকাংশ লোকই এই গণ্ডির বাইরে পা দিতে চায় না। প্রায় প্রত্যেক বাঙালীই অবাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না এবং নিজের ক্ষেত্রের বাইরে অন্য আড্ডায় গিয়ে পড়লে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এই দোষ থেকে আজকাল অনেকে মুক্ত হ'লেও আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সম্বন্ধেই এই কথা বলা যেতে পারত।

হিন্দু-মুসলমানে প্রেমভাব বৃদ্ধি পাবার তালে-তালে দেখ্ দেখ্ ক'রে শহরে হিন্দুদের মধ্যে লুঙ্গি ও মুরগীর প্রভাব আজ যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আগে তা ছিল না।

কাজ-কর্ম সেরে বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে বা স্নান ক'রে অনেকেই একখানি আটহাতি ধুতি পরতেন। চোদ্দ হাত ধুতিতে লজ্জা নিবারণ হয় না, এমন সব শ্রীঅঙ্গে যখন সেই আটহাতি ধুতি চড়ত, তখন যে কি বাহার হোতো তা বলাই বাহুল্য—গো-হত্যার গন্ধ থাকলেও তার তুলনায় লুঙ্গিও ঢের সভ্য। এর পরে অবস্থা নির্বিশেষে যার যেমন জুটল, তেমন জলযোগ ক'রে কেউ বা বাড়ীতেই ছেলে ঠেঙাতে বসতেন আর কেউ বা হুঁকো হাতে, কেউ বা খালি হাতেই পাড়াতেই আড্ডা দিতে বেরুতেন। এই ছিল সাধারণ লোকের নিয়ম।

পথ জনবিরল হ'য়ে পড়ার সঙ্গে পথের দু-ধারের বাড়ীগুলোর রকে আড্ডা জমাট হোতো। প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই এইরকম দুটো-তিনটে রক থাকত যেখানে পাড়ার মুরুব্বীরা সন্ধ্যের পরে গিয়ে জমতেন—বে-পাড়া থেকেও কেউ-কেউ আসতেন। বর্ষা ও শীতের দিনে ঘরের মধ্যে বসা হোতো আর অন্য সময়ে রকে মাদুর কিংবা শতরঞ্চি পেতে বসা হোতো, সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ ক'রে সেই সাড়ে ন-টার তোপ পড়া পর্য্যন্ত।

সাড়ে ন-টার তোপ কলকাতাবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সাড়ে ন-টার তোপ ছাড়াও সে যুগে ঠিক ঐ সময় পোর্ট কমিশনারের ভোঁ বাজত প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। অনেক দিন আগেই কলকাতা তার এই সম্পদ দু-টি হারিয়েছিল, আজ সে নিজস্ব সময়টুকুও হারিয়েছে।

সে যুগে সাড়ে ন-টার তোপ পড়ার সঙ্গে থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতি আরম্ভ হোতো। আবগারী দোকান বন্ধ হোতো (অবশ্য সামনের দরজা) সাড়ে ন-টায়, ছেলেরা পড়া থেকে ত্রাণ পেত, বাবুদের আড্ডা ভাঙত, এ রকম কত কি?

রাতের ফেরিওয়ালারা সব সৌখিন জিনিষ নিয়ে বেরুতো—কুলপী বরফ, জামাইতত্ত্ব লেডিকেনি, জুঁয়ে গোড়ে, বেলের মালা এই রকম সব জিনিষ। রাতে এক রকম অবাক জলপানওয়ালা আসত, তারা নানা রকম মজার কবিতা আবৃত্তি করত, কেউ কেউ গানও করত। বাবুদের আড্ডায় এদের খুবই পশার ছিল। আধুনিক যুগে অবিশি অবাক জলপানওয়ালারা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে গান গায়—ফেরী করা সম্বন্ধে তারা অনেক উন্নত পন্থা অবলম্বন করেছে।

প্রায় এই সব আড্ডায় নিজেদের মধ্যে আপোষে তর্কাতর্কি হ'তে-হ'তে এমন ঝগড়া ও গালাগালি সুরু হোতো যে বাড়ীর-মধ্যেরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতেন—একটা মারামারি খুনোখুনি হয় বুঝি! কিন্তু তখনকার লোকদের আড্ডার প্রতি এমন নিষ্ঠা ছিল যে, হাজার ঝগড়া হ'লেও পরদিন সন্ধ্যেবেলায় আবার গুটি-গুটি আড্ডায় গিয়ে বসা চাই। এর চাইতে অনেক কম ঝগড়াতেও ভাইয়ে-ভাইয়ে ভিন্ন হ'য়ে যেতে দেখা যেত।

সেকালে রাত্রিবেলা বহুরূপী বেরুতো নানা রকম সাজে সেজে। কালী মূর্তি বহুরূপীর কথা মনে হ'লে আজও শিউরে উঠতে হয়। লোকটা গেঞ্জি undervest কালো রংয়ে ছুপিয়ে পরে দুই পায়ে ঘুঙুর চড়াতো। দু-টো খুব লম্বা-লম্বা ফাঁপা টিনের হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথায় কালী ঠাকুরের টিনের মুখোস পরে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন খল-খল ক'রে হাসতে আরম্ভ করত, তখন ছোটদের দল, তা যে যতই ওস্তাদ হোক না কেন, দৌড় দিত অন্দরমহলের দিকে।

বহুরূপীদের বেশ খাতিরও ছিল পাড়ায়। তারা যে মানুষ, অন্য কোন জীব নয়, এ জ্ঞান টনটনে থাকলেও কি জানি তবুও মনে হোতো তারা ঠিক আমাদের মতন নয়। প্রতিদিন কালী সেজে-সেজে তারা কালী ঠাকুরের অনেকখানি অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়েছে বলে মনে হোতো। গলায় টিনের নরমুণ্ডের মালা ঝুলছে বুঝতে পারলেও বুদ্ধিকে কল্পনার ধোঁকা লাগাতুম—আসলে ওগুলো সত্যিকারেরই নরমুণ্ড, তবে মা কালীর প্রভাবে ওগুলো লোকের মনে হয় যেন টিনের। আমরা মনে করতুম, ওরা লুকিয়ে নরমুণ্ড খায় ও নররক্ত পান করে। অমাবস্যার গভীর রাত্রে কালী ঠাকুর নিজে আসেন ওদের কাছে পুজো নেবার জন্য। লোকের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালে কিছু দিতেই হবে, নইলে শাপ মন্যি ঝেড়ে দিলে 'একদমসে গোচস' হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে!

ঠাকুর মার্কা বহুরূপীদের সম্বন্ধে এই রকম সব অতিপ্রাকৃত ধারণা-গুলোকে কল্পনার বাতাস দিয়ে আমরা খুবই উঁচুতে তুলে রেখেছিলুম, এমন সময় এক দিনের একটা ঘটনায় সব উড়ে গেল।

এক দিন, সেদিন নিশ্চয় শনিবার কিংবা কোন ছুটির দিন ছিল। নইলে সে সময় পাঠাগার ছেড়ে নীচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সন্ধ্যে উৎরে যাবার কিছু পরে আমাদের সদর দরজা খোলা পেয়ে ঝম্-ঝম্ আওয়াজ করতে করতে কালীমূর্তি একেবারে উঠোনে এসে হাজির হোলো। তার পেছনে রকের আড্ডা থেকে জন কয়েক উঠে এলেন। ভিড় বাড়ছে দেখে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো।

বহুরূপী খানিকক্ষণ অট্টহাসি হাসলে, তার পর ভয় দেখবার জন্য দু-এক-বার আমাদের দিকে তেড়ে এল। এতক্ষণ চলছিল বেশ কিন্তু হঠাৎ সে মাথার ওপর থেকে সেই দাঁত ও লম্বা জিভ বার-করা প্রকাণ্ড মুখোশটা খুলে ফেল্লে।

এঃ, এ যে একেবারে আমাদের মতনই। এক মুরুব্বী ভদ্রলোক ভড়াক ভড়াক ক'রে তামাক টেনে চলেছিলেন, বহুরূপী ঝম্-ঝম্ ক'রে সেদিকে এগিয়ে সেই লম্বা টিনের হাত একেবারে তাঁর নাকের ডগা অবধি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—বাবু, কলকেটা দয়া ক'রে একটু দেবেন?

আচম্‌কা নাকের ডগায় কালীর হাত দেখে—হোক্ না সে টিনের কালী—কিসে যে কি হয়, তা কে বলতে পারে!—ভদ্রলোক ভড়কে গিয়ে হুঁকো-হাতে তিন পা পিছিয়ে গেলেন।

একটা হাসাহাসি পড়ে গেল। ভদ্রলোক সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে এক রকম কাঁপতে-কাঁপতেই হুঁকোর মাথা থেকে কল্‌কেটা তুলে নিয়ে সেই টিনের হাতের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

বহুরূপী টপ-টপ ক'রে দু-হাতের খোলোশ খুলে মাটিতে নামিয়ে রেখে কলকেটা নিয়ে উবু হ'য়ে বসে দশ আঙুল দিয়ে সেটাকে সাপটে ধরে ফক্-ফক্ ক'রে টানতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আর এক জন, তাঁরও হাতে থেলো হুঁকো, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের দেশ কোথায় গা?

বহুরূপী সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কলকেটা নামিয়ে ধরে আগুনে খুব জোরে ফুঁ দিতে লাগল। তার পরে আবার গোটা কয়েক টান মেরে বল্লে—নাঃ, এতে কিছু নেই—নিন্ ঠাকুর, আপনার কল্‌কে—

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক খালি গায়েই এসেছিলেন। তখনকার দিনে মধ্যবিত্তের ঘরে দিবা-রাত্রি জামা টন্‌কে থাকবার রেওয়াজ ছিল না। গ্রীষ্মের দিনে বাড়ীতে তো বটেই, পাড়ায় বেরুতে হ'লেও লোকে খালি গায়েই বেরুত।

ভদ্রলোক নিজের হুকোর মাথায় কলকেটা বসাচ্ছেন, এমন সময় বহুরূপী বল্লে—সাধে কি আর বলে—বামুন-চোষা কল্‌কে!

কথাটা শুনে সভায় একেবারে হর্‌রা উঠে গেল। মেয়েরা ছিলেন আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেও চাপা হাসির দু-চারটে টুক্‌রো ছিট্‌কে এল।

ভদ্রলোক বিলক্ষণ চটে গিয়ে কি প্যাঁচে বহুরূপীকে কাৎ করা যায়, গুমু হ'য়ে তাই ভাবতে লাগলেন।

বহুরূপী কিন্তু নির্বিকার হ'য়ে অন্য দিকে ফিরে যে ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁকে বল্লে—দিন বাবু আপনার কল্‌কেটা।

ভদ্রলোক কলকেটা তুলে তার হাতে দিতেই সে আবার সেই রকম উবু হ'য়ে বসে সাঁই-সাঁই ক'রে দম লাগাতে লাগল—সভা হ'য়ে গেল একেবারে নিস্তব্ধ। আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই হাঁ ক'রে তার কল্‌কে-টানা দেখতে লাগলুম, সকলেই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম—এবার কি হয়!

মিনিটখানেক বাদে কলকেটা নামিয়ে মুখের সামুনেকার মেঘ তাড়াতে-তাড়াতে বহুরূপী বললে—হ্যাঁ বাবু, জিজ্ঞাসা করছিলেন দেশ কোথায়? দেশ আমাদের নদে জেলায়।

আগেকার ভদ্রলোক ততক্ষণে সামলে উঠে বহুরূপীকে বোধহয় একেবারে পেড়ে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি জাত হে?

যার কল্‌কে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বহুরূপী বিনীতভাবে তাঁকে বললে—আজ্ঞে, আমরা জাতে ছুতোর।

ভদ্রলোক বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে আবার একটি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন—তা বাপু, ছুতোরের ছেলে হ'য়ে জাত-ব্যবসা ছেড়ে এ উঞ্ছবৃত্তি করছ কেন?

বহুরূপী বেশ বিজ্ঞের মতন জবাব দিলে—জাত-ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু করা যদি উঞ্ছবৃত্তি হয়, তা হ'লে তো ঠগ বাছতে গাঁ ওজোড় হয়ে যাবে ঠাকুর। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি কি জাত-ব্যবসা করেন, না উঞ্ছবৃত্তিই ক'রে থাকেন আমার মতন?

সেখানে আরও দু-চার জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, কথাটা তাঁরা রঙ্গছলে গ্রহণ করতে পারলেন না। কেউ-কেউ দু-একটা মন্তব্যও ছাড়তে লাগলেন। এক জন বললেন—বলি ওহে, কথা তো খুব বলতে পার দেখছি, গান-টান গাইতে পার? বহুরূপী একেবারে বিনয়ের অবতার হ'য়ে বললে—তা একটু-আধটু পারি বৈ কি! পয়সা পেলেই গাই।

গানের হুকুম হোলো। বহুরূপী একটু ঘুনু-ঘুনু আওয়াজ ক'রে গলা ভেঁজে নিয়ে গান ধরলে—'শ্মশান ভালবাসিস্‌ বলে শ্মশান করেছি হৃদি।'

পুরোনো গান কিন্তু বহুরূপী ছিল সুকণ্ঠ—গানটা ভাবের সঙ্গে দু-তিন বার গেয়ে-গেয়ে সে থাম্‌ল। অত্যন্ত কষ্টকর আবহাওয়ার মধ্যে যেন মেঘবর্ষণ হোলো। তার বাক্যবাণে যাঁরা রাগ করেছিলেন তাদের উষ্মা কেটে গেল। দু-এক জনের চক্ষু লোক-দেখানো জলে ভরে উঠল।

পাড়ার জন-দুয়েক নামজাদা কালীভক্ত পুজোর দেরী হ'য়ে যাচ্ছে দেখে বেরিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে আবার গানের ফরমাশ সুরু হোলো।

এক জন রসিকতা করলেন—হ্যাঁ হে, নাচতে পার ?

বহুরূপী হাত জোড় ক'রে বললে – আজ্ঞে না।

আর একজন বললেন—নাচ না হে, লজ্জা কি! পায়ে ঘুমুর বেঁধেছ আর নাচতে জান না ? এ কি একটা কথা হোলো!

বহুরূপী আবার সেই রকম হাতজোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে, আমি নিজের ইচ্ছায় নাচি না—তবে আপনারা যখন বলছেন তখন নাচতেই হবে। বিদায়ের সময় ভুলবেন না।

সকলে মিলে বহুরূপীকে উৎসাহ দিতে লাগলেন—নাচো, নাচো—কোন ভয় নেই।

সবার কথায় বহুরূপী তার নাচ সুরু করলে।

বাপ রে, সে কি নাচ! কি লম্ফ কি ঝম্ফ! বাড়ীর ও বাইরের যত লোক ছিল সেখানে—ছেলে-বুড়ো কারুর মুখে আর বাক্য নেই! আর সে নাচের কি শেষ আছে! থেকে-থেকে ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে মাটি ছেড়ে হাত-দুয়েক শূন্যে লাফিয়ে উঠে এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসা, খাঁড়া দিয়ে অসুর বধ করা, যুদ্ধ করা, অসুর ধরে-ধরে খাওয়া—দেখতে দেখতে আমরা হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম আর মনে হোতে লাগল, ধরে না থামালে বোধ হয় আমাদের জীবন-ভোর এই রকম দাঁড়িয়ে নাচই দেখতে হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই রকম নেচে বহুরূপী এলিয়ে পড়ল।

যা হোক, নাচ শেষ হোলো, সকলে চুপচাপ, এ-ওর মুখ চাওয়া- চাওয়ি করছে, এমন সময় বহুরূপীই বললে—বাবু, এবার আমায় বিদায় দ্যান।

সকলের টনক নড়ল, বহুরূপী বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়ে আবার আসবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল।

বহুরূপী চলে যেতেই তার নাচ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'য়ে গেল। কেউ বললে—ব্যাটা আমাদের খুব বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল।

কেউ বললে—বাপের জন্মে এমন নাচ দেখিনি।

বৃদ্ধ অক্রুরবাবু এক জায়গায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন, এক জন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—অক্রুরদা কি বলেন ?

অক্রুরবাবু ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের লোক। দিন-রাত্রি তিনি আফিংয়ের মৌজে ভোম্ হ'য়ে থাকতেন—বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার পর তিনি আর চোখ চাইতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই তিনি পাড়াময় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আর একটি আশ্চর্য্য গুণ ছিল, তিনি চলতে চলতে, বাজার করতে-করতে, কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন। আমরা দেখেছি, অক্রুরবাবু মুদীর দোকান থেকে সওদা ক'রে ঠোঙা কিংবা ঘিয়ের বাটি হাতে নিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘুম লাগাচ্ছেন। পাড়ার ছোট-বড় সবার বাড়ীতেই আনন্দ-উৎসব, সুখ-দুঃখ

শোকের সময় অক্রূর বাবু যেতেন আর গিয়েই লাগাতেন ঘুম। সন্ধ্যার পর পাড়ার যত আড্ডা ও লোকের বাড়ী ঘুমিয়ে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। অথচ তিনি দুঃখ করতেন, বিছানায় বালিশ মাথায় দিয়ে সুখে ঘুম তাঁর হয় না, সারারাত্রি জেগেই কাটাতে হয়। সবার ওপরে অক্রূরবাবু ছিলেন সবজান্তা। দিবানিশি ঘুমিয়ে এত জ্ঞান তিনি সংগ্রহ করলেন কি ক'রে, তা পাড়ার সবার একটা গবেষণার বিষয় ছিল।

এ-হেন অক্রূরবাবু এক পাশে বসেছিলেন অর্থাৎ ঘুমুচ্ছিলেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি চোখ বুজেই বললেন—না হে, একে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এর মধ্যে জিনিস আছে। একে বলে তাণ্ডব নাচ।

সবার যেন একটা হদিশ লেগে গেল। তাণ্ডব সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'য়ে গেল। সে সম্বন্ধে যার যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তা আউড়ে যেতে লাগলেন। এক জন বেশ ফলাও ক'রে বললেন—আরে বাবা, আসল তাণ্ডব কি দেখতে পারা যায়! সবার চোখ তা সহ্য করতে পারে না। অনেক সাধনা করলে তবে সে নাচ দেখবার শক্তি হয়। সবার চোখে সব নাচ সহ্য হয় না।

জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, ভদ্রলোক সেদিন একটা মহা সত্যই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে, অনেক নাচই আমার চোখে অদ্যাখ্য বলে মনে হয়েছে কিন্তু অন্যে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এই বৈষম্যের কারণ যা শুনেছি, তা এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে ঐ কথাই বলতে হয়—সে নাচ বোঝবার মতন শক্তি আমার নেই।

আর এক জন ভদ্রলোক বললেন—থিয়েটারের নাচ কি আবার নাচ না কি? আসল নাচ হচ্ছে এই, তবে ব্যাটা ঠিক মত নাচতে পারলে না।

বাল্যাবস্থায় একবার থিয়েটার দেখেছিলুম। জীবনে সেই প্রথম দেখলুম নাচ। পরীর মত দেখতে সখীদের সেই চক্কর মেরে নাচ—ওঃ, সে যে কি ভালোই লেগেছিল, কি বলব! ভবিষ্যতে নৃত্যকলাটিকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হবে, এমন বাসনাও মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল এবং থিয়েটারের সেই নাচই ছিল আদর্শ। কিন্তু সেদিন যখন শুনলুম, থিয়েটারের সেই নাচ নাচ-নামেরই যোগ্য নয় এবং এই তিড়িং-মারাই হচ্ছে আসল নাচ, সেদিন বিচলিতই হয়েছিলুম। যাই হোক, সেই রাত্রেই বিছানায় শুয়ে সংকল্প করা গেল—কুছ পরোয়া নেই, ঐ তিড়িংমারা নাচই শিখতে হবে।

কিন্তু বিধাতা যাকে প্রতিভা দেন অথচ সেই অনুপাতে অর্থানুকূল্য করেন না, সে দুর্ভাগার দুনিয়ায় দুর্গতির আর সীমা থাকে না। তাই নাচ না শিখেও সারাজীবন ধরে নেচেই বেড়াতে হোলো—কখনো তাণ্ডব, কখনো কত্থক, কখনো বা কথাকলি। তবে সেই বহুরূপীরই মতন নিজের ইচ্ছায় নয়, পরের কথায়।

মুশকিল আশান

একদিন মার কাছে মুশকিল-আশানের নামটা শুনলুম। মুশকিল আশান কথাটার মধ্যে কেমন-যেন একটা চমক আছে। মুশকিল আশান দেবতার নাম। সেই দেবতাকে যারা পুজো করে, সেই সব সন্যেসীরা রাত্রি-বেলা বের হয়—লোকের কাছে মুশকিল-আশানের নাম শোনাতে। লোকের কাছে তারাও মুশকিল-আশান বলে পরিচিত। এ-পাড়াতেও একজন মুশকিল-আশান আসে মাঝে-মাঝে অনেক রাতে সে না কি আবার সবার বাড়ীতে যায় না। মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসে মুশকিল-আশানের নাম শুনিয়ে যায়, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি।

অনেক রাতে, রাস্তায় লোক-জন চলা যখন একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়, সেই নিশুতিতে অন্ধকার অলি-গলিতে বাতি হাতে নিয়ে লোকের দরজায় দাঁড়িয়ে মুশকিল-আশানের নাম করে—বিপদকে তারা ডরায় না, কারণ তারা মুশকিল-আশানের পুজারী।

মার কাছে আরও শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলুম যে, এই মুশকিল আশানেরা হিন্দু নয়, তারা মুসলমান সন্ন্যাসী অর্থাৎ ফকির। তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে বটে কিন্তু জটা করে না। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতন তারা ন্যাঙট পরে না, তারা পরে আলখাল্লার মতন একটা জিনিষ যাকে ওরা কফ্‌নি বলে।

মার মুখে শুনে মুশকিল-আশানের একটা ছবি মনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে দেখবার ইচ্ছাও প্রবল হতে লাগল। কিন্তু সে কি ক'রে সম্ভব হবে—সে আসে অনেক রাত্রে, এদিকে সাড়ে নটা বাজতে না বাজতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি যে!

আর এক দিন মার কাছে শুনলুম—কাল রাতে মুশকিল-আশান এসেছিল, আস্‌চে শুক্রবারে আবার আসবে, বলে রেখেছি তাকে তোদের দেখাব।

অনেক কষ্টে আশার শুক্রবার এসে পৌঁছল। সে রাত্রে আমরা মার কাছে শুলুম। অনেক রাতে, অর্থাৎ তখন আমরা অঘোরে ঘুমুচ্ছি, মা ডেকে তুলে বল্লেন—চল, মুশকিল-আশান এসেছে।

মার হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, আমরা ঘুমের ঘোরে টলতে-টলতে চললুম তাঁর পেছনে-পেছনে—রাত দুপুরে বাড়ীর সব জায়গাগুলোই যেন অপরিচিতের মতন ব্যবহার করে, তাই দু-একটা ঠোক্করও খেতে হল। দু-টো উচু-নীচু ছাত, সিঁড়ি, দুটো উঠোন পেরিয়ে আমাদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে মা সদর দরজার হুড়কো খুলে দিলেন।

প্রথমেই বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ল খানিকটা ধোঁয়া। তার পেছনে অদ্ভুত

পোষাক-পরা, অদ্ভুত প্রদীপ হাতে নিয়ে ঢুকল এক অদ্ভুত চেহারার মানুষ !

আমাদের দুই ভাইকে সামনে রেখে মা পিছনে এসে দাঁড়ালেন। মুশকিল-আশান এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল—আমরাও সেই তালে পেছোতে-পেছোতে একবারে মার গা-সাঁটা হ'য়ে গেলুম।

সম্ভ্রম, বিস্ময় ও ভয়-মিশ্রিত এক বিচিত্র পুলকে আমরা দেখতে লাগলুম সেই মুশকিল-আশানকে।

মাথায় তার লম্বা বাবরী, বেশ পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো। মুখে যেমন লম্বা তেমনি ঘন কাঁচা-পাকা দাড়ি—চোখ দু-টো ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যায় না। নাকের ওপরেও ইয়া লম্বা-লম্বা রোঁয়া জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতন উদ্যত হ'য়ে রয়েছে। অঙ্গে একটা ময়লা আলখাল্লা হাঁটু ছাড়িয়ে একটু নেমেছে, পায়ের বাকী অংশটা নগ্ন। আলখাল্লার গায়ে বড়-বড় কয়েকটা রঙিন কাপড়ের তালি! গলায় বড়-বড় শাদা ও নীল পুঁতির লম্বা মালা ঝুলছে, সেই রকমই আর একগাছা মালা বাঁ-হাতের কব্জীতে ঝুলছে। ডান হাতে অদ্ভুত এক দীপ—যেন ছোট একখানা কাঁসিতে বড় একটা ঘটি উপুড় করা। তা থেকে বদ্‌নার মতন দু-টো নল দু-দিক দিয়ে বেরিয়েছে, তার একটাতে ইয়া মোটা পলতে জ্বলছে দাউ-দাউ ক'রে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই খোলা উঠোন ধোঁয়া ও কেরাসিনের গন্ধে ভরপুর হ'য়ে গেল। কাঁসার খালি স্থানটুকুতে তেলকালি ও পয়সা মাখামাখি হ'য়ে পড়ে আছে।

বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় আমাদের চম্‌কে দিয়ে মুশকিল আশান সুর ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল—ইহা পীর মুশকিল-আশান—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান। তারপরে গড়-গড় ক'রে আরো কতকগুলো কি আউড়ে গেল বুঝতে পারলুম না।

মা তাকে বল্‌লেন—বাবা, আমার এই ছেলে দু-টো বড্ড দুরন্ত—মুশকিল-আশানের কাছে একটু মিনতি কোরো এদের জন্যে।

মুশকিল-আশান আমাদের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার চাইলে। বুকের মধ্যে গুরু-গুরু করতে আরম্ভ করল। তারপর চোখ দু-টো আকাশমুখো ক'রে কি যেন দেখতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের চোখও উঠল ওপর দিকে, কিন্তু সেখানে ফাঁকা আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

প্রায় আধ মিনিট কাল সেই উৎকণ্ঠায় কাটবার পর মুশকিল-আশান খুব মিষ্টি সুরে বল্‌লে—মা, ছেলে-পুলে একটু দুষ্টু-দুরন্ত হ'য়েই থাকে—সব ঠিক হ'য়ে যাবে, কিছু ভাববেন না।

মা বল্‌লেন—সে রকম নয়, তা হোলে আর ভাবনা কিসের! এই বলে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—এই ছেলেটা এরি মধ্যে একবার তেতলার ছাত থেকে পড়েছে আর একবার জলে ডুবেছে—এখনো তো সারা জীবনই পড়ে আছে।

এই অবধি বলে আমার ছোট ভাইকে দেখিয়ে আবার বললেন—এটা ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এটাকেও ও হুড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এ হেন চিজটিকে মুশকিল-আশান মশায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর মা বললেন—এদের জন্যে দিনে-রাতে শান্তি পাই নে বাবা!

মাতৃকণ্ঠের সেই কাতর আকুলতা দেবতাকে স্পর্শ করেছিল কিনা জানি না, কিন্তু শিশু-হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তখুনি সংকল্প ক'রে ফেললুম—মার মনে কষ্ট দেবো না—মায়ের অবাধ্য হব না।

এই সংকল্প জীবনে অসংখ্যবার করেছি এবং অসংখ্যবারই সংকল্পচ্যুত হয়েছি।

মুশকিল-আশান আশ্বাস দিয়ে বললে—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে মা। মুশকিল আশান ভালই করবেন।

মা আঁচলের গেরো খুলে আমাদের দুই ভাইয়ের হাতে একটা ক'রে পয়সা দিলেন। আমরা তার সেই তেল-কালি-মাখানো কাঁসিতে পয়সা দু-টো ফেলে দিতেই মুশকিল-আশান আবার চেঁচিয়ে উঠল—ইয়া পীর—

তারপরে একটু তেল কালি তুলে আমাদের কপালে একটা ক'রে টিপ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মার সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে তাঁর পাশেই শুয়ে পড়লুম। দিনান্তের পারে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে, সেদিনটা আমার শুভই ছিল। জীবন্ত মুশকিল-আশানের পাশে শুয়ে দূরাগত মুশকিল-আশানের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—এমন দিন জীবনে কমই এসেছে।

মুশকিল-আশানকে আমি ভুলিনি, আর সে-ও আমায় ভোলেনি। মুশকিল-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ ক'রে আমার কানে এসে পেঁচেছে তার অভয় বাণী—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান।

জীবন-পথে কত মুশকিলেরই না দেখা পেলুম—মুশকিলের মরুভূমি মরীচিকা ও চোরাবালি, মুশকিলের হাড়িকাঠ, কাঁড়িকাঠ, খাঁড়া, ছোরা, ছুরি—কত মনোহররূপে, কত বীভৎসরূপে এসেছে তারা! সব কাটতে কাটতে আজ মুশকিলের সিংহদ্বারের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভরসা আছে, যথাসময়ে কানে এসে পেঁছবে মুশকিল-আশানের সেই অভয় বাণী—কোন ভয় নাই—যাঁহা মুশকিল তাঁহাই আশান!

পথে

এক দিন স্কুলের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নামল মুষলধারায়—

ইস্কুল থেকে বেরুতেই পারলুম না। পেটে দুর্দম ক্ষুধা এবং আকাশের কর্ণভিদ্ গর্জন ফাঁকা ক্লাসে বসে পরিপাক করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘণ্টাদেড়েক দারুণ বর্ষণের পর প্রকৃতি শান্ত হলেন। বেরিয়ে পড়লুম দুই ভাইয়ে—ইস্কুল থেকে বাড়ী অনেক দূরে, পাড়ি ডফ্ সাহেবের ইস্কুলে।

সেকালে কলকাতায় ঘণ্টাখানেক ঝেড়ে বৃষ্টি হ'লে—যিনি যেখানে তাঁকে সেইখানেই থাক্‌তে হোতো দু-তিন ঘণ্টার জন্য। প্রায় সব রাস্তাতেই জল দাঁড়াত। ইস্কুলের ছোট ছেলেদের ডুব-জল, বুক-জল,—হাঁটু-জল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল না। খাটা-পায়খানার যত ময়লা ভাসত সেই জলে আর তারই ওপরে দাপাদাপি ও লাফালাফি করতে করতে ছাত্রদল বাড়ী ফিরত। এমন দিনে বাড়ীতে ফিরে আমাদের সাবান দিয়ে স্নান করতে হোতো।

যে সব রাস্তায় জল দাঁড়াত না অথবা বেশী দাঁড়াত না, সে সব রাস্তায় হোতো কাদা—সে এক রকম চট্‌চটে ঘন এবং সাংঘাতিক রকমের পেছল কাদা, শতকরা পঁচিশ জন পথিককে আছাড় খেতেই হোতো। এই পা পিছলে পড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত হওয়াটাকে ছেলেদের ভাষায় বলা হোতো—আলুর দম হওয়া। কতদিন যে আলুর দম হ'য়ে বাড়ী ফিরেছি তার আর ঠিকানা নেই।

বর্ষাকালে জলও দাঁড়ায় না, কাদাও হয় না এমন রাস্তা সে সময়ের শহর-রক্ষকেরা দেশী পাড়ায় রাখা বোধহয় পছন্দ করতেন না। এ যুগেও এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

যাই হোক, বই, ছাতা, জুতো, কাঁচা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে অর্থাৎ দু-হাতে দশ হাতের কেরামতি করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলুম ফুটপাথের ওপরে খানিকটা ডাঙা জায়গায় বেশ একটা ভিড় গোল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বস্তুটিও যে নেহাৎ মামুলী নয় তা ভিড়ের হালচাল দেখে বাইরে থেকেই বুঝতে পারা যায়।

সেদিন ক্ষুধার টান ছিল প্রবল, তাই মজা দেখবার প্রলোভন উপেক্ষা ক'রেই এগিয়ে চল্‌লুম ; এমন সময় ভিড় থেকে হো-হো হাসির হর্‌রা শুনতে পাওয়া গেল—ছুটলুম সেদিকে। জুতো, ছাতা, বই সমেত কোনো রকমে এঁকে-বেঁকে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখতে পেলুম—পাগলিনী !

রাস্তার পাগলী বলতে লোকের মনে যে ছবি জাগে এ সে রকম নয়। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়, রাস্তার সঙ্গে তার পরিচয় সবে-মাত্র সুরু হয়েছে।

পাগলিনীর মাথা রুক্ষ নয়, দিব্য পরিপাটি ক'রে আচড়ানো, তেল-চকচকে এলানো চুল—সীঁথেয় ঝক্ ঝক্ করছে সিঁদুর, কানে ও হাতে সোনার গয়না। অঙ্গে চওড়া কালা-পেড়ে পাতলা শাড়ী, একেবারে ধোপদস্ত, বেশ বাগিয়ে পরা। স্থূলকায়া হ'লেও দেখতে খারাপ নয়। চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে, বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে না।

দেখলুম, পাগলিনী নিঃশব্দে কাঁদছে আর ভিড়ের লোকেরা উচ্চরবে হাসছে।

ভিড় থেকে এক জন লোক জিজ্ঞাসা করলে—শ্যামবাবুকে এত ভালবাসিস্ তো তাকে ছাড়লি কেন?

পাগলনী কাঁদতে-কাঁদতে বললে—তাড়িয়ে দিলে যে!

ইতিমধ্যে আর একজন বললে—তোর শ্যামবাবু আগেকার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কোথায় গিয়েছে! কত নম্বরের বাড়ী?

লোকটা যা-তা একটা ঠিকানা বলে দিলে। পাগলী বার দু-তিন তা আওড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কত দূর, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে পেঁছিতে পারব সেই ঠিকানায়?

একজন রসিকতা ক'রে বললেন—তোকে সেখানে যেতে হবে কেন? শ্যামবাবু বলেছে, সে নিজে এসে তোকে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

পাগলিনীর মুখে হাসি ফুটল। খুসীতে ভরপুর হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি বলেছে! তোকে বলেছে! তাকে নিয়ে এলি না কেন?

লোকটা বললে—চতুর্দোলা ভাড়া করবে, ব্যাণ্ড ভাড়া করবে তবে তো আসবে। তোকে তো আর এমনি নিয়ে যেতে পারে না?

চারদিকের সবাই হেসে উঠল—পাগলিনী আবার কাঁদতে শুরু করে দিলে।

ভিড়ের লোকেরা পাগলিনী সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতে লাগল। কেউ বললে,—ও ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, শ্যামবাবু বলে একটা লোক ওকে বের ক'রে নিয়ে এসে কিছু দিন বাদে ফেলে পালিয়েছে, তাইতে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

আর একজন বললে—ভদ্রঘরের মেয়ে নয়—তবে শ্যামবাবুর জনাই ও পাগল হয়েছে।

পাগলিনীকে দেখে মনের মধ্যে করুণার উদ্রেক হয়েছিল কিন্তু তার জীবন-কাহিনী করুণতর বলে মনে হোলো।

সেই রাত্রে খাবার সময় সবার সামনে পাগলিনীর গল্প করলুম। দেখলুম আসরের সবাই গম্ভীর হ'য়ে পড়লেন—দু-এক জন সহানুভূতি-সূচক একটু শব্দ উচ্চারণ করলেন মাত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে সকলেই মুখ খুলল; একজন শেষ রায়

দিয়ে দিলেন—ও মেয়েগুলোর শেষকালে এ-ই হ'য়ে থাকে।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার তো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল শ্যামবাবু লোকটাই খারাপ। নেই বা হোলো সে ভদ্র গৃহস্থঘরের কন্যা। কিন্তু ভালো সে বেসেছিল একজনকে, যার জন্য আজ পাগলিনী হ'য়ে রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছে—এত বড় সত্যটাকে এরা দু-টো চুক্‌চুক্‌ আওয়াজ ক'রে রায় দিয়ে দিলে, যত দোষ ঐ মেয়েটার!

কিন্তু মানুষের চিত্তলোক, যেখানে নিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজ চলেছে, সেই আমার চিত্তলোকে পাগলিনীর জন্য নতুন মহল তৈরি হ'তে সুরু হোলো।

পাগলিনীকে ইস্কুল-যাতায়াতের পথে রোজই দেখি। প্রায় রোজই তাকে একই জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত। দেখতুম, রাজ্যের ছোট ছেলে এবং সকল বয়সী স্ত্রী-পুরুষ তাকে সর্বদাই ঘিরে রয়েছে, তার আকুলতা দেখে হাসাহাসি করছে। ছেলেরা বলছে—ঐ দেখ, ঐ দূরে তোর শ্যামবাবু পালিয়ে যাচ্ছে।

পাগলী উঠে থপ্‌-থপ্‌ ক'রে দৌড়ল সেই কাল্পনিক শ্যামবাবুর উদ্দেশ্যে—কিছু দূর গিয়ে শ্যামবাবুকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এল। তার ব্যর্থতা দেখে সবাই হেসে উঠল।

এক দিন ইস্কুলে যাবার সময় দেখি পাগলিনীকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। দু-এক জন ভদ্রলোক উত্তেজিত হোয়ে চেঁচামেচি করছেন। একজন বললেন—এ সব লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত।

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি, পাগলিনী ফুটপাথের ধারে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। তার কপালের খানিকটা বেশ কেটে গিয়েছে, দু-তিন জন লোক মিলে দমকল থেকে আঁজলা ক'রে জল এনে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছে।

শুনলুম, সেদিন সকাল থেকেই পাগলিনী শ্যামবাবু, শ্যামবাবু ক'রে চেঁচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় ক'রে তুলেছিল। একটা লোক তাকে বলে যে, শ্যামবাবু বলে এখানে চেঁচালে কি হবে, সে তো ঐ ও পাড়ায় থাকে।

আর যায় কোথায়! সংবাদটি শুনেই পাগলী উঠে দৌড় মেরেছিল সেই ও-পাড়ার দিকে। স্থূল শরীর, কয়েক পা যেতে না যেতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গেছে। নিঃস্বার্থভাবে সকলে যখন সেই নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগে আত্মহারা, তখন জনকয়েক সহৃদয় লোক এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই পাগলিনীর নামকরণ হ'য়ে গেল। শ্যামবাবু-পাগলী বললেই ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই বুঝতে পারত কার নাম করা হচ্ছে।

বছর-দেড়েক পরে আমরা ও-পাড়ার ইস্কুল ছেড়ে দিলুম। শ্যামবাবু

পাগলীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, এমন সময় এক দিন দেখি, পাগলিনী হেদোর ধারে বেশ একটি জনতার মধ্যে বসে তার সেই সনাতন শ্যামবাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পাগলিনী সেই থেকে হেদোর ধারেই রয়ে গেল।

হেদোর গায়ে ফুটপাথের ধারেই সে বসে থাকে। কখনো বা ভিক্ষে করে। কিন্তু 'একটি পয়সা দে বাবা'র চাইতে 'ওরে, শ্যাম বাবু কোথায় বলতে পারিস' কথাটাই বলে বেশী। ক্রমে তার দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে গিয়ে পথেরই মতন সে মলিন হ'য়ে উঠতে লাগল। বস্ত্র ছিঁড়ে গেলে দু-এক দিনের মধ্যেই দেখতুম কোথা থেকে নতুন একখানা কোরা ধুতি কিংবা শাড়ী সে জোগাড় করেছে। কোথায় খেত জানি না, মধ্যে মধ্যে তেলে-ভাজা খেতে দেখতুম—সে সময়ে হেদোর ধারের মুখরোচক তেলেভাজা অনেকেরই নরকযাত্রার পথ সুগম করেছিল।

কখনো ফুটপাথের ধারে, কখনো বাগানের মধ্যে, বৃষ্টি-বাদলের সময় কাছাকাছি কোনো গাড়ী-বারান্দার তলায়—এইভাবে তার জীবন অগ্রসর হ'তে লাগল।

আমরাও বড় হ'তে লাগলুম—লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেটে একটা-আধটা টান মারার বয়সে পোঁছে গেলুম। কিন্তু পাগলিনীর সেই এক ভাব—শীতাতপবর্ষণ মাথায় নিয়ে সে পথচারীদের জিজ্ঞাসা ক'রে চলেছে শ্যামবাবুর ঠিকানা, কোন রাস্তা দিয়ে গেলে তার বাড়ীতে পোঁছতে পারা যাবে।

ক্রমে—পথচারী বা পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সেই একঘেয়ে আমোদে অরুচি ধরে গেল, তাই তারা তাকে ত্যক্ত করা ছেড়ে দিলে। পথে যারা নিত্য যাওয়া-আসা করে তাদেরও কৌতুহল মিটে গিয়েছে। সবাই নিজের মনের মতন তার একটা ইতিহাস তৈরী ক'রে নিয়েছে, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছে। শ্যামবাবু-পাগলীর মধ্যে নূতনত্ব আর কিছুই নেই—তার সম্বন্ধে জগৎ ক্রমেই নিরপেক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে যদি কোন কৌতুহলী পথিক তার কথার জবাব দিত তো পাগলী তার সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে শ্যামবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে থাক্‌ত। অশ্রুজল আর তার চোখে দেখিনি তবে কন্ঠে তখনো অশ্রু জমাট ছিল।

দিন যেতে লাগল, আমরা লায়েক হ'য়ে উঠতে লাগলুম। 'স্বদেশী'র পূত স্পর্শে 'বিড়ি' দ্রব্যটি জাতে উঠে গেল এবং আধুনিক যুগের খদ্দরের মতন সকলেই সেই দেশজাত শিল্পটির প্রতি মনোযোগী হ'য়ে উঠতে লাগল। লুকিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশে বসে বিড়ি ফোঁকবার জন্য প্রায় রোজই বিকেলে আমরা হেদোয় যেতুম—পাগলিনীর সে রূপ আর নেই, যা দেখে একদিন চমকে উঠেছিলুম। সে ছিল যাকে বলে বেশ স্থূলকায়া। ক্রমে তার অঙ্গের মেদ ও পেশীগুলো শুকিয়ে গিয়ে চাম্‌ড়া ঝুলে পড়তে লাগল, সুন্দর চোখ

দু-টো নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। চুলগুলো কিছু উঠে গিয়ে ও জট পড়ে বিশ্রি হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু একদিন দেখলুম কে তার মাথা কামিয়ে দিয়েছে। দু-পাশ থেকে গাল দু-টো ঝুলে চিবুক ছেড়ে নেমে পড়ল—হঠাৎ কোনো অজানা লোকের সামনে পড়লে সে ব্যক্তি ঠিক্‌রে পালিয়ে যেত।

পাগলিনী এখন আর পথের লোককে শ্যামবাবুর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে না। যে কোনো সুবেশ পুরুষ, তা সে ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক—আলিঙ্গনে উদ্যতা হ'য়ে তার দিকে ধাওয়া করে। বেচারী পথচারী ধোপদোস্ত জামা-কাপড় প'রে চলেছে আনমনে হঠাৎ সম্মুখে আলিঙ্গনোদ্যতা সেই তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, মুহূর্ত্ত পরেই প্রাণভয়ে সেই পলায়ন দৃশ্য, পথিক-মাত্রেই উপভোগ করত।

কিছু দিন আমোদ উপভোগ ক'রে লোকে এলো গেল। এ ব্যাপারটাও তাদের সয়ে গেল, আর কিছু মজা পায় না তারা। কিন্তু পাগলিনীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সমানে একে-ওকে-তাকে ধরে বেড়াতে লাগল—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তে কোনো বিকার নেই, সেই এক ভাব।

তারপর আমাকেও একদিন পথ ডেকে নিল যাত্রার তপস্যায়। সাত বৎসর ধরে মাতৃভূমির রাজপথে ঘুরে-ঘুরে কত ঘটনাই দেখলুম, কত কাহিনীই শুনলুম। কত পাগলের পাশে শুয়ে-বসে রাস্তায় রাত কাটিয়ে পথের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল আবার তেমনি অকস্মাৎ পথের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছুটে গেল—আবার ঘরের ছেলে ফিরে এলুম ঘরে।

কলকাতায় ফিরে আত্মস্থ হ'য়ে দেখতে পেলুম এখানেও পরিবর্ত্তনের ঝড় ছুটেছে হু-হু ক'রে। পরিবর্ত্তন ঘটছে তার সামাজিকতায়, তার আধ্যাত্মিকতায়, পরিবর্ত্তন ঘটছে তার মিত্রতায় তার ব্যস্ততায়। অঙ্গের পরিবর্ত্তন তার এমন ঘটেছে যে চম্‌কে উঠতে হয়। কত খোলার বাড়ী হয়েছে বাগানবাড়ী, কত বস্তিতে বসেছে বাজার, কত বাজার হয়েছে ওজোড়, কত এঁদো পাঁদাড় হয়েছে গুলজার। এরই মধ্যে, একদিন দেখলুম, এই তরঙ্গসঙ্কুল পরিবর্ত্তন-পারাবারের মধ্যে পাগলিনী ঠিক হেদোর ধারে বসে আছে, সাত বছর আগে যেমনটি তাকে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

পাগলিনীর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেদিন তাকে যে রকম দেখে গিয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক কৃশ হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু কৃশ হ'লেও সেদিনকার সেই বীভৎসতার ছাপ তার চেহারায় আর নেই। কয়েক দিন বাদেই বুঝতে পারলুম, তার সেই শ্যামবাবু-শীকার করার ভাবটাও একেবারে কেটে গিয়েছে। কথাবার্ত্তা একেবারেই বলে না বললেই হয়, কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে চুপ ক'রে থাকে নয় ত বিশ্রি গালাগাল দেয়। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলেছে, সেদিকে তার দৃক্‌পাতও নেই হঠাৎ মুখ তুলে যার দিকে চোখ পড়ল তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—একটা পয়সা দাও না।

সকলকে সমান ভাবে সম্বোধনও করে না, কারুকে তুমি, কারুকে বা তুই, শহরশুদ্ধ লোকের টনক নড়ে গেল—হেদোর ধারের শ্যামবাবু পাগলী আর শ্যামবাবু খোঁজ করে না।

আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। একদিন, তখন আশ্বিন মাস, দুর্গাপুজো হ'য়ে গিয়েছে, সামনেই কালীপুজো। সন্ধ্যে থেকে ঘণ্টা দু-তিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আশ্বিনের বুকে অঘ্রাণের আমেজ লাগিয়ে দিলে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়ার তেজ যেন বেড়ে গেল।

রাত্রি একটা বেজে গিয়েছে। নিঃশব্দ জনহীন পথ বেয়ে জল-কাদা বাঁচিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম—দেখলুম, হেদোর সামনের ফুটপাথে পাগলিনী বসে আছে। আঁচলের খানিকটা ফুটপাথের ওপরে পাতা, তার ওপরে চাট্টি মুড়ি। আমাকে দেখেই বললে—একটা পয়সা দে না রে!

আশ্চর্য! তার কণ্ঠস্বর তেমনিই রয়েছে—সেই অশ্রু-সজল তীক্ষ্ণ অথচ করুণ কণ্ঠস্বর।

একটা পয়সা বের ক'রে তার কাছে যেতেই সে হাত তুলে পয়সাটা নিয়ে আবার খেতে আরম্ভ করলে। তাকে দেখতে-দেখতে কি জানি আমার কেমন একটা কৌতূহল হোলো, আমি তাকে একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললুম।

বিশ বছর ধরে দেখলেও তার সঙ্গে মুখোমুখি কখনো কথা বলিনি। প্রশ্ন করলুম—হ্যাঁ রে, তোর শ্যামবাবু এখন কোথায় থাকে?

পাগলী একবার আমার মুখের দিকে চাইলে, তার পরে তার অর্দ্ধাবৃত বুকের আবরণ সরিয়ে বুকের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

একেবারে চমকে উঠলুম! তবে! তবে কি এত দিন ধরে তাকে যা দেখে এলুম তা কি তার আসল রূপ নয়! এই দীর্ঘ দিন ধরে তার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে কত ভাঙা-গড়া চলেছে সে কি সব বৃথাই গিয়েছে! হোতেও পারে। বিচিত্র নয় যে, পাগলিনীর শ্যামবাবু—রাম-শ্যাম-যদুর শ্যাম নয়। তার শ্যাম অন্তরে থেকেও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—তারই আহ্বানে সে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসেছে। একে-তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় গেলে পাব তাকে? যার-তার কথায় ছুটেছে দিগ্বিদিকে—কোনো বাধা মানেনি, সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে অঙ্গে, রক্তাক্ত দেহ বিছিয়ে দিয়েছে পথের ওপর—যে পথে একদিন শ্যামের পদপাত হবেই। নয় ত বা পথের এক পাশে বসে কাতর কণ্ঠে কেঁদেছে কোথায় গেলে শ্যামের দেখা পাব।

তার পরে একদিন শ্যাম এসে তাকে দেখা দিলেন সুন্দর বেশে, পথচারীর রূপ ধরে। শ্যাম এলেন কখনো যুবক, কখনো কিশোর, কখনো বা বালকের রূপ ধরে। পাগলিনী আহ্লাদে আটখানা—ছুটেছে আলিঙ্গন করতে কিন্তু শ্যাম তবু ধরা দেয় না। বিগতযৌবনা লোলচর্মা কুৎসিতা পাগলিনী শবরীর

মত প্রতীক্ষায় ছিল এমন সময় শ্যাম সাড়া দিলেন অন্তরে—চাপল্য তার স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরের জগৎ রইল পড়ে বাইরে, তার প্রেমালাপ চলতে লাগল শ্যামের সঙ্গে অন্তরে।

কিছুই বিচিত্র নয়!

মাতাল

মাতালের ঠিক সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি। যে মদ্যপান করে তাকেই কি মাতাল বলা চলে? তা বোধ হয় নয়, কারণ 'মাতাল' শব্দটি অপরাধাত্মক তো বটেই এবং প্রয়োগও হ'য়ে থাকে প্রায় আক্রমণ হিসাবেই। বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের নাটক-নভেল পর্যন্ত মাতালের কেলেংকারী পড়ে, নিজের বা জানাশোনা কোনো মদ্যপায়ী পূর্বাচার্যদের ইতিবৃত্ত শুনে এবং নিজে দেখে বিচার ক'রে লোকে মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলে গালাগালি দিয়ে থাকে।

অথচ এই মদ অনেকেই খায়। দেশ-বিদেশে ঘুরে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে যাঁদের আসতে হয়েছে সারা জীবন ধরে, তাঁরাই জানেন যে পরিচিতদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ জন লোক মদ্যপান করে থাকে। যাঁরা মদ্যপান করেন না তাঁদের মধ্যে শতকরা একটা মোটা অংশ মদ্যপান করেন না—খেতে খারাপ লাগে, বাড়ীর ভয়, স্ত্রীর ভয় ইত্যাদি নানা ভয়ে—মদের প্রতি ভয় বা ঘৃণাবশতঃ নয়।

'মাতাল অসহনীয়'—এই বাক্যের মধ্যে কিছু সত্য আছে নিশ্চয় কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সহনীয় মাতালও আছে। সংখ্যায় কম হ'লেও এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায় যে মদ্যপান করলেও অভদ্র নয় এবং মত্ত অবস্থাতেও যে ভদ্রতা-চ্যুত হয় না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, শুধু মদ্যপানের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 'ভালো'র সংখ্যা অল্পই হ'য়ে থাকে।

'অধিকারী ভেদ' বাক্যটি যে নিশ্চিত সত্য তা আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। যারা মদ্যপানের অধিকার নিয়েই সংসারে আসে তাদের ছাড়া মদ্যপানের অধিকার আর কারুর নেই। কিন্তু মুস্কিল এই, কে যে সত্যিকারের অধিকারী আগে থেকে তা জানবার উপায় নেই। সকলেই নিজেকে 'অধিকারী' মনে ক'রে সুরু ক'রে দেয় এবং অনধিকারিত্ব প্রমাণ হওয়া সত্বেও ছাড়তে পারে না, তাইতেই মদ্যপায়ীর এত দুর্নাম। যে যুক্তিতে ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দেবতা করা হয়েছে, সেই যুক্তি অনুসারেই মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলা হয়েছে। ছেলেবেলায় অনেক মাতালই চোখে পড়েছে, তারই কয়েকটা নমুনা এখানে দিচ্ছি।

বাল্যকালে, বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, 'মাতাল' দেখবার আগেই ভাগ্যগুণে এক মদ্যপায়ীর সংস্পর্শে এসেছিলুম। যাঁর কথা বলছি, তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ ছিল পঁয়ষট্টি বৎসরের। কিন্তু বয়সের এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল ভদ্রলোকের অপার ঔদার্য। আমি, আমার ছোট ভাই ও তিনি—এই তিন জনে মিলে আমরা এমন আড্ডা জমিয়েছিলুম যে লোকের চোখে তা বিসদৃশ ঠেকত। এ কথা একদিন শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন—ওরা নিজেরা বুড়ো হয়েছে কি না তাই সবাইকে বুড়ো দেখে। ওদের কথা কানে তুলো না ব্রাদার।

তাঁর অন্তরটি ছিল কাব্যময়। কাছে গিয়ে বসলেই, দু-চারটে এ-কথা-সে-কথার পর প্রায়ই কাব্যের কথা পাড়তেন—অবিশ্যি ইংরিজী কাব্য। কাব্যের অলঙ্কার নয়, কাব্যের ভাবরূপের কথা। বয়সের হিসাবে আমাদের বুদ্ধি একমাত্র 'লেখাপড়া' ছাড়া আর প্রায় সব বিষয়েই একটু 'ইয়ে' থাকলেও কাব্যসাগরে ডুব মারবার মতন দম তখনো তৈরি হয়নি। কিন্তু কাব্যের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-স্বপ্নকে যে অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে তিনি আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছে দিতেন তা স্মরণ ক'রে আজও বিস্মিত হই। বালক-মনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এমন সহমর্মিতা তাঁর ছিল যা কদাচিৎ মেলে।

এই ভদ্রলোক মদ্যপান করতেন। এমনিতেই তাঁর স্বভাবটি ছিল মিষ্টি, কিন্তু যখন মদ্যপান করতেন তখন তাঁর কথাবার্ত্তা, ব্যবহার মধুরতর হ'য়ে উঠত। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের 'লেখা-পড়া' নাটকের অভিনয় সুরু হোতো আর এই সন্ধ্যে-বেলাটাই ছিল তাঁর মৌতাতের সময়। শনি, রবিবার ও অন্য ছুটির সময় বাড়ীর অগোচরে ফুক্‌ফাক্‌ পালিয়ে মাঝে-মাঝে আমরা দু-ভাই তাঁর আসরে গিয়ে হাজির হতুম। এই দিনগুলির কথা স্মৃতি-সাগরের তলায় মহামূল্য রত্নের মতন থিতিয়ে পড়ে থাকলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য মাধুর্য আমার সারা-জীবনকে ব্যেপে রয়েছে।

প্রধানত এই কারণেই, হয়ত এর সঙ্গে পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার থাকলেও থাকতে পারে—মদ্যপায়ীর প্রতি একটা কৌতূহল ছিল ছেলেবেলায়। বয়সের সঙ্গে চোখ-কান খুলতে লাগল আর মদ্যপায়ীর বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ প্রকট হোতে লাগল চোখের ওপর।

সে যুগে অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। তখনকার দিনের তুলনায় এখন মাতালের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গেলেও পথে-ঘাটে মাতালের কেলেঙ্কারী আর দেখতেই পাওয়া যায় না, বলা চলে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ডেকো-হেঁকো মাতালের চাইতে চোরা-মাতালের সংখ্যা বেড়েছে বেশী।

আমাদের পাড়ায় ছিল হারাণের দোকান। তার বাড়ী ছিল আহিরীটোলা

অঞ্চলে, আর দোকান ছিল এদিকে। আমাদের জ্ঞান হওয়া এস্তক হারাণকে সেই দোকানে দেখেছি। হারাণ ঘুড়ি তৈরী করত। তার মতন ভাল ঘুড়ি তৈরি করতে কলকাতায় আর কেউ পারত না। কলকাতা মানে, এখনকার মধ্য ও উত্তর কলকাতা। বালীগঞ্জ বা ভবানীপুরকে কলকাতার মধ্যে ধরা হোতো না। ভবনীপুরের বাসিন্দারা এদিকে আসতে হোলে বলতেন, কলকাতায় যাচ্ছি। ঘুড়ি ছাড়া হারাণ লম্বা তারের পেছনে কাঠের গোল চাকতি লাগানো 'ফাইল'ও তৈরী করত। সকাল সাতটা-আটটা থেকে বেলা বারোটা, ওদিকে আবার বেলা দুটো-তিনটে থেকে রাত্রি দশটা অবধি তার দোকানে গেলেই দেখতে পাওয়া যেত সে কিছু-না-কিছু করছেই—সে ছিল একলা অর্থাৎ কাজের জন্য অন্য কোনো লোক সে রাখত না।

হারাণ ছিল একেবারে আর্টিস্ট। বড় বড় মোটা বাঁশ এনে পিপীলিকার মতন অধ্যবসায়ে সেই বাঁশ চিরে-চিরে ছোট-ছোট কাঠি ক'রে, সেগুলোকে চেঁচে-ছুলে ঘুড়ির কাঁপ তৈরী করত। ছুটির দিন পাড়ার ছেলেরা ঝাঁক বেঁধে হারাণের সামনে গোল হ'য়ে বসে তার কাজ দেখত।

পঞ্চাশের ওপর বয়েস হ'লেও বুড়ো লোককে সে একেবারেই কাছে ঘেঁষতে দিত না। পাড়া-বেপাড়া যত ছেলের সঙ্গে ছিল তার ভাব আর তারাই ছিল তার বন্ধু।

ছেলেদের কারুর আসল নাম ধরে সে ডাকত না! প্রত্যেকেরই একটা ক'রে সে নাম দিয়েছিল আর সেই নামেই তাকে ডাকত। নামকরণ করার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল—প্রত্যেকের নামই ছিল কোন আনাজের বা সব্জীর, যেমন—আলু, পটল, ঝিঙে, করলা ইত্যাদি। মানবকের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শাক-শব্জীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আবিষ্কার করবার প্রতিভা ছিল তার আশ্চর্য রকমের।

একবার পাড়ায় একজনেরা এল। তাদের বাড়ীর একটি ছেলে ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে খুবই কাহিল হ'য়ে গিয়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে দু-দিনেই আমাদের খুব ভাব জমে গেল। নতুন বন্ধুটিরও ছিল ঘুড়ি ওড়াবার সখ। একদিন বিকেলে তাকে নিয়ে হারাণের দোকানে গিয়েছি ঘুড়ি কিনতে—ছেলেটির গায়ে ছিল সবুজ জমির ওপর লম্বালম্বি শাদা ডোরাকাটা সার্ট। হারাণ তখন ঘাড় নীচু ক'রে ঘুড়ির কাঁপ চাঁচছিল। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চেয়েই বললে—হ্যাঁ ভাই রাঙা-আলু, এই চিচিঙ্গেকে কোথা থেকে জোগাড় করলে ভাই?

বলা বাহুল্য, হারাণ আমাকে রাঙা-আলু বলে ডাকত। আমাদের সেই নতুন বন্ধুর নাম ছিল মনমোহন, ডাক নাম মোনা। জমিদারের একমাত্র ছেলে, বাড়ীতে ও দেশে দোর্দণ্ড প্রতাপ তার। শিশু অবস্থা থেকে আজ্ঞে, হুজুর, বাবু শোনাই তার অভ্যেস। নেহাৎ ম্যালেরিয়ার ঠেলায় কলকাতায় চলে

এসেছে—তাকে কি না চিচিংগে! মনমোহন তো রেগে একেবারে টং হ'য়ে গেল। সেও ঘুড়ি কিনতে এসেছিল কিন্তু ঘুড়ি না কিনেই চলে এল। আমাকে বললে—ঐ ছোটলোকটার সংগে এত ভাব কেন রে তোর? তোকে রাঙা আলু বলে আর তুই কিছু বলতে পারিস নে?

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে চিচিংগের সংগে হারাণের এমন ভাব জমে গেল যে তার বাড়ীর লোকেরা পর্যন্ত বলতে লাগল—দিন রাত্রি একটা বুড়োর সংগে তোর এত কথা কিসের রে?

হারাণের হাল-চালই ছিল এক রকমের। চমৎকার রং-বেরংয়ের ঘুড়ি সে তৈরি করত কিন্তু আমাদের মনের মতন রং বেছে ঘুড়ি কেনবার উপায় ছিল না। প্রতিদিন তার দোকানের দরজায় একখানা শ্লেট ঝুলত আর তাতে লেখা থাকত—আজ এক-ঘয়লা, আজ সতরঞ্জি, আজ পংকীওয়ালা ইত্যাদি। এক দিনে নানা রংয়ের ঘুড়ি বিক্রি না করার পক্ষে তার যুক্তি ছিল এই যে, রং-বেরংয়ের ঘুড়ি উড়লে আকাশ মানায় না। আমাদের যুক্তি ছিল ঠিক তার উল্টো, কিন্তু আমাদের কোন কথাই সে মানত না। সে বলত—তবে অন্য জায়গা থেকে কিনে আনো—আজ শেলেটে যখন লেখা হ'য়ে গেছে এক-ঘয়লা তখন অন্য ঘুড়ি আর এখানে বিক্রি হবে না।

আর বলতুম—ওঃ, একেবারে হাইকোর্টের বিচার!

হারাণ হেসে-হেসে বলত—আমার বিচার হাইকোর্টের বিচারের বাড়া! বুঝলে ভাই রাঙা-আলু, হাইকোর্টের রায় আপীলে টলে যেতে পারে কিন্তু হারাণের বিচার কোনো আপীলেই টলে না।

এমনি অদ্ভুত ছিল তার হাল-চাল।

একদিন বিকেলে হারাণের দোকানে ঘুড়ি কিনতে গিয়ে দেখি, পাড়ার ছয়-সাতটি ঘুড়ি উড়িয়ে ছেলে হারাণের সামনে উবু হয়ে বসে রয়েছে। বিমর্ষ তাদের মুখ—সামনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে গালে হাত দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে হারাণ। সেই পরিস্থিতির গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে ইশারাতে এক জনকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি?

বন্ধু কোনো কথা না বলে ইশারাতেই হারাণকে দেখিয়ে দিলে।

কিছুই হদিশ না পেয়ে হারাণকে বললুম—একখানা দেড়-তে ঘুড়ি দাও তো?

হারাণ এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রেই ছিল। আমার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে অতি কাতরভাবে বললে—আজকে আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই রাঙা-আলু।

তার মুখের চেহারা দেখে ও কথা শুনে মনে হোলো, বাড়ীতে কেউ মারা-টারা গেছে।

সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারাণ?

হারাণ স্বভাবতই বক্-বক্ করতে ভালবাসত। দু-হাতের সঙ্গে তার মুখও সমানে চলতে থাকত। এক-এক দিন ঘুড়ি কিনতে গিয়ে তার বক্‌বকানি শুনতে-শুনতে এত দেরী হ'য়ে যেত যে পালিয়ে আসতে হোতো। অনেকক্ষণ বাক্-সংযম ক'রে এবার তার ধৈর্যচ্যুতি হোলো। হারান সুরু করলে—আরে ভাই রাঙা-আলু কি বলব! আজ ক'দিন থেকে ওপরের কষের একটা দাঁত ঢক্-ঢক্ ক'রে নড়ছে। কাল রাত থেকে জিভটা লেগে গেছে সেই দাঁতটার পেছনে, দাঁতটাকে ওখান থেকে সে তাড়াবেই তাড়াবে—খেতে, শুতে, কাজ করতে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। জিভটাতে বেশ ক'রে মনের লাগাম চাড়িয়ে টেনে নিয়ে এসে কাজ করতে সুরু করি আর সেই সুযোগে জিভটা আবার দাঁতের পেছনে লেগে যায়। আরে ভাই, কাজ করব হাতে মন থাকবে হাতধরা, তবেই তো হাতের কাজ হবে! তা সেই মনই যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে জিভের সঙ্গে যোগ দেয় তো হাতের কাজ কি ক'রে হয়!

কাজ করতে না পারার এমন কিণ্ডারগার্টেনীয় ব্যাখা শুনে হাসি পেলেও চেপে যেতে হোলো। বললুম—ও দাঁতটা তুলিয়ে ফেল।

হারাণ একটু বক্র-হেসে বল্‌লে—রাঙা-আলু ভাই, তুমি আমায় ছেলে-মানুষ পেয়েছ! এই ঝিঙে-ভাইও বলছিল দাঁতটা তুলে ফেলতে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, শুধু ওটা নয়, বত্রিশ-পাটি দাঁতই তুলে ফেল্‌ব।

হারাণ ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের লোক হঠাৎ তার ঐ সর্বনাশা স্পৃহা দেখে আমরা ভড়কেই গেলুম। ঝিঙে জিজ্ঞাসা করলে—কেন! সবগুলো তুলবে কিসের জন্য?

হারাণ বললে—ঝিঙে-ভাই, ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একটা দাঁতের যদি এক হপ্তার কাজ বন্ধ করে, তা হলে বত্রিশটাতে ক'হপ্তা হয় বল দিকিন? এত দিন যদি কাজ না করতে পারি তা হ'লে আমার যন্ত্রণা ভোগ ও ক্ষেতির কথা ছেড়েই দাও, কত লোকের কত রকমের অসুবিধা হবে বল দিকিন? কাজ কি ভাই অত হাঙ্গামার! শাস্ত্রে বলেছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, ব্যস্।

এই রকম সব পাকা-পোক্ত হিসাব ও যুক্তির বাঁধনে হারাণ রাজ্যের ছেলের মন বেঁধেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর এক জন বললে—আমাদের হারাণের বুদ্ধি আছে, যে যাই বলুক।

কথাটা শুনে হারাণ বেশ খুশী হ'য়ে বললে—থ্যাঙ্কস্ ভাই, তোমাদের এই ঘুড়িওয়ালা হারাণ অনেক হারাণবাবুর চেয়ে বুদ্ধি ধরে বেশী। যদি বল, তবে তুমি এ কাজ করছ কেন, হাইকোর্টের জজ হ'লেই তো পারতে। তার উত্তরে আমি বলব, বুদ্ধি কম থাকার দরুণ যে হাইকোর্টের জজ হতে পারিনি তা নয়—এ কাজ করাচ্ছে আমার নেয়ৎ।

এই বলে হারাণ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

তাকের ওপরে তাড়া করা ঘুড়ি রয়েছে দেখে বললুম—ঐ তো অত ঘুড়ি রয়েছে, দাও না।

হারাণ বললে—তা কি হয়! আজ আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই, সব বাড়ী যাও।

বিকেল বেলাটা হোলো মাটি। ঘুড়ির বদলে—হারাণ কাল দাঁত তোলাবে এই সংবাদটি সংগ্রহ ক'রে সেদিন যে-যার বাড়ী ফেরা গেল।

পরের দিন বিকেলে হারাণের দোকানে গিয়ে দেখলুম বেশ নিবিষ্ট চিত্তে সে কাজ করছে। একখানা ঘুড়ি কিনে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হারাণ, দাঁত তুলিয়েছ না কি?

হারাণ বললে—দেখ ভাই রাঙা-আলু, কাল সারা-রাত্রি ঘুমুইনি, খালি ভেবেছি। ভেবে দেখলুম যে, দাঁতের ওপরে খুবই অবিচার করা হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁতের ব্যথা না হ'য়ে যদি পায়ে যন্ত্রণা হোতো তা হোলে পা-টা কেটে তো আর ফেলে দিতে পারতুম না। আরে, নড়া-দাঁতের ধর্ম্মই হোলো কটকট-ঝনঝন করা। মন যদি ওদিকে যায় তো মনের দোষ—মনের দোষে দাঁতকে কেন সাজা দেবো। ঠিক বলছি কি না, বল তুমি?

ঠিক বলছ, বলে তখনকার মতন পালিয়ে বাঁচলুম।

তখনকার দিনে বৌবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে সেই গ্রে ষ্ট্রীট অবধি বড়-রাস্তার ওপরেই অনেকগুলো মদের দোকান ছিল। পথচারীরা এক পোয়া রাস্তা দূরে থেকেই নাকে কাপড় দিত আর দোকানের কাছাকাছি এসে দিত কান চাপা। দোকানের ভেতরে সেই সকাল থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি অসংখ্য মাতাল তারস্বরে গান, তর্ক, চ্যাঁচামেচি ঝগড়া করতে থাকত। সরকারী হুকুমে এই সব দোকান এখন বড়-রাস্তার ধারে সরু-সরু গলির মধ্যে উঠে গেছে। এতে তিন পক্ষই হয়েছে খুশী। বড়-রাস্তা থেকে একটা বীভৎস দৃশ্য সরে গেছে। মাতালেরাও বেঁচেছে—ঢুকতে বেরুতে চেনা-লোকের চোখে পড়া, রাস্তায় বেরিয়ে দু-কদম যেতে না যেতেই পুলিশ কনষ্টেবল, যারা মালদার মাতাল শীকার করবার জন্যই ওৎ পেতে বসে থাকত, তাদের খপ্পরে পড়া ইত্যাদি হাজার হাঙগামা থেকে রক্ষা পেয়েছে। দোকানদারেরাও খুশী, কারণ তাদের খদ্দের বেড়েছে।

আগেই বলেছি, সেকালে প্রায় সব সময়েই রাস্তায় ভদ্রলোক, ছোটলোক সব শ্রেণীরই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। 'সুরাপানে সাম্য ভাব প্রবল হয়' কথাটা খুবই সত্যি। কারণ সম্প্রদায়গত প্রভেদ থাকলেও ব্যবহারগত প্রভেদ তাদের মধ্যে বিশেষ দেখতে পাওয়া যেত না। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বা কাল্পনিক শত্রুর উদ্দেশে হাত-পা ছুঁড়ছে, আধ-আধ ভাষায় এড়িয়ে গালাগালি দিচ্ছে। হয়ত দুই প্রাণের বন্ধু একসঙ্গে বসে মদ্যপান ক'রে ফিরছে, পথে কি তর্ক হ'তে হ'তে লেগে গেল তুমুল কাণ্ড—বাড়াবাড়ি করলে

পুলিশে রুলের গুঁতো লাগাতে-লাগাতে টেনে নিয়ে যেত থানায়। কেউ বা পথের ওপরেই হাত-পা চিতিয়ে লম্বা — বসন অসংবৃত, সংজ্ঞা নেই। সামনে বাড়ীর লোকেরা বালতি-বালতি জল এনে মাথায় ঢালছে—দেখে-দেখে শিউরে উঠতুম আর ভাবতুম, এমন আত্মবিস্মরণকারী অসংযম লোকে মূল্য দিয়ে কেনে কেন?

হারাণ বলত—ব্যাটারা যা হজম করতে পারবি-নে তা গিলিস্ কেন!

এমন যে বুদ্ধিমান, দার্শনিক হারাণচন্দ্র, নেহাৎ বরাতে নেই বলে যে হাইকোর্টের জর্জ না হ'য়ে চিঠির ফাইল ও ঘুড়ি ম্যানুফ্যাকচার ক'রেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, সেও মদ্যপান করত—তবে বছরে একবার মাত্র।

একদিন ইস্কুলে যাবার জন্য পথে বেরিয়েই দেখি, হারাণ তার পাশের পরোটাওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সেই দোকানদারকে গাল পাড়ছে। হারাণের এতদবস্থা এর আগে কখনো চোখে পড়েনি! চোখা-চোখা বোলচাল ছাড়লেও ঝগড়া-ফ্যাসাদকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করত এবং তা থেকে দূরে থাকবার জন্য আমাদেরও উপদেশ দিত!

আস্তে-আস্তে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারাণ?

'চোপরাও'—বলে সে এমন চেঁচিয়ে ধমক ছাড়লে যে দশ হাত দূরে ছটকে গেলুম। বাপ রে! ব্যাপার কি!

ইতিমধ্যে আরও গুটিকয়েক পাড়ার ছেলে বই বগলে সেখানে এসে জমা হোলো। হারাণ আমাদের উদ্দেশে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—ছেলেমানুষ আছ ছেলেমানুষের মতন থাকবে—ইস্কুলে যাচ্ছ সিধে ইস্কুলে চলে যাও সব।

কথাগুলো বলেই হারাণ আবার পরোটাওয়ালাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলে।

পরোটাওয়ালা হিন্দুস্থানী হ'লেও বাংলা ভাষা বেশ ভালই বুঝতে পারত ও বলতে পারত। কিন্তু পাছে সেই ভাল-ভাল অভিধান বহির্ভূত বাক্যগুলি পরোটাওয়ালার বুঝতে কষ্ট হয় সেজন্য হারাণ সেগুলিকে হিন্দীতে তর্জমা ক'রে বলতে লাগল, আর তাই শুনে রাস্তার লোকেরা হো-হো ক'রে হাসতে আরম্ভ করে দিলে। একাধারে নতুন ধরণের গালাগালি আর সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষা শোনবার জন্য ক্রমেই ভীড় বাড়তে লাগল।

একটা জিনিষ বরাবর দেখেছি যে বাঙালীর পেটে মদ পড়লেই, প্রায় ক্ষেত্রেই সে ইংরিজি, হিন্দী, উর্দু ফরাসী ভাষায় বুলি কাটতে সুরু করে—ইংরেজ কিংবা ফরাসী মাতালকে স্প্যানিশ কিংবা তুর্কী ভাষায় কথা বলতে শুনিনি। যা হোক্, হারাণ সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষায়—যা একমাত্র হারাণ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না অথচ সকলেই বুঝতে পারে—পরোটাওয়ালাকে গালাগালি দিয়ে চলল।

পরোটাওয়ালা লোকটা ছিল আকাট ষণ্ডা। আশ-পাশের যত হিন্দুস্থানী দোকানদারদের মুরুব্বী ও ভরসাস্থল ছিল সে। হারাণের মতন দশটাকে সে খালি হাতেই পাট ক'রে দিতে পারত। কিন্তু দেখলুম যে, হারাণের সম্বন্ধে নির্বিকার হ'য়ে সে নিজের কাজ ক'রে চলেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হ'সে উঠল। পরোটাওলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলা গেল—কি হয়েছে, হারাণ তোমাকে এত গালাগালি দিচ্ছে কেন?

পরোটাওয়ালা তার নির্বিকারত্ব বজায় রেখেই বললে—কি আবার হবে! ব্যাটা সরাব টেনেছে।

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল—দুঃখের নয়—চমকের। মনে হোলো—এ্যাঁ, হারাণও সরাব খায়! ইস্কুলের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে দেখে অমন মজা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হোলো

ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার! পরোটার দোকানের সামনে খুব ভীড়, তার মধ্যে বই-হাতে ইস্কুল-ফেরৎ ছেলেই বেশী। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি হারাণ ও পরোটাওয়ালা দুজনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—হারাণের হাতে ঘুড়ির সরু একটা কাঁপ আর পরোটাওয়ালার হাতে সরু মাথা-বাঁকানো লম্বা একটা লোহার শিক, যা দিয়ে তাদের সেই বিপুলগর্ভ উনুনে খোঁচা দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্তু পরোটাওয়ালার হাতের অস্ত্র হারাণের হাতের অস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী ভয়াবহ হোলেও হারাণের মুখনিঃসৃত মিনিটে পঞ্চাশটা বোমার আঘাতে সে ব্যক্তি একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে—একেবারে সম্মোহিত অবস্থা।

রাজ্যের লোক সেই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। এক ভদ্রলোক হারাণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে হ্যা?

হারাণ হুঙ্কার ছেড়ে বললে—কি হয়েছে! কি হয়েছে এই মেড়োকে জিজ্ঞাসা কর।

পরোটাওয়ালা বলতে লাগল—বাবু, লোকটা সরাব খেয়ে আজ সকাল থেকে আমার দোকানের সামনে এই হাঙ্গামা লাগিয়েছে। সারাদিন এই ভীড়, খদ্দের আসতে পারছে না, সকাল থেকে বিক্রি-বাটা আমার বন্ধ হ'য়ে গেছে।

হারাণ তার হাতের অস্ত্র আপসাতে-আপসাতে বললে—তোর দোকানে কেউ পা দেবে না, শালা চোর!

পরোটাওয়ালা একবার চোখ পাকিয়ে হারাণের দিকে চেয়ে আবার সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে—দেখছেন!

ভদ্রলোকটি উদাসভাবে বললেন—পুলিশে খবর দাও!

সেদিনে এক চোর-ডাকাত ছাড়া পুলিশকে ভয় করে না এমন 'বীর লাখে একটা মিলত কি না সন্দেহ। পুলিশের নাম হওয়া-মাত্র ভিড় পাতলা হ'য়ে

গেল। পরোটাওয়ালা গুটি-গুটি তার দোকানে উঠে উনুনের সামনে গিয়ে বসল। হারাণ কিন্তু তখনো দাঁড়িয়ে—এমন সময় একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—ঐ লাল পাগড়ী—

আর যায় কোথা! হারাণ দৌড়ে, গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিতে-দিতে নিজের দোকানে ঢুকে পড়ল।

শোনা গেল, বছর-কয়েক আগে হারাণ একদিন একখানা পরোটা কিনেছিল, তাতে দোকানদার নাকি তরকারী দিয়েছিল কম। সেদিন থেকে হারাণ যতবার মদ্যপান করে ততবারই নাকি সেই একদিন কম তরকারী দেওয়ার জন্য—যে তরকারী পরোটার সঙ্গে স্রেফ দয়া ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে—হাঙ্গামা করে।

বাড়ীতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসতে না বসতেই হারাণের হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। বাড়ীতে একজন গুরুস্থানীয়া মহিলা বল্‌লেন—আজ তোমাদের হারাণ মদ খেয়ে সকাল থেকে রাস্তায় এমন হাঙ্গামা লাগিয়েছে যে কান পাতা যাচ্ছে না।

আর একজন বল্‌লেন—অমন লোকের কাছ থেকে কারুর কোনো জিনিষ কেনা উচিত নয়।

ঘুড়ির মাধ্যমে হারাণের কিছু-কিছু গুণ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা আছে—এই রকম কিছু মন্তব্য আশা করছিলুম সে তরফ থেকে, কিন্তু সে রকম কিছু না হওয়ায় তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ছুটলুম হারাণের খেল্ দেখতে।

গিয়ে দেখি যে, হারাণ আবার আসরে নেমেছে। চারিদিকে আগের চাইতে ভীড় বেশী। অবস্থা তার খুবই খারাপ, পা টলমল করছে, কথাবার্ত্তা যা বলছে তা শুনে মনে হচ্ছে যে কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে অসুবিধার জন্য কথা কিছু কম বল্‌ছে না।

শোনা গেল, পুলিশের নামে ভয় পেয়ে দোকানে ঢুকে সে উপরি-উপরি কয়েক পাত্র টেনে এমন দুঃসাহস সঞ্চয় ক'রে এসেছে যে রনাঙ্গণে ভূপাতিত হবার আগে নড়বে বলে মনে হয় না।

হারাণ মদ-দর্পে টলে-টলে পরোটাওয়ালাকে ইংরিজী ও হিন্দীতে মিলিয়ে উচ্চরবে উপদেশ দিচ্ছে, এমন সময় ভীড়ের সামনেই কোথা থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীর ভেতর থেকে জন চারেক ভদ্রবেশধারী যুবক টপ্-টপ্ ক'রে ভীড় ঠেলে একেবারে হারাণের সামনে এসে দাঁড়াল। এক জন জিজ্ঞাসা করলে—এ কি কেলেঙ্কারী হচ্ছে?

হঠাৎ তাদের আবির্ভাবে হারাণ একেবারে হ-য-ব-র-ল। সে কি একটা বল্‌লে বটে, কিন্তু তা বুঝতে পারা গেল না।

এক জন ধমকের সুরে বল্‌লে—চল, বাড়ী চল।

এবার হারাণ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একবার যা যা—বলে সে অবস্থায়

যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব দোকানের দিকে দৌড় দিলে। আগন্তুকেরা আর বাক্যব্যয় না ক'রে হারাণকে ধরে একেবারে কোলপাঁজা ক'রে তুলে ফেললে। হারাণ হাত-পা ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল কিন্তু ততক্ষণে তারা তাকে গাড়ীর মধ্যে পুরে ফেলে গাড়োয়ানকে ইঙ্গিত করতেই গাড়ীখানা ছুটে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিটের মধ্যেই ভীড় একেবারে সাফ্। শুনলুম, ওরা হারাণের ছেলে। মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি ক'রে যে ওরা টের পায় তা কেউ জানে না। প্রতিবারেই হঠাৎ এসে পড়ে আর কথা বলতে না দিয়ে তারা বাপকে ঐ রকম চ্যাংদোলা ক'রে ধরে নিয়ে যায়।

পরদিন ইস্কুল থেকে ফেরবার মুখে দেখলুম, হারাণ লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘাড় হেঁট ক'রে ফাইল তৈরি করছে।

মণি বাবু

আর একজন অদ্ভুত চরিত্রের মাতাল দেখেছিলুম ছেলেবেলায়, তাঁর নাম ছিল মণিবাবু। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের ছেলে এবং নিজেও তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। লেখা-পড়া বেশ ভালই জানেন বলে শুনতুম—কোন এক সওদাগরী আপিসে মোটা মাইনের চাকরী করতেন। অতি ভালমানুষ, এত ভালমানুষ যে পাড়ার কারুর সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইতেন না।

মণিবাবু মদ্যপান করতেন বটে কিন্তু মদের আনুষঙ্গিক গণ্ডগোল, চেঁচামেচি বা হাঙ্গামার ধারে-কাছে ঘেষতেন না। তবে নিজে কোন হাঙ্গামা-হুজ্জৎ না করলেও গ্রহবৈগুণ্যে তাঁকে নিয়ে পাড়ায় হাঙ্গামার অন্ত ছিল না।

প্রতিদিন সকালবেলা নটার সময় মণিবাবু চোগা-চাপকান, তার ওপরে ধপধপে শাদা পাকানো চাদর গলায় জড়িয়ে আপিসে বেরুতেন। এ নিয়মের আর নড়-চড় ছিল না। মণিবাবুকে দেখে পাড়ার চাকুরে বাবুরা সময় ঠিক করতেন। কিন্তু আপিসে যাবার সময় ঠিক থাকলেও আপিস থেকে ফেরবার সময় কিছু ঠিক ছিল না তাঁর। প্রতি রাত্রে ন-টা থেকে দু-টোর মধ্যে তিনি বাড়ী ফিরতেন ভাড়াটে গাড়ী চড়ে, আর প্রতি রাত্রেই না হোক, সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন তাঁর জন্যে রাত দুপুরে লাগ্‌ত হাঙ্গামা।

মণিবাবু ডেকো-হেঁকো লোক ছিলেন না। মদ্যপান করতেন লুকিয়ে, গোণাগুন্তি দু-তিন জন বিশেষ বন্ধু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে নয় এবং শত দিন অবধি তাঁর ধারণা ছিল যে, যাঁদের সঙ্গে তিনি মদ্যপান ক'রে থাকেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউ জানে না তাঁর মদ খাওয়ার কথা।

মণিবাবু ছিলেন বিপত্নীক। দু-টি নাবালক ছেলে, তারা দাদামশায়ের মোটা বিষয়ের মালিক—মানুষ হচ্ছিল কাকা-কাকীমাদের হাতে। সংসারে

সজ্ঞানে তাঁকে কোন ঝঞ্ঝাটই পোহাতে হোতো না।

আগেই বলেছি, মণিবাবু নিজকৃত হাঙ্গামায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন না। আফিসে যেতেন সকাল ন-টায় আর বাড়ী ফিরতেন অনেক রাত্রে ভাড়াটে গাড়ী চেপে।

তখনকার দিনে বড় রাস্তাগুলি ছাড়া কলকাতার গলিপথ ন-টা দশটার মধ্যে একেবারে নিশুতি হ'য়ে যেত। রাত দুপুরে পাড়ায় ছ্যাকড়া গাড়ী ঢুকলে আওয়াজের চোটে অর্দ্ধেক লোকের ঘুম ভেঙে যেত। সে সময়ে ভাড়াটে গাড়ী তো দূরের কথা, বাড়ীর গাড়ীর চাকাতেও রবার ব্যবহৃত হোতো না। শহর-বাসীদের কর্ণবিবর এখনকার মতন আওয়াজ-সহ হ'য়ে ওঠেনি. তাই সামান্য শব্দেই তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হোতো।

মণিবাবুদের বাড়ীটা ছিল বেশ বড় আর তিনি থাকতেন সেই পেছনকার দিকের একটি ঘরে। কারণ, লোক-জনের চীৎকার ছেলে-পিলেদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ তিনি সহ্য করতে পারতেন না. নিরিবিলি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর ঘরে পৌঁছতে হ'লে অনেকগুলি সিঁড়ি, দালান ইত্যাদি পার হ'তে হোতো. কিন্তু প্রতি রাত্রেই এমন সন্তর্পণে তিনি এই বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করতেন যে একটা ঠোক্কর খাওয়ারও শব্দ পর্যন্ত হোত না।

যা হোক, এবার মণিবাবুর হাঙ্গামা সুরু হোলো।

মণিবাবু রাত-দুপুরে পাড়া জাগিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী চড়ে তো বাড়ী এলেন। পাছে পাড়ার কেউ জানতে পারে বা কারুর চোখে প'ড়ে যান এই আশঙ্কায় গাড়ীতে বসেই যতখানি সম্ভব চারদিক চেয়ে অতি সন্তর্পণে টুপ ক'রে নেমে ভেজান দরজাটি ঠেলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর চাকর বেচারা কাজকর্ম সেরে বাবুর অপেক্ষায় ভেজান দরজার পাশে বসে সজাগ হয়ে ঢুলছিল. বাবু বাড়ী ঢুকতেই সে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে সটান হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

ওদিকে গাড়োয়ান কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ভাড়ার জন্য চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে। আজকের দিনে বাস. রিক্‌শ, ট্যাক্সি প্রভৃতি নানা রকম যান-বাহন চালু হওয়ায় ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম হ'য়ে পড়েছে। তখনকার কালে তাদের কণ্ঠস্বর ছিল ভয়াবহ এবং আদালতে না গিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে জেতবার ক্ষমতা শহরে দু-চারজন গোণাগুন্তি লোক ছাড়া আর কারুর ছিল না।

যা হোক্ গাড়োয়ানের সেই চীৎকারে আশেপাশের বাড়ীর লোক জেগে উঠে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে লাগল—যাদের সে সুযোগ নেই তারা ঘরে বসেই রাগ হজম করতে থাকল।

এদিকে গাড়োয়ানের চীৎকার ধাপে-ধাপে চড়ছে, ওদিকে মণি বাবুর কোন সাড়া নেই। প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে আরম্ভ করলে—

রোজ রোজ তো এ-হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না হে! সবাই সই ক'রে পুলিশে একখানা দরখাস্ত না পাঠালে এ তো থামবে না।

ওদিকে গাড়োয়ান ততক্ষণে কোচবাক্স থেকে নেমে পড়ে দমাদ্দম শব্দে দরজা ঠেঙাতে ও মরিয়া হ'য়ে চ্যাঁচাতে লাগল। পাড়ার কেউ-কেউ আপত্তি করায় গাড়োয়ানের সঙ্গে তাদেরও কিছু বচসা হ'য়ে গেল এরি মধ্যে. চাকর বেচারীর ঘুমটি জমতে না জমতে ভেঙে গেল. সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। পাড়ার সবাই বাবুকে না পেয়ে তার ওপরেই তম্বি সুরু ক'রে দিলেন—যা বাবুর কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে এসে গাড়োয়ানকে বিদেয় করে দে।

কিন্তু রাত্রিবেলা চাকরের বাড়ীর মধ্যে ঢোকার উপায় নেই, পথে দু-দুটো দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। কি হবে উপায়! শেষকালে ঘণ্টা দু'য়েক গলাবাজীর পর কোনদিন পাড়ার কেউ, কোনদিন বা মণিবাবুর বাড়ীর কেউ, কোন দিন বা চাকরেই ভাড়া মিটিয়ে দিত। হিসাব-নিকাশ কি ক'রে হোতো তা জানি না।

পরদিন সকালে ঠিক ন-টার সময় দেখা যেত. মণিবাবু সেজে-গুজে আপিসে চলেছেন। মুখে সেই নৈর্ব্যক্তিক সলজ্জ হাসি আর অন্তরে নিশ্চিত নিশ্চিন্ততা. —তিনি যে মদ্যপান করেন তা কেউ জানে না।

মধ্যে-মধ্যে মণিবাবু গাড়ী থেকে নামতেই পারতেন না অর্থাৎ বেহুঁস হ'য়ে পড়তেন। এই রকম সব সময়ে তিনি বুদ্ধি ক'রে চেনা গাড়ী ভাড়া করতেন। বাড়ীতে পেঁছে বাবুর অবস্থা দেখে গাড়োয়ানের চক্ষুস্থির! তার চীৎকারে সাত পাড়া জেগে গেল. কিন্তু মণি বাবু আর ওঠে না। উঠবে কি করে! তিনি তখন যেখানে পেঁচেছেন সেখান থেকে কোন মাতালই সে রাত্রে আর ফিরতে পারে না। গাড়োয়ানের চীৎকারে অস্থির হ'য়ে পাড়ার লোকরা নেমে এসে ধরাধরি ক'রে তাঁকে গাড়ী থেকে নামাত আর বাড়ীর লোকেরা চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে যেত।

কোন-কোন দিন এই রকম বেহুঁস হবার মতন অবস্থা হ'লে মণিবাবু বুদ্ধি ক'রে দু-একজন বন্ধু নিয়ে আসতেন। যাঁরা তাঁকে বাড়ী অবধি পেঁছে দিতে আসতেন, তাঁদের অবস্থা মণিবাবুর চেয়ে কিছু ভাল থাকলেও দেখেছি যে. তাঁদেরও পদদ্বয় ইচ্ছাশক্তির শাসনের অতীতে চলে গিয়েছে। প্রায়ই মণিবাবুকে ধরাধরি ক'রে নামাতে গিয়ে নিজেরাই খেতেন আছাড়।

উঃ, সে সব দিনের কথা মনে হ'লে আজও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

গাড়ীখানা তো মণিবাবুদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুরা অনেক কসরৎ প্যাঁচ ক'রে কোনো রকমে তো রাস্তায় নামলেন। তার পরে সুরু হোলো—এই মোণে. ওঠ—ওঠ রে, বাড়ী এসেছে—মোণে এই—দ্যাৎ. এই মোণে, ওঠ না ভাই—এই চলল প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে!

মোণে ওঠে না, কিন্তু পাড়ার সবাই উঠে পড়ল। ওদিকে দেরী হচ্ছে দেখে গাড়োয়ান ওপর থেকে সুরু করলে—এ বাবু, আর কত দেরী হবে?

বন্ধুদ্বয় লাগালে তারপর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া—ওঃ, ব্যাটা একেবারে লাটসাহেব!

গাড়োয়ান বললে—গালাগালি দিও না বাবু, ভাল হবে না।

—কি করবি রে তুই?

মারামারি লাগে আর কি!

গাড়োয়ানের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বন্ধুদের উৎসাহ গেল দ্বিগুণ বেড়ে। তারা আবার প্রাণপণ জোরে চীৎকার সুরু করলে—মোণে, এই মোণে, ওঠ্ রে বাড়ী এসে গিয়েছে।

শেষকালে পাড়ার লোকেরা প্রাণের দায়ে নেমে এসে দরজা খুলিয়ে চ্যাংদোলা করে মণিবাবুকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেত।

একদিন, তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে, ক'দিন থেকে দারুণ গরম পড়েছে, আপিস থেকে খবর এল যে, মণিবাবু সেখানে হঠাৎ খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। মণিবাবু ছিলেন বাড়ীর বড় ছেলে তাঁর পরের ভাই চাকরী করত কোথায়, আর দুটি ভাই পড়ত কলেজে এই দুই ভাই খবর পেয়ে তখুনি ছুটল দাদার আপিসে।

সেদিন সন্ধ্যা-রাতেই বেহুঁস হ'য়ে মণিবাবু বাড়ী ফিরলেন ভাইদের সঙ্গে। সকলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

তার পর সারা রাত ডাক্তার-বদ্যির আনাগোনায় পাড়া মুখরিত হয়ে উঠল কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। শেষ রাত্রির দিকে মণিবাবু শেষ হয়ে গেলেন। পাড়ার লোকেদের ডাকতে হোলো না, তারা যে যার গামছা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রভাত হবার আগেই মণিবাবুর শব বের ক'রে নিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

মদ খেয়ে মণিবাবু জীবনে একদিনও হাঙ্গামা না করলেও তাঁকে নিয়ে হাঙ্গামার অন্ত ছিল না।

পরদিন, শ্মশান থেকে ফিরে আসবার পর বিকেলবেলা পাড়ার অনেক মুরুব্বী ও মণিবাবুদের আত্মীয়-স্বজন আসতে লাগলেন তাঁর ভাইদের সান্ত্বনা দিতে। সকলেই প্রাণ খুলে মণিবাবুর প্রশংসা করতে লাগল। ভাইয়েরা বললে—বাবা মারা যাবার পরে আমাদের যে কি হ'তো দাদা না থাকলে, তা কল্পনাই করতে পারি না। কত অন্যায় করেছি, অত্যাচার করেছি, কিন্তু এক দিনের জন্য দাদার মুখ গম্ভীর দেখিনি কিংবা কড়া কথা শুনিনি।

ভাইয়েরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বৌদি মারা যাবার পর কি রকম যে হ'য়ে গেলেন—ইদানীং তো বাড়ীর কেউ কথা না বললে তিনি নিজে থেকে কোন কথাই বলতেন না।

মুরুব্বীরা বললেন—ছেলেবেলা থেকে মণি আমাদের সঙ্গে কখনো মুখ তুলে কথা কয়নি—পাড়ায় এত হাঙ্গামা হয় কিন্তু কারুর বিপক্ষে সে কোন

দিন কথা বলেনি—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে এমন নির্বিরোধী চরিত্র দেখা যায় না।

হাঙ্গামাকারীর প্রশংসা বোধ হয় তখনি করা যায়, যখন তার দ্বারা হাঙ্গামার সম্ভাবনা নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

চৌধুরী মশায়

বিশ্বম্ভরবাবু ছিলেন পাড়ার ছেলেদের ঠাকুর্দা। তাঁর নাতি ন্যাংটেশ্বর ছিল আমাদের বন্ধু আর সেই সম্পর্কেই পাড়ার ছোটছেলেরা তাঁকে ঠাকুর্দা বলে ডাক্‌ত। বেঁটে-সেঁটে বেশ ষণ্ডা চেহারা, যৌবনে কুস্তি ও জিমন্যাস্টিক করতেন -বয়স ষাট পেরিয়ে গেলেও শরীরে তখনো অসম্ভব শক্তি ছিল। পাড়ার কোন ছেলেই, এমন কি বড়রা পর্যন্ত তাঁর আঙুল সোজা করতে পারত না। সব সময়েই গায়ের জোরের কথা এবং যৌবন কালে তাঁরা গড়ের মাঠে গিয়ে কি রকম গায়ে পড়ে ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাদের ঠেঙানি দিতেন, মাসে অন্ততঃ একবার আমাদের কাছে সেই গল্প করতেন। পাড়ার ছোট-বড় সব ছেলেই ছিল তাঁর বন্ধু।

বিশ্বম্ভবাবুর একমাত্র ছেলে অর্থাৎ আমাদের বন্ধু ন্যাংটার বাবা যৌবনেই মারা গিয়েছিলেন এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে। তখন বিশ্বম্ভরের মা ছিলেন বেঁচে মা, স্ত্রী, পুত্রবধূ, এক নাতি ও এক নাতনী এই নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। তখনকার দিনের হিসেবে বিশ্বম্ভরবাবু বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী, তা ছাড়া নিজেদের প্রকাণ্ড বসত বাড়ী ও তার পেছনে আট-দশ বিঘের বাগান ও তাতে পুষ্করিণী—এই ছিল তাঁর সম্পত্তি। তখনকার দিনে শহরের অনেক বাড়ীর পেছনেই বাগান ও পুকুর থাকত। পাড়ার লোকে বল্‌ত বুড়ী অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের মার হাতে না কি নগদ টাকা আছে অগাধ।

বিশ্বম্ভর চৌধুরী প্রায় ছেলেবেলা থেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে-মাঝে মদ্য-পান করতেন, কিন্তু একমাত্র পুত্র অর্থাৎ আমাদের ন্যাংটেশ্বরের বাবা মারা যাওয়ায় সে শোক ভদ্রলোক শাদা চোখে আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাই প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণে মদ্যপান সুরু ক'রে দিলেন।

মদ্যপান ক'রে বিশ্বম্ভর যে খুব দুর্দান্ত হ'য়ে পড়তেন, তা নয়। কারুকে মার-ধোর করা কিংবা রাস্তায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকা, এ সব ছিল না বটে কিন্তু চেঁচামেচি হাঁক-ডাক এমন লাগাতেন যে নেহাৎ যারা তাঁকে জানত তারা ছাড়া আর কেউ তাঁর ত্রিসীমানায় এগুতে সাহস করত না।

সনাতন মাতাল-রীতি অনুসারে চৌধুরী-মশাইও সকালে আপিসে বেরুতেন

আর বাড়ী ফিরতেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে, এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের ইতিহাস। ছুটির দিন ও রবিবারগুলো বাড়ীর বাইরে বেরুতেন না বটে তবে সাত-পাড়ার লোক টের পেত যে আজ চৌধুরীর ছুটির দিন।

রাত দুপুরে বাড়ী ফিরে কড়া-নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খোলা না পেলে চৌধুরী-মশাই বড়ই বেজার হতেন। একটা সরু লম্বা বদ্ধগলির একেবারে শেষসীমায় ছিল তাঁর বাড়ী। পাছে দরজা খুলতে দেরী হয়, সে জন্য বিশ্বম্ভর গলিতে ঢুকেই সেই ডাকাতে গলায় হাঁক ছাড়তে সুরু করতেন—গিন্নি, ও গিন্নি—দরজাটা খোলো—আমি এসেছি—

পাড়ার কচি ছেলে-পুলে কঁকিয়ে উঠ্‌ল, আফিংখোরদের নেশা চম্‌কে গেল —বিশ্বম্ভর-গিন্নি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

কর্ত্তা বাড়ীতে ঢুকেই পাড়া কাঁপিয়ে গিন্নিকে সম্বোধন করলেন—বুঝেছ গিন্নি, আজ কি হয়েছে জানো ?

কাছাকাছি বাড়ীর লোকেরা উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগল—বিশ্বম্ভর আজ কোথায় কি কাণ্ড ক'রে এল শোনবার জন্য। কিন্তু বিশ্বম্ভর-গিন্নির সেদিকে কোনো উৎসাহই নেই। তিনি সাত বছর বয়সে বৌ হ'য়ে এ-বাড়ীতে ঢুকেছেন, শুধু বিশ্বম্ভরকে নয় তাঁদের তিন পুরুষকে তিনি হাড়ে-হাড়ে চেনেন নেহাৎ শাশুড়ী এখনো বেঁচে তাই প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ হ'তে পারে নি। তিনি বিশ্বম্ভরের কথাগুলো গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে নিরুদ্বেগে দরজা বন্ধ ক'রে বাড়ীর ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিশ্বম্ভর দুই হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর পথ আটকে চীৎকার কবতে লাগল—বুঝেছ গিন্নি, আজ যা হয়েছে—

গিন্নি বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি, এখন ওপরে চল দিকিন—

বিশ্বম্ভর হুঙ্কার ছাড়লে—কি বুঝেছ! বল কি বুঝেছ ?

বিশ্বম্ভরের হুঙ্কার শুনে নাতি-নাতনীদের ঘুম ভেঙে গেল। রোজ প্রায় শেষরাত্রে ঠাকুরদাদার সঙ্গে খাওয়া তাদের বাধ্যতামূলক। দাদুর সাড়া পেয়ে তারা ছুটে এল। তাদের দেখে বিশ্বম্ভর দ্বিগুণ উৎসাহে সুরু করলেন—জানিস ন্যাংটা, আজ কেল্লার পাশ দিয়ে আস্‌চি, এমন সময় চার ব্যাটা গোরা সোল্‌জার—বুঝলি ন্যাংটা ইয়া-ইয়া চেহারা ব্যাটাদের আরে বাবা, আমাকে দেখাচ্ছিস্ চেহারা! এসেছিল চালাকী করতে—come on fight বলেই এক শালার রগে একটি ঘুষো ঝাড়তেই ব্যাটার চোখটা উপড়ে একেবারে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আর এক ব্যাটা টপ ক'রে চোখটা লুপে নিলে আর দু-ব্যাটা সেটাকে চ্যাংদোলা ক'রে ধরে কেল্লার মধ্যে ছুটে পালিয়ে গেল—বুঝলি!

বোঝা-পড়া হ'য়ে যাবার পর ওপরে উঠে জামা-টামা ছেড়ে তিনি স্নান করতে গেলেন আর তাঁর গিন্নি ও পুত্রবধূ মিলে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে খাবার গরম

করতে লাগলেন। স্নান সেরে খেতে বসলে লুচি ভাজা সুরু হবে—ঠাণ্ডা লুচি আবার তাঁর সহ্য হোতো না কি না!

খাবার সময় সবাইকে সঙ্গে বসতে হবে—সে আশী বছরের মাকে পর্যন্ত। মা খেতেন না, তবে গিন্নি ও পুত্রবধূকে খেতেই হবে। প্রতিদিন মাংসের বাটিতে খানিকটা মাংস রেখে উঠে যাবার সময় বলতেন—বৌমা, মাংসটুকু খেয়ে ফেলো।

পুত্রবধূ যে বিধবা, সন্ধ্যের পর চৌধুরী-মশায়ের সে কথাটুকু আর মনে থাকত না।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে, এমন সময় কুকুরের কেঁউ-কেঁউ কান্নার রবে পাড়া কেঁপে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে চৌধুরী মশায়ের হুঙ্কার উঠল কুকুরের চীৎকার ছাপিয়ে—এই বোই (boy) শেক্ হ্যাণ্ড!

সঙ্গে-সঙ্গে আবার কুকুরের আর্ত্তনাদ ও তৎসহ যথোপযুক্ত তিরস্কারের সুরে চৌধুরীর শাসন-ভাষন—চোপ্‌রাও ইডিয়ট—বোই, শেক্ হ্যাণ্ড।

বিশ্বম্ভরের হুঙ্কার-চীৎকার-গান ইত্যাদি প্রায় প্রতি রাত্রেই শুনে শুনে পাড়ার লোকের অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ রাত দুপুরের এই নিয়মিত শান্তিভঙ্গের ব্যতিক্রম হ'লে লোকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ত। সাড়ে ন-টার তোপের মতন বিশ্বম্ভরের বাড়ী ফেরাটাও সকলে সময় নির্দেশক-রূপে ব্যবহার করত। পাড়ার লোকে বলত—রাত তখন, চৌধুরী বাড়ী ফেরেনি।

কিন্তু একটা বিষয়ে চৌধুরীর প্রশংসা করত সবাই যে, দশ-পনেরো মিনিটের বেশী হাঁক-ডাক সে করে না। কিন্তু সেদিন তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে কুকুর-কণ্ঠ যুক্ত হ'য়ে এমন অশ্রাব্য ধ্বনির সৃষ্টি হোলো যে সাতটা কনশার্ট পার্টি মিলেও তা করতে পারে না।

সে সময়কার লোকদের পরকে সহ্য করবার শক্তি এখনকার চাইতে ছিল অনেক বেশী। বিশেষ ক'রে প্রতিবেশীর এই শ্রেণীর অত্যাচার সে যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই হোতো। কিন্তু সে রাত্রে একেবারে অসহ্য হওয়ায় কেউ-কেউ প্রাণের দায়ে, কেউ বা কৌতূহলের ঠেলায় ছুটলেন চৌধুরীর বাড়ীতে —যারা গেল না তারা জেগে ব'সে রইল ব্যাপারটা কি জানবার অপেক্ষায়।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক বাদে লোকেরা চৌধুরী-বাড়ীতে কোলাহলের যে কারণটি জেনে ফিরে এল তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। বিবরণটি এই প্রকার— বিশ্বম্ভর চৌধুরী সতেরো-আঠারো বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকেছিলেন, এখন তাঁর ষাট পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু সমানে চাকরী ক'রে যাচ্ছেন। পনেরো টাকায় ঢুকে এখন তিনি আড়াইশো টাকার ওপর মাইনে পান। নিজের বিয়ে, ছেলের বিয়ে, ছেলের মৃত্যুদিন প্রভৃতি কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ছাড়া তিনি কখনো আপিস কামাই করেন-নি, তার ওপরে কাজের লোক। এই সব কারণে

আপিসের কেরাণীকুল ও কর্তৃপক্ষের সকলেই তাঁকে খুবই খাতির করতেন। আগেকার সায়েবরা আর নেই, এখন সব নতুন ছোকরা সায়েবরা মেজাজী হ'লেও চৌধুরী মশায়কে সম্মান করত।

ক'দিন থেকে এক ছোকরা মনিবের শুকনো মুখ দেখে চৌধুরী তাকে বললেন—ক'দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, কি যেন একটা চিন্তায় তুমি কাতর হ'য়ে রয়েছ—যদি কোন দুঃখ পেয়ে থাক তো আমি রয়েছি কি করতে? তোমাদের বাপ-দাদারা আমার কাছে কিছু লুকোতেন না। তাঁরা কাছে নেই কিন্তু আমি তো আছি। আমি দেখা-শুনা করব বলেই তো এই কাঁচা বয়সে তোমাদের পাঠাতে সাহস করেছেন তাঁরা এই বিদেশ-বিভুঁয়ে।

সায়েব চৌধুরীর কথা শুনে হেসে বললে—ধন্যবাদ চৌধুরী, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। ও কিছুই না। দিন-দুয়েক আগে আমার একটা কুকুর মারা গেছে। প্রিয় কুকুর মারা গেলে যে কি দুঃখ মনে লাগে তা কুকুরের সখ যার নেই সে বুঝতে পারবে না।

চৌধুরী-মশায় সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন—ওঃ, সে দুঃখের কথা আর বলো না সায়েব। আমার নিজের খুবই কুকুরের সখ কি না—ও আমি জানি। আমার মা এখনো বলে—বিশে, তোর সমস্ত সন্তান-স্নেহ কুকুরগুলোর ওপর পড়ল কি না, তাইতে তোর ছেলেটা বাঁচল না! বাড়ীতে প্রায় পঞ্চাশটি কুকুর—এক-একটি মরে আর একখানা ক'রে বুকের হাড় খসে যায় সায়েব! তা তুমি কিছু দুঃখ কোরো না, আমি তোমায় কুকুর এনে দেবো।

বলা বাহুল্য যে, চৌধুরী মশায়ের পুত্রশোকের কারণ সান্নিপাতিক ব্যাধি, কুকুর-প্রীতি নয়। ইতিপূর্বে কুকুরের সখ তাঁর কোন কালেই হয়নি।

চৌধুরীরও কুকুরের সখ আছে শুনে সায়েব একটু খুশী হ'য়েই বললেন—আরে, সে কুকুর তুমি পাবে কোথায়?

চৌধুরী বললে—সায়েব, তুমি তা হ'লে চৌধুরীকে এখন চেননি। আমি তোমায় ঠিক সেই রকম কুকুরই এনে দোব। উপরন্তু আমার কুকুর শেক, হ্যাণ্ড করবে, দু'পা তুলে দাঁড়াবে, পেছনের পা তুলে পিকক হবে, লাফাবে—দেখে বলবে, হ্যাঁ, চৌধুরী একটা কুকুর দিয়েছে বটে!

সায়েব বললে—আমার বরাত খারাপ। রাশিয়া থেকে এক জোড়া 'বোরজোই' কুকুর আনলুম, তার একটা জাহাজেই মরে গেল আর একটা সেদিন গরমে মরে গেল। এখানে ও কুকুর পাও তো দেখো তো,—যত দাম চায় আমি দিতে রাজী আছি।

চৌধুরী বললেন—কুকুর আমি তোমাকে দোবোই, তুমি কিছু ভেবো না। কিন্তু দাম তোমাকে দিতে হবে না।

ব্যস! তারপরে চৌধুরীর আর কিছুই মনে নেই। সায়েবকে দেখলে মধ্যে-মধ্যে মনে হয় বটে, কিন্তু ঘর থেকে বেরুলেই ভুলে যান, এমনি চলেছে,

এমন সময় সায়েবই এক দিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে—চৌধুরী আশা করি, আমার কুকুরের কথা ভোলনি ?

চৌধুরী তখুনি বলে ফেললে—সে কথা কি ভুলতে পারি সায়েব ! সেই দিনই বাড়ী গিয়ে আমার যেটা সব চেয়ে ভালো কুকুর, তাকে বললুম—ভোলা, তোর বরাত ভাল রে, আমার সায়েব তোকে চেয়েছে। যা ব্যাটা, তুই যেমন পেটুক তেমনি জায়গায় যা ! দু-বেলা চপ-কাটলেট ওড়াবি। ওঃ ! আমার কথা শুনে ফুর্ত্তির চোটে ভোলা লাফাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তারপরে রোজই আপিসে বেরুবার সময় আসতে চায়—শেষকালে—পরশু দিন নিয়ে আসব বলে চেনে বেঁধেছি এমন সময় ভোলার মন খারাপ হ'য়ে গেল !

চৌধুরীর কথা শুনে সায়েব হাসবে কি কাঁদবে স্থির করতে পারে না, এমন অবস্থা ! তিনি চৌধুরীকে বললেন—বল কি চৌধুরী ! তুমি কুকুরের কথা বুঝতে পার ?

চৌধুরী সবিনয়ে বললে—শুধু কথা নয় হুজুর—মনের কথা ! তা যদি না পারলুম তো এত দিন কুকুর পুষলুম কি করতে ? তুমি কিছু ভেবো না হুজুর। আজই আসবার সময় ভোলা আসবার জন্য লাফালাফি সুরু করেছিল। তা আমি তাকে কাল কি পরশু নিয়ে আসব বলে এসেছি।

সায়েবের মুখে দ্বিতীয় বার কুকুরের কথা শুনে চৌধুরী ঠিক ক'রে ফেললেন, আর নয়। বার বার আরব্য উপন্যাস শুনালে সে চটে যেতে পারে। যেমন ক'রেই হোক ভাল কুকুর একটা সংগ্রহ করতেই হবে. এমন সংকল্প সারাদিন ধরে আঁটিতে লাগলেন মনের মধ্যে। কোথায় কার কাছে ভাল কুকুর আছে বা সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, তারই আলোড়ন উঠল মনের মধ্যে—কিছুই ঠিক পান-না এমন সময় ভক্তবৎসল দয়া করলেন।

সেদিন রাত দুপুরে বাড়ী ফেরবার মুখে একটা চাটের দোকানের সামনে এক পাল কুকুরকে বসে থাকতে দেখে চৌধুরী মশাই স্থির করলেন, সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা ভাল দেখে ধরে নিয়ে গিয়ে রাতারাতি শিখিয়ে-পড়িয়ে কাল সকালে সায়েবকে উপহার দেবেন। কিন্তু চিন্তাটিকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা-জনিত পরিশ্রমের ফলে তাঁর বহু আয়াসলব্ধ লক্ষ টাকার নেশাটি ছুটে গিয়েছিল এবং সে জন্য এই মাগ্যির বাজারে কিঞ্চিৎ ব্যয়-বাহুল্যও ঘটেছে।

ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় চৌধুরী মশায় প্রকাশ করেছেন যে যেটাকেই ধরতে গিয়েছেন, সেটাই মেরেছে দৌড় আর সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও তার পেছনে ধাওয়া করেছেন। মত্ত অবস্থায় কল্পনার সঙ্গে পদযুগলের তালের সমতা রক্ষা করতে না পেরে দু-চার বার আছাড়ও খেতে হয়েছে। এই রকম ক'রে তিন-চারটের পেছনে মাইল খানেক ছুটোছুটি ক'রে শেষকালে কুকুরও ধরা পড়ল না, এদিকে নেশাও গেল ছুটে—আবার কেঁচে গণ্ডুস সুরু ক'রে তবে মাথায় নতুন প্ল্যান এল।

এবারে চৌধুরী মশায় একটা কাটলেট কিনে কুকুরদের দেখানো মাত্রই সবগুলো ছুটে এল, কিন্তু এইটে ছিল তাদের সর্দার—এটা আর সবাইকে তাড়িয়ে নিজে এল অর্থাৎ সমস্ত কাটলেটটি নিজেই খাবে। চৌধুরী মশায় তাকে…'আ তু তু' ক'রে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে কাটলেটের আধখানা খেতে দিলেন। সারমেয়-নন্দন খেতে ব্যস্ত. ইতিমধ্যে বাকী আধখানা কাটলেট নিজের মুখে পুরে দিয়ে কোঁচাটা খুলে কুকুরটার গলায় বেশ ক'রে বেঁধে ফেললেন। তারপরে টানতে-টানতে বাড়ীতে এনে তাকে লাফানো, দু-পায়ে দাঁড়ানো, শেক্ হ্যাণ্ড প্রভৃতি করতে শেখানো হচ্ছিল, এমন সময় পাড়ার লোকেরা গিয়ে উপস্থিত।

পাড়ার লোকেরা এ কথাও বললেন যে. সায়েবী কায়দা-কানুন ও লম্ফ-ঝম্ফগুলো রপ্ত হ'য়ে গেলে শেষরাত্রের দিকে কুকুরটির ল্যাজ ছাঁটাই হবে এবং সেজন্য একটু চেঁচামেচিও হ'তে পারে, এমন একটি সংবাদও বিশ্বম্ভর চৌধুরী নাকি তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

এ-হেন সুখবরটি পেয়ে দু-একজন শঙ্কা প্রকাশ করায় তাঁরা বললেন—ভয় নেই. বিশ্বম্ভরের মায়ের আওয়াজ পাওয়া গেছে—বুড়ীকে দেখলেই ওর সব মাতলামো ছুটে যাবে। ভাল ছেলের মতন গুটি-গুটি এখুনি গিয়ে খেতে বসবে।

সকলে বলাবলি করতে লাগল—বিশ্বম্ভর মাকে বড় ভক্তি করে। যে অবস্থাতেই থাক্ না কেন, জীবনে মার কথা সে কখনো অমান্য বা অবহেলা করেনি।

ষাট বছর বয়স হয়েছে, অথচ সে ব্যক্তি কখনো মায়ের কথা অমান্য বা অবহেলা করেনি, এমন লোক আর দেখা তো দূরের কথা জীবনে দ্বিতীয় বার শুনিনি।

তবুও বিশ্বম্ভর মাতাল ছিল।

যা হোক, সায়েবের বাড়িতে কুকুর গেল না বটে, কিন্তু সে জীবটি বিশ্বম্ভরের বাড়ীতেই রয়ে গেল এবং মৃত্যু অবধি তার ল্যাজের দৈর্ঘ্য অক্ষুণ্ণই ছিল।

নাতনীর বিয়ের মাসখানেক পরেই দিন কতক ভুগে একদিন সকালবেলা বিশ্বম্ভর চৌধুরীর মা মারা গেলেন। ষাট বছর বয়সে চৌধুরী-মশায় মাতৃহীন হ'য়ে যে খুব আঘাত পেয়েছেন, তাঁর মুখ দেখে তা মনে হ'লো না, বরং বেশ খুশী হয়েছেন বলেই বোধ হ'লো।

অনেকে বলতে লাগলেন—বুড়ীর হাতে বেশ কিছু নগদ ছিল, এত দিন পরে সেগুলি হাতে আসায় চৌধুরী আর হাসি চাপতে পারছে না।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় শ্মশান-বন্ধুর দল ফিরে এল দু-টো ভাড়াটে গাড়ী ক'রে। দেখলুম, একটা গাড়ী থেকে বিশ্বম্ভরকে প্রায় কোলপাঁজা

ক'রে নামিয়ে রাস্তায় দাঁড় করানো হোলো। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল, তারপরে কয়েক-পা টলে-টলে এগিয়ে এসে তাদের গলির মুখটার কাছে দড়াম ক'রে পড়ে গিয়ে চীৎকার করতে লাগল—মা গো, আমায় ফেলে তুই কোথায় গেলি!

চৌধুরীর চীৎকার শুনে পাড়ার ছেলে-বুড়ো বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ ও চৌধুরী-মশায়ের সমবয়সীরা মিলে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই তাঁর শোকের আবেগ সামলাতে পারলে না। তিনি সেই রাস্তায় লুটিয়ে 'মা মা' ক'রে কাঁদতে থাকলেন। সেই আকাট ষণ্ডা চৌধুরীর অন্তঃকরণের একটা জায়গা এমন দুর্বল দেখে কেউ বা দুঃখ প্রকাশ, কেউ বা ঠাট্টা করতে লাগল বটে, কিন্তু তার সেই কান্না আমার হৃদয়ের এক জায়গায় এমন ঘা দিলে যে সমবেদনায় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল।

শেষকালে পাড়ার মুরুব্বীরা তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য ধরাধরি ক'রে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কার সাধ্য তাকে সামলায়! তার এক-একটা ঝট্‌কানিতে সবাই ছিট্‌কে পড়তে লাগল। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের বন্ধু অর্থাৎ চৌধুরী-মশায়ের নাতি ন্যাংটাকে বললেন—যা রে ন্যাংটা, তুই একটু বল্‌গে যা, তুই বল্‌লে ঠিক উঠে যাবে!

সবাই বলাবলি করতে লাগল যে, অপরিসীম মাতৃশোক নিবারণের জন্য চৌধুরী অপরিমিত মদ্যপান করেছে।

একজন বৃদ্ধ, তিনি চৌধুরী-মশায়ের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। ভদ্রলোক তামাক টানতে-টানতে বলতে লাগলেন—একটু বাদে ও আপনিই উঠে যাবে'খন—সারা জীবনটা কাটালে ওর কেলেঙ্কারী দেখতে-দেখতে।

যা হোক, চৌধুরী ওঠেই না, কেউ সামলাতেও পারে না, এমন সময় ন্যাংটা কাছে গিয়ে বললে—দাদু চল ভেতরে, ওরা সব কান্নাকাটি করছে।

ন্যাংটার কথাগুলো চৌধুরী-মশায়ের মাতৃশোকাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করলে। তিনি দ্বিগুণ জোরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—ওরে ন্যাংটা রে, ওরা কি বুঝবে রে শালা! তোর মা একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, তোর তখন চার বছর বয়েস—আমার মা বিধবা হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়েসে আমার বয়েস তখন তিন মাস। তো শালার বাপ গেলেও ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা পর্যন্ত বেঁচে ছিল—আমার এই দুনিয়ায় এক মা ছাড়া আর কোন শালাই ছিল না রে! সেই মা আমার চলে গেছে—আমার দুঃখ তুই শালা কি বুঝবি!

এদিকে ঠাকুদার ওই রকম হ্যানস্তা হচ্ছে দেখে বন্ধু ন্যাংটেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই একযোগে মিলে চৌধুরী-মশায়কে তুলে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল।

পাড়ার মুরুব্বীরা চৌধুরী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে মায়ের শোক তিন দিনের, মাঝে থেকে তার মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে যাবে।

গণকের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কতক মেলে, কতক মেলে না, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। মদ্যপান বেড়ে গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃশোকও বেড়েই চলল।

মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি হ'য়ে যাবার পর চৌধুরী-মশায় আর আপিসে বেরুলেন না। সেখান থেকে সায়েবরা ডেকে পাঠাতে লাগল, লোক-জন যাওয়া-আসা করতে লাগল, কিন্তু চৌধুরী তাদের বলে দিলেন—আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, তখন মা একদিন বলেছিল, ওরে বিশে, একটা কাজ-কম্মে' মন না দিলে বয়ে যাবি। শেষকালে আমায় কি পথে বসাবি! এই বেলা একটা চাকরী-বাকরী দেখে ঢুকে পড়। মার কথায় তখন সেই পনেরো টাকা মাইনেতে চাকরীতে ঢুকেছিলুম। না হ'লে, চাকরী করবার মতন অবস্থা আমার নয়। আজও নয়, সেদিনও ছিল না।' মা চলে গেছে, আবার চাকরী কিসের!

চৌধুরী বাড়ীতে বসে দিন-রাত তেড়ে মদ্যপান সুরু ক'রে দিলে। বাড়াবাড়ি দেখে ন্যাংটার ঠাকুরমা অর্থাৎ চৌধুরী-মশায়ের স্ত্রী এক দিন বললেন—ওগো, একবার আমার মুখের দিকে চাও!

সেইদিনই চৌধুরী-মশায় উকীল, সাক্ষী প্রভৃতি ডেকে নিয়ে এসে উইলের বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন।

কিছু দিনের মধ্যেই অর্থাৎ মায়ের বাৎসরিক হবার আগেই চৌধুরী মশায়ের শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল।

নেলো

আর একটি মাতালের কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

আমাদের ছেলেবেলায় বড়রাস্তায় অর্থাৎ হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে আরম্ভ ক'রে মাণিকতলার মোড় অবধি অসংখ্য খোলার বাড়ী ছিল। এই সব বাড়ীর অনেকগুলিতেই ছিল হোটেল। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, চচ্চড়ির নয়, এখানে চপ, কাটলেট, কারি, কোর্মা ও আরও সব অদ্ভুত নামের মাংসের খাবার তৈরি হোতো। বড় লোকেরা অর্থাৎ যাঁদের পয়সা, সখ ও সাহস এই তিনই ছিল তাঁরা মধ্যে-মধ্যে খানা খেতে যেতেন বিলিতি হোটেলে, আর যাঁদের পয়সা ইত্যাদির অভাব সত্ত্বেও ছিল রসের প্রাণ, তাঁরা মধ্যে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকতেন এই সব হোটেলে। সে যুগে এই সব হোটেলে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ না হ'লেও নিন্দনীয় ছিল। তার কারণ এইগুলির মধ্যে নিষিদ্ধ পানীয় ও ভোজ্য চলত অবাধে।

আমাদের বাড়ীর পাশেই এই রকম একটা বড় হোটেল ছিল। এই হোটেলের মালিক ছিল স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী। এই রকম হোটেল প্রতিষ্ঠা ক'রে জনসেবার পন্থা সে-ই নাকি প্রথম উদ্ভাবন করেছিল।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে এই গিরিশের দোকানের সামনে খুব ভিড় হয়েছে দেখে নীচে গিয়ে দেখলুম, দোকানের সামনের রকে একটা মাতাল এসে বসেছে। তার গায়ে কোনো জামা নেই, পরনের ধুতিখানা কোনো রকমে কোমরে জড়ানো—খুব মজার মজার কথা বলছে আর লোকেরা হো-হো ক'রে হাসছে। ভিড়শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই তার ভাব। প্রায় সকলেই তাকে কোনো-না-কোনো প্রশ্ন করছে আর সকলকেই সে একটা-না-একটা জবাব দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জবাবটাই হাসির ফোয়ারা!

চমক লাগল! ঠিক এ ধরণের মাতাল ইতিপূর্বে দেখিনি। মাতাল দেখে-দেখে তাদের সম্বন্ধে একটা আন্দাজ মনের মধ্যে তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল। একে দেখে মনে হ'ল—এ ব্যক্তি আমার সেই আন্দাজের গণ্ডীর বাইরের লোক।

গোলমাল, হাসি, হর্‌রা ও ভিড় ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখে হোটেলের মালিক চক্রবর্ত্তী মশায় শঙ্কিত হ'য়ে বলে ফেললেন—ওরে নেলো, এখন যা ভাই। সন্ধ্যের সময় দোকানের সামনে ভিড় দেখলে খদ্দের ভড়কে যাবে।

নেলো বললে—যাচ্ছি ঠাকুর, যাচ্ছি। আচ্ছা একটা কথার উত্তর দাও দিকিনি—সুড়-সুড় ক'রে চলে যাচ্ছি। লোকে বলে তোমার জ্ঞানগম্যি

আছে। আচ্ছা বল তো বাবা, গাছ আগে কি বীচি আগে? মুরগী আগে না ডিম আগে?

প্রশ্ন শুনেই ভীড়ের সবাই হেসে উঠল। কেউ বললে—গাছ আগে, কেউ বললে—বীচি আগে। কিন্তু সমস্যাটার সমাধান কেউ করতে পারলে না।

ভীড় বাড়তেই লাগল। দেখলুম, সকলেই তাকে চেনে, ছেলে-বুড়ো সবাই তার নাম ধরে ডাকে, সবাই তার সঙ্গে কথা কয় আর সবার কথারই সে জবাব দেয় এমন মজা ক'রে যে না হেসে থাকতে পারা যায় না। প্রথম দর্শনেই মনে হোলো, যাই হোক না কেন লোকটার বুদ্ধি আছে, এ কথা মানতেই হবে।

আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে হাসি তামাসায় কাটবার পর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বললে—নেলো, এইবার যা ভাই, সন্ধ্যে দেব, এখন যা। তোর তো আজ সারারাত চলবে—রাত্রি দশটা নাগাদ যদি মনে থাকে তো আসিস্‌, এইখানেই খাবি।

নেলো বললে—যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, দুটো চপ দাও খেয়ে চলে যাই।

—আবার এখন চপ কেন? বললুম না, রাতে যত চাইবি দোবো।

নেলো বললে—এই তো বাবা, বেতালা বাজালে। পেটের মধ্যে ক্ষিদের খেয়াল তান ছাড়ছে হ্যা র্যা র্যা র্যা—ত্যা র্যা র্যা র্যা—তার সঙ্গে সমানে সংগত চালাবে, তা নয় তুমি ঢিমের ঠেকা সুরু করলে? কোথায় এখন বেলা পাঁচটা আর কোথায় রাত্তির দশটা—কোন পাঁদাড়ে পড়ে থাকব তখন, তা মা ধান্যেশ্বরীই জানেন। দুটো চপ দাও ভাল ছেলের মতন খেতে-খেতে চলে যাই।

লোক-জন তার কথা শুনে হাসতে লাগল বটে, কিন্তু ঠাকুর মশায় গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রেই রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে নেলো বললে—আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, যদি ঠিক উত্তর দিতে পার তো আমি চলে যাব আর যদি না পার তো চারটে চপ খাওয়াতে হবে।

ভীড়ের লোকেরা নেলোর প্রশ্নটা শোনবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি প্রশ্ন নেলো?

কিন্তু ঠাকুর কিছুতেই ঘাড় পাতে না। শেষকালে সবাই চাঁদা করে দু-আনা তুলে ফেললে—তখনকার দিনে এই সব দোকানে ছোট চপের দাম ছিল দু-পয়সা মাত্র।

নেলো প্রশ্ন করলে—ভগবান আমার কোচুয়ান—কেন বল তো বাপু?

কেউ জবাব দিতে পারে না, সবাই চুপ।

নেলো বললে—কারণ, তিনি আমায় যে পথে চালান আমি সেই পথেই চলতে বাধ্য হই।

ভীড়ের লোকেরা হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। তখুনি

চারটে চপ হাজির হোলো। নেলো গপ্ গপ্ ক'রে খেতে লাগল আর লোকেরা ওর মধ্যে কিছু আমোদ পাবার আশায় হাঁ ক'রে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল।

Oxford University Mission বাড়ীটার সদর দরজা আজ-কাল বিবেকানন্দ রোডের ওপর হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় ও রাস্তাটার অস্তিত্বই ছিল না—ও বাড়ীটার সদর দরজা ছিল কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ওপরেই, আর ঠিক সামনে বিপরীত ফুটপাতেই ছিল এক মদের দোকান—ঈশ্বরের পাশেই শয়তানের বাসা প্রবাদটির জ্বলন্ত নিদর্শনের মতন।

এক দিন বিকেল বেলা, বোধহয় ইস্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার মুখে দেখি এই মদের দোকানের সামনে বিপুল জনতা—এত ভীড় যে ট্রাম চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। ভীড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে যা দেখলুম তা কল্পনাতীত। সে দৃশ্য শহরের রাস্তায় কল্পকালে একবার দেখা যায় কি না সন্দেহ!

দেখলুম, মদের দোকানের সামনের চওড়া রোয়াকের ওপরে একটা বিরাট কুমীর পড়ে আছে, অবশ্য মৃত। তার মুখখানা হাঁ করিয়ে তার মধ্যে দু-টো এগারো ইঞ্চি থান ইট ভরা হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার কায়দায় নেলো তার পিঠে চেপে বসে আছে। তার দু-পাশে ছোট, বড়, ছুঁচ-মুখো, থ্যাবড়া-মুখো সব মাংস-কাটার ছুরি-ছোরা পড়ে রয়েছে। একটা ছোরা হাতে নিয়ে নেলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতে লাগল—এত দিন ধরে কত মানুষ খেয়েছে তার ঠিক নেই, আজ ব্যাটা ধরা পড়েছে। এর মাংস দিয়ে চপ, কাটলেট, কোপ্তা, কোর্মা বানাব—আপনাদের নেমন্তন্ন রইল।

নেলোর আসল নাম ছিল লালবিহারী সাহা। সে গালাব কাজ করত এবং বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। মাঝে-মাঝে দেখা যেত ধোপদোস্ত ধুতি, জামা, চাদর ও পায়ে জুতো পরা লালবিহারী বাবু ঘাড় গুঁজে হন্-হন্ ক'রে পথ দিয়ে চলেছে। সে সময় অনেককে শুনেছি তাকে সম্ভাষণ করতে—এই যে লালবিহারী বাবু, কত দূর চলেছেন?

লালবিহারী ঘাড় তুলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিত—এই যাব একটু রাধাবাজারে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, 'লালবিহারী বাবু' মূর্ত্তিতে তাকে মোটেই মানাত না। তার চেয়ে সেই আধ-ময়লা ধুতি—আধখানা কোন রকমে কোমরে জড়ানো আর আধখানা রাস্তায় লুটোচ্ছে, এক পা এখানে পড়েছে আর এক পা ওখানে—সেই অবস্থাটাই যেন তাকে মানাত ভাল। তার কারণ, ঐ অবস্থায় না পৌঁছলে তার মুখ দিয়ে তত্ত্বকথা বেরুত না—যে জন্য তার এত জনপ্রিয়তা। নইলে সংসারে মাতালের অভাব কি?

রাস্তায় এমন বেলেল্লাগিরি করা সত্ত্বেও তাকে পুলিশ ধরত না কেন—এটা আমাদের কাছে একটা সমস্যা ছিল। শুনেছিলুম, কলকাতার একজন

নামজাদা 'বাবু' মদ খেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় বেলেল্লাগিরি ক'রে বেড়াবার জন্য নেলোকে পুলিশের লাইসেন্স ক'রে দিয়েছে। এমন সব দিলদরিয়া মাতাল-বৎসল 'বাবু' বাস্তব জগতে বাস না করলেও সেদিন পর্যন্তও তাঁরা লোকের কল্পনা-জগৎ থেকে নির্বাসিত হননি।

সে সময়ে কায়স্থদের পৈতে গ্রহণ নিয়ে শহরে খুব হৈ-চৈ সুরু হয়েছিল। অনেক ধনী ও পণ্ডিত কায়স্থ পৈতে নিতে লাগলেন এবং শাস্ত্র পড়ে প্রমাণ করতে লাগলেন যে তাঁরা ক্ষত্রিয়। কেউ-কেউ নিজের পদবীর পরে 'বর্মা' শব্দটি যোগ করলেন—শহরে খুব হৈ-চৈ. ব্রাহ্মণেরা একেবারে তটস্থ।

এই সময় এক দিন দেখি, অক্সফোর্ড মিশনের সামনে মদের দোকানের রকে একটা একতালা সমান উঁচু ও সেই অনুপাতে মোটা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে নেলো বক্তৃতা সুরু করেছে—ফুটপাতের উপরে বেশ ভীড়। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক, সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় অবনতি ও সে বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে বলে চলেছে। বিষয়বস্তু দুরূহ ও গম্ভীর হ'লেও তার ভাষার প্রাসাদগুণে ইস্কুলের ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজের অধ্যাপক পর্যন্ত সকলেই সেই বক্তৃতা উপভোগ করছে।

বেশ চলছিল. হঠাৎ নেলো বক্তৃতা থামিয়ে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে নামবার চেষ্টা করতে সুরু করলে। পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে কয়েক জন 'ধর ধর' বলে উঠল, কেউ বা সত্যি তাকে ধরবার জন্য অগ্রসর হ'লো কিন্তু তারা পৌঁছবার আগেই নেলো সেই পিপের মসৃণ গা বেয়ে দড়াম ক'রে নীচে পড়েই একেবারে গড়াতে-গড়াতে ভীড়ের কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। ভীড়ের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তার বক্তৃতা উপভোগ করছিলেন। ভদ্র-লোকের খালি পা. গায়ে নামাবলী, নেড়া মাথায় মোটা টিকি, এক হাতে একটা পোঁটলা—বোধ হয় যজমানের বাড়ী থেকে ফিরছিলেন। নেলো কোন রকমে ভূমিশয্যা ছেড়ে টলমল করতে-করতে ব্রাহ্মণের সামনে এসে অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে বললে—ঠাকুর মশায়, প্রণাম হই। বড় সুসময়ে এসেছেন আপনি, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল।

ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি পরামর্শ লালু?

—আজ্ঞে, বলছিলুম কি—দেশে এই রকম অনাচার বাড়তেই চললে. হিন্দুধর্ম তো আর টঁ্যাকে না। আপনারা একটু নেক-নজর না দিলে তো সব যায়!

ঠাকুর মশায় বললেন—ঘোর কলি, কলিকালে এ সব তো হবেই।

নেলো বললো—কায়স্থরা পৈতে নিতে আরম্ভ করেছে জানেন কি? দু-দিন বাদে অন্য জাতেও পৈতে নেবে, দেখে নেবেন আপনি।

ঠাকুর বক্র হেসে বললেন—হ্যাঁ জানি। ওরা সব ক্ষত্রিয় হয়েছে।

—তা দেশে ক্ষত্রিয়ের দল এত বাড়তে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? এর একটা

বিহিত করতে পারা যায় না কি ?

ঠাকুর মশায় তাঁর পোঁটলাটা দুলিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বল্‌লেন—কি আর করা যাবে, এ যুগে ব্রাহ্মণের কথা কি আর কেউ শোনে ?

নেলো টলতে-টলতে দু-হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর পথ আটকে বল্‌লে—শোনে বই কি, তেমন বামুন হ'লে শুনতেই হবে। আমি বলি, একটা কাজ করলে হয় না ?

—কি কাজ ?

—ক্ষত্রিয়দের ঠাণ্ডা করা আপনাদের মতন চাল-কলা-খেকো বামুনের কর্ম্ম নয়। বলছিলুম কি, পরশুরাম ঠাকুরকে একবার খবর দিলে হয় না ? আর একবার এই ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে দিয়ে যেতেন।

ঠাকুর মশায় আর বাক্যব্যয় না ক'রে বাড়ীমুখো ছুটলেন।

সে সময় কায়স্থদের পৈতে নেওয়ার হুজুগে একজন বেশ নাম করেছিলেন। ইনি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান ক'রে রেশমের কাপড় পরে বেদপাঠ করতেন। তাঁর সেই বেদপাঠ রাস্তা থেকে শুধু যে শোনা যেত তা নয়, তাঁকে দেখতেও পাওয়া যেত। একদিন সকাল বেলা ভদ্রলোক বেদপাঠ শুরু করেছেন, এমন সময় কোথা থেকে নেলো এসে হাজির ! তার হাতে একটা খাঁচা আর তার মধ্যে বিরাট আকারের এক মোরগ, সঙ্গে বেশ একটি জনতা, তার মধ্যে বালকের সংখ্যাই বেশী। খাঁচাটাকে মুখের সামনে ধরে নেলো সুর ক'রে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে—পড় বেটা রাধাকৃষ্ণশ্যাম—

ছেলের দল হো-হো ক'রে উঠতেই ভদ্রলোকের বেদপাঠ মাথায় উঠে গেল। মুখ তুলে ব্যাপার দেখে এগিয়ে এসে তিনি নেলোকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হচ্ছে লালু ?

—আজ্ঞে, পাখীটাকে রাধাকেণ্ট পড়াচ্ছি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—মুরগীতে কখনো রাধাকেণ্ট পড়ে ?

নেলোও হেসে বললে—কেন পড়বে না মশায় ! আপনার দ্বারা যদি বেদ উচ্চারণ হ'তে পারে তো আমার মুরগী কেন রাধাকেণ্ট বলতে পারবে না ?

আর কথা না বাড়িয়ে তিনি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

এই রকম প্রায় দেড় যুগ ধরে ঘরের পয়সায় মদ খেয়ে নেলো মাতাল রাস্তার লোকদের আমোদের খোরাক জুটিয়ে চলছিল—কখনও পায়ে হেঁটে, কখনো মুটের মাথায়, কখনও গাড়ীর চালে—হটাৎ এক দিন সে চারপায়ায় চড়ে চলে গেল—unmourned, unattended and unsung.

শিউলি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে।

অনেক খেস্তাখেস্তির পর দুপক্ষ সবেমাত্র আখড়ায়, নেমেছে. খেল তখনও ভালো করে শুরু হয়নি। যুদ্ধটা ভারতবর্ষের কানের কাছে পেঁছবার অনেক আগেই আমাদের কর্ণধারেরা কলকাতা শহরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে নানা রকম পরখ-নিরীখ শুরু করে দিলেন। রাত্রিবেলা শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান কলকাতা শহরের উপরে পাছে আক্রমণ চালায় এজন্য রাস্তায় গ্যাসের ফানুষগুলোতে আলকাতরা মাখিয়ে কালো করে দিলেন; ফুটপাথের ওপরে চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘর করে দিলেন—আচম্বিতে বোমারু আক্রমণ হলে পথিক যাতে সেই ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে, রাস্তায় সিগারেট খাওয়া মানা ইত্যাদি নানা রকম সাবধানতা কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করলেন। এত করেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে শেষকালে তাঁরা রাস্তায় বাতিগুলো একেবারে নিভিয়ে দিলেন।

শুধু তাই নয়। লোকের বাড়িতে ও খোলা জায়গায় জ্বালানো বাতি রাখতে পারবে না, এবং ঘরের ভেতরেও তেমনভাবে আলো রাখবে না—যার রশ্মি রাস্তা কিংবা ওপর থেকে দেখা যায়। অর্থাৎ শহর এতদিন অবগুণ্ঠিত ছিল, এবার বোরখার অন্তরালে আত্মগোপন করলে।

চোর-জোচ্চোর-বাটপাড়-খুনেরা সুযোগ পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে পড়লেন। এমন কি ঐ রকম মনোভাবাপন্ন লোকেরা—সুযোগের অভাবে যাঁদের প্রতিভা তেমন বিকশিত হয়নি, তাঁরাও কাজে নেমে পড়লেন। সন্ধ্যের পর পথচলা ভার—লোক চেনা যায় না—দূরে কেউ আসছে দেখলেই বুক দুরদুর করতে থাকে। এ সব ছাড়া আদিভৌতিক উৎপাত তো বেড়ে গেল. সন্ধ্যে হতে না হতে রাজ্যের ছুঁচো, ইঁদুর, ভাম এবং নানান রকম নাম-না-জানা জানোয়ার শহরের বুকের ওপরে যদিচ্ছা চরে বেড়াতে আরম্ভ করল। আবার এতদিন শহরের রাস্তায় যারা রাজত্ব করছিল, সেই কুকুর ও ধর্ম্মের ষাঁড়ের দল কোথায় যে গা-ঢাকা দিল তা সকলের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অনেকে বলত—কুকুরের কিমা ও ষাঁড়ের ডালনা করে কুরুক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে সৈনিকদের জন্যে।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন সমস্ত শহর চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি যুগে যুগে মানুষের অন্তরে আনন্দের খোরাক জুটিয়ে এসেছে, কিন্তু অবস্থার বিপাকে

এই সব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিগুলি মানুষের মনে ত্রাসেরই সঞ্চার করত। সেদিন মানুষের হাত চাঁদ অবধি পৌঁছয়নি। আজকের দিন হলে হয়তো চাঁদের অঙ্গে আলকাতরা দিয়ে তাকে কালো করবার চেষ্টা করা হতো। কিংবা হয়তো গোটা চাঁদটাকেই শেকড় সমেত উপড়ে এনে পূর্বসমুদ্র ভরাট করে একটা বিরাট কৃষিকার্যের পরিকল্পনা করা হতো। কিন্তু আজকের তুলনায় সেদিনকার বৈজ্ঞানিকেরা ছিলেন নাবালক, কাজেই এই সব দিনগুলোয় নীরবে সরকার পক্ষ শত্রু বোমার প্রতীক্ষা করতেন আর শহরবাসীরা সবংশে সিঁড়ির তলায় বসে রাত্রি যাপন করতেন। কত মধুনিশি এইভাবেই অতিবাহিত হতো।

এমনি এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে শোনা গেল জাপানীরা শিয়ালদা'তে বোমা ফেলে গেছে।

অনেকে বলতে লাগলেন—আওয়াজ পাওয়া গেল না—অথচ সেখানে বোমা পড়ল কি করে?

বিশেষজ্ঞ গুজব সম্রাটেরা উত্তর দিলেন—জাপানীরা যেমন কথাবার্তা কম কয়—চুপচাপ কাজ সারে, জাপানী বোমাও তেমনি আওয়াজ করে না। কিন্তু যা কাজ করবার তা করে যায়।

অনুকূল পরিস্থিতি পেয়ে গুজব সম্রাটেরা খুবই তৎপর হয়ে উঠলেন। একদিন দুদিন বাদেই চমকপ্রদ খবর—কোনো দিন বা গড়ের মাঠে অদ্ভুত চেহারার লোক দেখা গিয়েছে, মেটেবুরুজের গঙ্গায় একখানা জাহাজ পানকৌড়ির মতন ডুবছে আর উঠছে—এই সব স্বচক্ষে দেখা খবর প্রচার হতে লাগল। কেউ সেগুলো বিশ্বাস করলে—কেউ বা বিশ্বাস করলে না। আজগুবি কবিতার মত আজগুবি খবর নিয়েও মাতামাতি করবার লোকের অভাব হয় না। আস্তে আস্তে শহরের ভিড় পাতলা হতে লাগল। সাতপুরুষের মধ্যে দেশের কথা যাদের মনে হয়নি হঠাৎ তাঁরা দেশাত্মবোধের চেতনায় গ্রামমুখে ছুটলেন। অনেকে বলতে লাগল—খবরগুলো মিথ্যে বটে, কিন্তু তা সত্যি হতে কতক্ষণ?

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল—জাপানী সৈন্যরা সিঙ্গাপুর ঘুরে ঐ নতুন খালের ধার দিয়ে বেলেঘাটায় এসে পৌঁছেচে এবং সেখানে ভীষণ লড়াই চলেছে। শহরের ভিড় আরও পাতলা হতে লাগল। বিপজ্জনক অবস্থা উপস্থিত হতে পারে ভেবে আমরা আগে থেকেই কলকাতা থেকে একটু দূরে গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলুম—সময় মতো সরে পড়বার জন্য। এই তালে ওনাদের সেইখানে চালান করে দেওয়া গেল। কিছুদিন বাদেই এক জ্যোৎস্না রাত্রে সত্যি সত্যি শহরে দু-একটা জাপানী বোমা পড়ল। ফল যে অবশ্যম্ভাবী হবার তাই হয়ে গেল—শহর আধখানা খালি হয়ে গেল।

নতুন ধরনের জীবনযাত্রা শুরু হলো। বাড়িতে একেবারে একা থাকি।

সকালবেলা একটা লোক এসে সামান্য যা কাজকর্ম থাকে তা করে দিয়ে চলে যায়। সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই স্নান করে দরজায় ডবল তালা-চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যেই আপিসে গিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। কারণ কর্তারা সে সময় দিবালোক সঞ্চয় করছিলেন। চৌরঙ্গীর এক হোটেলে রাইস-কারির নামে সাদা ছররা ও রবারের খোল যতটা পারা যায় ততটা গলাধঃকরণের চেষ্টা করে দৌড় দি। ওদিকে চারটের মধ্যে ছুটি। এদিক ওদিক ঘুরে সন্ধ্যে নাগাদ এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে জমায়েৎ হই। সেখানে রাত্রি এগারটা অবধি থ্রি হাট স ও নো ট্রামস করে বাড়িমুখো রওনা হই। বন্ধুরা অতি যত্ন করে এক পাঁজা লুচি ও এক বাটি মাংস ও তদুপযুক্ত তরকারী একটা বোকনোয় করে কাপড় দিয়ে ছাঁদা বেঁধে দেন, তাই হাতে করে করে অন্ধকারে হয় যাত্রা শুরু।

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে এক রাত্রে বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছি—চলেছি নিজের বাড়ির দিকে। কার্তিক মাসের শেষাশেষি। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাস্তায় জমাট বেঁধে আছে। দুপা আগের লোক চিনতে পারা যায় না। তাই ঠেলে ঠেলে পা ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে এগিয়ে চলেছি। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই—অর্ধ রাত্রে শহরবাসীরা নিদ্রিত। পথের দুপাশে মাঝে মাঝে সরু, সরু গলি – ভয় হচ্ছে, কখন কোন গলি দিয়ে গুণ্ডার দল বেরিয়ে এসে অতি যত্নে পুষ্ট এই দেহের মধ্যে নির্মমভাবে ছোরা বসিয়ে দেবে। মনে মনে ভরসা হয় ট্যাকে বড় জোর দু টাকার বেশি হবে না– কিন্তু ভয় জিনিসটা যুক্তি মানে না। সে সমস্ত যুক্তি ছাপিয়ে মনের উপর সওয়ার হয়ে বসে।

এক একটা গলি পেরিয়ে যাই আর মনে হয় আজকের মতো একটা ফাঁড়া কেটে গেল। একবার মনে হলো—পেছন থেকে কেউ যদি এসে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে এক কোপে গলাটা উড়িয়ে দেয়! ওঃ! কন্ধকাটা ভূত হয়ে এই অন্ধকারে ঘুরে মরতে হবে। পেটে দুর্জয় খিদে, হাতে খাবারের ছাঁদা, কিন্তু মুখ নেই যে খাই! সে এক ভীষণ পরিস্থিতি—নিজের চিন্তায় নিজেই হেসে ফেলছি।

চলেছি তো চলেইছি। এক এক জায়গায় হেমন্তের শিশিরসিক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী পথের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার সেই সব জায়গায় আরো ঘনীভূত হয়ে উঠে দস্তুরমতো পথ বিজন অতি ঘোর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলতে চলতে চৌধুরীদের বাড়ির ধারে এসে পেঁছিলুম। চৌধুরীরা বিরাট ধনী লোক। চঞ্চলা লক্ষ্মী পাঁচপুরুষ ধরে গৃহে অচলা হয়ে আছে। অর্থের সীমা নেই—অথচ ভাগীদার কম। প্রকাণ্ড প্রাসাদ—তার চারদিকে বিস্তৃত সুরক্ষিত বাগান। পথের ধারে কোমর-ভোর চওড়া ইঁটের দেওয়াল—তার ওপরে দেড়মানুষ-সমান ঘন লোহার রেলিঙ। রেলিঙের ধারে ধারে ছোট বড় ফুলের গাছ। কোনো কোনো গাছ রেলিঙ উপচে রাস্তার দিকে ঢলে পড়েছে।

তারই ধার ঘেঁসে আমি চলেছি—ধীর মন্থর গতিতে। মনে হচ্ছে এই বাগানটা পেরুলেই আমার বাড়ির গলি।

সদর দরজার তালার চাবি ঠিক আছে কি না—এক একবার হাতড়ে দেখছি—এমন সময় এক ঝোঁক শিউলির সুবাস আমার নাকে এসে লাগল। মনে হলো—গাছটা যেন ডেকে বললে—কি বন্ধু, এত রাত্রে ফিরছ!

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারপর দু-এক পা পেছু হেঁটে ওপরের ঝোপগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললুম—কোথায় তুমি বন্ধু। টপ করে শিশিরসিক্ত একটি ছোট্ট শিউলি মুখের ওপর এসে পড়ল। ফুলটা তুলে আলগোছে মুঠোতে ধরে একটা গম্ভীর নিঃশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হতে আরম্ভ করলুম।

শিউলির সুবাস আমার মনের মধ্যে স্মৃতির প্রবাহ উন্মুক্ত করলে। তারই স্রোতে গুণ্ডা কন্ধকাটা ভূত কোথায় ভেসে গেল। মনে পড়ল শৈশবকালে আমরা গুটিকতক ছেলে চৌধুরীদের বাগানে সকালে শিউলি ফুল কুড়োতে আসতুম। চারদিক থেকে একটি একটি করে অনেক মেয়েও সেখানে এসে জুটতো। অপর্যাপ্ত ফুল, আমরা ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে শেষ করতে পারতুম না।

চৌধুরীদের দারোয়ানদের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বাড়ি ফেরবার মুখে আমরা সবাই দারোয়ানদের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সমস্বরে সুর করে বলতুম—"সীতা রাম সিয়া রাম রাম সীতা রাম, রাধে গোবিন্দ বলো প্রেমসে।" এই সমস্বরে গান শোনবার জন্যেই দারোয়ানরা আমাদের বাড়ির মধ্যে যেতে দিত। স্মৃতির প্লাবনে ভেসে আসতে লাগল, কত লোকের মুখচ্ছবি। পিতা মাতা ভাই বন্ধু—কত আত্মজন—সময় যাদের টেনে নিয়ে গিয়েছে কোন অতীতের গহ্বরে। মনে হলো আমাকেও সে একদিন তার পক্ষপুটে তুলে নিয়ে চলে যাবে। আমিও অচিরে তাদেরই মতন অতীত হয়ে যাব। মনের মধ্যে একান্ত ব্যথা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

চৌধুরীদের বাড়ি ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ির গলিটায় মোড় ফিরেছি, এমন সময় কে যেন পেছন থেকে ডাকলে—শুনুন!

আওয়াজটা কানে যেতেই সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কিন্তু তখুনি মনে হলো—এ তো ঠিক গুণ্ডার আওয়াজ নয়! আর যাই হোক, তারা কিছু আপনি আজ্ঞে বলে ডাকবে না। সাহসে ভর করে ফিরে দাঁড়ালুম! পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বার করে দেখবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ক্ষীণ সেই আলোকে স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। তবে মনে হলো অদূরেই একজন দাঁড়িয়ে—তবে সে বোধহয় মেয়েমানুষ। বীর-পদভরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম—কি চাই তোমার?

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলল—কি চাই বুঝতে পারছেন না।

পকেট থেকে টর্চটা বার করে জেবলে নিজের সাদা মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে বললুম—বুঝতে খুবই পারছি, কিন্তু এদিকে দেখেছ?

সে বললে—এত রাত্রে যাকে পুরুষের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় তার আর অত বাছতে গেলে চলে না! এই কাছেই আমার বাড়ি—চলুন।

বাঃ রে! অমন সাফ ও চোস্ত জবাব পেয়ে খুশি হয়ে গেলুম। মনের মধ্যে তার সম্বন্ধে জানবার জন্যে কৌতূহল গর্জে উঠতে লাগল। আবার মনে হলো—পকেটে তেমন বিশেষ কিছু নেই—আবার একটা ফ্যাসাদে পড়ব না তো। আমার চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়ে সে খপ করে আমার একখানা হাত ধরে বললে—চলুন। রাস্তায় মিছে দাঁড়িয়ে দেরী আর করবেন না!

হাতখানা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাবছি কি করব—এমন সময় সে বললে—দেখুন, ওরা যদি ধরে তাহলে বলবেন—আমি আপনাদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করি। আপনি চোখে দেখতে পান না—তাই রাত্রে আমায় নিয়ে বেরিয়েছেন—হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্যে।

ওঃ! এ যে দেখছি দস্তুর মতো অ্যাডভেঞ্চার। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের ইশারা পেয়ে মনটা নেচে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য তার কণ্ঠস্বর! সে রকম কণ্ঠস্বর আমি ইতিপূর্বে কোনো মানুষের কণ্ঠে শুনিনি। সে কণ্ঠস্বর মধুর কিংবা কর্কশ, মৃদু কিংবা জোরালো—এ সবের কোনো পর্যায়ে পড়ে না। সে যেন ইহলোকের নয়, সুদূর লোকান্তর থেকে ইথারস্রোতে ভেসে আসা শব্দতরঙ্গের একটি কণামাত্র, যার কিছু শ্রুতিগোচর হয়—বাকিটা অনুভব করতে হয়। জিজ্ঞাসা করলুম—ওরা কারা?

—ঐ যারা যুদ্ধের জন্য রাস্তা গার্ড দেয়—বড় বদমাইস ওরা। এবার চলুন—এই কথা বলে আবার আমার ডান হাতখানা ধরে টান দিলে।

ডান হাতে খাবারের ঝুড়িটা ছিল। সেটাকে বাঁ হাতে নিয়ে তার হাতে হাতখানা সমর্পণ করে বললুম—চল।

আমাদের যাত্রা সুরু হলো। অন্ধকার নগরপথের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলুম। অন্ধকারের পর অন্ধকার, কোনো কোনো জায়গায় সন্ধ্যের ধোঁয়া পথের মাঝখানেই জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভেদ করে চলেছি। চলতে চলতে কখনো মনে হচ্ছে—কোথায় সারা দিন এক রকম অনাহারে কাটিয়ে রাত্রে বেশ করে আহারপর্ব সমাধা করে ঘুম লাগাব—না কোথায় এক মুহূর্তে সব ঘুরে গিয়ে চলেছি এখন চিত্রকরের বিষয়বস্তু হয়ে—অভিনয় করতে করতে। সম্পূর্ণ অপরিচিতা কে এই নারী—যার আকর্ষণে রাস্তা দিয়ে চলেছি অন্ধ সেজে। আবার কখনো বা মনে হচ্ছে—আমরা সকলেই তো এই রকম অন্ধ সেজে চলেছি সংসারের পথ বেয়ে। সব বুঝতে পারি কিন্তু করবার কিছু নেই। এই যাত্রার পরপারে কি দেখব তাও কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি। জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় আহত অভিজ্ঞতার

ভাণ্ডারে যে সব কণ্টকহার থরে থরে সাজানো আছে সেখানে আর একখানি মালা যুক্ত হবে মাত্র। আবার এক অভাগীর অশ্রুজলে আমার অশ্রু মিলিত হবে কিনা—কে জানে ?

চলেছি তো চলেইছি। চক্ষু কখনো একেবারে নিমীলিত, কখনো বা অর্ধনিমীলিত, কখনো বা বিস্ফারিত। পথের পরে পথ অতিক্রম করে চলেছি—কখনো বড় রাস্তায়, কখনো গলিতে আবার কখনো বড় রাস্তায়। মনে হতে লাগল—আমরা যেন কত যুগ-যুগান্তর ধরে এই অন্ধকার ভেদ করে চলেছি—কোথায় যাবো—তার ঠিকানা নেই।

একবার জিজ্ঞাসা করলুম—ওঃ, আর কতদূর !

সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমার ডান হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত ধরে বললে—আর এসে পড়েছি।

উঃ! কি ঠাণ্ডা তার হাত। মনে হতে লাগল যেন তার শরীরের সমস্ত শৈত্য আমার শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে। বুকের মধ্যে শীতে গুরগুর করতে লাগল। একবার মনে হলো—এতবার কথা বললে কিন্তু তার মুখ তো এখনো পর্যন্ত ভালো করে দেখা গেল না। কি জানি—এ কোনো অশরীরী অপদেবতা তো নয়। আমারই চিন্তা রূপ ধরে এসেছে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে লোকান্তরে।

তাই যদি হয়—তাই বা মন্দ কি! এই রকম চলতে চলতে এক জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ব! আমার চিন্তাধারাকে থমকে দিয়ে সে বললে—এইবার এসে পড়েছি—।

সত্যিই আমরা ঠিকানার কাছে এসে পড়েছিলুম। অনেক দূর এগিয়ে একটা চওড়া রাস্তার ডান দিকে প্রকাণ্ড বস্তি। ছোট বড় একতলা দোতলা খোলার চালের বাড়ি—তারই একখানা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। বাড়িখানা পথের দিকে সাংঘাতিকভাবে হেলে পড়েছে। একটা বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে সে আমাকে বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, তবুও সাহসে ভর করে ঢুকে পড়া গেল। ঘরখানা এত হেলে পড়েছিল যে, দরজার পাল্লাটা ছেড়ে দিতেই সেটা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধে জায়গাটা ভরে আছে। বললুম—বাতি জ্বালো।

সে বলল—মাদুরটা পাতি।

ইতিমধ্যে পকেট থেকে টর্চটা বার করে ঘরখানাব চারদিক দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মনে হলো যেন আমার পায়ের কাছে আর একটি মেয়ে ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। তারও ওপাশে আর একজন শুয়ে আছে বলে মনে হলো। ইতিমধ্যে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে মেয়েটি বলল—বসুন।

আমি জুতো খুলে সেই জীর্ণ মাদুরে বসে জিজ্ঞাসা করলুম—কে শুয়ে আছে ?

মেয়েটি বললে—আমার মা ।

—আর ওপাশে ?

ওর মা হাতটা মাথায় তুলে এমনভাবে শুয়েছিল যে কিছুতেই তার মুখটা ভালো করে দেখতে পেলুম না। তার ওপাশে যে শুয়েছিল তাকে দেখেই চমকে উঠলুম। আমি কেন—অসীম সাহসী লোকও সে মূর্তি দেখলে শিউরে উঠবে। শীর্ণ—এত শীর্ণ যে মানুষ বলে তাকে আর চেনা যায় না। তবে বোঝা যায় যে এক সময় সে মানুষ ছিল। যাক—সেই বীভৎস মূর্তির বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম।

জিজ্ঞাসা করলুম—ওর কি হয়েছে ?

মেয়েটি বললে—আজ এক বছর থেকে ও অসুখে ভুগছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি !

সে মুখ তুলে বললে—আমার নাম বকুল।

এতক্ষণে তার মুখখানা ভালো করে দেখলুম। বয়স তার অল্প হলেও মুখের মধ্যে অল্প বয়সের কোনো মাধুর্যই নেই—দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছাপ সেখানে গভীরভাবে পড়েছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে লজ্জিত হয়ে শতছিন্ন শাড়িখানা গায়ে টেনে দিল।

অদ্ভুত তার চক্ষু দুটি। অতি সুন্দর আয়ত চোখ নয়, সে এক রকম ভিজে ভিজে ছলছলে চোখ যা দেখলে মনে হয় এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। কিংবা এক্ষুণি সে কান্না শেষ করেছে। আমার মনে হতে লাগল—এ রকম এক জোড়া চোখ যেন কার মুখে দেখেছি। মনের মধ্যে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলুম—কোথায়—কোথায়—কোথায় দেখেছি এ চোখ! কোন সে নারী যে তার ছলছল চোখ দুটি আমার স্মৃতিমঞ্জুষায় জমা রেখে আত্মগোপন করেছে! আমার জাগ্রত মন অবচেতন লোকে ডুব দিয়ে খুঁজতে লাগল তাকে। সে কি মীনাক্ষীর মন্দিরে অথবা কন্যাকুমারীর মন্দিরের অলিন্দে ? কোথায় দেখেছি এ চোখ ? সে কি তক্ষশিলার পথে—না কি আনারকলির সমাধি মন্দিরে ?—কিছুতেই সেই পলাতকার সন্ধান পেলাম না। শেষকালে বললুম—তোমার মাকে ডাকো না ?

সে ধাক্কা দিয়ে মাকে ডেকে তুললে। মা কপট নিদ্রায় পড়েছিল, তবুও এমন ভাবে উঠল যেন সেই ধাক্কাতেই উঠল। রুগ্নার প্রতি ইশারা করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ওর কি হয়েছে ?

—ওর ক্ষয় রোগ হয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তার বলে দিয়েছে ও বাঁচবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—ও কি খায় ?

সে বললে—কি আর খাবে! আমরা যা খাই তাই খায়। আজ দুদিন আমাদের কিছু জোটেনি, ওর মুখেও কিছু দিতে পারিনি। আজ সকালে বকুল চারটে পয়সা এনেছিল—তাই দিয়ে এক কাপ চা এনে আমরা দুজন খেয়েছিলুম। ওর মুখেও একটু দিয়েছিলুম—কিন্তু গিলতে পারলে না—কষ দিয়ে গড়িয়ে গেল।

এতখানি বলে সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে সে একটু হুঁ শব্দ করলে। তার মাথার চুল কিছু পাকা কিছু লাল আর কিছু কালো। নিষ্করুণ দারিদ্র্যের ছাপ তার মুখে দপদপ করছে। কিন্তু আশ্চর্য তার চোখ দুটি। কন্যা বকুলের মতো ছলছলে ভাব—তবে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। আমার মন আবার ছুটল সে পলাতকার সন্ধানে—কোথায় কার মুখে দেখেছি সেই চোখ? সেও আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে সেই দুটি অদ্ভুত চোখে।

হঠাৎ বিস্মৃতি টুটে গেল। সেই কপাল ও চোয়াল-বারকরা স্ত্রীলোকের মুখের ওপরে ফুটে উঠল আর একটি ছোট্ট বালিকার মুখ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—দেখ ঐ মাণিকতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে চৌধুরীদের বড় বাড়ি আছে না—ছেলেবেলায় তুমি কি সেখানে সকালবেলায় ফুল কুড়োতে আসতে?

অভিভূতার মতো অতি ক্ষীণ স্বরে সে বললে—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমার মুখ মনে পড়ে?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, মনে পড়ে।

—তোমাকে আমরা কি একটা নাম ধরে ডাকতুম?

মন্ত্রমুগ্ধার মতো ফিসফিস করে সে বলল—শিউলি।

—দেখ শিউলি, আজ অনেক রাত্রে সেই চৌধুরীদের বাড়ির ধার দিয়ে আসছিলুম, আমরা যে গাছগুলোর তলায় ফুল কুড়োতুম তাদেরই কোনো বংশধর এই ফুলটি আমার হাত দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শিউলি কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি শিউলি ফুলটি তার হাতে দিতেই সে বার কয়েক হাতখানা নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ফুলটা নিয়ে তার রুগ্ন অচেতন্য মেয়ের কপালে চোখে কয়েকবার ঠেকিয়ে তার বালিশের ওপর রেখে দিলে। কন্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইতেই দেখতে পেলুম তার স্বাভাবিক ছলছলে চোখ দুটিতে দুফোঁটা অশ্রু টলটল করছে।

আমার চোখও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললুম—অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, এবার আমি চলি, দু-তিন দিন বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলা এসে তোমাদের সব কথা শুনব।

পকেটে একটা টাকা আর কয়েক আনা পয়সা ছিল, সেগুলোকে বকুলের হাতে দিয়ে বললুম—দেখ, আমার কাছে খাবার আছে। তোমাদের কোনো পাত্র থাকে তো দাও ঢেলে দিই।

কথাটা বলা মাত্র বকুল, দেয়ালে হেলানো একটা চটা-ওঠা কলাই-করা থালা এগিয়ে দিলে। আমি পাত্রখানা উজাড় করে লুচি, মাংস, তরকারী—যা ছিল ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

পরের দিন আবার সেই রাত্রি এগারোটার পর গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে খাবার নিয়ে যেতে যেতে বকুল আর শিউলির কথা ভাবছিলুম। আমাদের গলির মোড়টার কাছে আবার শুনতে পেলুম সেই আকুল আহ্বান—শুনুন।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম বকুল দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—অনেকক্ষণ থেকে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন?

সে বললে—আজ দুপুরবেলায় দিদি মারা গিয়েছে। তার দেহ সৎকার করি এমন পয়সা আমাদের নেই। সন্ধ্যে থেকে ঘুরে ঘুরে টাকা দুই জোগাড় হয়েছে। কিছু সাহায্য করতে পারেন?

আমার কাছে কিছুই ছিল না। বললুম—কাছেই আমার বাড়ি। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

বাড়িতে এসে দশটি টাকা তাকে দিয়ে বললুম—শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক আছে?

বকুল বললে—কে আর আছে? মা আর আমি—আমরা দুজনে মাথায় করে নিয়ে যাব।

সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—আর কিছু বলবে?

কিন্তু বকুল কিছুই বললে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ওতেই হবে?

বকুল ঘাড় নেড়ে জানালে—ওতেই হবে।

বললুম—পরশু দিন সন্ধ্যেবেলা তোমাদের ওখানে যাবো।

বকুল বললে—আচ্ছা, তাহলে যাই।

বকুল চলে গেল। আমি দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে ওপরে উঠে গেলুম।

দিন দুয়েক পরে সন্ধ্যের ঝোঁকে একদিন বকুলের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাদের বাসস্থান চিনতে আমার কোনই কষ্ট হলো না। সেদিনের মতো ঘরের দরজা বন্ধ দেখে বার দুয়েক বকুলের নাম ধরে ডাক দিলুম। কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললুম। ভেতরের অন্ধকার যেন একটা বিরাট হাঁ করে আমাকে গিলতে উদ্যত হলো। ঘরের দরজাটা দুহাতে ধরে রেখে আবার ডাকলুম—বকুল!

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ঘরের মধ্যে ঢুকে টর্চটা জ্বালিয়ে দেখলুম

—কেউ কোথাও নেই। ছেঁড়া মাদুর ও দুটো কলাই-করা থালা অন্তর্হিত হয়েছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। দরজার পাল্লা দুটো যেন বিদ্রূপ করে আমার মুখের ওপরেই বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকারে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—অন্ধকারেই তারা মিলিয়ে গেল।

শঙ্কর

এক পাড়ার বাস ও একই ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়া সত্ত্বেও শঙ্কর আমাদের সঙ্গে ভাল করে মেলামেশা করত না। অবিশ্যি এর কারণও ছিল একাধিক। তারা ছিল বড়লোক তার বাবার বড় ব্যবসা, তিন পুরুষে আগেকার তৈরি বড় বাড়ি; তার ওপরে ক্লাসে সে ছিল ভাল ছেলে। সে বসত ফার্স্ট বেঞ্চে, আমরা বসতুম লাস্ট বেঞ্চে। এই সব কারণ ছাড়া আর একটা বড় কারণও ছিল, সেটা হচ্ছে শঙ্কর খারাপ কথা একেবারে সহ্য করতে পারত না; আর আমরা ছিলুম এক একটি খিস্তির অবতার। বিশেষ করে এই কারণেই সে আমাদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত।

সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলে ভাগ্য ছাড়া আরও যে কয়েকটি বিশেষ উপকরণ থাকলে সুবিধা হয়, যেমন সুন্দর চেহারা, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী পিতা, বুদ্ধি ও পরিশ্রম করবার ইচ্ছা ও শক্তি—এই সবগুলি উপকরণের অধিকারী হয়েও শঙ্করের জীবনতরী কি করে বানচাল হয়ে গেল সে কথা আজও আমার বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে।

আগেই বলেছি শঙ্কর লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো। এই এক লাফে সে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেল। তার নতুন বন্ধু জুটল, নতুন ক্রীড়াক্ষেত্রে সে বিচরণ করতে আরম্ভ করলে। এখন আমাদের দেখলে কখনো চিনতে পারে, কখনো মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কখনো বা জিজ্ঞেস করে—আজকাল কি করা হচ্ছে?

শঙ্কর ক্রমে উচ্চস্থান অধিকার করে করে আই. এস-সি. ও বি. এস-সি. পাশ করে এখনকার এক বড় ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকল—কয়েক বছর পরে কাজ শিখলে অনেক টাকা মাইনে হবে। এই কাজে এতদিন শুধু ফিরিঙ্গি ও ইংরেজ ছেলেদেরই নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু শঙ্করের বাবা বড় বড় বিলিতী সওদাগরী আপিসের কর্তাদের ধরে তাকে এই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। শঙ্কর প্রতিদিন সাহেব সেজে সচকিত প্রতিবেশীদের বিস্মিত দৃষ্টি অতিক্রম করে আপিস অথবা কারখানায় যাতায়াত করতে লাগল।

বছর দুয়েক এই রকম কাটবার পর সেবারে পুজোর সময় একদিন সকাল

বেলা শঙ্করদের বাড়ির ধার দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলুম তাদের বৈঠকখানায় গান হচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলুম। গান শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল, ভৈরবীর সাড়া পেয়ে শরতের সেই প্রভাতটি প্রসন্ন অনুরাগে যেন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। ক্রমে পাড়ার আরও কয়েকজন এসে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ শঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বললে—বাঃ, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ভাই, ভেতরে আসতে পার না।

ইদানীং শঙ্কর আমাদের সঙ্গে কথাই বলত না। এইজন্য তার এই হঠাৎ অমায়িকতায় অবাক হয়ে গিয়ে কি করব তাই ভাবছি, এমন সময় শঙ্কর এসে আমার হাতখানা ধরে অন্য সবাইকে বললে—চল চল, ঘরে গিয়ে বসবে চল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে বসা গেল। আরও কিছুক্ষণ গান বাজনা চলবার পর শঙ্কর তার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—এরা সব আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বেশ বুঝতে পারা গেল শঙ্করের কথাবার্তা ও ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যে দিব্যি সুষ্ঠুভাবে সে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করতে শিখেছে—ফটাফট সিগারেট ওড়াচ্ছে। মোট কথা পুরোনো দিনের সেই শঙ্কর—খারাপ কথা বলি বলে যে আমাদের সঙ্গে মিশত না, সে বিদায় নিয়েছে। সেদিন ওঠবার সময় সে বললে— সন্ধ্যাবেলা কি করিস—এখানে আসিস, বেশ আড্ডা জমানো যাবে'খন।

পরদিন থেকে শঙ্করের বৈঠকখানায় আমরা আড্ডা জমাতে লাগলুম। আগেই বলেছি পুরোনো দিনের সে শঙ্কর একেবারে বদলে গিয়েছিল। নতুন করে তার সঙ্গে পরিচয় হবার পর দেখলুম সে অত্যন্ত পরদুঃখকাতর। কারখানায় অ্যাপ্রেণ্টিসগিরির জন্য সে মাসে একশো টাকা করে ভাতা পেত। সংসারে তাকে কোনো সাহায্য করতে হতো না বটে কিন্তু সেই অর্থের অধিকাংশই সে দুঃখী লোককে বিলিয়ে দিত।

একদিন শঙ্কর বললে—হ্যাঁরে তোদের এত বয়েস হলো—হুইস্কি-টুইস্কি খেতে শিখেছিস?

একদিন আমাদের জন তিনেককে সে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালে। সেখানে দেখলুম সে ভালো রকম হুইস্কি টানতে শিখেছে।

এই রকমে বছরখানেক কেটে যাবার পর একদিন শঙ্কর প্রকাশ করলে যে, সে বিলেতে যাচ্ছে। বললে—বাবা থাকতে থাকতে পাশ করে আসতে পারলে একটা মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে যাব—এখানে কাজ নিলে আর কত পাওয়া যাবে!

বিলেতে যাবার ব্যবস্থা হতে লাগল। একদিন শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় খিদিরপুর ডকে তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম।

বছর দুয়েক যায়। শঙ্করের ভাইদের কাছে খবর নিয়ে জানি যে সে বেশ

ভালই আছে, ভাল করে পরীক্ষা পাশ করেছে। দুটো পরীক্ষা পাশ করেছে—ফিরতে এখনো তিন বছর দেরী আছে ইত্যাদি, এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতন খবর পাওয়া গেল তার বাবার ব্যবসা ফেল পড়েছে।

খারাপ খবর প্রায় মিথ্যা হয় না। শংকরের বাবা পাওনাদারদের দেনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিলেন। তাতে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হয়ে তো গেলই, উপরন্তু বসত বাড়িখানাও বাঁধা পড়ল। শংকরের বাবা সত্যবাবু সবাইকে বারণ করে দিলেন, এ খবর যেন তাকে পাঠান না হয়। মাসে মাসে তার খরচ তিনি যেমন করে হোক পাঠিয়ে দেবেন।

যেমন করেই হোক মাসে মাসে শংকরের খরচ যেতে লাগল। কিন্তু বিধাতা এতেও বাদ সাধলেন—একদিন রাত্রিবেলা আহারাদির পর সত্যবাবু হঠাৎ হার্টফেল হয়ে মারা গেলেন।

তখন আর শংকরকে কে টাকা পাঠাবে! তার দুই ভাই তখন লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করছিল। বাপের কল্যাণে তারা ভালই রোজগার করত—তারা ইচ্ছা করলে দুজনে মিলে দু তিন শো টাকা মাসে মাসে বড় ভাইকে পাঠাতে পারত, কিন্তু তারা তা না করে সমস্ত বৃত্তান্ত শংকরকে লিখে জানালো।

অগত্যা পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখেই শংকরকে ফিরে আসতে হলো। কিন্তু সে একলা ফিরল না—তার সঙ্গে এল শংকরী—এক মেমসাহেব।

বলা বাহুল্য, মেমসাহেবকে নিয়ে বাড়িতে ভাইদের সংসারে বাস করা সম্ভব নয়, কাজেই শংকরকে উঠতে হলো চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে। ওদিকে ট্যাঁক খালি, এদিকে প্রত্যহই অর্থ চাই। আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনগ্রস্ত বাড়িখানা ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি আর কিছুই নেই। কিছু দিনের মধ্যেই ভাইয়ে ভাইয়ে পার্টিশানের মামলা বেধে গেল। পাওনাদারদের দিয়ে থুয়ে অবশিষ্ট অংশ তিন ভাইয়ে ভাগ করে যা পাওয়া গেল তা দিয়ে আর চৌরঙ্গীর হোটেলে থাকা চলে না।

হগ সাহেবের বাজারের কাছে একখানা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শংকর সেখানে উঠে এল।

এবারে চাকরি চাই। কিন্তু চাকরির বাজার সব কালেই সমান। তার ওপরে সেই আধা-ইঞ্জিনীয়ারকে চাকরি কে দেবে! সম্মানে আঘাত লাগবে বলে কেরানীগিরি বা অন্য চাকরিও করতে পারে না। শেষকালে অনেক ধরাধরি করায় বিলেত যাবার আগে যে কোম্পানীতে সে কাজ শিখছিল তারা তাকে নিতে রাজী হলো। আপাততঃ যা হয় একটা জুটল কায়ক্লেশে তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হতে লাগল।

কথায় বলে দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন তার সহচরীরাও তার অনুগমন করে। শংকরের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না। দুর্ভাগ্য তো এসেইছিল, এবার তার সহচরীরাও বিচিত্ররূপে দেখা দিতে লাগল।

একদিন শংকর কারখানায় কাজ করছে এমন সময় পুলিশের লোক এসে

তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। শোনা গেল, যে মেমসাহেবকে সে বিয়ে করে এনেছে সে নাকি পূর্বে একবার বিয়ে করেছিল এবং তার প্রথম পক্ষের স্বামী বর্তমান। সেই ব্যক্তি শঙ্কর ও সেই মেমসাহেবকে জড়িয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুই আদালতে ঠুকে দিয়েছে নালিশ।

হৈহৈ ব্যাপার পড়ে গেল। মেমসাহেবকে টেনে নিয়ে গেল বিলেতে, শঙ্করের হাজত বাস চলতে লাগল। ওদিকে কোম্পানী মাইনে বন্ধ করে দিলে প্রায় আট মাস ধরে টানাটানির পর সে মুক্তি পেল—শুধু আইনের কবল থেকেই নয়, মেমসাহেবের কবল থেকেও।

মেমসাহেব যাবার আগেই চাকরি গিয়েছিল—আবার চাকরি খোঁজা শুরু হলো। কিন্তু চাকরি মেলা কি সহজ কথা! আজকে একটা জোটে তো দু-মাস বাদে তা ছুটে যায়। ধাপে ধাপে সে নামতে লাগল। লিণ্ডসে স্ট্রীট ছেড়ে বৌবাজারের হোটেল। ইজের ছেড়ে ধুতি, সিগারেট ছেড়ে বিড়ি। শেষকালে বেকার অবস্থায় সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের এক মেসে স্যাঁতসেতে এক-তলার এক ঘুলঘুলির মতো ঘরে তাকে আশ্রয় নিতে হলো।

ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ না হলেও শঙ্কর বি. এস-সি. পাশ ছিল, কিন্তু তবুও কেন সে চাকরি জোটাতে পারত না অথবা জুটলেও রাখতে পারত না তা বলতে পারি না। ভাগ্য বিরূপ হলে সবই সম্ভব হয়। তার ধুতি ছিঁড়ে গেল, জুতো ছিঁড়ে গেল—আমরা মাঝে মাঝে তাকে কিছু কিছু সাহায্য করতুম বটে—কিন্তু আমাদের আর সাধ্য কত ছিল!

এমনি করে প্রায় যখন সে দুর্দশার শেষ ধাপে নেমে এসেছে তখন আমাদের অন্যতম বন্ধু দুর্গাপদ তাকে বললে—আমাদের বাড়িতে তো অনেক ঘর পড়ে রয়েছে, তুই সেখানে এসে থাক, খাওয়া-দাওয়াও আমাদের সঙ্গেই করবি—তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা চাকরি খুঁজে নিবি, তখন অন্য কোথাও গেলেই হবে।

কিন্তু শঙ্কর তাতেও রাজী হলো না। সে বললে—যে পাড়ায় আমরা একদিন মাথা উঁচু করে থেকেছি সেখানে কারুর বাড়িতে অন্নদাস হয়ে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলে—দেখ না তোরা, শীগ্গিরই একটা প্যাঁচ লাগাচ্ছি।

দিন দুই পরে শঙ্করের মেসে গিয়ে জানলুম, সত্যিই সে প্যাঁচ লাগিয়েছে অর্থাৎ দিন দুই থেকে সে উধাও হয়েছে, আর মেসে আসেনি। মেসওয়ালা বললে যে, শঙ্করবাবুর কাছে মাস চারেকের পাওনা বাকী পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সে জানালে যে, শঙ্করবাবু অতি ভদ্রলোক। টাকা একদিন না একদিন তিনি শোধ করে দেবেনই।

আমরা শঙ্করের ঘরে গিয়ে দেখলুম, যে ট্রাঙ্কটা নিয়ে সে বিলেত গিয়েছিল সেটা খাটের নীচে পড়ে আছে। খালি তক্তাপোষে ছেঁড়া পেণ্টুলান ও সার্ট

পুঁটলী করে বেঁধে বালিশ করে সে শুতো—তা যেমন তেমনই পড়ে আছে। দেখা গেল, ঘরের এককোণে ছেঁড়া জুতোটাও সে ফেলে গেছে।

শঙ্কর এইভাবে চলে যাওয়ায় সত্যিই মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপর নানা অনুভূতির প্রলেপ পড়তে পড়তে আমাদের বন্ধু শঙ্কর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল।

প্রায় পনেরো বছর শঙ্করের কোনো খোঁজ পাইনি। একদিন হাওড়া অঞ্চলে একটা ঠিকানার খোঁজে গিয়েছি। এ গলি সে গলি ঘুরতে ঘুরতে কেমন করে একটা বস্তির সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সরু কাঁচা রাস্তা, দু-পাশে খোলার বাড়ির সারি। বাড়িগুলোর সামনে আবর্জনার স্তূপ প্রায় মানুষের সমান উঁচু হয়ে আছে। একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় সেই ময়লা থেকে গন্ধ ছুটেছে। রাস্তা হয়েছে পেছল আর সেই পেছল রাস্তায় পালে পালে মনুষ্য কীট কাদায় মাখামাখি করে ছুটোছুটি করছে—কোনো রকমে কোঁচায় নাসারন্ধ্র টিপে ধরে রাস্তাটুকু পার হচ্ছি এমন সময়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করল—এখানে কোথায় আসা হয়েছিল? মুখ তুলে দেখি রাস্তার কল টিপে একটা লোক বালতিতে জল ভরছে। মিশ কালো তার রং, মাথায় টাকের চারপাশে পাকা চুল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। পেণ্টুলান পরা—তবে পায়ের কাছটা গুটিয়ে একেবারে হাঁটু অবধি তোলা—তার ভেতর থেকে কালো কাঠির মত দুটো উলঙ্গ পা বেরিয়ে রয়েছে, পায়ের অনুপাতে হাতও তেমনি সরু। বুকের হাড়গুলো সব যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আমি লোকটার দিকে অবাক হয়ে দেখছি এমন সময় বালতিটা তুলে নিয়ে আমার কাছে এসে সে বললে—কি বাবা, চিনতে পারলে না তো! আমি শঙ্কর।

তুমি শঙ্কর !!

শঙ্কর বললে—এদিকে কোথায় গিয়েছিলে! চল আমার ওখানে।

শঙ্কর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে। খোলার বাড়িতে একটা ঘর—খোলার বাড়ি হিসাবে ঘরখানা বেশ বড়। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি অতিশয় শীর্ণা একটি স্ত্রীলোক মেঝের ওপর চেটাইয়ে বসে তাড়ি খাচ্ছে! তার সামনেই মুখে নেকড়া বাঁধা বেশ বড় একটি তাড়ির ঝাঁপা রয়েছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ তুলে একবার আমাদের দিকে চেয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল।

ঘরের মধ্যে দুদিকে দুখানা জারুল কাঠের খাট। একখানার ওপরে একটা মাদুর ও একটা বালিশ পড়ে আছে। তাড়ির দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না এমন অবস্থা। দেখলুম, এক কোণে আরও তিন-চারটে তাড়ি ভরতি কলসী রয়েছে—দলে দলে মধুলোভী মক্ষিকা সেগুলি ঘিরে গুঞ্জন করছে।

আমাকে সেই মাদুর পাতা খাটখানার ওপর বসিয়ে শঙ্কর জলভরা

বালতিটা ঘরের এক কোণে রেখে আমার পাশে এসে বসে বললে—তারপর। তোমাদের সব খবর কি ভাই! ওঃ! কতদিন বাদে দেখা হলো!

বললুম—আমাদের খবরের কথা ছেড়ে দাও—তোমার খবর কি? সেই যে মেস থেকে উধাও হোয়ে চলে গেলে তারপর এই দেখা।

শঙ্কর একটু হেসে বললে—আমার খবর কি আর বলতে হবে—দেখেই বুঝতে পাচ্ছ তো সব।

কথা বলতে বলতে একবার সে টপ করে উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা তাড়ির কলসী তুলে নিয়ে এসে খাটের তলা থেকে একটা মোটা কাঁচের গেলাস টেনে নিয়ে তাড়ি ঢালতে ঢালতে বললে—মেস থেকে উধাও হোয়ে গিয়েছিলুম কাশীতে। সেখানে ছেলে পড়ানোর কাজ করতুম আর ছত্তরে খেতুম।

এক গ্লাস তাড়ি ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে শঙ্কর বললে—খা।

আমি খাব না বলতে শঙ্কর বললে—কেন তাড়ি খাস না—খুব ভাল জিনিস।

বললুম—সকাল বেলা নেশা করলে সারাদিনই চালাতে হবে সেইজন্য—

ওঃ—বলে শঙ্কর নিজেই এক চুমুকে গেলাসটা মেরে দিলে।

শঙ্কর বলতে লাগল—কাশী থেকে সে মেসওয়ালার পাওনা টাকা মাসে মাসে পাঠিয়ে শোধ করে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কাশী ছেড়ে এখানে কতদিন হলো এসেছিস?

—এখানে এসেছি তা পাঁচ-ছ বছর হবে। কাশীতে টিকতে পারলুম না। দশ বছর ধরে নানা ছত্তরে খেয়ে খেয়ে রক্ত-আমাশা ধরে গেল।

শঙ্কর বলে চলল দীর্ঘ কাহিনী—তার দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস। যেখানেই সে গিয়েছে দুর্দশার দূত কেমন করে তাকে ধাওয়া করেছে—সঙ্গে সঙ্গে গেলাস গেলাস তাড়িও চলতে লাগল। বলতে বলতে কখনো সে কাঁদে কখনো হাসে। বললে—কাশী ছেড়ে এখানে এসে এই ঘরখানা ভাড়া নিয়েছি। বরাত সে সময় ভাল ছিল—কারণ এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলা লরী চালাবার জন্য জনকয়েক লোকের দরকার ছিল—দরখাস্ত করতেই চাকরিটা লেগে গেল। পঞ্চাশ টাকায় ঢুকেছিলুম; এই পাঁচ বছরে সত্তর টাকা হয়েছে।

বললুম—সত্তর টাকায় তো এর চেয়ে ভালভাবে থাকতে পারিস?

শঙ্কর বললে—দূর! কুড়ি টাকা তো তাড়ি খেতেই যায়—পাঁচ টাকা ঘর-ভাড়া—রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করিনি, ঐ মোড়ের দোকান থেকে তুন্দুরের রুটি কিনে আনি—কোনো দিন শিক কাবাব, কোনো দিন টিকিয়া, কোনো দিন সুখা—বেশ রাঁধে ওরা—খাবি?

বললুম—না ভাই, সকাল বেলা আর ওসব চলবে না।

শঙ্কর বললে—তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চাকরি—কদিন হলো ধাঙড়েরা ধর্মঘট করায় কাজ বন্ধ আছে।

শঙ্কর গেলাসের পর গেলাস তাড়ি ওড়াতে লাগল। ক্রমেই তার কথা এড়িয়ে আসতে লাগল। তারপর সেই তেলচিটে বালিশটা টেনে এনে তাতে মাথা দিয়ে আমার পাশেই শুয়ে পড়ল। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সেই স্ত্রীলোকটি আগেই চেটাইয়ের ওপর অঙ্গ ঢেলে দিয়েছে। ঘর হয়ে পড়ল নিস্তব্ধ। তাড়িখোর মক্ষিকাদের গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

চুপ করে বসে বসে কি করব তাই ভাবছি—বাইরে শিশুদের কোলাহল, জলের কলের কাছে নারীদের কলরোল, কয়লার দোকানের চীৎকার, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের ধিক্কার, অদূরে রেল ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস ও ভোঁ সব জোট পাকিয়ে এক অখণ্ড ওংকারের মতো আমার কানে এসে বাজতে লাগল, আর তারই প্রভাবে আমার মন, আমার চেতনা স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। এরই মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো একটা চিন্তা আমাকে খোঁচা দিতে লাগল—এ আমি কোথায় এসে পড়লুম। ভূতলে ঐ যে নারী নেশার ঘোরে পড়ে রয়েছে—কেন? শঙ্কর বলে ছেলেবেলায় আমরা যাকে চিনতুম সেই বা এখানে এল কি করে! শঙ্কর আজ যে অবস্থার মধ্যে পড়েছে আমিই তো সে অবস্থায় পড়তে পারতুম। শুধু আমি কেন! আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে কেউ এই অবস্থায় পড়তে পারত। কি জানি কেন আমার মনে হতে লাগল শ্মশানবাসী শঙ্কর যেমন জগদ্বাসী জীবকে রক্ষা করবার জন্য কালকূট কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন সেই রকম আমাদের সকলের প্রাপ্য দুর্দশা শঙ্কর একাই বহন করে চলেছে।

সহানুভূতিতে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে লাগল। শঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরবার অদম্য ইচ্ছা আমায় অস্থির করে তুললে। আমি তার অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ অঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে ডাকলুম—শঙ্কর—শঙ্কর ভাই—

শঙ্কর কোনো জবাব দিলে না। ভূতলশায়িনী সেই স্ত্রীলোকটি দু-হাতে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে বললে—ও এখন উঠবে না—উঠতে যার নাম বেলা তিনটে।

এই বলেই সে আবার শুয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ শঙ্করের গায়ে হাত বুলোলুম—কিন্তু সে জাগল না দেখে আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

কবি বলেছেন যে, এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুটি রসাল ফল ফলেছে—একটি সৎসঙ্গ ও অন্যটি কাব্যামৃত। খুব খাঁটি কথা। এই দুটি ফলের রসাস্বাদন করেই আমাদের যৌবন কেটেছে। কিন্তু কলিযুগে ঠিক শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সব সময়ে সম্ভব নয়, তাই আমরা কবির মূল সূত্রটি গ্রহণ করে তার যুগসম্মত একটি ভাষ্য করে নিয়ে কাব্যামৃত শব্দটিকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করেছিলুম—কাব্য এবং অমৃত। কবি দিয়েছিলেন দুটি বস্তু, আমরা তাকে তিনটিতে পরিণত করেছিলুম অর্থাৎ সৎসঙ্গ, কাব্য এবং অমৃত।

এই কাব্য এবং অমৃতরস প্রাণভরে পান করবার জন্য আমরা কয়েকটি বন্ধু (তাঁরা এখন সকলেই নামজাদা লোক, কাজেই আর নাম করলুম না) এই সংসার বিষবৃক্ষ থেকে নেমে চলে যেতুম কোন দূর দেশে, অভিভাবকদের চক্ষুর অন্তরালে—সময় ও শাসনের বাধা যেখানে পৌঁছতে পারত না। ভেবেছিলুম এমনি করেই বুঝি দিন যাবে, কিন্তু বিষ্ণুশর্মা ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি, কারণ তা যদি যেত তাহলে তিনি সংসারকে বিষবৃক্ষ আখ্যা দিতেন না।

কাব্যামৃতধর্মে দীক্ষা নেবার পর দূরদেশে যাবার সময় আমরা রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই যাতায়াত করতুম। কিন্তু সেখানে লটবহর ও ভীড়েব প্রাচুর্যে কাব্যচর্চায় বড়ই ব্যাঘাত হতে লাগল। কাব্যপাঠ করতে করতে যখন আমাদের চক্ষু সজল ও কণ্ঠ গদগদ হয়ে উঠেছে হয়তো সেই সময় বেরসিক যাত্রীরা আমাদের রকমসকম দেখে কেউ মুখ টিপে, কেউ বা প্রকাশ্যেই নির্লজ্জের মতো উচ্চ হাস্য করতে থাকে। কেউ বা আমাদের অমৃত পান করতে দেখে নাকে কাপড় দেয়, কেউ বা সরাসরি জিজ্ঞাসাই করে বসে—ক্যা? পিতা হ্যায়?

সরল লোক তারা, কাব্যও বোঝে না, অমৃতও বোঝে না। কাব্য ও অমৃতের রাসায়নিক ক্রিয়ায় দেহে আলস্যের প্রভাব বাড়ে কিন্তু সেখানে মাল ও মানুষের ঠেসাঠেসিতে হাত-পা বিস্তারের অসুবিধা হয়। এই সব নানা কারণে তৃতীয় শ্রেণী ত্যাগ করে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হলুম।

কিন্তু দুদিনেই বুঝতে পারলুম দ্বিতীয় শ্রেণীর বাধা প্রবলতর। একবার এই রকম দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসে কাব্যচর্চা করতে করতে আমরা যাচ্ছি। আমরা ছাড়া আরো দুজন যাত্রী আছেন কামরায়। তখন রাত্রি দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। সেই সন্ধ্যে হতে না হতে মশাই একজন বললে কিনা—তোমরা যদি সারারাত্রি এই রকম ব্যাড়ব্যাড় করতে থাক তো বাধ্য হয়ে আমাদের পুলিশ ডাকতে হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে অন্যদিকে খরচ সংক্ষেপ করে সেবারে আমরা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটলুম।

চলেছি সাঁচি তীর্থে কিন্তু পথ জানি না। ঠিক হয়েছে এলাহাবাদে গিয়ে সাঁচি যাবার ব্যবস্থা করা যাবে। ডাকগাড়িতে ভীড় হয় বলে অন্য গাড়িতে সওয়ার হয়েছি। গাড়ি টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে সমস্ত দিন ধরে। আমাদেরও ছোটবার কোনো তাড়া নেই, গাড়ি কতখানি অগ্রসর হলো সেদিকে খেয়ালই নেই—দিন কতখানি অগ্রসর হলো সেই সেই তালেই ঘড়ি ধরে বসে আছি।

শরৎকালের দ্বিপ্রহর। আমাদের ট্রেনখানা তখন বিহারের ভেতর দিয়ে চলেছে। প্রায় প্রতি স্টেশনেই গাড়ি থামছে। অধিকাংশ স্টেশনেই লোকজন, যাত্রী নেই বললেই হয়। কোনো কোনো বড় স্টেশনে যা দু-চারজন যাত্রী দেখতে পাওয়া যায়, তারা প্রথম শ্রেণীর দিকে ঘেঁষতেই সাহস করে না। তাদের সঙ্গে নিজেদের এই সাময়িক পার্থক্যটা মনে মনে উপভোগ করছি, এমন সময় মাঝারি গোছের একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই কতকগুলো লোক হৈহৈ করে এসে আমাদের কামরাটা আক্রমণ করলে। আমরাও হৈহৈ করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল—আরে ইয়ে ফার্স্টক্লাস হ্যায়।

হ্যায় তো হ্যায়—কিয়া হুয়া?

তারা দলে ছিল খুবই ভারী, জোর করে ঠেলে দরজাটা খুলে ফেলল। দেখলুম স্টেশন-মাস্টার থেকে আরম্ভ করে রেলের কুলিরা পর্যন্ত সেই দলে রয়েছে। সকলেই শশব্যস্ত। ওদিকে আমরা পরাজয় মেনে সরে এসে নিজেদের জায়গায় বসলুম।

তারপরেই কামরার মধ্যে ঢুকতে লাগল বাক্স, তোরঙ্গ, বালতি, ঝুড়ি, বন্দুকের বাক্স ইত্যাদি। আমরা প্রথমে মনে করেছিলুম বোধহয় সাদা চামড়া-ওয়ালা কোনো বড় কর্তা আছেন, কিন্তু জিনিসপত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে মনে হলো তা নয়।

যা হোক আমরা নির্ভুল অনুমানই করেছিলুম, কারণ সবার পশ্চাতে যিনি দেখা দিলেন তিনি দেশী লোক—গলায় মালা, আশে-পাশে আরো অনেক লোক নিয়ে মন্থর-গতিতে গল্প করতে করতে কামরার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ট্রেনটা ছাড়তে তখনও পাঁচ সাত মিনিট দেরী ছিল, ততক্ষণ তিনি কামরার সামনে দাঁড়িয়ে লোকজনের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে গার্ড বাঁশীতে ফুঁ দিতেই তিনি গাড়িতে উঠে দরজাটি আগলে দাঁড়ালেন, সকলে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন করতে লাগল। কারো বা চক্ষু সজল হয়ে উঠল—ট্রেন চলতে আরম্ভ করল।

ভদ্রলোকের চাকর আগেই এসে আমাদের সামনের বেঞ্চিখানার ওপরে বেশ পরিপাটি করে বিছানা পেতে রেখে গিয়েছিল। ট্রেনখানা যতক্ষণ আস্তে আস্তে

চলছিল ততক্ষণ তিনি দরজার কাছে বাইরে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্টেশনের হুদ্দো পার হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর মুখখানা ভেতরে এনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নিলেন। আমাদের ওপর দিয়ে অত্যন্ত অবহেলা ভরে চোখটা বুলিয়ে একবারে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে একখানা ইংরেজি নভেল পড়তে আরম্ভ করে দিলেন।

ভদ্রলোকের চেহারা বেশ বলিষ্ঠ। বয়স হলেও দেহে জরার কোনো চিহ্ন নেই। মাথার চুল কানের কাছে দু-একগাছা পাকা, কাঁচা পাকা দাড়ি বেশ সৌখীন করে ছাঁটা। হাফপ্যাণ্ট পরা, হাল-চাল দেখলে মনে হয় কোনো দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য করে থাকেন।

আমরা এই নতুন আগন্তুক সম্বন্ধে কখনো ইঙ্গিতে কখনো খুবই আস্তে আলোচনা করতে লাগলুম। ভদ্রলোকের দুটো বাক্সতে বাঙালীর নাম লেখা রয়েছে, আমাদেরও সর্বাঙ্গে বাঙালীর মার্কা মারা, তবুও কোনো রকম সম্ভাষণ না করেই নিজের জায়গায় বসে পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। এইসব সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু মন্তব্য বিনিময় হতে লাগল। কিন্তু সে কথা থাক, লোকটি কতক্ষণ থাকবেন এবং তাঁর থাকার জন্য আমাদের কাব্যামৃত চর্চায় ব্যাঘাত ঘটবে কিনা, এই চিন্তায় আমরা বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠলুম।

এইভাবে তো সারাদিন কাটল। কখনো আড় চোখে তিনি আমাদের দেখেন, কখনো তাঁকে আমরা দেখি। সন্ধ্যে উতরে গেল, তবু লোকটি কোথাও নামে না। শেষকালে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়! আর প্রাণে কত সয়—বলে তো আমরা হাতমুখ ধুয়ে কাব্যগ্রন্থ, বোতল, সোডা, গেলাস প্রভৃতি নিয়ে বসে গেলুম।

এতক্ষণে দেখলুম ভদ্রলোকের চক্ষু খুলল—যে অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি সারাদিন ধরে অত্যন্ত অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভরে আমাদের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে ঘোরাফেরা করছিল এবার দেখতে দেখতে তা বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দেখলুম ভদ্রলোক নিমেষহীন নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন অরসিক বলে যে, নয়নে পলক আছে—দেখবার মতো জিনিস হলে অতি অরসিকেরও দৃষ্টি যে পলকহীন হতে পারে তার নমুনা আমরা প্রতি মুহূর্তেই পেতে লাগলুম।

পাত্র ঢালা হলো। পাত্র দুয়েক পেটে পড়বার পর কাব্য পড়া শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতা—প্রত্যেক কবিতা পাঠের পর কিছুক্ষণ তাই নিয়ে আলোচনা হয়, আবার একটি পাত্র অন্তরস্থ করে অন্য জনে পড়তে শুরু করে—এইরকম চলল।

ওদিকে লক্ষ্য করছি আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীর হালচালেরও পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। বিস্ময়ের মাত্রা উপচে, তখন তিনি কৌতূহলের

সাগরে পড়েছেন। ভদ্রলোক আড়চোখে এক একবার দেখবার চেষ্টা করেন, কি বই পড়তে পড়তে আমরা গদ্‌গদ্‌ভাবে সজল-চক্ষু হয়ে পড়ছি, কোন মার্কা সোডা দিয়ে কোন মার্কা অমৃত পান করছি। এবারে লক্ষ্য করলুম তাঁর নয়নে পলক ফিরেছে। আমাদের চোখে চোখ পড়লেই জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে পলায়মান সেই নিবিড় কালোর মধ্যে কি যেন অনুসন্ধান করতে থাকেন। বিস্ময় থেকে কৌতূহল অর্থাৎ বুঝতে পারলুম পূর্বরাগ এবার অনুরাগে পরিণত হয়েছে।

ট্রেন ছুটেছে অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে, কিন্তু গতি কিংবা শব্দ আমাদের স্পর্শ করছে না। আমরা তখন কাব্যের তরণীতে বসে ভাবসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি—কোনোদিকে দৃকপাত নেই। কবির সুখ ও দুঃখ আমাদের সুখ ও দুঃখে পরিণত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে হাসছি, কাঁদছি, একান্ত হয়ে উঠেছি তাঁর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে বলছি—

"যদি কৌতুক রাখ চিরদিন,
ওগো কৌতুকময়ি,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,—
তবে তাই হোক, দেবি, অহরহ
জনমে মরণে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে—"

অমৃতের পাত্র ভরে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে—নিঃশেষে পান করে আবার ডুব দিচ্ছি কাব্যসমুদ্রে—

—"এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে ?
এই যে বাসনা
এর কোনো তৃপ্তি আছে ?
এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী······
এর কোনো কূল আছে ?

হঠাৎ একটি শব্দে ধ্যান ভেঙে গেল—"মশায়—"

মুখ তুলে দেখি সামনের বেঞ্চির ভদ্রলোক উঠে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলুম—কিছু বলছেন কি ?

—হ্যাঁ বলছি। বলে কোনো লৌকিকতা না করেই আমাদের মধ্যে বসে

পড়ে বললেন—আমি সেই সন্ধ্যে থেকে আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখছি—ব্যাপার কি বলুন তো ?

—কিসের কি ব্যাপার মশাই ?

—আমি সেই সন্ধ্যে থেকে লক্ষ্য করছি আপনাদের—আপনারা কি পড়ছেন ? হাসছেন, কাঁদছেন, তর্ক করছেন—আবার পড়ছেন, মাপ করবেন, আমি ঠিক এরকম ব্যাপার কখনো দেখিনি কি না ?

বললুম—মশাই আমরা কাব্য পাঠ করছি ও অমৃত পান করছি।

ভদ্রলোক বললেন—পান যা করছেন তা বোঝবার মতো বয়স আমার হয়েছে—মনে রাখবেন আপনাদের চেয়ে আমার বয়স ডবলেরও বেশী হবে।

কাব্য পাঠ তখনকার মতো বন্ধ হলো। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপচারি হতে লাগল। ব্রাহ্মণ তিনি. ভালো পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার, সারাজীবন রেলে চাকরি করে জঙ্গলে জঙ্গলে বিদেশে-বিভুঁয়ে ঘুরে কাটিয়েছেন। দীর্ঘদিন পরে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ফিরে চলেছেন—তাঁদের দেশ বলতে মধ্যপ্রদেশের এক অজ্ঞাত শহরে, সেইখানেই তিনপুরুষ ধরে বাস করছেন, কিছু বিষয়-আশয়ও তাঁদের আছে। দেশের সঙ্গেও এতদিন কোনো সম্পর্ক ছিল না, বাইরে বাইরেই তাঁকে ঘুরতে হয়েছে কারণ গৃহ বলতে তাঁর কিছুই নেই। চাকরি-বাকরি আরম্ভ করে প্রথম জীবনে বিবাহ করেছিলেন, বছর কয়েক পরেই স্ত্রী মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পরও বাড়ি আসা-যাওয়া ছিল—তাঁর একটি মেয়ে ছিল, তাকে দেখতে আসতে হতো কিন্তু সাত আট বছর বয়স হতে না হতে ভগবান তাকেও টেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন। বাড়িতে ভাইপোরা আছে. তাদের সঙ্গে বনিবনা না হলে তিনি কোনো তীর্থে গিয়ে বাস করবেন।

ভদ্রলোকের কাঠামোটা দেখে তাঁকে যেমন জাঁদরেল কঠিন বলে মনে হয়েছিল আসলে দেখা গেল তা নয়। দেখলুম এদিকে বেশ অমায়িক। কাব্যচর্চা করেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বললেন—সারাজীবন লোহালক্কড় নিয়েই কাটিয়েছি—কাব্য-টাব্যর ধার কোনোদিন ধারিনি, স্কুল-কলেজেও ও বাই ছিল না কোনোদিন।

একথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের সেই সন্ধ্যে থেকে দেখছি সমানে গড়গড় করে কবিতা পড়ে যাচ্ছেন—কি পাচ্ছেন ওর মধ্যে ?

—আনন্দ পাচ্ছি। আমরা আনন্দের উপাসক।

—আর ঐ যে ওগুলো খাচ্ছেন ?

—এতে আনন্দ অনেকক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে।

—কেন, এমনিতে বুঝি আনন্দ হয় না ?

—হয়তো হয় কিন্তু আমরা পাই না। যেদিন এমনিতেই আনন্দ পাব সেদিন আর কাব্য পড়বার কিংবা অমৃত পান করবার প্রয়োজন হবে না।

সিদ্ধিলাভ করবার পর সাধনার যেমন আর প্রয়োজন হয় না।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমরা বললুম—দেখুন, কোনো কোনো আধারে কাব্য সহ্য হয় না। কবিতা কানে গেলেই তাঁদের মেজাজ চটে যায়। আপনি যদি সেরকম না হন তাহলে একটা কবিতা পড়ে আপনাকে শোনাই —হয়তো আপনিও আনন্দ পেতে পারেন।

ভদ্রলোক বললেন—পড়ুন, শুনি আপনাদের কাব্য, দেখি আনন্দ পাই কি না!

ইতিমধ্যে এক বন্ধু এক পাত্র অমৃত ভদ্রলোকের সামনে ধরতেই তিনি সিঁটকে উঠে বললেন—না না, ওটা আর চলবে না। কবিতা পড়ুন, তাই শুনি।

ধ্বস্তাধস্তি চলতে লাগল। ভদ্রলোককে স্বীকার করতে হলো জীবনে বার দুয়েক অমৃত পান করেছিলেন কিন্তু ভালো লাগেনি। বুড়ো বয়সে ওটাতে আর রুচি নেই ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের অনুরোধের আতিশয্যে পড়ে শেষকালে কোনো রকমে এক পাত্র গলাধঃকরণ করলেন। তারপর আরম্ভ হলো পড়া—'যেতে নাহি দিব।'

ভদ্রলোক স্থির হয়ে শুনতে লাগলেন। দু-এক জায়গায় কি যেন বলবার উপক্রম করেই আবার চুপ করলেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে ধরা ধরা গলায় বললেন—বাঃ বড় ভালো লাগল—যদি কষ্ট না হয় তো আরেকবার পড়বেন?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

আবার শুরু হল—

'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর,
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।'

কবিতা শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের চোখ দুটো ক্রমেই অশ্রুসজল হয়ে উঠতে লাগল। সেই ইঁট কাঠ লোহা-লক্কড়ের আবরণে কোথায় সঞ্চিত ছিল বেদনা, কাব্যের আঘাতে তা দুই চোখ উপচে পড়তে আরম্ভ করল। কবিতা শেষ হয়ে গেলে ভদ্রলোক চোখ মুছতে মুছতে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দেখলেন আর একটি প্রস্তুত পাত্র তাঁর অপেক্ষা করছে।

ভদ্রলোক দু-হাত তুলে বললেন—আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।

—যেটুকু খেলেন সে তো চোখ দিয়েই বেরিয়ে গেল দাদা!

—না না, আর নয়।

ভদ্রলোক বারবার বলতে লাগলেন—বড় আনন্দ পেলুম, বড় আনন্দ পেলুম। এখন মনে হচ্ছে সন্ধ্যে থেকেই আপনাদের সঙ্গে যোগ দিইনি কেন?

ট্রেনখানা একটা আঘাটায় থেমে গেল বলে মনে হলো! কিছুক্ষণ যেতে না যেতে ভদ্রলোকের চাকরটি কোথা থেকে এসে বিছানাপত্র বাঁধতে আরম্ভ করে

দিলে। তিনি বললেন আমার স্টেশন এসে গিয়েছে, পরের স্টেশনেই আমি নামব।

আমরা বললুম—অল্পক্ষনের জন্য হলেও বড় আনন্দ পেলুম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে।

ভদ্রলোক বললেন—দেখুন সারা জীবন কাজের চাপেই দিন কেটেছে। ভাবছিলুম পেনসন নিয়ে দিনগুলো কাটবে কি নিয়ে! আপনাদের কাছে একটা হদিশ পেলুম—আপনারা যে আমার কি উপকার করলেন তা আপনারা বুঝতে পারবেন না।

ট্রেনখানা চলতে আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি কোথায় পাওয়া যায়, কি নাম—সেগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখে নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একটা অন্ধকার স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। নির্জন কোলাহলহীন অন্ধকার স্টেশন—স্টেশন-মাস্টার থেকে ইস্টিশনের বাতিগুলো পর্যন্ত ঘুমন্ত। তারই মধ্যে জিনিসগুলি নামিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক আমাদের নমস্কার জানিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আবার ট্রেন ছুটতে লাগল অন্ধকারের বুক ফুড়ে।

বংশী ভুনাওয়ালার দোকান

বংশী ভুনাওয়ালার দোকান ছিল আমাদের পাড়ায়। ভুনাওয়ালা বলে তাচ্ছিল্য করবার কিছু নেই; বিরাট বড় দোকান—সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে।

বংশীর বাবা শুকদেও প্রথম জীবনে ফেরি করত। তখন কলকাতা শহরে এত রবরবা ছিল না। আমাদের দিকটায় বিস্তর জমি খালি পড়েছিল। তারই খানিকটা ইজারা নিয়ে সে ছোট একটি দোকান পেতেছিল। সেই দোকানই ক্রমশঃ বড় হয়ে আজ বংশী ভুনাওয়ালার দোকানে পরিণত হয়েছে।

শুকদেওদের তিন ছেলে—বংশী, গণেশ ও রামচরণ। এই ছেলেরাই পরে বাপের ব্যবসাকে ফলাও করে তুললে। খালি ভুনাওয়ালার দোকান নয়—দোকানের সংলগ্ন আরো খানিকটা জমি নিয়ে তারা দোতলা মাঠকোঠা করেছিল। এইখানে তারা ভাড়াও দিত এবং নিজেরাও থাকত।

শুকদেও মারা যাবার পর এরা তিন ভাইয়ে অক্লান্ত চেষ্টা করে ছোট্ট সেই দোকানটিকে বড় কারবারে পরিণত করলে। তিন ভাই বিয়ে করল; বৌরা এসে স্বামীদের কারবারে লেগে গেল। এখন মস্ত উঁচু মাচায় গামলায় করে থরে থরে পণ্য সাজানো—চালভাজা, কড়াইভাজা, ছোলাভাজা, চেপটা ছোলা, যবের ছাতু, ছোলার ছাতু—আরও কত কি! নিচে গনগন করছে উনুন—পাশে বৌরা জাঁতা ঘুরোচ্ছে, কেউ বা বাড়ির ভেতরে রাঁধছে, কেউ বা

মাচার ওপরে দোকানে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করছে। ছেলেরা কোট জুতো পরে ইস্কুলে যাতায়াত করছে। এক কথায় বংশীর যেমন জমজমাট ব্যবসা তেমনি জমজমাট পরিবার।

বংশীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু তার স্ত্রীর বয়স তার থেকে অনেক বেশি। বংশীর বয়স হলেও তাকে তখনো জোয়ান বলে মনে হতো কিন্তু তার বৌকে আসল বয়সের চেয়েও অনেক বেশি বয়সের বলেই মনে হতো। এরই মধ্যে বংশী দিনকয়েকের জন্য কোথায় গিয়ে এক বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। বংশীর কাণ্ড দেখে তাদের বাড়ির সবাই তো বটেই পাড়াসুদ্ধ লোক অবাক। দিন-কতক খুব হৈ-চৈ, ঝগড়াঝাঁটি—চালে আর কাক-চিল বসতে পারে না এমনই অবস্থা।

দিনকয়েক বাদে অবস্থায় একটু সাম্যভাব এসে পেঁছিলে সকলে বংশীর নববিবাহিত স্ত্রীকে চক্ষু মেলে দেখলে এবং দেখে দ্বিতীয় দফা অবাক মানলে।

নতুন বৌয়ের বয়স বাইশ তেইশ বছর হবে। রংটা মাজা-মাজা—বংশীদের ঘরে তাকে গৌরবর্ণাই বলা চলে। টানাটানা চোখ দুটি যেন একটি শাণিত ছুরির দুটো ফলা। মুখখানা একটু লম্বা এবং অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। দেহলতা নিটোল যেন কুঁদে বার করা হয়েছে। এ রকম সুন্দরী অনেক বড় ঘরেও মেলে না।

নতুন বৌ এসেই নিজেকে বিপরীত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে। দু-দিনের মধ্যেই সে দাঁড়িপাল্লা ধরতে শিখে গেল এবং বাংলা বলতে লাগল বংশীদেরই মতো। নতুন বৌয়ের নাম ফুলবাসিয়া।

ফুলবাসিয়ার আগমনের পর বংশীর দোকানের বিক্রি বেড়ে গেল প্রায় দ্বিগুণ। পাড়ার যাঁরা জন্মেও ভুনাওয়ালার দোকান থেকে জিনিস কিনতেন না তাঁরা হঠাৎ ছোলাভাজা ও চালভাজার অনুরাগী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফুলবাসিয়া তাঁদের অনুগ্রহকে গ্রাহ্যই করলে না। দরকার হলে তাঁদের সঙ্গে সমানে চেঁচামেচি করতেও ছাড়ত না। আমরা জানি এই ফুল-বাসে অনেক দূরে-দূরান্তের ভৃঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসত, কিন্তু ফুলের চারদিকে গুঞ্জরণ করাই তাদের সার হতো। সকলকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হতো।

ফুলবাসিয়ার বচন ছিল তীক্ষ্ন। সমানে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সে গালিগালাজ করে যেত। কিন্তু তবু খদ্দেরের ভিড় কমত না। বংশী ভুনাওয়ালার দোকান এখন লোকের কাছে ফুলবাসিয়া ভুনাওয়ালীর দোকানে পরিণত হলো।

ইতিমধ্যে ফুলবাসিয়া আবার পশ্চিমের কোন জায়গাথেকে গোটা পাঁচ-ছয় দুধাল ছাগল আমদানি করলে। গাধার মত সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা লোমওয়ালা এবং গোরুর পালানের মতন পালানওয়ালা সেই ছাগলের দল দেখবার জন্যে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত। এগুলি ছিল ফুলবাসিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি।

সে নিজে তাদের পরিচর্যা করত, নিজে দুধ দোয়াতো এবং বিক্রিও করত। উদ্বৃত্ত দুধ যা থাকত তা তাদের সংসারের জন্য খরচ হতো।

বর্ষা আর শীতকাল ছাড়া বংশীদের পরিবারের পুরুষেরা প্রায় সকলেই রাস্তায় খাটিয়া পেতে রাত্রি কাটাতো। ছাগলগুলোও এই সময়ে বাইরেই থাকত। তাদের বাড়ির কয়েক পা দূরেই ছিল প্রকাণ্ড মাঠ, সেই মাঠে দুপুরবেলা ফুলবাসিয়াই ছাগলগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসত। তারা স্বচ্ছন্দে ঘাস টাস খেত। আবার বিকেল নাগাদ সেগুলোকে সংগ্রহ করে এনে দাগানের দু-পাশে বেঁধে রাখত।

এখন এই মাঠটি ছিল আমাদের লীলাভূমি। পাড়ার এবং বেপাড়ার আমরা কয়েকটি সেরা সেরা ছেলে এই মাঠে ফুটবল খেলতুম এবং আড্ডা দিতুম। ফুলবাসিয়ার দিকে না এগোলেও আমাদের মধ্যে তার সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত ছিল না। খেলা যে রোজই হতো তা নয়, কিন্তু যেদিনে খেলা হত না সেদিনে নানান বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ফুলবাসিয়া ছিল একজন।

দেবাশীষ থাকত আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। সে ফুটবল খেলত না, আলোচনার মধ্যে অতি সামান্যই কথাবার্তা বলত, কিন্তু সে ছিল আমাদের সিগারেটের ভাণ্ডারী।

—দেবা, একটা সিগারেট ধরা।—বলা মাত্রই সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে দুটান মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে দিত। ও ছিল অতি ভালমানুষ ও নিরীহ লোক। আমাদের যেদিন কিছুই করবার থাকত না, সেদিন দেবাশীষকে নিয়ে চ্যাংদোলা করে দৌড়ানো হতো। কখনো কখনো শুকনো পাতা জোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেবাশীষকে দোলানো হতো আর সে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাত। আমরা তাতে পরমানন্দ উপভোগ করতুম। দেবাশীষ হাসিমুখেই এ-সব সহ্য করত এবং কোনদিনই আড্ডা কামাই করত না।

দেবাশীষ ছিল পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, কিন্তু তার কোনো চাল ছিল না বললেই হয়। মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, মোটা ধুতি—এই ছিল তার পোশাক। আর ছিল তার মেজাজ! অমন শরীফ মেজাজের লোক আজও আমার চোখে পড়েনি। কখনো তাকে বিরক্ত হতে বা রাগতে দেখিনি।

আমাদের মাঠ রাস্তার ধারে হলেও তার তিন ভাগ ছিল কতকগুলো বাড়ির আড়ালে, আর এক ভাগ ছিল রাস্তার দিকেখোলা। একদিন বিকেলে আমরা মাঠে বসে গুলতানি করছি, ফুটবলটা পাম্প হচ্ছে—এখুনি খেলতে নামব এমনি অবস্থা—ঠিক সেই সময় কে যেন দেবাশীষের কাছে সিগারেট চাইলে। দেবাশীষের পকেটে তখন সিগারেট ছিল না।—এখুনি কিনে নিয়ে আসছি—বলে সে উঠে রাস্তার দিকে অগ্রসর হলো। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক

থেকে ফ্লবাসিয়ার আবির্ভাব ঘটল।

ফ্লবাসিয়া এসেই চীৎকার করে তাদের উদ্দেশে গালাগালি দিতে শুরু করল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলুম—কি হলো রে! তার সেই উত্তেজিত অবস্থার সামনে বেরোবার সাধ্য আমাদের ছিল না। শেষকালে বুঝতে পারা গেল তার ছাগলের পালকে তাড়া দিয়ে কে মাঠের বার করে দিয়েছে।

ফ্লবাসিয়া চেঁচাচ্ছে। এমন সময় এদিক থেকে দেবাশীষ এগিয়ে গিয়ে ফ্লবাসিয়াকে কি যেন বললে। আমরা সবাই হাঁ করে দেখছি যে এবার কি হয়! ফ্লবাসিয়া দেবাশীষের কথায় কি একটা জবাব দিলে কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। তারপরে দুজনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো—কি কথাবার্তা হলো কিছুই আমরা বুঝতে পারলুম না—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে তারা দুজনে রাস্তার দিকে চলে গেল।

কি কথাবার্তা হতে পারে তা অনুমান করবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে আমাদের ফুটবল পাম্প হওয়া শেষ হয়ে গেল। আমরা মাঠে নেমে পড়লুম। খেলার উত্তেজনায় দেবাশীষ ও ফ্লবাসিয়া উভয়েই ডুবে গেল।

পরের দিন আমাদের অন্য জায়গায় ম্যাচ খেলা। তার পরের দিন গড়ের মাঠে মোহনবাগানের ম্যাচ। এই রকম উপরি উপরি কতকগুলো ব্যাপারে সেদিনের বিকেলের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। সেদিনের সেই ব্যাপারের পরে দেবাশীষ যে আর মাঠে আসছে না—এটা আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি।

প্রায় পনের দিন এইভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে মাঠে আমি একলা বসে আছি এমন সময় দেবাশিষের কথা মনে পড়ে গেল। একটু পরেই নির্মল মাঠে আসতেই আমি তাকে বললুম—এই, দেবাশীষ আসছে না কেন কি হলো তার?

নির্মল বললে—অনেক দিন আসছে না দেখে আজ সকালে তার বাড়ি গিয়েছিলুম। সে বললে—একটা ছেলে পড়াবার কাজ পেয়েছি ভাই বিকেলবেলা স্রেফ আড্ডা না দিয়ে তাকে পড়াতে যাই। দশ টাকা করে দেবে বলেছে—মন্দ কি!

নির্মল বলতে লাগল—জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার টাকার কি এ ভাবনা? যখনই চাইছ—বাবার কাছ থেকে পাচ্ছ। আমার কথা শুনে দেবাশীষ আমতা আমতা করতে লাগল, স্পষ্ট জবাব কিছুই দিলে না।

নির্মল আরো বললে—ব্যাপারটা রহস্যময় বলে বোধ হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি কাল বিকেলে ওর পেছু নিয়ে দেখবো যে ও কোথায় যায়!

আমি বললুম—আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ঠিক হল আজ আমরা দুজনে দেবাশীষের পেছু নেব। সে চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোয়। আমরা বেলা সাড়ে তিনটের সময় গিয়ে তার বাড়ি

আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকব।

পরের দিন আমি আর নির্মল তাদের বাড়ির থেকে খানিকটা দূরে অবিশ্যি বাড়িটাকে নজরে রেখে—এক জায়গায় ওৎ পেতে বসে রইলুম। বেলা চারটে নাগাদ দেবাশীষ বাড়ির থেকে বেরিয়ে এল। দেখলুম তার গায়ে ধোপদোস্ত পাঞ্জাবি, পরনেও তেমনি ফর্সা ধুতি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একবার চারদিকে ভালো করে দেখে আমরা যেদিকটায় বসে ছিলুম তার বিপরীত দিকে হনহন করে চলতে লাগল। খানিকটা চলে আমরা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে পৌঁছলুম। তখন রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। দেবাশীষ তারই মধ্যে দিয়ে উত্তর মুখে এগিয়ে চলল। আমরাও সমান ব্যবধান রেখে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। দেখলুম সে খানিকটা করে চলে আর ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—আবার চলতে থাকে। নির্মল বললে—দেখলি! ছেলে পড়াতে যাবে তো এত সন্তর্পণে কেন বাবা!

যাই হোক, আবার সে চলতে লাগল। মানিকতলার ভেতরে ঢুকে সে হঠাৎ মারলে টেনে দৌড়। কি ফ্যাসাদ! আমরাও দৌড়তে লাগলুম। পঞ্চাশ ষাট গজ দৌড়ে একটা পানের দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে গেল। সেখান থেকে সিগারেট কিনে একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলে-দুলে চলতে লাগল পশ্চিম দিকে। আমরা যতদূর সম্ভব নিজেদের লুকিয়ে লুকিয়ে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। তারপরে বাঁ দিকে একটা পল্লীর মধ্যে ঢুকে পাঁচখানা বাড়ি ছাড়িয়ে একটা বাড়িতে টুপ করে ঢুকে পড়ল। আমরাও ছুটে গিয়ে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম দেবাশীষ ততক্ষণে উঠোন পার হয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমরা তার এত কাছে এসে পড়েছি—তবু সে টের পেল না। ওপরে দোতলায় উঠে সে বারান্দার ধারে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আর বাক্যব্যয় না করে আমরাও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দেবাশীষ উঠে আমাদের দেখে বলে উঠল—আরে! তোরা কোত্থেকে? আমার পেছনেই ছিলি বুঝি? আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল কে যেন আমার পেছু নিয়েছে! যাকগে—যখন এসেই পড়েছিস তখন বোস ভাই!

ঘরের মধ্যে একদিকে একটা উঁচু বিছানা—তাতে বালিশ, পাশবালিশ সবই রয়েছে। বিছানার সামনে মাদুর পাতা। আমরা জুতো খুলে মাদুরে বসলুম। এমন সময় ঘরে অন্য দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল ফুলবাসিয়া।

কিমাশ্চর্যমতৎপরম্! মিশরের পিরামিড কিংবা ইলোরা আর কৈলাস চেষ্টা করলে কল্পনা অন্ততঃ করা যায়। কিন্তু এ যে কল্পনাতীত!

দেবাশীষ বললে—ফুলবাসিয়া, বোসো। এরা আমার বন্ধু। আমার অজ্ঞাতে আমার পেছু নিয়ে একেবারে এখানে এসে ঢুকেছে।

ফুলবাসিয়ার মুখ দেখে মনে হলো সে আমাদের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি। একটু হেসে তবু সে বললে—তাই নাকি!

ফুলবাসিয়াকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। একেই তো সে ছিল সুন্দরী, তার ওপরে দেহে কদিন সাবান পড়েছে—মাথায় তেল—সুন্দর একখানি চওড়া পেড়ে তাঁতের শাড়ি হিন্দুস্থানী ধরনে পরা—মাথায় কবরীতে একটি বেলফুলের মালা জড়ানো—সত্যিই চমৎকার দেখাচ্ছিল ফুলবাসিয়াকে!

দেবাশীষ আমাদের বললে—এ বাড়িতে কয়েক দিনের জন্যে এসে উঠেছি বটে কিন্তু অন্যত্র বাড়ি আমি ঠিক করেছি। শীগগিরই সেখানে উঠে যাব।

একটু ক্ষণের মধ্যে ফুলবাসিয়াও মুখর হয়ে উঠল। আমি আর থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা ফুলবাসিয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না তো?

সে বললে—না, না, আপনারা বন্ধুলোক, আপনাদের কথায় কি রাগ করতে আছে?

জিজ্ঞাসা করলুম—অনেকগুলি ধনী লোক তোমার অনুগ্রহভিখারী হয়ে নিরাশায় ফিরে গিয়েছে। শেষকালে দেবার মধ্যে তুমি কি দেখলে?

ফুলবাসিয়া আমার কথার মাঝখানে বললে—ওর ওপর বড় মায়া পড়ে গেল। তাছাড়া দিনরাত সতীনের সঙ্গে খিচিমিচি আর ঐ বুড়ো বর সহ্য করতে পারলুম না। তার ওপরে দেখলুম মানুষটা ভালো, তাই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।

দেবা বললে—কিন্তু ভাই, তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর আমরা যদ্দিন বেঁচে আছি একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না?

প্রতিজ্ঞা করলুম। ফুলবাসিয়া খপ করে আমার দু-হাত ধরে বললে—কারুকে বলবেন না। আমার স্বামী খবর পেলে মিছিমিছি কতকগুলো মারপিট থানা পুলিস হবে।

ফুলবাসিয়ার হাত ধরে বললুম—তুমি নিশ্চিন্তে থাক, কারুকে বলব না।

দেবার কল্যাণে দেবদুর্লভ ফুলবাসিয়ার স্পর্শলাভ করলুম।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঘুণাক্ষরেও দেবাশীষের কথা প্রকাশ না করলেও তার সম্বন্ধে আলোচনারও অন্ত রইল না। কোথায় গেল সে—কেন আসছে না—কেন রাগ করেছে ইত্যাদি। যাই হোক, দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে আমি কিংবা নির্মল কেউই আর ওদিকে যাইনে। একদিন নির্মল দেবার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল—তার বাবা মারা গিয়েছেন। সে নিজের বিষয়-আশয় বুঝে নিয়ে বসতবাড়ির ভাগ ভাইদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে!

দিন কাটতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই চাকরি পেয়ে অদৃশ্য হতে লাগল। ক্রমে ফুটবল খেলা ছেড়ে ভবের খেলা শুরু করবার ডাক পড়ল।

মাঠ থেকে ঘাট, ঘাট থেকে আঘাটার কোনাকুনি ত্রিকোণীতে ঘা খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগলুম। গুরুজনদের অনুশাসন অমান্য করে নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা-সাধনের ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলুম। তখনকার যুগে এখনকার মতো চাকরি এত সুলভ ছিল না। খোঁটার জোর না থাকলে চাকরি পাওয়াই যেত না। অনেক উমেদারির পর একটা বড় সওদাগরি আপিসে শেষকালে চাকরি জুটে গেল।

কিছুদিন বাদে তারা বললে—বিদেশে যদি যাও তাহলে উন্নতি হবে। ব্যস! বিদেশে চলে গেলুম।

দীর্ঘদিন—অতি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরে বদলী হয়ে আবার কলিকাতায় ফিরে এলুম। মাথার চুল খিচুড়ি, চোখে চশমা, দাঁত পড়তে শুরু করেছে—এই অবস্থা। কলকাতায় ফিরে এসে দেখলুম বংশী ভুজাওয়ালার অবস্থা অনেক ফিরে গিয়েছে।

তাদের মাঠকোঠা হয়েছে অনেক বিস্তৃত। শুনলুম তারা টাকা ধারধোর দেবার কারবারও করে। কারা যেন দু-তিনখানা বাড়িও তাদের কাছে বাঁধা রেখেছে। একখানা নিজস্ব বাড়িও করে ফেলেছে। তাছাড়া ওরা আবার খুচরোর সঙ্গে পাইকিরী কারবারও আরম্ভ করেছে। বস্তা বস্তা চালভাজা ছোলা ভাজা কড়াইভাজা ভুট্টার খই পাইকারী কারবারীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বংশী ও তার ভাইয়েদের হাতে সোনার তাগা উঠেছে। বংশীর বেশ ভুঁড়িও হয়েছে। মেয়েরা-বৌরা আর তাদের কারবারের কাজ করে না। ছটা সাতটা কারিগর দিনরাত কাজ করে চলেছে। এক কথায় অবস্থা তারা ফিরিয়ে ফেলেছে।

ইওরোপে তখন যুদ্ধের সাড়া লেগেছে। সকলেই নিজের ঘাঁটি সামলাচ্ছে—হিটলারের হিট অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতদিন সবাই ঘুমোচ্ছিল তারই মধ্যে সে নিজেকে অসম্ভব শক্তিশালী করে তুলেছিল। তার কিছু কিছু ঢেউ আমাদের ভারতবর্ষে এসেও লাগছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা যুদ্ধ ঘোষিত হলো।

যুদ্ধ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল—যে যার ঘাড়ে পারল লাফিয়ে পড়ল। আমাদের শহরের হালচালও গেল বিগড়ে। সন্ধ্যার দীপমালা নিষ্প্রভ হতে হতে একেবারে নিভে গেল। দোকান-পাট সব বন্ধ। সরকার জীবনধারণের জন্য খাদ্য বিতরণের ভার নিজে নিলেন। ফলে একশ দেড়শ বছর ধরে এখানে যারা মুদির দোকান করে আসছে তারা ঝাঁপ বন্ধ করে শ্লান মুখে দেশে ফিরে গেল। সন্ধ্যে হলেই সব বন্ধ। বংশী ভুজাওয়ালার দোকানও এরই মধ্যে টিমটিম করে চলে একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

পাড়ার লোক বললে—তাই তো বংশী, তোমাদের এতকালের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল!

বংশী ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—পরমাত্মা যা করবেন তাই হবে।

কিন্তু সেই দিনই পাড়ার লোক সবিস্ময়ে দেখলে বংশীর মাঠকোঠার সামনে খানতিনেক লরী বস্তাবোঝাই হয়ে এসে দাঁড়াল। লরীতেই লোকজন ছিল : তারা ঝটপট নেমে মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি বস্তাগুলো দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল। বস্তাগুলো ছোট বড় লাল সাদা নানান আকারের কাঁকরে ভরা। ধুলো, কেওলিন, মাটিগুঁড়োনোও তার মধ্যে আছে। সারারাত ধরে সেই সব কাঁকর, বালি, ধুলো চালে ডালে ছোলায় মটরে কলায়ে ধনে-জিরেয় আটায় ময়দায় মিশ্রিত হয়ে শেষ রাত্তিরে তিন লরীর বদলে ছ' লরীর মাল চালান হয়ে গেল। আবার দিনের বেলায় আসতে লাগল চাল ডাল আটা ময়দা। বংশীরা ফুলে ফেঁপে উঠল। শুধু বংশীরা নয়—এ রকম অনেক বংশী অর্থলোভে পাইকিরী দরে নরহত্যা করতে লাগল।

যুদ্ধের ঘূর্ণিতে মানুষের মাথা গেল বিগড়ে : সংসারের হাওয়াই উলটে গেল। ছেলে বাপকে ধরে ঠেঙাতে লাগল—চাকর মনিবকে। চোর হলো সাধু, সাধু হলো চোর, মেয়েরা হয়ে উঠল বেপরোয়া। এর মধ্যে বিদেশ থেকে দলে দলে সৈনিক এসে পড়ল শহরে, জিপ গাড়ি সাঁজোয়া গাড়ি দিনরাত্রি পথের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। শুদ্ধ নরহত্যা করবার উল্লাসে তারা লোক-চাপা দিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি লোকচাপা দিয়ে তারা হাসতে হাসতে ছুটে গেছে। লোক ছুটছে—কোথায় টাকা, হা টাকা, যো টাকা! এই উন্মাদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যে দেখেছে নটরাজের তাণ্ডব সেই জেনেছে কি মহান্ কি বিরাট আর কি অপ্রতিবার্য এই ধ্বংসের লীলা।

এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল বংশীদের অতবড় মাঠকোঠা ভেঙে একেবারে মাঠ করে ফেলা হয়েছে। যে সময় একমুঠো সিমেণ্ট কিংবা এক পাত ইস্পাত শতগুণ দাম দিয়ে লোক জোগাড় করতে পারে না সেই সময়ে বংশীর বিরাট প্রাসাদ হতে লাগল। দ্যাখ-দ্যাখ করে এক বছরের কাজ দু-মাসেই শেষ হয়ে গেল। একদিন যেখানে বংশী ভুজাওয়ালার ছোট্ট ঘর ছিল সেখানে উঠে পড়ল এক বিরাট প্রাসাদ। তাদের বাড়ির কাছেই মস্ত একটা খালি জায়গা পড়ে-ছিল সেটা কিনে নিয়ে বংশী নিজের নামে বাজার বসিয়ে ফেললে। বাজারের চারদিকে তেতলা বাড়ি—বাড়ির ওপর লেখা হলো "বংশীবাবুর বাজার"। শহরের আর একদিকে আর এক বাজারের নাম হলো 'গণেশ মার্কেট', আর একটা বাজারের নাম হলো "রামবাবুর বাজার"। বংশীরা এক এক ভাই আট-দশ লাখ টাকার ওয়ার-বণ্ড কিনে ফেললে। বংশীর বাড়ির গেটে তামার প্লেটে বড় বড় পেতলের হরফে লেখা হলো—'বংশীপ্রসাদ জয়সোয়াল এণ্ড ব্রাদারস্ প্রাইভেট লিমিটেড'। দরজার আর এক দিকে লেখা হলো "জয়সোয়াল প্যালেস"। গেটের দুদিকে বন্দুকধারী সেপাই বসল। আরো আশ্চর্যের বিষয় বংশীকে সরকার দুদিন ডেকে নিয়ে গেল। জেনারেল পোস্ট আপিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বংশীপ্রসাদ ওয়ার-বণ্ড সম্বন্ধে লেকচার দিয়ে এল।

সেদিন ছিল মহরমের ছুটি। ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে আমরা দুই ভাই মহরম দেখতে যেতুম। মেছোবাজারে একটা বাড়ির উঁচু রকে আমাদের চড়িয়ে দিয়ে বাবা নিজে পাশে দাঁড়াতেন। সেই দামামাধ্বনি ও রণহুঙ্কার, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, পাটাখেলা, লুপখেলা—এই সব দেখতে দেখতে আমাদের বুকের মধ্যেও রণবাদ্য বাজতে লাগল। কখনো ভয়ে, কখনো উৎসাহে সময়টা যে কি করে কেটে যেত তা বুঝতে পারতুম না। ফেরবার সময় দুই ভাইয়ে দুটো ঝিঁঝিপোকা কিনে বাজাতে বাজাতে ফিরতুম। তারপর থেকে সখ করে কখনো মহরম দেখতে যাইনি। বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে দু-একবার যেতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় কিছুই ভালো লাগেনি।

সেদিন ছিল আপিসের ছুটি। কাজকর্ম কিছুই নেই। খুড়ো জ্যাঠা আর অবশিষ্ট নেই যে ধরে গঙ্গাযাত্রা করি—নিজেই গঙ্গাযাত্রা করলে হয় এমনই অবস্থা—দুপুরবেলা সার্কুলার রোডে মহরম দেখতে গেলুম। এক জায়গায় ভিড় একটু কম দেখে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখের সামনে লাঠি খেলতে খেলতে দলের পর দল চলেছে। দেখলুম সেই আন্ডার-ওয়্যারের ওপরে জরির ফিতে দেওয়া জাঙিয়ার বাহুল্য আর নেই—অধিকাংশই পেণ্টুলান-হাফপ্যাণ্ট-বুশশার্ট পরে নেমেছে। এই সব দেখছি—এমন সময় দেখি আমার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে ধীরে ধীরে আমাকে লক্ষ্য করে দেখছে।

দেখলুম লোকটির মুখ হাত কান—সব কুষ্ঠরোগে ফুলে উঠেছে। মনের মধ্যে অস্বোয়াস্তি ভোগ করতে লাগলুম—মনে হলো আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ি। ঠিক সেই সময় লোকটি ঘুরে সিধে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমিও তার মুখের দিকে তাকালুম—মুখটা অসম্ভব ফোলা, চোখ দুটো কোথায় গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে—কিন্তু দেখতে দেখতে সেই দুই চোখে পরিচয় ভরে উঠতে লাগল। বলে উঠলুম—আরে! দেবাশীষ যে! কি খবর?

ভাঙা ভাঙা গলায় সে বললে—চিনতে পেরেছেন?

আমি বললুম—দেবাশীষ, আমাকে আপনি বলছ কেন?

দেবাশীষ বললে—কি জানি, যদি কিছু মনে করো।

দেবাশীষ চলতে আরম্ভ করল উত্তর মুখে। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম। জিজ্ঞাসা করলুম—ফুলবাসিয়ার খবর কি?

সে বললে—ফুলবাসিয়া মারা গেছে বছর দুই হলো। তারই তো প্রথমে এই রোগ হয়। ডাক্তার দেখে বললে—এ বড় খারাপ জাতের কুষ্ঠ। একে এক্ষুনি কোনো আশ্রমে পাঠিয়ে দাও, সেরে যাবে। মধ্যপ্রদেশে বড় আশ্রমে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিলুম, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে

চাইল না। বললে—তোমাকে ফেলে কোথাও গেলেই আমি মরে যাব। দেখতে দেখতে সে ফুলে ফেটে পড়তে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে মারা গেল। তারপরেই আমাকে এই রোগে ধরেছে।

বললুম—কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তোমার—তোমার মুখ—তোমার চেহারা!

দেবাশীষ বললে—খালি আমার চেহারার পরিবর্তন দেখছ? সমস্ত দুনিয়াটা কি ফুলে ফেঁপে পচে ফেটে পড়ছে না? কি বদলে যায়নি? আমাদের ছেলেগুলো মেয়েগুলো ন্যায় ধর্ম সমাজ—সবই তো কি অদ্ভুত বদলে গেছে! এর মধ্যে যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে সেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

বললুম—তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাচ্ছ না কেন?

দেবাশীষ বললে—আমি যাব ঠিক করে ফেলেছি। বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করতে যা একটু দেরি।

চলতে চলতে দেবাশীষ বললে—আশ্রমে যাবার আগেই আমি একটা পরিবর্তনের আশা করছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি পরিবর্তন?

—মৃত্যু।

কথাটা বলেই দেবাশীষ বাঁদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার পা-দুটোও অসম্ভব রকমের ফুলে উঠেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে। অপসৃয়মান সেই চেহারা ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

তারপর ডানদিকের একটা গলিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একবার

একবার গ্রীষ্মের এক দারুণ দিনে আমরা কয়েকটি বন্ধু লাহোরে বাসা বেঁধেছিলুম। চোত মাসের শেষাশেষি। এই সময়ে লাহোর শহরে কেউ বেড়াতে যায় না—এটা অতি জানা কথা। আমরা এই অসময়ে সেখানে গিয়ে জুটেছিলুম কর্মদোষে। সেখানকার এক বড়লোকের ছেলের ফিল্ম তৈরি করার সখ হয়েছিল। বাপকে পটিয়ে সে টাকার বিষয়ে রাজীও করিয়েছিল। এই সূত্রেই আমাদের সেখানে যাওয়া।

লাহোর আমার অজানা জায়গা নয়। ইতিপূর্বে বার দুয়েক সেখানে গেছি এবং সেই শহরকে ভালোও বেসেছি। কিন্তু এমন পরম উপভোগ্য সময়ে সেখানকার রূপ এই প্রথম দেখলুম।

আমাদের জন্য বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল পুরাতন শহরের এক কোণে চুন্নি-মণ্ডীতে—সেখানে শেখুপুরা হাভেলির পরিত্যক্ত একটি অংশতে। এই বাসস্থানের একটু বিবরণ দেওয়া দরকার।

প্রকাণ্ড গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। গেট এত বড় এত উঁচু আর এত প্রশস্ত যে দুটো হাতী সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। গেটের সেই খিলানের ওপরেই মস্ত বাড়ি। সেই বাড়িতে শেখুপুরার রাজাদের কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজন বাস করে। গেটে ঢুকেই ডানদিকে হচ্ছে সর্দখানা—মাটির নিচের ঘর। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমেই বৈঠকখানা-ঘর দুটি, হলঘর একটি, দুই-তিনটি শোবার ঘর, চানের ঘর, কল, পায়খানা ইত্যাদি। মাথার ওপরে একদিকের রাস্তার দিকে দু-তিনটে জানলা আছে—সেইখান দিয়ে আলো আসে। অন্যদিকের জানলার ভেতর দিয়ে হাভেলির বাগান দেখা যায়।

ফটকের খিলেন পেরিয়েই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারদিকেই বাড়ি ঘেঁষাঘেঁষি করা। উত্তরদিকে বিশাল ভগ্নস্তূপ। পশ্চিমে প্রকাণ্ড কেল্লার মতো প্রাসাদ—তারও খানিকটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাঙ্গণের চারদিকে যে বাড়ি তাতে রাজাদেরই আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীর দল বাস করেন। মধ্যখানে খানিকটা ঘাসজমি—ঘাসজমিটাকে ঘিরে আছে চওড়া একটা রাস্তা। আমাদের বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল এই ভাঙা কেল্লার খানিকটা জায়গায়। প্রাঙ্গণের একদিকে একটি বড় বৈঠকখানা-ঘর ; প্রায় সেইখান থেকেই পাঁচতলা উঁচু সিঁড়ি বেয়ে আমাদের বাসস্থানে পেঁছিতে হয়। বাহ্যতঃ এই জায়গাটা দোতলা বলে মনে হয়, কিন্তু এত উঁচু দোতলা হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আরো দুটো তলা ছিল।

আমরা ছিলুম চারজন বাঙালী। তাদের মধ্যে দুজন স্ত্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন কৌতূহলপরবশ হয়ে। আমি এবং অবিবাহিত বিষ্টুচরণ—আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা করে ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল। ঘরের দরজাগুলো গরমে ফেটে চৌচির—সার্সি একটিও নেই। মাছির ভয়ে সব দরজাতেই চিক্ ঝুলছে। ঘরের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্য কিছু আসবাবপত্র কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। একটি নেয়ারের খাট, একটি টেবিল—টেবিলটি ঢকঢক করছে, আর একটি চেয়ার—তার চারটি পায়াই অসমান—মানে চেয়ারে বসলে নাগরদোলায় বসবার কাজ হয়। টেবিলের ওপরে খানকয়েক বই—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী তর্জমা, একখানি শেলির কবিতার বই—বইগুলি রোদের আঁচ লেগে লেগে শুকিয়ে এমন অবস্থায় পেঁছেছে যে, সেগুলিকে আর বন্ধ করা যায় না। একটা আলনাও ছিল—সেটিও ঘরের অন্যান্য আসবাবের সামিল।

অসংখ্য ঘর! তারি মধ্যে কয়েকটিকে কোনোরকমে থাকবার মতো অবস্থা করে আমাদের খাতির করা হয়েছে। কমোড-দেওয়া বাথরুমও আছে—কিন্তু কমোডে বসে একটু অসাবধান হলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এ ছাড়া রান্নাঘর খাওয়ার ঘর তো আছেই। আমাদের ঘরের লাগোয়া আর একখানি ঘরে একটি মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল—তার বাড়ি মালাবারে, বোম্বাই শহরে নয়।

বাংলা সে মেয়েটি মোটেই জানত না—মাতৃভাষা ছাড়া জানত এক ইংরেজী ভাষা। তার নাম দিয়েছিলুম আমরা শকুন্তলা। অবশ্য সে খ্রীষ্টান ছিল বলে তার একটা ইংরেজী নামও ছিল—মেবেল।

আমাদের অন্যদিকে একটি মারাঠী পরিবারের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের একটি মেয়ে ফিল্মে কাজ করবার জন্য এসেছিল। মেয়েটি যুবতী—তাকে একলা পাঠানো যায় না। কাজেই তার সঙ্গে বাড়ির আরো দুটো তিনটে যুবতী ও শিশু এসেছিল। এদের অভিভাবকরূপে এসেছিলেন দেশপাণ্ডে যাঁকে আমরা পণ্ডিতজী বলে ডাকতুম।

আমাদের ঘর দিয়ে তাদের ঘরে যাওয়া যেত না বা তাদের ঘর দিয়ে আমাদের ঘরে আসা যেত না। উভয় পক্ষের দরজাগুলিতে বিরাট সব ফাঁক থাকায় উভয় পক্ষেরই কার্যকলাপ ইচ্ছে করলেই দেখা যেত।

আমাদের ছবির গল্প ছিল আনারকলির জীবন। লাহোর শহরে আনারকলির নাম ঘরে ঘরে ফেরে। এই শহরেরই রাবী নদীর ধারে থামের সঙ্গে হাত-পা শেকলে বেঁধে তার চারদিকে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছিল। আনারকলির করুণ জীবন-কথা সর্বজনবিদিত। সিংহাসন পাওয়ার পরে সেলিম রাবী নদীর তীর থেকে তার দেহ শহরের মধ্যে নিয়ে এসে কবর দেয় এবং সুন্দর একটি সমাধি-মন্দিরও করে দেয়। তাকে ঠিক যেখানে পোঁতা হয়েছিল তার

ওপরেই শ্বেতমর্মরের কারুকার্যখচিত বেদী রেখে দেওয়া হয়। এই বেদীর গায়ে ফার্সী ভাষায় একটি কবিতা লেখা আছে যার মর্মার্থ—"এ আনারকলি! যদি আমি স্বপ্নেও একবার তোমার দেখা পাই তা হলে এই রাজ্য-সিংহাসন সব ত্যাগ করতে পারি। ইতি পাগল সেখু।"

সকলেই জানেন সেলিমের ডাকনাম ছিল সেখু বাবা। সেবারে আমরা গিয়ে দেখলুম সমাধি-মন্দিরের ভেতরে সরকারের কি একটা দপ্তর বসেছে এবং বেদীটা ঘরের এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের কাজ শুরু হলো ভোরবেলা। ভোর পাঁচটায় আমরা উঠতুম—তখনি বেশ খটখটে আলো হয়ে যেত এবং ছ-টার মধ্যে চড়চড়ে রোদ উঠে যেত। যতক্ষণ রোদ থাকবে ততক্ষণ কাজ করা যাবে এইজন্যে সেই ভোরবেলা চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তুম শহর থেকে দূরে আগে থাকতে ঠিক করা কোনো জায়গায়। লোকালয় থেকে দূরে গেলেও সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছে এই সন্ধান পেয়ে দলে দলে লোক সেইখানে এসে জুটত।

আমাদের শেঠ ছিল ধনীর সন্তান—বন্ধু-বান্ধব হিন্দু-মুসলমান তার অনেক ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাজ মনে করে আমাদের সাহায্যে লেগে যেত। এই ছবি তোলার কথা সবিস্তারে বলতে গেলে লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাবে—তবে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

লাহোরের বাইরে রাবী নদীর পুল পেরিয়ে এপারে সরকারের তৈরি তালকুঞ্জ আছে। এক এক জায়গায় কয়েকটি করে তালগাছ আর তার পাশ দিয়ে চমৎকার রাস্তা। জায়গাটার নামই ছিল পামগ্রোভ। এইখানে আমাদের প্রায়ই কাজ হতো। একদিন—সেদিন অনেক লোক নিয়ে কাজ—গুটিকতক মেয়েকেও নিয়ে আসা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে সময় ভদ্রঘরের মেয়েরা সিনেমার দিকে ঘেঁষতও না—এই সব লোক এবং মেয়েদের আনবার জন্যে আলাদা একটি বাস ভাড়া করা হয়েছিল এবং বাসটিকে রাস্তা থেকে ঘাস-জমিতে নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল। সিনেমার ছবি তোলা হবে শুনে আমাদের আগে থাকতেই দলে দলে দর্শক সেখানে উপস্থিত হতে লাগল। ঐ গরম ও রোদ উপেক্ষা করে তারা কয়েক মাইল পথ হেঁটে আসত। আমাদের পান করবার জন্যে আগে থাকতেই সেখানে জলের ব্যবস্থা করে রাখা হতো, কিন্তু বাইরের এই রবাহুতেরা এসে আগেই সেই জলটুকু শেষ করে ফেলত।

সেদিনও এই রকম চলেছে—কাজ তখনো আরম্ভ হয়নি—আরম্ভের আগেকার ব্যবস্থা চলেছে—এমন সময় দর্শকদের মধ্যে দু-তিনটি ছেলে ফাঁকা বাসে চড়ে, ড্রাইভারের সিটে বসে কি সব খটাখট নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ গাড়িটা চলতে আরম্ভ করলে।

সরে যাও, সরে যাও, এক এক দল লোক এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐরকম নিরুদ্দেশ গাড়ি চলতে দেখে যে যার ছুটকে পড়তে লাগল। মেয়েরা এক

জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিল, গাড়িটা তাদের সামনে এসে পড়ায় তারা দৌড়ে দুপাশে সরে গেল ; কিন্তু একটি পালাতে পারলে না। আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম—হায় ! হায় ! কী হলো—

মেয়েটি কিন্তু অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে টপ করে বাম্পারে বসে পড়ল। গাড়িও চলেছে উদ্দেশ্যবিহীন—সিধে একটা তালকুঞ্জের দিকে, সেখানে গিয়ে ধাক্কা লাগলে মেয়েটি তো পিষে যাবে এমনই অবস্থা। ইতিমধ্যে ড্রাইভার কোথা থেকে দৌড়ে এসে টপ করে উঠে গাড়িটা থামিয়ে ফেললে। অন্য সব মেয়েরা ছুটে গিয়ে সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে এলো।

দেখলুম সে হোহো করে হাসছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি ?

সে বললে—ফুল।

ফুলেরই মতো সুন্দর দেখতে সে। টকটকে রাঙা মুখ, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড মেখে মাথার খানিকটা জায়গা রুপোলি করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বললুম—ফুল, আজকে তোমার ফাঁড়া গেল। আর একটু হলেই মারা যেতে।

ফুল বললে—সে যে অনেক ভালো হতো বাবুজি !

সেদিনে ফুলের কথাটা আমার মনে লাগল। সেদিনে এবং তার পরেও আরো কয়েকদিন তার কথাটা আমার মনের মধ্যে গুনগুন করতে লাগল। তারপরে তাকে ভুলে গেলুম।

তার পনেরো বছর পরে একদিন বোম্বাইয়ের রাস্তায় ফুলের সঙ্গে দেখা। সে-ই এগিয়ে এসে নমস্কার করে আমায় বললে, বাবুজি, আমায় চিনতে পারছ ? আমি ফুল।

দেখলুম সে দেহে একটুখানি মোটা হয়েছে, রঙটাও আরো ফর্সা হয়েছে। প্রথমে তাকে যা দেখেছিলুম তার থেকে ভালোই মনে হলো।

বললুম—তুমি ফুল, তোমাকে যখন প্রথম দেখেছিলুম তখন তুমি প্রায় কুঁড়ি অবস্থায় ছিলে। তারপর এখন বেশ প্রস্ফুটিত হয়েছ দেখতে পাচ্ছি। তারপর, তুমি এখানে এলে কি করে ?

ফুল বললে—আমার বাবু নিয়ে এসেছে, এখানে প্রায় বছর খানেক এসেছি।

বললুম—এখন আশা করি আর মরতে চাও না ?

সে বললে—চাই বাবুজি, এক্ষুনি যদি মরণ আসে আমি বারণ করব না।

বললুম—কেন ? তোমাকে দেখে তো বেশ মনে হচ্ছে, তুমি বেশ সুখেই আছ !

—সুখে আছি, কিন্তু দুঃখ আসতে কতক্ষণ ! এই জোয়ানি চলে গেলে

কি করব বাবু? তার চেয়ে এখুনি মরা ভালো নয় কি?

আমি বললুম—ভগবানের ওপর নির্ভর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বললে—বাবুজি, আপনাকে আমি অনেক কথা বলতে চাই। আপনার বাড়িতে একবার আসব?

আমি বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার যখন ইচ্ছে আসতে পার। সে আমার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আর আসেনি।

সমস্ত দিন অনাহার ও রৌদ্রদগ্ধ হয়ে আমরা সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে আসতুম। প্রথমেই তো কাপড়-চোপড় ছেড়ে আধঘণ্টা শুতুম; তারপরে ক্লান্তি অপনোদনের পানীয় কিঞ্চিৎ সেবন করে স্নান করতে যাওয়া হতো। স্নান সেরে আড্ডায় বসতুম, সেখানে সামান্য জলযোগ চলত। ইতিমধ্যে আমাদের শেঠ যমুনাপ্রসাদ এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধব কয়েকজন এসে উপস্থিত হতেন। কাল কি কি কাজ আছে তার একটা ফিরিস্তি তৈরি হতো। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাও চলত, পান-ভোজনও কিছু কিছু চলত। রাত্রি প্রায় ন-টার সময় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তাঁরা যে যার বাড়ি চলে যেতেন।

আগেই বলেছি যমুনাপ্রসাদের অনেকগুলি বন্ধু আমাদের নানা কাজে সাহায্য করতেন বিনা স্বার্থে। এঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেখুপুরার রাজা সাহেব। যমুনাপ্রসাদের বন্ধুদের সঙ্গে দুদিনেই আমাদেরও পরম বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

অবাঙালীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে আমি ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত। আমার অন্য বন্ধু দুজনও তাই। কিন্তু বিষ্টুচরণ ঠিক আমাদের মতো মিশতে পারত না। সেই জন্যে কাজ থেকে ফিরে এসে সে চানটান করে ছাদের ওপর গিয়ে শুয়ে থাকত।

এই সব নতুন বন্ধুর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান অনেকেই পরে আমাদের পরম বন্ধুরূপে গণিত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যের পর অনেকদিন কেউ কেউ আমাদের তাঁদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতেন। সেখানে রাত্রে আহার ও হৈ-হুল্লোড় করে আমরা বাসস্থানে ফিরে আসতুম। অনেক সময় আমাদের এখানেই খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হতো। আমাদের দুই বন্ধুপত্নীর মধ্যে একজন ছিলেন রন্ধননিপুণা, তাঁর রান্না এঁরা খুবই ভালোবাসতেন। মুসলমান বন্ধুরা মাছ পছন্দ করতেন না, কিন্তু এঁর রান্না অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেতেন।

মাঝে মাঝে আমাদের শহর ছেড়ে বার-চোদ্দ মাইল দূরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠে কাজ করতে হতো। এক একদিন সব সময়ে রোদ্দুর পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে বড় বড় মেঘের খণ্ড সূর্যকে ঢেকে ফেলত। তাতে আলো হয়ে পড়ত ঘোলা। ছবি ভালো উঠবে না বলে আমাদের ক্যামেরাম্যান যোশী

কাজ বন্ধ করে দিত।

যোশী মহারাষ্ট্রীয় দেশস্থ ব্রাহ্মণ। তার রঙ কালো আবলুষ কাঠের চেয়েও কালো। মাথার চুল ধবধবে সাদা, খুব মোটা একজোড়া ভ্রূ গোঁফের মতো—তাও সাদা ধবধব করছে, চোখের পাতার লোমগুলো সব সাদা—এমনকি গায়ের রোঁয়াগুলো সব সাদা। সর্বদাই তার শরীর খারাপ। আজ ছ-বছর ধরে দুবেলাই দই-ভাত খায়। এর পনেরো বছর বাদে কোলাপুরে যোশীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছিলুম—তখনো সে দই-ভাত খেয়ে চলেছে।

যোশীর ভারি তিরিক্ষি মেজাজ। একবার যদি বলে এ আলোতে আমি ছবি তুলব না তাহলে তাকে দিয়ে আর কাজ করানো সম্ভব ছিল না। সূর্যের ওপর মেঘের আবরণ পড়লে আমাদের শেঠ যমুনাপ্রসাদ গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়তেন।

প্রতিদিন তাঁকে বাবার কাছে হিসেব দিতে হতো—কত ফুট কাজ হয়েছে। যমুনার বাবা ছিলেন মস্ত উকিল। গরমের চোটে লোক মরে যাচ্ছে, রোদের চোটে কাঠ ফাটছে—সেখানে রোদের অভাবে ছবি তোলা হয়নি একথা তিনি বিশ্বাসই করতে চাইতেন না।

যমুনাপ্রসাদ গালে হাত দিয়ে হতাশ হয়ে আকাশের দিকে চাইত আর আমাদের জিজ্ঞাসা করত—আরে ভাই, আচ্ছা বলতো ঐ মেঘটা সরতে কতক্ষণ লাগবে। একটুখানি খোলা রোদের আভাস পেলে যমুনা ব্রাক্ করে লাফ দিয়ে উঠে বলত—আরিয়া—আরিয়া—অর্থাৎ কিনা "আ রহা হ্যায়।" কিন্তু তখুনি হয়তো আবার আর একটা মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেললে—আর অবাক হয়ে যমুনাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল।

একদিন এই রকম চলেছে—যমুনাপ্রসাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা কতক্ষণে রোদ খুলবে বলতো!

আমি বললুম—শেঠ, এক কাজ করুন—এক্ষুনি মেঘ সরে যাবে। এক ডজন বীর (বিয়ার) আর এক বোতল হুইস্কি মানত করুন!

যমুনাপ্রসাদ চোখ বড় বড় করে বললে—সত্যি বলছ?

বললুম—করেই দেখুন না!

যমুনাপ্রসাদ বললে—কুছ পরোয়া নেই। তারপর আকাশের দিকে হাত জোড় করে আবার বললে—হে মেঘ, তুমি আর সূর্যকে ঢেকো না, তোমাকে এক ডজন বিয়ার ও এক বোতল হুইস্কি দেবো।

আশ্চর্যের বিষয় মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মেঘ সরে গেল ও পুরোদমে আমাদের কাজ শুরু হোলো। বলা বাহুল্য, যমুনা তার মানত রক্ষা করেছিল।

আর একদিনের কথা। আমাদের ছবির যিনি নায়িকা তিনি ছিলেন একটি ফিরিঙ্গি মহিলা। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই জানাশোনা

ছিল—এমন কি বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারা যায়।

একবার একটি থিয়েটার কোম্পানী নিয়ে ভারতবর্ষে পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলুম। এরা তিন বোন ও মা আমাদের সঙ্গে ছিল। পুণাতে গিয়ে আমরা প্রায় সকলেই দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। তখন তারা অক্লান্ত সেবা করে আমাদের সুস্থ করে তুলেছিল। আর একবার নিদারুণ অর্থ-সংকটে পড়ে আমরা প্রায় অনশনের সম্মুখীন হয়েছিলুম। এই রকম সুখ-দুঃখের দিন একসঙ্গে কাটিয়ে তারা আমাদের বন্ধুই হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন আমাদের কাজ হচ্ছিল—সরিফুন্নিসা (তখনও সে আনারকলি হয়নি) পারস্য না আফগানিস্থান—কোথা থেকে ভারতবর্ষে আসছে। এক জায়গায় রক্ষীদল একটু পিছিয়ে পড়েছে—এমন সময় মরুভূমির কুখ্যাত দস্যু কোহ্-ই-দমন ঘোড়ায় চড়ে এসে সরিফুনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে রক্ষীদল এসে কোহ্-ই-দমনকে গুলী করে মেরে ফেললে।

এখন গতকাল ছিল রবিবার। সেদিনে সমস্ত দোকান বন্ধ। বাজারে কোনো জায়গায় ফাঁকা কার্তুজ পাওয়া গেল না। সর্বকর্মে উৎসাহী শেখুপুরা বললে—কুছ পরোয়া নেই, আমাদের বাড়িতে যে সব কার্তুজ আছে তার থেকে গুলী ছররা ইত্যাদি বার করে নিয়ে ক্যাপটা রেখে দিলেই তাতে আওয়াজ হবে। এই রকমই আটটা-দশটা কার্তুজ খালি করে সে তাদের চার-পাঁচজন সেপাইকেও নিয়ে এল অভিনয় করবার জন্যে।

আমি একটু দূরে বসে ছবির বিবরণ লিখছিলুম, এমন সময় আমাদের নায়িকার মা আমার পাশে এসে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখ তোমরা যে ঐ গুলী ছুঁড়বে—সেগুলো যথার্থ ফাঁকা তো!

বললুম—নিশ্চয়ই। তা না হলে আপনাদের মেয়েকে বুলেট মেরে আমাদের কি লাভ?

অভিনয় আরম্ভ হলো। আনারকলি কয়েকজন লোকের সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। রক্ষীদল পেছিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে কোহ্-ই-দমন কয়েকজন লোক সঙ্গে করে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করল। আনারকলিকে টেনে নিয়ে তারা তাকে ঘোড়ার ওপর তোলবার ব্যবস্থা করছে এমন সময়ে রক্ষীদল এসে গুলী চালালে। একটা-দুটো গুলী চলতেই আমাদের নায়িকা আকাশের দিকে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠল—

O, mummy, I am hurt।

এক ঝলক দৃষ্টির দহনে আমাকে প্রায় ভস্ম করে দিয়ে মাম্মি তো চীৎকার করতে করতে মেয়ের দিকে ছুটলেন। মেয়ে তো তখন অজ্ঞান। হায় কি হলো—হায় কি হলো—করতে করতে সবাই সেদিকে ছুটলো।

হাসপাতাল—হাসপাতাল—গাড়ি—ইত্যাদি চীৎকার করতে করতে লোকজন একখানি যা গাড়ি ছিল—কারণ সে সময় সব গাড়ি গিয়েছে খাবার আনতে—

তাতেই উঠে মা আর তিন বোন কাঁদতে কাঁদতে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে হাসপাতালের দিকে ছুটলো। আমাদের বিষ্টুচরণ তাদের সঙ্গে গেল।

ব্যাপার দেখে মাঠশুদ্ধ লোক হতভম্ব। যমুনাপ্রসাদ ও শেখুপুরোর মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি। শেখুপুরো বেচারী বন্ধুর সাহায্য করতে সেই ভোর পাঁচটা থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করত। তারই যে এই পরিণাম হবে সে কল্পনাও করতে পারেনি।

সে বার বার বলতে লাগল—ভেইয়া, ভেইয়া—আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি ওগুলোর ভেতরে একটারও ছররা ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে শহর থেকে গাড়িতে আমাদের খাবার চলে এলো। কেউ খেলে—কেউ খেলে না! বেলা তিনটে নাগাদ আমরা আবার বাড়ির দিকে রওনা হলুম। কাজকর্মের শেষে রোজই আমরা সকলেই সর্দখানায় এসে বসতুম। সেখানে কিছুক্ষণ জটলা হতো—তারপর যে যার বাড়ির দিকে চলে যেতুম।

সেদিন ফটক পেরিয়ে গাড়ি প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকতেই দেখি বৈঠকখানার ঘরে আমাদের নায়িকা, তাঁর ভগ্নীরা এবং মাতুঃশ্রী বসে আছেন। নায়িকার পিঠে প্রকাণ্ড একটা ব্যাণ্ডেজ। মাতুঃশ্রী আমাকে দেখেই বললেন—দেখ, কি করেছ তোমরা?

অল্পক্ষণের মধ্যেই আরো অনেকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—হাসপাতালে গিয়েছিলে নাকি?

তিনি বললেন—হাসপাতালে গেলে এতক্ষণে তোমাদের সবার হাতে হাতকড়ি পড়ে যেত। পিঠে আঘাত লেগেছে—আমি নিজেই ব্যাণ্ডেজ করেছি।

ইনি নার্সের কাজ জানতেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—যমুনাপ্রসাদ কোথায়?

সে বেচারী ভয়ে পেছিয়ে ছিল। ডাক পড়তেই এগিয়ে এলো। যমুনাপ্রসাদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হতে লাগল। এক শেখুপুরো ছাড়া আমরা সকলেই সেখান থেকে চলে এলুম। সন্ধ্যে নাগাদ শুনলুম তারা খেসারতস্বরূপ হাজার টাকা নগদ আর এক মাসের ছুটি পেয়েছে।

আমাদের বিষ্টুচরণ খবর শুনে বললে—সব ব্যাপারটাই যোগসাজসে আগাগোড়া ঠিক করাই ছিল। আমি নিজে দেখেছি—কিসসু হয়নি। পিঠের একটা জায়গা একটুখানি লাল হয়ে রয়েছে। খুব সম্ভব ক্যাপ ছিঁড়ে এসে সেই কাগজ খানিকটা এসে লেগেছিল পিঠে।

যাই হোক, তারা তো সেই রাত্তিরেই ড্যাংড্যাং করে কলকাতায় চলে গেল।

আর আমরা লাহোর কেল্লার মধ্যে কাজ শুরু করলুম।

যমুনাপ্রসাদের অন্য এক বন্ধু এই কাজে খুবই উৎসাহী ছিল। সে ছিল বিরাট ধনীলোক—আমাদের শেখুপুরার চেয়েও অনেক—অনেক বেশি ধনী। সে প্রায়ই রাত্তিরে আমাদের খাবার নেমন্তন্ন করত। নেমন্তন্নর সংকেত ছিল—ভেইয়া—আজ গুলিকা রৌগনজুস।

বাস, আমরা বুঝে নিতুম ব্যাপার কি! সন্ধ্যের একটু পরেই পাঁচ ছ-জন তার ওখানে গিয়ে হাজির হতুম। খেতে বসবার আগেই জারবরস আকণ্ঠ পান করে খানিকটা হৈ-হুল্লোড় করে খেতে বসতুম। সত্যিই—তার ওখানে গুলির রৌগনজুস চমৎকার তৈরি হতো।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে তার প্রকাণ্ড মাস্টার বুইক বার করতো। তাতে আমরা পাঁচ-ছয়জন চড়তুম। চালক থাকত পাশে বসে আর সে নিজেই চালাত। ঘণ্টায় প্রায় সত্তর আশি মাইল বেগে গাড়ি ছুটে চলত। গ্রীষ্মের রাত্রে ঐ আহার্যের পর বড় আরামবোধ হতো। মনে হতো এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না—

শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটতো সেই শালামারবাগের দিকে, শহর থেকে প্রায় পাঁচ-ছ'মাইল দূরে একটা অন্ধকার জায়গায় এসে থামতো গাড়ি। অতঃপর খানিকটা অন্ধকার পথ চলে এক অন্ধকার উঁচু-নিচু বাড়ির মধ্যে দিয়ে একটু সরু গলিপথ—সেই পথ ধরে আরো খানিকটা চললে পাওয়া যেত একটি নতুন একতলা বাড়ি।

বাড়ির দরজায় এসে সে ঘা দিত। কিছুক্ষণ বাদেই একটি বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিত। তার পিছু পিছু আমরা একটা মাঝারি গোছের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হতুম।

বৃদ্ধা সতরঞ্চির ওপরে একটা ময়লা চাদর পেতে দিয়ে আমাদের বসতে বলতো। আমরা জুতোশুদ্ধই সেই সতরঞ্চিতে বসে পড়তুম। তার কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসতো আর একটি প্রৌঢ়া—ইজের কুর্তা পরা। প্রৌঢ়াকে দেখে মনে হতো এককালে সে সুন্দরীই ছিল। আমাদের সেলাম করে সে আমাদের সামনেই বসে পড়ত আর বন্ধুর সঙ্গে তার পাঞ্জাবী ভাষায় কথাবার্তা চলতো। এই কথাবার্তার একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারতুম না।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই প্রৌঢ়ার কাছে আমাদের রেখে বন্ধু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। প্রৌঢ়া উদুর্ ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপচারি করতো—আমাদের ছবির কথা, কলকাতার কথা, লাহোর কেমন লাগছে, পাঞ্জাব কেমন লাগছে—ইত্যাদি।

এরই মধ্যে বন্ধু দুটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরতো। একটির বয়স বছর কুড়ি-একুশ আর অন্যটির বয়স ষোলো-সতেরো। বড়টি ছিল অপূর্ব সুন্দরী; ছোটটি অত সুন্দর নয়। বড়র মুখখানা আজও মনের

মধ্যে ঝকঝক করে।

কি রকম সুন্দর সে ছিল—তার বর্ণনা দিতে আমি পারব না। নাক মুখ চোখ আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিয়ে সে সৌন্দর্যকে মেপে দেখানো যায় না। তারা এসে আমাদের সেলাম করে পানদানিটা টেনে নিয়ে পান সাজতে বসতো। এক এক খিলি করে আমাদের পান দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতো। আমাদের বন্ধু কোনো কোনোদিন বলতো—এদের সঙ্গেও আলাপ করো।

তখন তারা চোস্ত উর্দু ভাষায় আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতো। তারপরেই হতো গান। এক একজন দাঁড়িয়ে গান গাইতো—না সারেঙ্গী না তবলা অর্থাৎ কোনো সংগত থাকতো না। গান হতো পাঞ্জাবী গান—তার একবর্ণও আমরা বুঝতে পারতুম না।

তাদের পোশাকও ছিল বাহুল্যবর্জিত—একটা সাদা শালোয়ার, হাঁটু অবধি ঝুল কুর্তা আর একটা করে চাদর।

সন্ধ্যাবেলার জারকরস রৌগনজুসকে জীর্ণ করে কখন চলে গিয়েছে তা টের পেতুম না। রূপের নেশায় ভরপুর হয়ে বাড়িতে এসে শুয়ে পড়তুম।

আগেই বলেছি আমাদের বিষ্টুচরণ সেখানকার লোকজনের সঙ্গে তেমন মিশতে পারতো না। কাজকর্ম সারা হলেই দিন থাকতে থাকতেই সে বাড়িতে ফিরে আসতো। বাড়িতে ফিরে এসে চানটান করে ছাতে শুয়ে থাকতো।

আমার ঘরে ফার্ণিচার হিসেবে কর্তৃপক্ষ একটি ছোট টেবল-হারমোনিয়াম রেখেছিলেন। একদিন সেটাকে বাজাবার চেষ্টা করে দেখি দুই বেলোতে বিরাট বিরাট ছিদ্র—ক্যাঁ কোঁ থেকে ভোঁস ভোঁস আওয়াজই তার থেকে বেশি বেরোয়। একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়িতে ফিরে এসে দেখি দুই বন্ধুপত্নীর একজন প্রাণপণ চেষ্টায় সেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন আর অন্যজন চিল-চীৎকার করে গান গাইবার চেষ্টা করছেন। আর তাঁদেরই সামনে শকুন্তলা বসে সাশ্রুনয়নে সেই গান শুনছে।

আমরা আসতেই বান্ধবীরা তো গা-ঢাকা দিলেন। শকুন্তলা উঠে এসে আমাকে বললে—রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছিল। আহা—কি অপূর্ব সুর আর গান! কথা বুঝতে না পারলেও মনের মধ্যে ভাবের আবেগ এসে পড়ে!

শকুন্তলার চোখ দুটো দেখলুম অস্বাভাবিক লাল আর তাতে জল ডবডব করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

শকুন্তলা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—জানো, আজ আমরা একটা খুব ভালো জিনিস খেয়েছি। আমি এবার থেকে রোজ এই জিনিস খাবো। আমার কি মনে হচ্ছে জানো—

বললুম—না, কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে আমি যেন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি—আমি যেন স্বর্গে গিয়েছি—ওঃ, কি অদ্ভুত অনুভূতি! এতটা বয়স আমার বৃথাই গেল!

জিজ্ঞাসা করলুম—কি খেয়েছ বলতো ?

শকুন্তলা বললে—বাং—বাং। বিন্টু রোজ খায়। আমরা তাকে বলেছিলুম—আমাদের একদিন খাইও। তাই সে বেচারী আজ কষ্ট করে বাজার থেকে বাং নিয়ে এসেছিল।

এই বলেই শকুন্তলা তান ধরলো—ট্রা লা লা লা লা—

বললুম—শকুন্তলা, নিজ হিত যদি চাও তাহলে ঐ বাং-টাং না খেয়ে আমরাও সন্ধ্যেবেলা যা খাই তাই একটু করে খেয়ো—সেটা আরো ভালো জিনিস।

শকুন্তলা বললে—দূর দূর—nothing like বাং।

এই বলে সে একরকম নাচতে নাচতে চলে গেল বান্ধবীদের খোঁজে। আমিও ছুটলুম তার খোঁজে। বললুম—শকুন্তলে, যে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তুমি এতক্ষণ অশ্রুসজল মুখে আকাশে উড়ছিলে সেই রবীন্দ্রনাথ ঐ আমরা যা খাই সন্ধ্যেবেলায়—তার সম্বন্ধে কি বলেছেন জানো—

"শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান।"

তা তোমাকে আমি 'অপরিমাণ' খেতে বলছিনে, পরিমিতেই খেয়ো আমাদের সঙ্গে, দেখবে কত মজা পাবে—

শকুন্তলা কিন্তু শুনলে না। সে বলতে লাগল—আমি বাংই খাবো।

যাই হোক, সেদিন তো কেটে গেল। পরের দিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরে শকুন্তলা একলা সেই ভাঙ্গা হারমোনিয়াম বাজাবার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখেই সে উৎসাহিত হয়ে বললে—জানো, আজকে আমরা কালকের ডবল ডোজ বাং খেয়েছি। ওঃ—আজ যা মনে হচ্ছে—

মন-মেজাজ বিশেষ ভালো ছিল না। তার কথা শেষ হবার আগেই বললুম—একটু বাইরে যাও দিকিনি—কাপড়চোপড় ছাড়বো।

শকুন্তলা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

সেদিন আর আমরা বাইরে কোথাও যাইনি। ছাতের এককোণে আমরা তিনজনে বসে গল্পগুজব করছি—কি একটা কাজে নিচে নেমে দেখি—শকুন্তলা সেখানকার খোলা ছাদে একটা তক্তায় বসে আছে আর এক বন্ধুপত্নী তার মাথায় জলের চাপড়া দিচ্ছে—অন্য বন্ধুপত্নী তাকে বাতাস করছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে শকুন্তলা ছুটে এসে বললে—আমাকে বাঁচাও। আমি মরে গেলুম। আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে।

আমি বললুম—কেমন। 'বাং' খাও—'বাং' ?

শকুন্তলা বললে—ওসব কথা ছেড়ে দাও—আমাকে বাঁচাও !

তাকে ধরে নিয়ে খাটে বসিয়ে দিলুম। বললুম—শুয়ে পড় !

সে বললে—শুতে পারছিনি, শুলে আরও বাড়ছে। তুমি আমার বাবাকে

টেলিগ্রাম করে দাও। ও বাবা! তুমি কোথায়!

বান্ধবীরা ইতিমধ্যেই বরফ আনতে দিয়েছিল। তখুনি বরফ এসে হাজির হলো। তাকে শুইয়ে দিয়ে একজন তার মাথায় বরফ ঘসতে লাগল। আর একজন বাতাস করতে লাগল। শকুন্তলা সমানে চীৎকার করে যেতে লাগল —ও বাবা! তুমি কোথায়।

ঘণ্টাখানেক পরে একটু শান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ব্যাপার দেখে বিষ্টুচরণেরও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক ডাক্তার ডাকতে হয়নি। সে যাত্রা শকুন্তলা এমনিতেই সেরে উঠল। তবে আমার বিশ্বাস "বাং" সে জীবনে আর খায়নি।

আমরা লাহোর কেল্লা ও শালামারবাগের কাজ আরম্ভ করলুম। লাহোর কেল্লার শিষমহল যেমন সুন্দর তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও তেমনি। শিষমহলের ওপরেই পাথরের ট্যাবলেট মারা। এইখানেই রঞ্জিৎ সিংয়ের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি হয়েছিল। এই কেল্লাতেই রঞ্জিৎ সিংকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কেল্লার একদিকের বাড়িতে ছোট ছোট ঘর—ঘরের মধ্যে খিলেনের গোলক ধাঁধা। একদিকে একটা ঝরোকা, তারই ভেতর দিয়ে একটু আলো আসে। আমি ভাবতুম এইসব ঘরে কারা থাকত! মন চলে যেত সেই জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে অতীতের কোন্ সুদূরে। এইখানে যারা থাকতো তাদের সুখদুঃখের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতুম। কে জানে সেলিম এই ঘরে বাস করত কি না।

কোনো কোনো দিন আমাদের কাজ হতো শালামারবাগে। তিনতলা উদ্যান, অসংখ্য ফোয়ারা ও একটি আবসার অর্থাৎ শিলকোটার মতো খাঁজ কাটা কাটা একটি চওড়া পাথর—তারই গা দিয়ে জল ছাড়া হতো।

এই জলছাড়া অবস্থায় শালামারবাগকে খুব কম লোকেই দেখেছে। আমাদের শেঠেরা পয়সা খরচ করে এই জলছাড়ার ব্যবস্থা করতেন ভালো ছবির জন্য। আবসারের গা দিয়ে যখন জল ঝরতো তখন মনে হতো যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে!

চৈত্র মাসের শেষে আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলুম—দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এসে পেঁছিলুম। আকাশে মেঘের দল ভীড় করতে লাগল। লাহোরের পরে আমাদের দিল্লী যেতে হবে—সেখানে মাস দুয়েকের মতো কাজ ছিল।

ক্রমে লাহোর ছাড়বার সময় উপস্থিত হলো। তিন চারটি বন্ধু আমাদের সঙ্গেই দিল্লী চললেন। আর একজন যেতে পেলে না, কারণ তাকে লাহোর ছাড়তে হলে সরকারের অনুমতিপত্র নিতে হতো। সে সময়মতো দরখাস্তও করেছিল কিন্তু সরকার অনুমতি দিলেন না। বিদায়ের সময় সেই বন্ধু আমাদের হাত ধ'রে কাঁদতে লাগলো।

এবারকার এই শহরে আমাদের অবস্থানকালে আমরা কয়েকটি বন্ধুর

লাভ করেছিলুম—তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। এদের সঙ্গ লাভের লোভে বারে বারে নানান ছুতোয় পাঞ্জাবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আগের মতোই নিবিড় সঙ্গলাভ করে মুগ্ধও হয়েছি। তারাও এখানে অনেকবার এসেছে। আনন্দে আমাদের দিনগুলি কেটে গেছে। এদের মধ্যে কবি ছিল, সম্পাদক ছিল, তাছাড়া আরো নানান ব্যবসায়ের লোক ছিল। বিদায়ের সময় নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছি। তখনো বুঝতে পারিনি আমাদের সেই আলিঙ্গনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচিত হচ্ছে। দেশ বিভাগের পর মুসলমান বন্ধুদের কোনো খবরই আর পাইনি। হিন্দু বন্ধুদেরও অধিকাংশেরই খবর পাইনি। দু-একজনের কথা শুনেছি —তারা ছন্নছাড়ার মতো জীবন কাটাচ্ছে।

মহারানী

চাঁদুকাকার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক কিছু ছিল না—পাড়াতুতো সম্বন্ধ। কিন্তু সেকালের পাড়াতুতো সম্পর্কের বন্ধন একালের রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে বেশী পোক্ত ছিল। সেই সম্পর্কের জোরে আমাদের অর্থাৎ পাড়ার ছেলেদের চাঁদুকাকাদের অন্তঃপুর অবধি গতিবিধি ছিল, যেখানে সূর্যালোককেও সন্তর্পণে ও ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করতে হতো।

চাঁদুকাকারা ছিলেন সে যুগের বড় লোক, অধিকাংশ ঘরেই আলো জ্বলতো না। বড় বড় ঘরে খেরোয় মোড়া বড় বড় ঝাড় ঝুলতো, পালা-পার্বণে সেগুলো জ্বলতো। সাধারণতঃ বাবুদের পোশাক আব চাকরদের পোশাক ছিল প্রায়শঃ সমান। ওরি মধ্যে বাবুরা কোচান ধুতি পরতেন—কোথাও নেমন্তন্নে তাঁদের পোশাকের বাহার খুলতো। বাড়িতে লোকের মধ্যে চাঁদুকাকা, তাঁর বাবা মা ঠাকুরমা, তিন-চারটি দূর সম্পর্কীয় বিধবা পিসি, মাসি, এক পাল ঝি ও চাকর আর আমাদের কাকিমা অর্থাৎ চাঁদুকাকার স্ত্রী।

শুনেছিলাম কাকিমার যখন নয় বছর বয়স সেই সময় তাঁর বিয়ে হয়েছিল। জমিদারের সুন্দরী মেয়ে অথচ মাথায় তেমন চুল নেই—ছেলেবেলা থেকে কতবার যে মাথা কামানো হয়েছে তার ঠিকানা নেই। এই মাথা কামানো অবস্থাতেই চাঁদুকাকার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়। মেয়েটি এতই সুলক্ষণা ছিল যে পাছে ফসকে হস্তান্তর হয়ে যায় সেই ভয়ে চাঁদুকাকার বাবা সেই মাথা কামানো অবস্থাতেই তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে নেড়া মাথায় ঘোমটা দেওয়া সিঁদুর-পরা পুত্রবধূ ঘরে নিয়ে এসেছিলেন—বলা বাহুল্য বিস্তর জমি-জায়গা ও ধন-সম্পত্তিও কাকীমার অনুসরণ করেছিল।

চাঁদুকাকার মা পুত্রবধূর মুখ দেখে সুখীই হলেন, বধূমাতার পিতা প্রদত্ত

দান ইত্যাদি দেখে আরো সুখী হলেন কিন্তু বৌ-এর নেড়া মাথা দেখে একেবারে বসে পড়লেন।

একালের পুরুষেরা মাথার চুলের যত্ন করে বেশী কিন্তু সেকালের মেয়েরা মাথার চুল বাড়াবার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত হতো। বাড়ির মেয়েদের কিংবা বৌদের মাথায় চুল নেই দেখলে শ্বশুর কিংবা মায়েরা প্রমাদ গুণতেন। তাই আমাদের নেড়ী কাকিমার মাথায় তাঁর শাশুড়ী ঠাকরুণ যে কত রকমের শেকড় পাতা বেটে লাগাতেন তার হিসেব সে কালের পিসিমায়েরাই রাখতেন—একালের গিন্নী-মাদের তা জানা থাকলে মেয়েদের মধ্যে বব্ ছাঁটের প্রাদুর্ভাব অন্ততঃ বাংলা দেশে হতো না।

কাকিমার নেড়া মাথায় ওষুধ লাগিয়ে কয়েক ইঞ্চি চুল বাড়তে না বাড়তে দু-বেলা প্রাণপণে টেনে চুল বাঁধা শুরু হলো। কিন্তু হায়, এত সত্ত্বেও ঘাড়ের দু-ইঞ্চি নীচে নেমে চুলের বৃদ্ধি কমে গেল। চুল কম থাকা-রূপ শারীরিক এই বৈকল্যকে তিনি ঘোমটায় এমন চাপা দিয়ে রাখতেন যে ছেলেবেলা থেকে তাঁকে যারা জানতো তাঁরা ছাড়া তাঁর এই দৌর্বল্য কেউ টের পেত না।

কাকীমার বয়স কতো হলো—মনে রাখবেন, আমরা সে কালের কথা বলছি—কাকীমার বয়স হলো—চোদ্দ, পনের, ষোল—ওমা, এখনো বৌ-এর ছেলে-পিলে কিছু হলো না! চড়াও মাদুলী, চড়াও শিন্নি, তাবিজ-তকমা, পুজো, মানস, স্বস্ত্যয়ন—দেবতা কিছুতেই সুখী হন না। চাঁদুকাকার বাপ মা মনে করলেন, তবে কি আমাদের ছেলের আবার বিয়ে দিতে হবে নাকি গো!

সম্পর্কীয়া আর নিঃসম্পর্কীয়া সকলেই বলাবলি করে, চাঁদুর বৌয়ের ছেলেপিলে হলো না বোধ হয়—আবার নূতন বৌ আনতে হবে। কেউ বা কথাটা শুনে মুখ গম্ভীর করে, কেউ বা বলে—এ আর নূতন কথা কি? বেটা ছেলে যত খুসী বিয়ে করতে পারে—তবে বার-মুখো না হলেই হলো। চাঁদুর পিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহদের কত বৌ ছিল তা আঙুলে গোনা যায় না।

কাকীমার কানে কথাটা গেল—বৌ মানুষ তিনি, কাউকে কোন কথা বলতে পারতেন না। উদ্বেগে কিন্তু রাতে ঘুম হয় না! স্বামীর আবার বিয়ে হবে শুনলে সেকালের বৌদের মনে কি ভাব হতো তা একালের মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারবে না। দারিগুটিকার দানকে যেমন সহজ ভাবে নেওয়া হয়, সতীনকে সে সময়ের মেয়েরা অনেকটা সেইভাবেই দেখতো। সতীন যদি দজ্জাল না হয়ে ভাল মানুষ হতো তা হলে অনেক ক্ষেত্রে বরণীয়াই হতো।

যাই হোক, সতীন আসবে শুনে কাকীমা গোপনে কাঁদেন, নিজের দুঃখ কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন না—সে যে বড় লজ্জার কথা।

চাঁদুকাকার বাবা তখনো বেঁচে, কাজেই দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁর মতের কোনো স্থানই নেই। তবুও মাঝে মাঝে স্ত্রীর সুন্দর মুখখানা মানস পটে ফুটে ওঠে—ভাবেন, আমার আবার বিয়ের কথা শুনে তার কি মনে

হচ্ছে, তার মনে নিশ্চয় আনন্দ হচ্ছে না। আঃ তাকে দুঃখ দিতে প্রাণ চায় না, আবার বিয়ে করতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই কিন্তু কি করবো—মা চান, বাবা চান—পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ—তার উপরে জমিদার পিতা। হয়তো বা রেগে-মেগে ত্যাজ্য পুত্র করে দিতে পারেন। এ সময় স্ত্রী যদি তাকে প্রাণ খুলে অনুমতি দেয় তো সব দিক বজায় থাকে।

এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে চাঁদুকাকা দিন কাটাচ্ছেন। এমন সময় কাকীমা গায়ে পড়ে কথাটা পাড়লেন—হ্যাঁ গো, তুমি নাকি আবার বিয়ে করবে?

চাঁদুকাকা ছেলেবেলা থেকে স্ত্রী কণ্ঠ শুনে আসছেন—স্ত্রী জগৎলক্ষ্মীর বয়স নয় ও তাঁর বয়স চৌদ্দ—এতদিন স্ত্রীর কণ্ঠে এ সুর কখনো শোনেননি।

চাঁদুকাকা চমকে স্ত্রীর দিকে ফিরে দেখলেন দু-ফোঁটা অশ্রু তার দু-চোখে টলটল করছে। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চাঁদুকাকার হৃদয়ে এমন একটা তন্ত্রে গিয়ে আঘাত করলে যা একাল সেকাল সর্বকালব্যাপী মানুষের হৃদয় বীণায় বাঁধা আছে, ঠিকমতো ঘা দিতে পারলেই তা বেজে ওঠে। চাঁদুকাকা স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি পাগল হয়েছ, তোমায় ছেড়ে আমি আবার বিয়ে করবো?

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন লুকোবার জন্য জগৎলক্ষ্মী স্বামীর বুকে মাথা রাখলেন।

এদিকে আবার জামাই-এর বিয়ের কথা হচ্ছে শুনে জগৎলক্ষ্মীর মা-বাবা ব্যস্ত হয়ে বেয়াইকে চিঠি লিখলেন—দোহাই, এমন কাজ করবেন না। জগৎ-লক্ষ্মীর ছেলে-পুলে হওয়ার বয়স এই আরম্ভ হয়েছে মাত্র, শেষ হয়ে যায়নি। আরো কয়েকটা বছর দেখে যা বিহিত হয় করবেন।

বেয়াই-এর চিঠি পেয়ে ঈশানচন্দ্রের জমিদারী মেজাজ গরম হয়ে উঠলো—কি এতবড় স্পর্ধা? আমি কি করবো না করবো তার নির্দেশ আসবে ছেলের শ্বশুরের কাছ থেকে!

সঙ্গে সঙ্গে জমিদার গিন্নীও তর্জন করে উঠলেন—তাই তো কি আস্পর্ধা!

কর্তা গিন্নী পরামর্শ করে সেইদিনই পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলেন—চারদিক থেকে ঘটক ঘটকী আসতে লাগলো আরো মেয়ের সন্ধান নিয়ে।

কর্তা নিজে যান, গিন্নী নিজে যান মেয়ে দেখতে—জমিদার পুত্রের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ হবে, মেয়ে ডানাকাটা পরী হওয়া চাই—এবার আর গিন্নী টাকার মোহে ভুলছেন না, মেয়ের মাথায় খুব চুল না থাকলে কিছুতেই চলবে না।

শেষকালে অনেক খুঁজে পেতে, অনেক সন্ধানের পর মনের মতো মেয়ে পাওয়া গেল। এ যে একেবারে ডানাকাটা পরী, আর চুল যা—এলো করে দিলে আকাশ ভরে যায়। কিন্তু মেয়ে গরীবের, তা বাপু, দিতে থুতে পারবে না।

ঈশানচন্দ্র বললেন—কুচ পরোয়া নেই, মেয়ে যখন আমার পছন্দ হয়েছে তখন দেওয়া থোওয়ার কথা আর তুলো না!

দু-পক্ষের কথা চালাচালি ইত্যাদি হতে লাগলো। আশীর্বাদ করবার শুভদিন ঠিক হয়ে গেল। সব ঠিক, কিন্তু শুভদিনের সুপ্রভাতে দেখতে পাওয়া গেল যে চাঁদুকাকা কোথায় ভাগলবো হয়েছেন। ছেলে কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ—পুকুর বাগান, বন্ধু- বান্ধদের বাড়ি সব ছেঁকে ফেলা হলো কিন্তু কোথাও চাঁদুকাকার সন্ধান মিলল না। মেয়ের বাড়ির লোকেরা আশীর্বাদ করতে এসে ফিরে গেল। ঈশানচন্দ্রের বেইজ্জতের আর সীমা নেই। দুঃখে রাগে অপমানে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

দিন দুই বাদে চাঁদুকাকার চিঠি গেল। তিনি শ্বশুরবাড়ির থেকে লিখেছেন, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করবার ইচ্ছা তাঁর নেই।

ছেলের চিঠি পেয়ে ঈশানচন্দ্র একেবারে ফেটে পড়লেন। তিনি তখনই ঘোষণা করলেন যে, ছেলেকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন, এবং যে মেয়েকে তাঁর ছেলের জন্য দেখা হয়েছিল সেই মেয়েকে নিজে বিয়ে করবেন। এখনো তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স হয়নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কন্যাপক্ষ তাতেই রাজি—তারা জমিদার জামাই চায়, তাতে ছেলেই হোক আর বাপই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না। বৈঠকখানায় খুব হৈ-চৈ চলতে লাগল। একদল তাঁকে উৎসাহ দেয়, একদল চুপ করে থাকে, কিন্তু জোর করে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। কথাটা গড়াতে গড়াতে ক্রমে গিন্নীর কানে যেতে বিলম্ব হলো না। স্বামীও তাকে জানালেন এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ করা ছাড়া তিনি আর গত্যন্তর দেখতে পারছেন না—স্বপক্ষে দু দশটা নজিরও দেখিয়ে দিলেন।

ছেলের দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্য ঈশান গিন্নী বেশী উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূকে আঘাত করবার জন্য যে মুষল তোলা হয়েছিল, ঘটনাচক্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে আঘাত নিজের মাথার উপর উদ্যত দেখে ব্যাপারটার গভীরতা ও গাম্ভীর্য তিনি বেশ ভাল ভাবে অনুধাবন করলেন। স্ত্রীর অন্তরে আঘাত দিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে অস্বীকার করে তাঁর ছেলে পিতৃস্নেহ পিতার বিষয়কে অবহেলা করে চলে গেল—এবার এর মহত্ত্ব তাঁর কাছে পরিস্ফুট হলো। ছেলের প্রতি শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে তাঁর মন ভরে উঠলো। শুধু তাই নয়, এও বুঝতে তাঁর দেরী হলো না যে তাঁর পুত্রবধূ এই কয় বছরের মধ্যে তার স্বামীর হৃদয় এতখানি অধিকার করে বসেছে যা ত্রিশ বছরেও তিনি পারেননি। এই কথাটায় তাঁর নারীত্বের অভিমানে গিয়ে আঘাত লাগলো তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক স্বামীকে এই পাপ থেকে রক্ষা করবেন, নয়তো আত্মঘাতী হবেন।

যাই হোক, ঈশানচন্দ্রের দ্বিতীয়বার আর বিয়ে হলো না। কি করে

হলো না, কেন হলো না সে বৃত্তান্ত লিখতে গেলে গল্প উপন্যাসে গিয়ে দাঁড়াবে। জেনে রাখুন সে বিবাহ না করেই ঈশানচন্দ্র তীর্থযাত্রায় বেরুলেন। সংসারে দারুণ বিশৃঙ্খলা। যাবার আগে কর্মচারীদের জানিয়ে গেলেন, তাঁর ছেলে চন্দ্রমোহনের কোনো সংবাদ যেন তাঁকে না পাঠান হয়—এমন কি তার মৃত্যু হলেও নয়। পাছে এখানকার কোনো সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছায় এই জন্য তিনি প্রথমেই ছুটলেন দ্বারকায়—সেযুগে দ্বারকায় যাওয়া বড় চাট্টিখানি কথা ছিল না।

এদিকে চন্দ্রমোহন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় তাঁর শ্বশুর শাশুড়ী তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। চন্দ্রমোহনের চরিত্র গুণে জমিদার ভগবানচন্দ্র এমন বিগলিত হলেন যে, তিনি তখনই উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক জামাই-এর অর্ধেক মেয়ের নামে লিখে দিলেন। তারপর বছর খানেক যেতে না যেতে তিনি দৌহিত্রের মুখ দেখে ইহলীলা শেষ করলেন।

ঈশানচন্দ্র তখন রণছোড়জীর চরণে আত্মসমর্পণ করবার চেষ্টা করছেন। আরো বছর দুই যেতে না যেতে চন্দ্রমোহনের চাঁদের মতো একটি মেয়ে জন্মাল। দিদিমা আদর করে তার নাম দিলেন রানী—ঈশানচন্দ্র তখন কন্যাকুমারীর মন্দিরে।

পাঁচ সাত বছর তীর্থ করে ঈশানচন্দ্র কাশীধামে বাড়ি করে বসলেন। স্থির করলেন এইখানেই একটি মন্দির-প্রতিষ্ঠা করে দেবতার নামে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করবেন।

এই রকম ভাবে দিন চলেছে—ঈশানচন্দ্র ছেলের কোনো খবর তাঁর কাছে পাঠাতে মানা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খবরগুলোর চলে চলে বেড়াবার এমন একটা অদ্ভুত শক্তি আছে যে, শত বাধা সত্ত্বেও তারা যথাস্থানে পৌঁছে যায়। মন্দির করবার জন্য ঈশানচন্দ্র কাশীতে জমি জায়গা খরিদ করবার ব্যবস্থা করছেন এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন যে তাঁর অন্তরের দেবতারা অনেকদিন আগেই দেহ পরিগ্রহ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্যস, মন্দির বিগ্রহ সব শিকেয় উঠলো। সমস্ত রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে ঈশানচন্দ্র সস্ত্রীক ছুটলেন নাতি নাতনীকে দেখতে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বিধবা বেয়ানকে খুব কথা শোনালেন। রাগ করে না হয় তিনি একটা কথা মুখ থেকে বার করেই ফেলে ছিলেন, তা বলে কি তাঁদের কোনো আক্কেল নেই। নাতি নাতনী হবার খবরটা শ্রেফ চেপে যাবার মানেটা কি! ছেলে না হয় আমাদের অবাধ্য হয়েছে কিন্তু বৌমারও তো একটা বিবেচনা থাকা দরকার।

যাই হোক, ঈশানচন্দ্র নাতির চেয়ে নাতনীকে দেখেই মজলেন। তার দিদিমার দেওয়া নাম ছিল রানী; তিনি তার নাম দিলেন মহারানী। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ঈশানচন্দ্র তাঁর নতুন মহারানীকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন।

রানীর নাম মহারানী না হয়ে বিজয়িনী হওয়াই উচিত ছিল। বছর সাত তার বয়েস, মাথা ন্যাড়া, দুকানে মাকড়ি পরা। মহারানী এসেই পাড়ার শুধু সমবয়সী ছেলে মেয়েই নয় ছেলে বুড়োরও মন জয় করে ফেললো। ছেলেদের সঙ্গে সে খেলতো ডাংগুলী, মেয়েদের সঙ্গে পুতুল। পাড়ার সব বাড়িতে তার প্রতিদিন পদার্পণ করা চাই। ঠাকুরদার বুকের পাঁজর—ঠাকুরমার অঞ্চলের নিধি। তার পায়ের মলের আওয়াজে দিক্‌বিদিক প্রকম্পিত হতে লাগলো। তার চেহারা দেখা না গেলেও সে যে কোন বাড়িতে আছে তা তার মলের আওয়াজে টের পাওয়া যেত।

এমনি সমারোহের সঙ্গে মহারানী তার রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় পুজোর দিনের এক সকাল বেলায় পায়ে ফুটলো এক কাঁটা। কাঁটা ফুটেছে তো ফুটেছে—মহারানীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পরের দিন পা-টা ফুলে উঠলো, পায়ের টনটনানিও বেশ। মা ও ঠাকুরমা বললেন—আজ আর বাড়ি থেকে বেরুসনি মহারানী, শুয়ে থাক।

কিন্তু তাকে আটকে রাখার মতো ঘর কোথাও ছিল না—সে ঐ পায়েই নেংচে নেংচে বেড়াতে লাগলো।

সন্ধ্যে নাগাত কিন্তু সে শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিল। নুনের পুলটিস চলতে লাগলো সারারাত ধরে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সকাল বেলায় ঈশান চৌধুরী ডাক্তার দেখালেন—একটা, দুটো, তিনটে, শহরের বড় বড় চিকিৎসক এসে কিছু করতে পারলো না। সন্ধ্যে হবার পূর্বেই মহারানী অজ্ঞান হয়ে পড়লো—ঈশান চৌধুরী কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

চাঁদুকাকা সাহেব ডাক্তার ডাকলেন। তিনিও কিছু ভরসা দিতে পারলেন না। জমিদার ঈশান চৌধুরী, সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলেন—আমার মহারানীকে বাঁচিয়ে দাও।

তিনি সবাইকে শাসাতে লাগলেন মহারানীর কিছু হলে আমি কিন্তু বাঁচবো না, বলে দিচ্ছি—

কিন্তু সব শাসানি অগ্রাহ্য করে দেবতা তাকে ভোর রাত্রে টেনে নিয়ে গেলেন। সকাল বেলা ফুলসাজ-সজ্জিত হয়ে মহারানী চলে গেল তার বাড়ি ও পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলের হৃদয় জয় করে।

ঈশান চৌধুরী সত্যিই বলেছিলেন—তাঁকে আর রাখা গেল না। মহারানী চলে যাবার মাস খানেকের মধ্যেই তিনিও চলে গেলেন।

সকলে বলতে লাগলো—ঈশান চৌধুরী অদ্ভুত লোক ছিলেন। তিনি নাতির জন্য করলেন গৃহত্যাগ আর নাতনীর জন্য করলেন দেহত্যাগ।

রাজা দশরথ পুত্রের জন্য দেহত্যাগ করে অমর হয়ে আছেন, ঈশান চৌধুরী নাতনীর জন্য দেহত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইলেন!

সবাক চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-জগতের শুধু বিস্ময় নয়—বিপ্লবও উপস্থিত করলো। সে সময় বাংলাদেশে একমাত্র ম্যাডান কোম্পানি স্টুডিও করে নির্বাক ছবি করতো। তাছাড়া বাঙালীদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কখনো কখনো কয়েকজনে মিলে নির্বাক ছবিও করতেন বটে কিন্তু ছবি হিসাবে সেগুলো যাই হোক না কেন, ব্যবসা হিসাবে তাদের একটাও টেকতে পারেনি। সশব্দে সবাক ছবি উপস্থিত হতে বাংলাদেশে সত্যিকারের চলচ্চিত্রের ব্যবসা শুরু হয়। কিন্তু এখানে আমি সে সব কথা আলোচনা করছি না।

চলচ্চিত্রশিল্পের একটা বড় দিক অভিনেতা-সংগ্রহ। আমরা সে সময়ে অভিনেতা সংগ্রহ করতুম সাধারণতঃ রঙ্গমঞ্চ থেকে। রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতাকেই প্রায়ই নায়ক করা হতো। অভিনেত্রী অবশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা হতো না, তবে রঙ্গমঞ্চ যেখান থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করতো আমাদেরও অভিনেত্রী-সংগ্রহের চেষ্টা সেইখানেই করতে হতো। অভিনেত্রী-সংগ্রহ করবার জন্যে আমাদের লোক থাকত। তারা প্রতিদিন নানা জায়গা থেকে অনেক রকম মেয়ের সন্ধান এনে দিত; আর সন্ধ্যের পরে আমরা জনকয়েক মিলে দেখতে যেতুম। রাত্রি এগারোটা-বারোটা অবধি সেখানে ঘুরে বাড়ি ফিরতুম।

এই প্রসঙ্গে এই রকম কাজে লিপ্ত থাকাকালে কয়েকটি মেয়ের সম্পর্কে আসতে হয়েছিল। সে সব দিনের কথা মনে হওয়ায় অনেকগুলি মুখ মনশ্চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে; কিন্তু আপাততঃ তাদের অধিকাংশকেই বাদ দিতে হচ্ছে। আমি মাত্র চারটি মেয়ের কথা লিপিবদ্ধ করছি।

আগেই বলেছি মেয়েদের সন্ধান নিয়ে আসবার জন্য আমাদের লোক নিযুক্ত ছিল। একদিন একটি মেয়ের সন্ধান পেয়ে সেখানে আমরা তিন-চারজনে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

সবাক চিত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নতুন সমস্যা এসে জুটেছিল। এ পাড়ায় নায়িকার সন্ধান না পেলে ফিরিঙ্গি মেয়েদের জোগাড় করবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাদের দিয়ে বাঙালী মেয়ের ভূমিকা অভিনয় করানো ছিল কঠিন। মুখ-চোখ ও অঙ্গসৌষ্ঠব সাধারণতঃ তাদের ভালোই হতো কিন্তু তারা বাঙালী মেয়েদের ঢঙে চলতে পারত না। সবাক ছবিতে ফিরিঙ্গি মেয়েদের কাজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু ঠোঁট নাড়লেই চলবে না—কথাও বলতে হবে। শুধু কথা নয়, কণ্ঠস্বরটি মিষ্ট হওয়াও দরকার। আর গান গাইতে পারলে তো কথাই নেই; কেননা তখনকার দিনে ডায়রেক্ট গান তোলা হতো, পেন্ ব্যাক সিস্টেমের প্রচলন হয়নি।

যাই হোক, এখন আরম্ভ করা যাক।

একদিন সন্ধান পেলুম—একটি সুশ্রী মেয়ে আছে, সে সিনেমায় নামতে রাজী। একদিন দেখতে চললুম ; সঙ্গে চলল কয়েকজন বন্ধু—তারাও এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

আমাদের সংবাদদাতা লোকটিও সঙ্গে ছিল। ওপাড়ার একটি বাড়ির দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসিয়ে রেখে লোকটি গেল তাদের ডাকতে। ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হলো তারা অবস্থাপন্ন লোক।

কিছুক্ষণ পরে একটি বয়ীয়সী মহিলা এলেন। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে কাকে ডাকলেন—ঊষা, এদিকে আয়। এত লজ্জা তো ছবি করবি কি করে ?

সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল জড়োসড়ো হয়ে। এক ঝলকেই দেখে নেওয়া গেল মেয়েটি বেশ সুশ্রী এবং লম্বা দোহারা চেহারা। মেয়ের মা বসতে বসতে আমাদের বললেন—ওর সিনেমা করবার ভারি শখ। বলে —এসব পেশায় আমার মন নেই। আমি বলি—সিনেমা করবি যদি তো কর—

এক নিঃশ্বাসে এতখানি বলে ফেলে তিনি বললেন—হ্যাঁ বাবা, শুনেছি সাংঘাতিক সাংঘাতিক আলো মুখের ওপর ফেলা হয়, তাতে চুল পুড়ে যায়, চামড়া কালো হয়ে যায়, চোখ নষ্ট হয়ে যায়—

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম—না না, ওসব কিছুই হয় না। এসব কথা কোত্থেকে শুনলেন ?

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে সিনেমা করতে খুব রাজি—আমরা যা শেখাব, যা করতে বলব—তাই সে করবে। কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে গেল। আর একদিন এসে পাওনা-কড়ির কথা ঠিক করা যাবে বলে আমরা সেদিনকার মতো উঠলুম। ঊষাকে দেখে আমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছিল। তার মুখশ্রী সুন্দর, চোখদুটি টানাটানা, অঙ্গসৌষ্ঠবও ভালো। যদি অভিনয় ভালো করতে পারে তবে সে যে ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হলুম। শুনলাম সে গানও গাইতে পারে। দেনা-পাওনার কথাও ক্রমে ঠিক হয়ে গেল। আজকের তুলনায় তা অতি নগণ্য বললেও চলে। আজকালকার বড় অভিনেত্রীরা একটা ছবিতে একদিনে যা রোজগার করে এ তাও নয় বললেই হয়।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের রিহার্শ্যাল শুরু হলো। আজকের দিনে রিহার্শ্যাল জিনিসটা বোধহয় উঠেই গেছে ; কারণ ভদ্রঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়েরা এ লাইনে এসেছেন ; কিন্তু তখনকার দিনে তো আর তা ছিল না। আমরা যেখান থেকে যেসব অভিনেত্রী সংগ্রহ করতুম, তাদের উচ্চারণ ছিল অত্যন্ত খারাপ। আকাশকে তারা বলতো আগাস। তাছাড়া ক-এর জায়গায় খ এবং র ও ড়-এর বিপর্যয় তো ছিলই। অবশ্য

ওটা এখনও আছে ; আর সঙ্গগুণে 'সাথে' কথার মতো ওটা চলেই গেল।

যাই হোক, রিহার্শ্যাল তো শুরু হয়ে গেল। উষা বেশ মন দিয়েই কাজ করতে লাগল। সে গানও শিখতে লাগল। বাড়িতে যে সময়টুকু থাকে তারই মধ্যে গলাও সাধে। যখন কাজ না থাকে তখন একলা বসে বিড়বিড় করে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি করে। যে সময়টা অন্য মেয়েরা আড্ডা দিয়ে কাটায় সে সময় সে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি করে। একদিন সেইরকম করতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি হচ্ছে উষা ?

সে বললে—নিজেকে তৈরি করছি বাবা। কোনোরকমে একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে এ পাড়া পর্যন্ত ছেড়ে দেবো আমি—তা মা যাই বলুন।

এইরকম চলছে, দু-এক দিনের মধ্যেই সুটিং আরম্ভ হবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে এমন সময় একদিন উষা কামাই করে বসল। সেদিন তো কেটে গেল। পরের দিনও সে এলো না দেখে আমরা তো শংকিত হয়ে উঠলুম। সামনেই স্যুটিং। তাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে—এমন উৎসাহী সে ! অথচ এই সময়েই কামাই করে বসল ! সন্ধান করে জানতে পারা গেল তার জ্বর হয়েছে।

অগত্যা অন্য দৃশ্য নেবার ব্যবস্থা হলো। দৃশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভও হয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন সেই ঝোঁকে কেটেও গেল--কিন্তু উষার দেখা নেই। একদিন রাত্তিরে কয়েকজন মিলে উষার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি সে বিছানায় শুয়ে আছে। এই কদিনের জ্বরেই অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। তার মাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—এখনও কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। অথচ সমানে জ্বর হয়ে চলেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—একশ তিনের ওপরে জ্বর হবে। জ্বর দেখবার জন্য বাড়িতে একটা থার্মোমিটারও নেই। তার মাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললুম—জ্বরটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, আপনি এক্ষুনি কোনো ডাক্তার ডেকে এনে দেখান।

আমাদের কথা শুনে তার মা তো হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। আমরা বললুম—কান্নাকাটি করে কিছু হবে না, এক্ষুনি মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

উষা সেই অবস্থাতেই আমাদের বললে—এই দু-এক দিনের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে গেলেই আমি গিয়ে পার্ট করব।

তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বলে আমরা চলে এলুম।

এদিকে ছবি তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। উষার ছিল প্রধানা ভূমিকার পার্ট। তাকে বাদ দিয়ে আর কতদিনই বা কাজ চলে। পনেরো-বিশ দিন তার জন্যে অপেক্ষা করে থেকে আমরা আর একটি মেয়ে জোগাড় করে তাকে তালিম দিতে লাগলুম। তখনও মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল যে এর মধ্যে উষা যদি ভালো হয়ে ওঠে তবে তাকে দিয়েই কাজ শুরু করাবো।

আমাদের লোক হপ্তার মধ্যে দুবার করে গিয়ে তার খোঁজ নিয়ে আসে; কিন্তু প্রতিবারই শুনি তার অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। আমরা নতুন মেয়েটিকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলুম। কাজের চাপে কিছুকাল ঊষার সন্ধানই নিতে পারিনি? একদিন শুনলুম তাকে ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন বাদে শোনা গেল তার দুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এক রাত্রে আমরা কয়েকজন তাকে দেখতে গেলুম। দেখলুম তার হাত-পাগুলি প্যাঁকাটির মতন সরু হয়ে গিয়েছে। চোখে একজোড়া কালো চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আর সেই ঊষা বলে চেনাই যায় না। তার মা আমাদের দেখে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো। আধপাগলার মতো যা তা বলতে লাগলো! মেয়ের রোগের চিকিৎসায় সে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছে তবুও তার রোগ সারছে না। ঊষা সেইরকম স্থির হয়ে বিছানায় পড়ে রইলো—একটা কথাও বললে না। দেখলুম চশমার ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। দৃষ্টিহীনার চোখের অশ্রু আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তার মাকে আশ্বাস দিয়ে এলুম সে শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে।

দিনকতক বাদে আমাদের লোক এসে জানালো—ঊষা মারা গিয়েছে। রাত্রিবেলা মৃত্যু কখন এসে তাকে চুপেচুপে ডেকে নিয়ে গিয়েছে—কেউ জানতেও পারেনি।

আর একটি মেয়ের কথা।

তার নাম ছিল চপলা। চপলা তো চপলাই। আমরা তাকে ডাকিনি—সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে স্টুডিও দেখতে এসেছিল। রিহার্শ্যাল দেখতে বোধহয় তার অভিনয় করবার শখ হলো। তার বান্ধবী আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমার সঙ্গের ঐ মেয়েটি ছবিতে নামতে চায়।

তাকে বললুম—নামতে চাইলেই তো হবে না, অভিনয় করতে পারবে?

সে বললে—তা বলতে পারিনি, তবে চমৎকার গান গায়।

রিহার্শ্যাল হয়ে যাবার পর মেয়েটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি ছবিতে কাজ করতে চাও?

সে এক গাল হেসে বললে—হ্যাঁ।

বললুম—দেখ, এ কাজে ভয়ানক পরিশ্রম, দিনরাত খাটতে হয়! পারবে তুমি?

মেয়েটি সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে জানালো—পারবো।

মুখ চোখ নাক তার খুব ভালো না হলেও চলনসই। প্রধানা নায়িকার ভূমিকা না হলেও অন্য পার্টে চলে যেতে পারে। মেয়েটি বেশ লম্বা, আর বেশ সপ্রতিভ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শুনেছি তুমি গান গাইতে পারো?

সে বললে—সামান্য।

হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিয়ে বললুম—একটা গান গাও দেখি।

মেয়েটি বললে—কাল এসে শোনাবো।

একসময় তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি যে ছবিতে নামতে চাও, তা তোমার মা-বাপ কি অন্য কোনো অভিভাবক রাজি হবেন তো? তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে তো!

সে কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

সেদিনের মতো মেয়েরা চলে গেল। পরদিন তাদের সঙ্গে চপলাও এলো, আমাদের সে গানও শোনালে। সে নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দস্তুরমতো তান-গিটকিরি মেরে একখানি গান গাইলে। আমাদের সঙ্গীত-শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কার কাছে শেখো?

সে বললে—কারো কাছে নয়। গ্রামোফোন, রেডিও আর লোকের মুখে গান শুনে আমার শেখা।

কথাটা শুনে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলুম। এমন সুন্দর গান গায় অথচ কারো কাছে শেখা নয়! কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাই হোক, তাকে ছোটখাট একটি পার্ট দেওয়া হলো। আশ্চর্যের বিষয়, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সে অভিনয় করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম—এর আগে তুমি অভিনয় করেছো?

সে একটু হেসে বললে—এর আগে আমি কখনো অভিনয় করিনি—এমন কি রিহার্শ্যালও দিইনি।

একদিন ঠাট্টা করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—চপলা, তুমি নাচতে জানো?

সে বললে—একটু একটু পারি। কিন্তু সে আপনাদের দেখাবার মতো নয়।

বললুম—দেখাও না!

সকলের অনুরোধে পড়ে সে নাচ দেখাতে রাজি হলো। তারপর ঘুঙুর পরে তবলা ও সারেঙ্গীর সঙ্গে খানিকক্ষণ নাচলে। চপলা বললে—এসবই আমার দেখে শেখা। সত্যিকারের তালিম কারো কাছেই কখনও পাইনি।

আমাদের স্টুডিওতে তখন একটা হিন্দী বইয়ের হিন্দী ছবির মহড়া চলছিল। তাদের ছবিতে জিপসিদের নাচের একটা দৃশ্য ছিল। চপলাকে জিজ্ঞাসা করলুম—চপলা, তুমি জিপসি নাচতে পারো?

সে বললে—হ্যাঁ, ট্যাম্বুরিন নিয়ে তো?

বললুম—হ্যাঁ।

সে বললে—আজ একটু অসুবিধে আছে কাল দেখাবো।

পরের দিন চপলা শাড়ির নিচে চোস্ত পায়জামা পরে একেবারে ট্যাম্বুরিন হাতে নিয়ে উপস্থিত। যাঁরা হিন্দী ছবি করছিলেন তাঁদের ডাকা হলো।

সঙ্গীত-শিক্ষক এলেন তাঁর তবলা-বাঁয়া নিয়ে। সারেঙ্গী এলো, শুরু হলো বাজনা—আর সেই সঙ্গে চপলা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হাতে-পায়ে ট্যাম্বুরিন বাজিয়ে নাচতে লাগলো। নাচ দেখে তো সকলেই অবাক। হিন্দী ছবির পরিচালক বললেন—আমি আগে জানলে ওর জন্যে একটা ভালো পার্ট লিখতুম! যাই হোক, এর পরের ছবিতে দেখা যাবে।

সঙ্গীত-পরিচালক বললেন—ঠিক আছে। তবে দু-এক জায়গায় একটু-আধটু মেরামত করতে হবে আর নতুন মিউজিকের সঙ্গে রিহার্শ্যাল দিতে হবে।

খুব তেড়ে হিন্দী ছবিতে একটা নাচের রিহার্শ্যাল চলতে লাগল। ঠিক হলো ওদের সীন আগে হয়ে যাক তারপর আমাদের কাজ হবে। তাড়াতাড়ি সেট তৈরি হলো। স্যুটিং শুরু হয়—এমন সময় চপলা মেঘে মিলিয়ে গেল। অর্থাৎ আমাদের লোক এসে জানালে—কাল রাত্রে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে সে পালিয়েছে—কোথায় আজমগড় না ফরাক্কাবাদ সে কথা কেউ বলতে পারে না।

চপলার মা বললে—আমি তোমাদের আগেই বলেছিলুম বাবা, ও ঐ রকমেরই।

মাসখানেক ধরে অপেক্ষা করা হলো; কিন্তু নিরুদ্দিষ্টা চপলার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। এর পরেও প্রায় দশ বছর ধরে তার সন্ধান করেছি, তখনও সে ফেরেনি।

এবার যার কথা বলবো তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে ভারতের এক প্রান্তে।

একদিন বিকেলে বাড়িতে বসে আছি এমন সময় একটি লোক এসে আমায় বললে—একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

যে লোকটি দেখা করতে এসেছিল সে আমাদের চেনা লোক। আমাদের স্টুডিওতেই সে কাজ করে। আমি তাকে বললুম—স্টুডিও থেকে ফিরে আমি তো কোথাও যাই না। স্বচ্ছন্দে সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে।

লোকটি একটু ভণিতা করে বললে—আপনার বাড়িতে আসার বিষয়ে তার পক্ষে কিছু বাধা আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কে সে? বেটাছেলে না মেয়েছেলে?

সে বললে—মেয়েছেলে। একজন নায়িকিনী।

নায়িকিনী শব্দটি ওদেশে এক শ্রেণীর মেয়েদের নাম। এই মেয়েরা বিয়ে করে, ছেলেপিলে হলে সমাজবদ্ধ হয়ে গৃহস্থের মতো বাস করে। স্বামী মরে গেলে আবার বিয়ে করতে বাধা নেই; আবার কখনো বা কারো আশ্রয়ে থেকে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও কোনো নিন্দে নেই। অনেকে আবার ছেলেমেয়ে ফেলে পালিয়েও যায়। এদের ছেলেমেয়ে সমাজে খুব নিন্দনীয় নয়। অনেকে সমাজে রীতিমতো প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভও করেছে।

এরা ক্রমেই সংঘবন্ধ হয়ে নিজেদের সামাজিক উন্নতিতে মন দিয়েছে। এখন তারা ঢের উন্নত জীবন যাপন করে। এদেরই নাম নায়িকিন্। সংক্ষেপে তাদের সম্বন্ধে যা জেনেছিলুম তাই এখানে লিপিবন্ধ করলুম।

যাই হোক, নায়িকিনী আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে আশ্চর্য হলুম না, শুধু কৌতূহলাবিষ্ট হলুম। বললুম—বেশ, বেলা বারোটার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। দুপুরবেলা যাবো, তুমি এসো।

লোকটি বললে—আজ্ঞে, সে বলেছে সন্ধ্যের পর আপনাকে নিয়ে যেতে।

হেসে বললুম—কাল তো দুপুরবেলা গিয়ে দেখে আসি, তারপর সন্ধ্যের পর যাওয়া যাবে।

লোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন বেলা একটার সময় সে এসে আমায় নিয়ে গেল। শহরের মধ্যে একটা মাঠকোঠা। এদেশে শতকরা প'চানব্বই জন লোক এইরকম মাঠকোঠায় বাস করে। লজগজে সি'ড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ছোট ঘর। আসবাবপত্রের বালাই নেই, এইরকম সব বাড়িতে ভারি আসবাব রাখাই চলে না। দেয়ালে গোটা তিন-চার ব্রোমাইড ফোটো ঝুলছে। আমাকে বসিয়ে সে আর একটা ঘরে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনলুম সে বলছে—লজ্জা কি? ডেকে নিয়ে এসে আবার লজ্জা কি?

আমার লোকটি আবার আমি যে ঘরে বসেছিলুম সেই ঘরে এসে ঢুকলো। তার পেছনে পেছনে আর একজনও ঢুকলো। যে ঢুকলো তার চেহারার কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

বলা বাহুল্য, যে ঢুকলো সে স্ত্রীলোক। দীর্ঘাঙ্গী, বয়স বাইশ তেইশের বেশি হবে না। টকটকে গৌর তার রঙ, মুখাবয়ব সুশ্রী। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলুম, এ ফুল এদেশে বড়-একটা জন্মায় না। একখানি চকচকে লাল শাড়ি সে পরেছে—অঙ্গে ঘন লাল রঙের কাঁচলি, বেণীবন্ধনে টকটকে লাল একটা গোলাপফুল গোঁজা। আমাকে ছোট্ট একটি নমস্কার করে আমার সামনেই বসে পড়ল। আমাকে যে লোকটি নিয়ে এসেছিলো সেই তার হয়ে বললে—ও সিনেমা করতে চায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি সিনেমায় কাজ করবে?

সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে—হ্যাঁ বাবুজি।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

সে বললে—গুলাব।

—তোমরা কি মুসলমান?

—না না, আমরা হিন্দু।

আমি বললুম—এদেশে মুসলমান মেয়েদের নাম হয় গুলাব—তাই তো শুনেছি।

সে বললে—আমার নাম ছিল সরোজ। আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি সে নাম বদলে গুলাব রেখেছেন।

আমি লক্ষ্য করেছিলুম এদেশে হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী পুরুষ কেউই ভালো হিন্দী বা উর্দু বলতে পারে না; উচ্চারণের কথা তো না-বলাই ভালো! কিন্তু এ মেয়েটি দেখলুম প্রায় শুদ্ধ উর্দু বলতে পারে; উচ্চারণও সুন্দর। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এ কার ফটো?

সে বললে—আমার বাবার।

—আর এই দুটি?

—আমার দুই দাদার।

জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তাঁরা?

সে বললে—কালাপানি।

—আর তোমার বাবা?

বাবার ফাঁসি হয়ে গেছে।

মনে মনে ভাবলুম—এতো এক সিনেমারাজ্যে এসে পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি করেছিলেন তিনি?

গুলাব বলতে লাগল, তারা আগে যে শহরে থাকতো সেখানে কয়েকটা কাপড়ের কল ছিল। তাছাড়া সুতোর কল চিনির কলও ছিল। এই কলে তার বাবা ও দাদারা চাকরি করতেন। তাঁরা বেশ বড় চাকুরেই ছিলেন। তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। সমাজে তারা ধনী বলেই বিবেচিত হতো। ছেলেবেলা তাদের মা মারা গিয়েছিলেন।

মার কথা বলতে বলতে গুলাবের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। সে বললে—আমি মা-বাবার একমাত্র মেয়ে ছিলুম, খুব আদরেই মানুষ হয়েছিলুম। কিছুদিন আগে এইসব কলের শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের লাগলো গণ্ডগোল। বাবাকে শ্রমিকেরা তাদের নেতা করে মালিকদের কাছে পাঠালো। মালিকেরা কিন্তু শ্রমিকদের কোনো কথাই শুনলো না। এইসব নিয়ে ধর্মঘট, হাঙ্গামা-হুজ্জোত চলতে লাগলো। ক্রমে অন্যান্য কলের শ্রমিকরাও একজোট হয়ে পড়লো। পুলিশ গুলি চালালো। শেষকালে একদিন শ্রমিকেরা চিনির কলের দু-তিন জন সাহেবকে হত্যা করলো। মিলিটারি এলো তারা শ্রমিকদের গোলমাল ঠাণ্ডা করে দিলে। সন্ধ্যাবেলায় পুলিশে আমার বাবা ও ভায়েদের ধরে নিয়ে গেল। বিচারে বাবা, দুই ভাই ও আরো কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হলো। বোম্বাইয়ে আপীল করে আমার দাদারা ফাঁসি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত হলো। কিন্তু বাবা ও আরো দুজনের ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো বছর। আত্মীয়স্বজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভয়ে আমাদের দিকে এগোলেন না। আমি এখন যে লোকের আশ্রয়ে আছি সে ছিল আমার দাদাদের বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই এরা

আমাদের বাড়িতে আসতো। এদের পরিবার ছিল নামজাদা ধনী পরিবার।

গুলাব একটু থামলো। তারপর চোখ মুছে বলতে লাগলো—প্রথম প্রথম এ আমার ওপর বেশ ভদ্র ব্যবহার করতো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপমূর্তি প্রকাশ হলো। দুর্দান্ত মাতাল ; তার ওপর নিয়মিত ভাবে আমাকে নির্দয়ভাবে প্রতিদিনই প্রহার করতো। দিনরাত সন্দেহ পাছে আমি অন্যলোকের কাছে চলে যাই! শেষ পর্যন্ত সন্দেহের জ্বালায় সেখান থেকে নিয়ে এসে এইখানে রেখে দিয়েছে। আর ঐ যে ঝিটা—ও সমস্ত খবর ওকে দেয়। আজকাল ও সপ্তাহের মধ্যে দুদিন কি তিনদিন আসে, আর আমায় মারধোর করে। আপনি আপনাদের স্টুডিওতে আমার একটা কাজ ঠিক করে দেবেন? আর—

এই অবধি বলে গুলাব থামলো।

আমি বললুম—আর কি?

এবার সে বেশ স্পষ্ট করেই বললে—আর এই লোকটির কবল থেকে আমি উদ্ধার পেতে চাই। আপনি আমায় আশ্রয় দিন।

আমি বললুম—দেখ, স্টুডিওতে চেষ্টা-চরিত্র করে একটা কাজ হয়তো জোগাড় করে দিতে পারি, কিন্তু আমি তোমায় আশ্রয় কি করে দেবো? আমি যে নিজেই আশ্রয়হীন। দুদিনের জন্যে এখানে এসেছি, এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার আমায় উড়তে হবে অন্য কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে।

মেয়েটি কোনো কথা না বলে ঘাড় নিচু করে রইলো। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম—ভালো করে যদি অভিনয় করা শিখতে পারো তাহলে তুমিই আমাকে আশ্রয় দিতে পারো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, একটা কিছু হয়েই যাক।

পরের দিন স্টুডিওতে গিয়ে কর্তাদের কাছে গুলাবের কথা বললাম। তাঁরা তেমনভাবে কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তিন-চার দিন এমনি কেটে গেল। এদিকে রোজই গুলাব খবর চেয়ে পাঠায়—আমার কি হলো?

শেষকালে একদিন তাকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। ব্যাস—যেমনি তাকে দেখা—কর্তারা তো তখুনি তার মাইনে ঠিক করে ফেললেন। একটা ছবিতে সে পার্ট পর্যন্ত পেয়ে গেল। কর্তাদের অনেকেই তার পেছু পেছু ঘুরতে লাগলেন। যাই হোক, সামলে-সুমলে আমি তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলুম এবং অনন্যমনা হয়ে কাজ করতে উপদেশ দিলুম।

কিন্তু দুদিন না যেতে যেতেই শুনলুম—তার সেই রক্ষক লোকজন নিয়ে এসে মারধোর করে তাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

এবার আর-একটি মেয়ের কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো।

সন্ধান পাওয়া গেল—বৌবাজার অঞ্চলে একটি মেয়ে এসেছে—সবেমাত্র বাড়ী থেকে পালানো। অতীব সুন্দরী, হয়তো চেষ্টা করলে তাকে ছবিতে

নামানো যেতে পারে।

সন্ধান নিয়ে একদিন আমরা তিন বন্ধুতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম। খোঁজ করে তার ঘরে গিয়ে দেখলুম, মেয়েটি মেজেতে বসে আছে। আমরা যেতেই সে উঠে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—কাকে খুঁজছেন ?

—আমরা আপনাকেই খুঁজছি।

অতি ভদ্র ও বিনীতভাবে সে বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে কোনো আসবাবপত্র নেই। মেজেতে একটি মাদুর বিছোনো। একধারে চাবুস্-এর একটা মাঝারি গোছের সিন্দুক ঝক্‌ঝক্ করছে! তখনকার দিনেও সে সিন্দুকটার দাম অন্ততঃ পাঁচ-শ টাকা।

মেয়েটির আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখলুম—প্রায় কনুই অবধি গয়নায় ঢাকা। ওপর হাতেও বেশ মোটা দু-গাছি অনন্ত, গলায় মোটা নেকলেস। সাধারণতঃ এসব মেয়েরা এতো গয়না পরে থাকে না।

মেয়েটির চেহারা লম্বা, দোহারা গড়ন, রঙ উজ্জ্বল গৌর। প্রথম দৃষ্টিতে তেমন বোঝা যায় না, কিন্তু দেখতে দেখতে বোঝা যায় সে রীতিমত সুন্দরী।

আমাদের সামনে এসেই সে বসলো। তার কথাবার্তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের টান রয়েছে এবং চ-বর্গটি একেবারে বিকৃত। তাকে জিজ্ঞাসা করুলম—তুমি নতুন বেরিয়ে এসেছ ?

সে বললে—ঠিক নতুন নয়, প্রায় বছর খানেক হতে চলল।

—কোন দেশে তোমার বাড়ি ?

সে বললে—আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে। কিন্তু এই পর্যন্ত জেনেই খুশী থাকুন, কারণ কোন জায়গায় দেশ বাপের নাম কি -এসব জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাবেন না।

দেখলুম মেয়েটি বেশ সরল। একটুখানি আলাপের পরেই আমাদের সঙ্গে বেশ সরলভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলুম—এ জীবন কেমন লাগছে ?

সে হেসে উঠল। বললে—এ জীবনের জন্যে তো বেরিয়ে আসিনি। তবে এ রকম ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই যা হয় আমার বেলাতেও তাই-ই হয়েছে। আমাকে যে বার করে নিয়ে এসেছিল কিছুদিন পরে সে পলায়ন করেছে। এখন প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম তুমি সিনেমা করবে ?

সে বললে—সিনেমা কি আমার দ্বারা হবে ?

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—এই জীবন থেকে বাঁচবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।

আমি বললুম—তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আমি তোমাকে এ জীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো।

সে হেসে বললে—বলেন কি ? এই বাড়ির বাড়িওয়ালা যে একজন নামজাদা গুণ্ডা এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোক তারা সর্বদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন অত্যাচার করে যে পাঁচ-সাত দিন আর উঠতে পারি না।

আমি বললুম—তুমি যদি এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার পেতে চাও—তাহলে ওসব গুণ্ডাফুণ্ডা—সব ঠিক করে দেবো। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

সে সময় বাংলাদেশে Women's Protection League নামে একটি সংস্থা ছিল। নারীহরণ, নারীধর্ষণ এবং নারীদের উপর নানান অত্যাচার তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। অপহৃতা ধর্ষিতা নারীদের খুঁজে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করা এবং অপরাধীদের সাজা দেওয়া ছিল এই সংস্থার প্রধান কাজ। বাংলাদেশের—বিশেষ করে কলকাতার অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সংস্থার কর্মীরা ছিলেন অবৈতনিক। দু-চারজন অতিদরিদ্র অথচ উৎসাহী কর্মী যুবক শুধু সামান্য কিছু বেতন পেতেন। আমার পিতা ছিলেন এই সংস্থার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অর্থাৎ সংগঠন-সম্পাদক। তিনি মফস্বলে কখনো ফকির, কখনো দরবেশ, কখনো সাধু কখনো বা ব্রাহ্মণ ভিখারী—এইসব ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে ঘুরে অপহৃতা নারীদের সন্ধান করতেন এবং দুর্বৃত্তদের ধরে এনে সাজা দেবার ব্যবস্থা করতেন। ব্যবহারজীবীরাও বিনা পয়সায় এই সংস্থার হয়ে কাজ করতেন। পুলিশ ছিল এদের হাতধরা। আমার পিতাকে হত্যা করবার শাসানি দিয়ে অনেক চিঠি আসতো। এমনকি তাঁকে সাবধান করবার জন্য আমাদের কাছেও চিঠি আসতো। আমার ভরসা ছিল—তাঁর কানে একবার এই মেয়েটির কথা তুলে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অভিনেত্রীর সন্ধানে হাড়কাটা গলিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি—একথা বাবাকে বলবার সাহস আমার ছিল না। আমাদের বাড়িতে বাবার দু-তিনটি চেলা থাকতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে মফস্বলে যেতো। তাদের মধ্যে একজনকে আমি এই মেয়েটির কথা বললুম এবং এ বিষয়ে বাবাকেও জানাতে বললুম।

দিন দুয়েক বাদে লোকটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে এসে বললে ঐ মেয়েটি পূর্ববঙ্গের কোনো শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বিবাহের পরেও সে ধনী পিতৃগৃহে বাস করছিল। এই ফাঁকে আর একটি যুবকের সঙ্গে তার প্রণয় জন্মায়। সেই যুবকটি তাকে ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে যায়। কন্যার পিতা Women's Protection League-এ খবর দেওয়ায় এরা খোঁজ করে কলকাতাতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে এ মেয়েটি হাকিমকে বলে যে সে সেচ্ছায় উক্ত যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। এরপরে আদালতে কিংবা League-এর কিছুই করবার নেই।

লোকটি এই সঙ্গে আমায় জানিয়ে দিলে—মেয়েটি দেখতে যাই হোক

আসলে সে অত্যন্ত বদমাইস। আপনাকে কর্তা জানাতে বলেছেন যে আপনি কোনক্রমে ওর ত্রিসীমানায় যাবেন না।

এরপরে আমার আর কি করবার আছে! আমি ও-সম্বন্ধে আর কিছুই করিনি।

মাস তিনেক বাদে বৌবাজার অঞ্চলে এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম। ফিরতি মুখে একবার সেই মেয়েটির সন্ধান নিয়ে জানলুম যে, মাসখানেক আগে কে বা কারা তাকে হত্যা করে তার সমস্ত গহনা নিয়ে চলে গিয়েছে।

এরপর এ বিষয়ে আর আমি কোনো সন্ধান করিনি।

ক্ষণিকের অতিথি

একবার শীতকালে মেবার রাজ্যের রাজধানী উদয়পুর শহরে মাস তিনেকের জন্য বাসা বাঁধতে হয়েছিল। ছোট্ট দেওয়ালঘেরা রূপকথার মতো শহর—এই শহরের সব চেয়ে যেটি বড় রাস্তা সেই রাস্তার ওপরেই এক বাড়িতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম। রাস্তাটি উদয়পুরের চৌরঙ্গী—কয়েক গজ মাত্র চওড়া হলেও সেইটেই শহরের প্রধান পথ। এই পথের একদিকে শহরে ঢোকবার সব থেকে বড় দরজা আর অপর প্রান্তে রাণার প্রাসাদের প্রধান তোরণ—হাতীপোল দরজা। রাস্তার দু-দিকের বাড়ীগুলির একতলার পথের ধারের ঘরগুলিতে সব দোকান—নানা রকমের ব্যবসার কেন্দ্র। সকালে ঐ রাস্তাতেই বাজার বসে—লোকজনের কোলাহল ও গাড়িঘোড়ার আওয়াজে সমস্ত দিন রাস্তাটি গমগম করতে থাকত। সন্ধ্যে হতে না হতেই কে যেন শহরের অঙ্গে রুপোর কাঠির পরশ লাগিয়ে দিত—দিনের কর্ম-কোলাহল, ব্যস্ততা সব থেমে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব হয়ে পড়ত নিঝুম—সুনসান।

রাত্রি দশটা বাজতে না বাজতে শহরে ঢোকবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় শহরে ঢুকতে কিংবা বেরুতে হলে সরকারী অনুমতি নিতে হয়। সে অনুমতি সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য নয়—রাত্রে শহরের বাইরে যে যায় অথবা বাইরে থেকে ঢোকে সে ব্যক্তি দাগী হয়ে থাকে, তার ওপরে কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে, কাজেই নেহাৎ বিপদে না পড়লে কেউ ও-কাজ করে না। শহরের ছোট-বড় রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সেই স্বল্প আলোতে রাস্তার খানিকটা আবছায়ার মতো দেখা গেলেও লোকের মুখ চেনা যায় না, তাই রাত্রি আটটার পর কেউ রাস্তায় বেরুলে তাকে একটা হারিকেন লণ্ঠন সঙ্গে নিতে হয়। এ নিয়ম কেবল পুরুষদের বেলায়। মেয়েদের লণ্ঠন নিতে হয় না—সেখানকার পুলিশের ধারণা যে মেয়েদের মুখ দেখতে আলোর প্রয়োজন হয় না।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খাবার দাবার নিয়ে আমরা কাজে বেরিয়ে যেতুম শহরের বাইরে অনেক দূরে—কখনো কোনো পাহাড়ের ওপরে, কখনো বা উদয়পুরের বিখ্যাত বিরাট সেই সব হ্রদের ওপারে। সমস্ত দিন অর্থাৎ যতক্ষণ ধরাতলে সূর্যকিরণের লেশমাত্র থাকত ততক্ষণ হতো আমাদের কাজ। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাজ সেরে ফিরে আসতুম ডেরায়।

আমাদের বাড়িখানার একতলায় রাস্তার দিকের ঘরগুলোতে ছিল সব দোকান, দোতলায় ছিল দুটো ছোট আর একটা মস্তবড় হলঘর। ছোট ঘর দুটোতে জিনিসপত্র বাক্স প্যাঁটরা থাকত আর বড় ঘরে ছিল ঢালা বিছানা। এই ঘরখানাতেই আমাদের থাকা, শোওয়া, খাওয়া ইত্যাদি চলতো। সদর দরজা থেকে একটি সিঁড়ি একেবারে প্রায় রাস্তা থেকেই উঠে এসে এই ঘরে শেষ হয়েছিল।

কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রাত্রি প্রায় নটা নাগাদ আমাদের গানবাজনার আসর বসত একেবারে সেই একটা দেড়টা অবধি। আমাদের মধ্যে ভালো গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে প্রভৃতি ছিল, যন্ত্রপাতি, ঘুঙুর, প্রভৃতি সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না—বলা বাহুল্য, প্রতি রাত্রেই আসর খুবই জমে উঠত। দিনভোর হাড়ভাঙা খাটুনির ক্লান্তি বেশ বিধিমতে দূর করে আমরা শুয়ে পড়তুম।

আমাদের বাড়ির নীচে এক বোরি (সম্প্রদায়) মুসলমানের মুদীর দোকান ছিল। এই ব্যক্তি আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করত। সে দেশে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এই মুদীর কল্যাণে মাছের অভাব আমাদের কোনদিন হতো না—এই ব্যক্তিই সে দেশের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিল।

আমাদের গান-বাজনার আসর বসতে না বসতেই অর্থাৎ হারমোনিয়ামের পোঁ বা তবলার চাঁটি শুনতে পেলেই সে বুঝতো এইবার দোকান বন্ধ করবার সময় হয়েছে—সে তাড়াতাড়ি ঝাঁপ বন্ধ করে উঠে এসে বসতো আমাদের আসরে। রাত্রে আমাদের ওখানেই খেয়ে আসরের এক কোণে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো।

আমাদের এই আসরে প্রায় প্রতি রাত্রেই কত অজানা লোক যে এসে উপস্থিত হতো তার আর ঠিকানা নেই। কত মাতাল, বদ্ধ পাগল, অর্ধ পাগল, খেয়ালি, খামখেয়ালি—সে যে কত রকমের তার হিসাব নেই। সদর দরজা খোলা, ওপরে গান চলেছে, সামনেই সিঁড়ি—অতএব উঠে পড়।

দেখতুম সেই দারুণ শীতে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে হি হি করতে করতে ঘরে ঢুকে আসরের এক জায়গায় বসে পড়লো—কোনো দ্বিধা নেই, লৌকিকতার লেশমাত্র নেই, কোনো প্রকার সম্ভাষণেরও ধার ধারে না, কারুর হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, কারুর হাতে নেই। বিচিত্র চরিত্রের লোক সে সব—দিনের বেলায়

কর্মচঞ্চল জগতে তাদের চিনতে পারা যায় না, জানতে পারা যায় না। কোনো কোনো দিন কেউ কেউ ভারী গোলমাল আরম্ভ করে দিত। গান থামা মাত্র শুরু করে দিত গান, কিছুক্ষণ আমরা ধৈর্য ধরে শুনতুম, তার আর শেষ নেই —যা তা চীৎকার মাত্র, শেষকালে মুদীকে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে জোর করে নীচে নামিয়ে দেওয়া হতো। নাচের আসরেও মাঝে মাঝে কেউ নাচ শুরু করে দিত—তাছাড়া কবি, অভিনেতা, বক্তা প্রভৃতিরও আবির্ভাব কম হতো না। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে আজ তারা প্রায় সকলেই, মন থেকে মুছে গিয়েছে। শুধু তিনটি মানুষের স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে।

একদিন, সেদিন সারা দিন মেঘলা থাকায় আমরা আর কাজে বেরুইনি। সকাল থেকেই হু হু বাতাস বইতে থাকায় বেশ জমে শীত পড়েছে। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানাতেই কাটিয়ে দিলুম। সন্ধ্যা হওয়ার পর চারদিকের জানালা সেঁটে দিয়ে আমাদের নিয়মিত আসর বসলো, গানও যথারীতি জমল বটে কিন্তু সেদিন আমাদের সেই মুদী বন্ধু ছাড়া বাইরের আর কোনো লোকেরই দেখা নেই। রাতের পাখিরা শীতের চোটে বাসা ছেড়ে আর কেউ বেরোয়নি। সেদিন আসর একটু তাড়াতাড়ি বসেছিল তাই বারোটা বাজতে না বাজতে আসর গেল ভেঙে। এক একজন করে খেতে যাচ্ছে, কেউ বা আলস্য ভাঙছে বা গল্প-গাছা করছে, বাইরের বাতাসও উদ্দাম হয়ে উঠেছে এমন সময় ঘরের মধ্যে দুটি জৈন সাধ্বী এসে উপস্থিত হলেন—দুজনেরই মাথা কামান, মাথার পিছন দিকে একটুখানি ঘোমটার মতো দেওয়া। বাড়িতে ধুয়ে ধুয়ে সাদা কাপড়ের যেমন লালচে মতো রং হয়ে যায় তেমনি লালচে সাদা রঙের মোটা গাঢ়ার থান পরা। নাকের কাছ থেকে থুতনি অবধি সুতোর ঝালর বাঁধা। হাতে একটা করে সুতোর মোটা ঝালর অথবা ঝাঁটা।

উদয়পুরে জৈনদের খুবই প্রভাব। ইতিপূর্বে নাকে ঝালর বাঁধা সুতোর ঝাঁটা হাতে জৈন সন্ন্যাসিনী দু-চারজন দেখেছি। পাছে নাকেমুখে কোনো কীট প্রবেশ করে প্রাণীহত্যা হয় সেজন্য তাঁরা মুখে ঐ রকম ঝালর বেঁধে ঘোরেন—বসবার সময় বেশ করে সে জায়গাটা সুতোর নরম ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে তবে বসেন। ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র প্রাণও তাঁরা জ্ঞানতঃ বিনষ্ট করেন না। নিজেদের মধ্যে এঁদের সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। যে নিত্য কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয় তার কিছু কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শুনেছি—দেখে শুনে মনে মনে বিস্ময় মেনেছি। তাঁদের সম্বন্ধে আরও জানবার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু সকল বিস্ময়কে অতিক্রম করে অযাচিতভাবে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুই সাধ্বী আমাদের ভবনে হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়ায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তাই হয়ে পড়লুম। আমাদের মধ্যে কয়েকজন আসরে তখনও বসে ছিলেন, দেখলুম সাধ্বীরা ঘরে ঢুকেই একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিঃসংকোচে উপবিষ্ট লোকেদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে একেবারে দেওয়ালের ধারে

একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপরে একটু এদিক-ওদিক দেখে মেজের বিছানাটা একটু সরিয়ে সেই সুতোর ঝাঁটাটা দিয়ে জায়গাটা আলতো-ভাবে ঝেড়ে দুজনে সেখানে বসে রইলেন। আমরা যে এতগুলো লোক সেখানে বসে আছি, হঠাৎ তাঁদের এই অপ্রত্যাশিত আগমন সম্বন্ধে তাঁদের দিক থেকে কিছু বক্তব্য আছে বলে মনেই হলো না তাঁদের হালচাল দেখে। দেখলুম তাঁদের দেখে আমাদের মুদ্দী বন্ধু খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে কখনো ওঠে কখনো বসে, কখনো আমাদের কি বলবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু আমাদের সকলেরই মনোযোগ অন্যদিকে থাকায় সে বিশেষ কিছু বলতে পারছিল না।

সাধ্বীদের মধ্যে একজনের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। অপরজনের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে যে কোনো বয়স হতে পারে। রং কোনো কালে উজ্জ্বল গৌর ছিল, কিন্তু রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে তার ঔজ্জ্বল্য কোনকালে চলে গেছে।

আমাদের মধ্যে কি কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তা মনে নেই তবে তাঁরা আসামাত্র আমরা সবাই চুপ করে তাঁদের হালচাল দেখছিলুম। হঠাৎ তাঁরা দুজনেই মুখের ওপর থেকে সেই সুতোর ঝালর সরিয়ে ফেললেন। এরই একমুহূর্ত পরে তাঁদের মধ্যে বর্ষীয়সী যিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তাঁর বক্তব্য প্রথমটা বুঝতে না পারায় একটু উৎকর্ণ হতেই বুঝতে পারলুম যে সাধ্বী সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ করেছেন। কিছুক্ষণ তাঁর বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যা ব্যুৎপত্তি তার দ্বারা তাঁর বক্তব্যের পরিমাপ করা অসম্ভব হলো। মিনিট দু-তিন গড়গড় করে সংস্কৃত আওড়ে সন্ন্যাসিনী চুপ করলেন। তিনি মনে করলেন তাঁর তরফের বক্তব্য শেষ হয়েছে কিন্তু আমাদের তরফের পাণ্ডিত্য যে অসীম সে জ্ঞান তাঁর ছিল না। কাজেই রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ করতে হলো।

বললুম—মাপ করবেন। সংস্কৃত ভাষা আমরা বুঝতে পারি না। কাজেই এতক্ষণ ধরে যা বললেন—তা ভস্মে ঘৃতাহুতি হয়েছে।

আমার কথা বুঝতে না পারলেও হয়তো মুখ দেখে আমার বক্তব্য বুঝতে পেরে তিনি আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। এবার সংস্কৃতে না বললেও যে ভাষা আরম্ভ করলেন, তা আমাদের কাছে দেবভাষার মতোই দুর্বোধ্য। অর্থাৎ এবারে মেবারের কথ্য ভাষায় বলতে লাগলেন। ভাগ্যে আমাদের বন্ধু মুদ্দী সেখানে উপস্থিত ছিল তাই সেবারে কোনো রকমে ইজ্জৎ রক্ষা হলো। আমরা বুঝতে না পারলেও এবারের বক্তব্য সে বুঝতে পেরে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথোপকথন চালিয়ে আমাদের বললে যে এঁরা শহরের একপ্রান্তে একজন রোগিণীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। রাত্রি ঠাহর করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে ফটকের কাছে এসে দেখেন যে ফটক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এত রাত্রে ফটকের প্রহরীকে তুলে কষ্ট না দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, আমাদের এখানে লোকজনের

কথাবার্তা শুনে ঢুকে পড়েছেন, বাকী রাতটা এইখানেই কাটাবেন বলে। মুদ্দীকে বললুম যে ও'দের বল যে এখানে সব পুরুষ মানুষ থাকে, স্ত্রীলোক নেই। মুদ্দী সেকথা জানাতে তিনি—ঠিক আছে—বলে বসেই রইলেন। মুদ্দী দেখলুম তখনও তাঁর সঙ্গে কি সব কথা বলতে লাগল। তার দু-চার কথার জবাব দিয়ে শেষে তিনি চুপ করলেন। মুদ্দী আরও কিছুক্ষণ বকবক করে চুপ করলো।

মুদ্দীর সঙ্গে এতক্ষণ যিনি কথা বলছিলেন তিনি সাধ্বীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী। অল্পবয়স্কা যিনি তিনি এতক্ষণ সামনের দেওয়ালের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বসে ছিলেন। বর্ষীয়সী মুদ্দীর সঙ্গে কথা বন্ধ করে ঠিক তাঁর সঙ্গিনীর মতোই সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন। তাঁদের সেই সমাহিত অবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ঘরের মধ্যেও একটা শান্ত অথচ অস্বস্তিকর গুমোট জমে উঠতে লাগল। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমি মুদ্দীকে প্রশ্ন করলুম—তুমি এ'দের চেনো নাকি? মুদ্দী বললে—খুব চিনি। এ'রা জৈন সন্ন্যাসিনী। বর্ষীয়সীকে লক্ষ্য করে বললে—উনি এই শহরের সকলের মা বললেই হয়। কোথায় কার অসুখ, সেখানে গিয়ে সেবা করেন—কে শোকার্ত তাকে সান্ত্বনা দেন—অথচ বেশি কথা বলেন না। তিনি কাছে গেলেই মানুষ শোকতাপ ভুলে যায়—রোগী মনে করে সে নিরাময় হয়ে গিয়েছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যিনি তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে মুদ্দী বললে—এখানকার একজন বড়ঘরের কন্যা ও বধূ ইনি—সংসারে বীতরাগ হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। বছর কয়েক আগে এই নিয়ে শহরে জৈন সাধুদের সঙ্গে জৈন গৃহস্থদের মহা গোলযোগ হয়েছিল। শেষকালে রাণার কাণে সেই হাঙ্গামার কথা গিয়ে পে'ছিয়। তিনি হুকুম দেন যে উনি যখন নিজে সাধ্বী হতে চাইছেন তখন তাঁকে বাধা দেবার কারুর অধিকার নেই। তারপর একদিন জৈন সাধু ও সাধ্বীরা মিলে মহা সমারোহে শোভাযাত্রা করে ও'কে বাড়ি থেকে নিয়ে গেল। সেইদিন থেকে বাড়ির সঙ্গে ও'র আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আমাদের এখানে এসে ও'রা অভুক্ত থাকবেন—ও'রা কি খাবেন জিজ্ঞাসা কর, আমরা আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। মুদ্দী আবার সেই ভাষায় তাঁদের কি জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সেদিক থেকে কোনো প্রত্যুত্তরই এল না—তাঁরা সেই স্থির চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন, মনে হলো মুদ্দীর কোনো কথা তাঁদের কানেই গেল না।

সাধ্বীরা আমার কাছেই বসে ছিলেন। চোখ খোলা অথচ মনে হতে লাগল যেন তাঁরা ধ্যানে বসেছেন। দৃষ্টি কোনো পদার্থের ওপর নিবদ্ধ নয়, যেন দূরে—বহুদূরে এই সুখ-দুঃখময় সংসার-সাগরের ওপরে সে দৃষ্টি প্রসারিত। বিশেষ করে উভয়ের মধ্যে বর্ষীয়সীর চোখ দুটো অদ্ভুত। সে চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—যেন একজোড়া চকচকে কাঁচের চোখের পেছনে

শক্তিশালী আলো রয়েছে, তারই জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে বাইরে। স্বচ্ছ সেই চোখ দুটোর ভেতর থেকে মনের তল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়—যতদূর দৃষ্টি চলে তার মধ্যে বাসনা বা কামনার মালিন্য কোথাও নেই। অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সীর চোখও ছিল অদ্ভুত। কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় সদ্যপরিত্যক্ত সংসারের আবিলতার কিছু ছাপ যেন তখনও তাতে লেগে রয়েছে—সদ্যজাগরিতা তরুণীর চোখে স্বপ্নের আবেশ যেমন জড়িয়ে থাকে।

আমি তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম—দেখলুম ধীরে ধীরে তাঁদের চোখ বন্ধ হয়ে এল। ভাবতে লাগলুম সংসারের এই কলুষ পারাবারে এমন শুভ্র শতদল ফোটে কি করে!

সারা রাত্রি তাঁরা ধ্যানে কাটিয়ে দিলেন। অতি প্রত্যুষে বিহঙ্গ কাকলীর সাড়া পাওয়া মাত্র উঠে পড়ে আমাদের কোনো সম্ভাষণ না করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেলেন—দুর্যোগের রাত্রে পাখি যেমন বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেয়, আবার সকাল হলেই উড়ে চলে যায়।

সঞ্জীবনী

মনস্বীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কেরানি। কিন্তু কেরানি বলতে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে চিত্র ফুটে ওঠে তিনি তা ছিলেন না। মনস্বী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম. এ. পাশ করে সরকারী চাকরিতে ঢুকেছিলেন, কর্মক্ষেত্রেও গুটি দুই পরীক্ষা পাশ করে তিনি আপিসের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এক শ্রেণীর চাকুরিজীবী আছেন যাঁরা শয়নে-স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে চাকরি করে থাকেন। এঁরা যতক্ষণ আপিসে থাকেন ততক্ষণ কর্মে রত থাকেন, ট্রামে-বাসে বসে আপিসেরই আলোচনা করেন, বাড়িতে গিন্নি ও ছেলেপুলের সঙ্গে আপিসেরই গল্প করেন, আপিসের পোষাক পরেই নেমন্তন্নে যান। ব্যারাম হলে বিকারের ঝোঁকে তাঁদের মুখ দিয়ে আপিসের বড় সাহেবের বকুনি বেরোয়—অবসরকালে আপিসের স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে তাঁদের জীবন অবসান হয়। ধর্মে এঁরা কেউ হন একেশ্বরবাদী কেউ বা একাধিক অর্থাৎ যাঁর মাথার ওপর যতগুলি উচ্চ কর্মচারী তিনি ততগুলি দেবতা মেনে থাকেন।

মনস্বী কিন্তু ভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। আপিসে তিনি কারুর খোশামোদ করতেন না। বরং তাঁর চেহারার বিরাটত্ব এবং ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ডত্ব আপিস-শুদ্ধ উচ্চ-নীচ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

ধর্মে তিনি ছিলেন শৈব। অনেকদিন আগে একবার পুজোর ছুটিতে কাশী বেড়াতে গিয়ে তাঁর মন মহাদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি সেখান

থেকে কষ্টিপাথরের একটি সুন্দর মহাদেবের প্রতীক আনিয়ে ছাদের একদিকে আলাদা একটি ঘর বানিয়ে সেখানে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই থেকে প্রত্যূষে উঠে স্নান করে নিজের হাতে ফুল বিল্বপত্র চয়ন করে ঘণ্টাখানেক ধরে পুজো করতেন। আপিসে যাবার সময় ট্রামে উঠেই চক্ষু বুজিয়ে এমন ধ্যানস্থ হয়ে বসতেন যে আপিসে যাচ্ছেন কি কালীঘাটে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারা যেত না। আপিসে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটি চন্দনলিপ্ত নুড়ি বের করে সেটি কয়েকবার মাথায় ঠেকিয়ে একখানি মোটা খাতা বের করে তাতে দু-পৃষ্ঠা ভরে শিবনাম লিখে কাজ আরম্ভ করতেন। এই খাতার সব পৃষ্ঠা ভরে গেলে সেটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শিবের চরণে নিবেদন করতেন—অর্থাৎ যাতে অবসর সময়ে দেবতা তাঁর ভক্তির মাত্রা হিসেব করতে পারেন।

একবার, কি একটা উপলক্ষে পঞ্জিকা দেখবার সময় হঠাৎ এক বিজ্ঞাপনের প্রতি মনস্বীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। বিজ্ঞাপনটি এই প্রকার— বৃহৎ টোটকা-বিজ্ঞান চিকিৎসা। শ্রীশ্রীঅমুক মহারাজকে মহাদেব নিজে যে সব ওষুধ দিয়েছিলেন, জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সেই অমূল্য রত্নরাজি সাধারণে বিনামূল্যে বিতরণ করছেন—কেবল ছাপার খরচের জন্য মাত্র দশটাকা দক্ষিণা।

গণিতশাস্ত্রে এম-এ মনস্বীনাথ ভক্তির আবেগে বিজ্ঞাপনটার সত্যাসত্যের কথা একবার বিবেচনাও করলেন না। বিজ্ঞাপনটি পড়ামাত্র তাঁর সম্মুখে যেন নতুন জগতের দরজা খুলে গেল। বইখানা তখুনি আনিয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে মনস্বী স্থির করলেন মহাদেবের নামে এই ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করবেন। সাধন ভজন তো আছেই সঙ্গে সঙ্গে লোকসেবাও চলবে। সাধন ও লোকসেবা একাধারে এই দুই সড়কে ছুটতে ছুটতে তিনি মোক্ষধামে উপস্থিত হবেন।

রাজ্যের জড়ি বুটি গাছ-আগাছা সংগ্রহ হতে লাগল। রোগীর অভাব হলো না, মানুষ যেখানে রোগ সেখানে। বিশেষ বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যাবে শুনলে নীরোগীও রুগ্ণ হয়ে পড়ে। প্রথমে বন্ধুবান্ধব, তারপরে আপিসের লোক, পাড়া, বেপাড়া এমনি করে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। এর মধ্যে মনস্বীনাথ পেলেন যশের আস্বাদন যা সাধন-ভজনের মধ্যে কোনোদিন তিনি পাননি। তাঁর ওষুধ খেয়ে যাদের রোগ সেরে যেত তারা তো প্রশংসা করতোই, যাদের না সারত তারাও বিরাগভাজন হবার ভয়ে সে কথা আর উত্থাপনই করতো না। তা ছাড়া দেবতার নিজের হাতে দেওয়া ওষুধ—রোগ সারেনি বললেই হলো! রোগ নিশ্চয় সেরেছে, রোগী বুঝতে না পারলে সে দেবতার দোষ নয়।

এই লোকসেবাব্রতে মনস্বীর যশ যতই বাড়তে লাগল তাঁর বাড়ির লোকের সহানুভূতি যে ততই কমতে লাগল সে কথা বলাই বাহুল্য। সকাল সন্ধ্যে রোগী ও নানা লোকের ভিড় ও চেচাঁমেচি তো আছেই তা ছাড়া ওষুধ-পত্র, গাছ-গাছড়া সামলানো, সেগুলি বাটা, গুঁড়ো করা, রোদে দেওয়া ও সময়মতো

তুলে রাখা প্রভৃতি কাজ বাড়ির চাকরদেরই করতে হতো এবং সেজন্য গৃহস্থালীর অসুবিধা নিত্যই বেড়ে চলেছিল। তিনি ছিলেন বাড়ির কর্তা, কাজেই গৃহলক্ষ্মীরা এই সব অসুবিধা সহ্য করতো মাত্র। বাড়ির মধ্যে একমাত্র তাঁর নাতনী সুষমা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঠাকুরদার সাধনা ও লোকসেবায় সাহায্য করতো।

মনস্বীর দুই ছেলে। বড় ছেলের একমাত্র সন্তান সুষমা, ছোট ছেলের সন্তানাদি নেই। মনস্বী তাঁর দেবপূজোর জন্য ফুল তোলা, পূজাগৃহ মার্জনা করা, সেখানকার বাসনপত্র নিত্য পরিষ্কার করা ও ঠাকুরের অন্যান্য পরিচর্যা নিজের হাতেই করতেন। এই সব কাজকেও তিনি পূজোর অঙ্গ বলেই বিবেচনা করতেন এবং কখনো অন্য কারুর ওপর এর ভার দিতেন না।

শিশু অবস্থা থেকেই সুষমা তার ঠাকুর্দার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তখন থেকেই সে দাদুর খড়কে আনা, পান জল এনে দেওয়া প্রভৃতি ফাইফরমাস খাটত। একদিন সকালে সুষমা স্নান করে বাগানে ফুল তুলতে লেগে গেল। ফুলের মতো সুন্দর সেই বালিকার দেবপূজোর ফুল চয়নে আগ্রহ দেখে মনস্বীর মন মাধুর্যে ভরে উঠলো—তিনি তাকে বাধা দিলেন না।

সেই থেকে ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবপূজোর ফুল চয়ন থেকে আরম্ভ করে পূজাগৃহ মার্জনা পর্যন্ত দেবসেবার প্রায় সব কাজই সুষমা নিজের হাতে তুলে নিলে। ক্রমে ওষুধপত্র তৈরি এবং তদারকের ভারও তার হাতে এসে পড়ল।

এই রকমে কিছুকাল কাটবার পর একদিন সকালবেলা ধ্যানান্তে মনস্বী মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর পাশেই সুষমা বসে আছে—তার চোখ দুটি বন্ধ, হাত জোড় করা ঠাকুরের দিকে মুখ—ধীর স্থির যেন নিষ্পন্দ দীপশিখা।

সদ্যস্নাতা কিশোরীর এই ধ্যানমূর্তি দেখে মনস্বীর মনে হলো যেন তপস্বিনী উমা শিবের আরাধনায় বসেছেন—এতদিন শিবপূজোর ফলে তাঁর ঘরে পার্বতীর অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি নিঃশব্দে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে উঠে এলেন। ঠাকুর পরিচর্যার ভার ইতিপূর্বে সুষমা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সেদিন থেকে ঠাকুর্দার মতো সে মহেশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করলে।

এবার ঠাকুর প্রসন্ন হলেন। পঁচিশ বছর ধরে মনস্বীনাথের পূজোয় যা হয়নি সুষমার এক বছরের পূজোয় তা হলো—অর্থাৎ মহেশ্বরের টনক নড়ল।

একদিন সকালবেলায় দেখা গেল প্রবল জ্বরে সুষমা অচৈতন্যপ্রায়। মনস্বী ব্যস্ত হলেন কিন্তু সুষমা তাঁকে বললে—কিছু ভয় নেই, ঠাকুরের চরণামৃত দাও তাতেই আমার অসুখ সেরে যাবে।

মনস্বী প্রথমে ঠাকুরের চরণামৃত, তারপরে শ্রীশ্রী অমুক মহারাজের টোটকা,

তারপরে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সব ওষুধকে ব্যর্থ করে এক ব্রাহ্মমুহূর্তে মহেশ্বর সুষমাকে নিয়ে গেলেন।

মনস্বীনাথ সুষমার শোক সহ্য করতে পারলেন না। তার মৃত্যুর মুহূর্তে মনস্বীর অন্তরাত্মা চীৎকার করে উঠল—দেবতা এ কি করলে!

নাতনির শব বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উন্মাদের মতো পথে বেরিয়ে পড়লেন—এই দারণ শোকের সান্ত্বনা যেন বহির্বিশ্বে কোথায় লুকিয়ে আছে তারই সন্ধানে।

মনস্বীনাথ পথে পথে ঘুরে বেড়ান। মন্দির, মঠ, দেউলে গিয়ে দেবতাকে জানান—ঠাকুর এ কি করলে! সাধুসন্ত ফকিরকে ধরে জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় গিয়েছে তাঁর সুষমা, কি করলে তার দেখা পাব? স্নান নাই, আহার নাই, ছিন্ন বস্ত্র, নগ্নপদ। মাথার ওপর দিয়ে বর্ষাবাদল চলে যায় ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর তাপিত অন্তর নিরন্তর কাঁদিতে থাকে—দেবতা এ কি করলে! মাঝে মাঝে মনস্বীর বন্ধুবান্ধব কিংবা ছেলেরা তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই কোন ফাঁকে আবার বেরিয়ে পড়ে তিনি আগের মতো পথে পথে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

একদিন বৈশাখের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে সকলে যখন নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ধুঁকছে সেই সময় মনস্বীনাথ কোথা থেকে একরকম ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে সোজা তেতলায় উঠে ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার চরণে আছড়ে পড়লেন—দেবতা এ কি করলে! দাও দাও ফিরিয়ে দাও, সুষমাকে ফিরিয়ে দাও—না হয় আমাকেও নাও।

আকুলভাবে প্রার্থনা করতে করতে সেদিন মনস্বীর মনশ্চক্ষে তাঁর ইষ্টমূর্তি ফুটে উঠল। বিরাট, বিশাল, কল্পনাতীত সেই মূর্তির স্মিত হাসিতে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন–বৎস, আমি তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি—বল তোমার কি চাই?

আকুলকণ্ঠে মনস্বী বলে উঠলেন—প্রভু, আমি প্রিয়বিরহে কাতর—আমায় সঞ্জীবনী মন্ত্র দাও—যাতে আমি মরলোক থেকে প্রিয়জনকে অমৃতলোকে নিয়ে যেতে পারি।

মনস্বীর প্রার্থনা শুনে দেবতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাঁর লুণ্ঠিত মস্তক নিজের কোলে তুলে নিয়ে তাঁর কানে অমৃতমন্ত্র দিতে লাগলেন। মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত সেই অমৃতমন্ত্র শুনতে শুনতে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালবেলা দেখা গেলো ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা, মনস্বীনাথ নেই। তিনি লিখে গেছেন—আমি সঞ্জীবনীর সন্ধান পেয়েছি—তারই খোঁজে চললুম হিমালয়ের গভীরে—আমার খোঁজ কোরো না।

—:—